ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী'বসন
দরিদ্রের বল।
"একধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল!

১৮

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজি!
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে।

নৌকাডুবি।

৪৪

সভাভঙ্গের পর অন্নদা হেমনলিনীকে লইয়া যখন ঘরে ফিরিলেন, তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। চা খাইতে বসিয়া অন্নদাবাবু কহিলেন, "আজ বড় আনন্দলাভ করিয়াছি!" ইহার অধিক আর তিনি কথা কহিলেন না,—তাঁহার মনের ভিতরের দিকে একটা ভাবের স্রোত বহিতেছিল।

আজ চা খাওয়ার পরেই হেমনলিনী আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেল, অন্নদাবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

আজ সভাস্থলে—নলিনাক্ষ—যিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে আশ্চর্য্য তরুণ এবং সুকুমার; যুবাবয়সেও যেন শৈশবের অম্লানলাবণ্য তাহার মুখশ্রীকে পরিত্যাগ করে নাই, অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটি ধ্যানপরতার গাম্ভীর্য্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার দুই চক্ষু অন্তর্দৃষ্টির সুদূরগামিতার মধ্যে নিমগ্ন। তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিয়ম-সংযমের দ্বারা তিনি নিয়ত সাধনশীল, অথচ তাঁহার মুখের ভাব একটি সহজ প্রসন্নতার দ্বারা দীপ্যমান।

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ক্ষতি"। তিনি বলিয়াছিলেন, সংসারে যে ব্যক্তি কিছু হারায় নাই, সে কিছু পায় নাই। অমনি

যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না, ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখনি যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা-কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ্, তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে, সে লোক দুর্ভাগা; বরঞ্চ তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা মানবচিত্তের আছে। যাহা আমার যায়, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করজোড় করিয়া বলিতে পারি, "আমি দিলাম, আমার ত্যাগের দান, আমার দুঃখের দান, আমার অশ্রুর দান"—তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের উপকরণমাত্র ছিল, তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের দেবমন্দিরের রত্নভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকে।

এই কথাগুলি আজ হেমনলিনীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বাজিতেছে। ছাদের উপরে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের তলে সে আজ স্তব্ধ হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত মন আজ পূর্ণ সমস্ত আকাশ, সমস্ত জগৎসংসার তাহার কাছে আজ পরিপূর্ণ।

বক্তৃতাসভা হইতে ফিরিবার সময় যোগেন্দ্র কহিল, "অক্ষয়, তুমি বেশ পাত্রটি সন্ধান করিয়াছ যা হোক্! এ ত সন্ন্যাসী! এর অর্দ্ধেক কথা ত আমি বুঝিতেই পারিলাম না!"

অক্ষয় কহিল, "রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। হেমনলিনী রমেশের ধ্যানে মগ্ন আছেন—সে ধ্যান সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের মত সহজ লোকে ভাঙাইতে পারিবে না। যখন বক্তৃতা চলিতেছিল, তখন তুমি কি হেমের মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই?"

যোগেন্দ্র। দেখিয়াছি বই কি। ভাল লাগিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু বক্তৃতা ভাল লাগিলেই যে বক্তাকে বরমাল্য দেওয়া সহজ হয়, তাহার কোনো হেতু দেখি না।

অক্ষয়। ঐ বক্তৃতা কি আমাদের মত কাহারো মুখে শুনিলে ভাল লাগিত? তুমি জান না যোগেন্দ্র, তপস্বীর উপর মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে। সন্ন্যাসীর জন্য উমা তপস্যা করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহা কাব্যে লিখিয়া গেছেন। আমি তোমাকে বলিতেছি, আর যে কোনো পাত্র তুমি খাড়া করিবে, হেমনলিনী রমেশের সঙ্গে মনে মনে তাহার তুলনা করিবে—সে তুলনায় কেহ টিঁকিতে পারিবে না। নলিনাক্ষ মানুষটি সাধারণ লোকের মতই নয়—ইহার সঙ্গে তুলনার কথা মনেই উদয় হইবে না। অন্য কোনো যুবককে হেমনলিনীর সম্মুখে আনিলেই তোমাদের উদ্দেশ্য সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কিন্তু নলিনাক্ষকে বেশ একটু কৌশল করিয়া যদি এখানে আনিতে পার, তাহা হইলে হেমের মনে কোনো সন্দেহ উঠিবে না,—তাহার পরে ক্রমে শ্রদ্ধা হইতে মাল্যদান পর্য্যন্ত কোনোপ্রকারে চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত শক্ত হইবে না।

যোগেন্দ্র। কৌশলটা আমার দ্বারা ভাল

ঘটিয়া ওঠে না —বলটাই আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু যাই বল, পাত্রটি আমার পছন্দ হইতেছে না।

অক্ষয়। দেখ যোগেন, তুমি নিজের জেদ লইয়া সমস্ত মাটি করিয়ো না! সকল সুবিধা একত্রে পাওয়া যায় না। যেমন করিয়া হোক্, রমেশের চিন্তা হেমনলিনীর মন হইতে না তাড়াইতে পারিলে আমি ত ভাল বুঝি না। তুমি যে গায়ের জোরে সেটা করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনেও করিয়ো না। আমার পরামর্শ অনুসারে যদি ঠিকমত চল, তাহা হইলে তোমাদের একটা সদ্গতি হইতেও পারে।

যোগেন্দ্র। আসল কথা, নলিনাক্ষ আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্ব্বোধ। এরকম লোকদের লইয়া কারবার করিতে আমি ভয় করি। একটা দায় হইতে উদ্ধার হইতে গিয়া ফের আর-একটা দায়ের মধ্যে জড়াইয়া পড়িব!

অক্ষয়। ভাই, তোমরা নিজের দোষে পুড়িয়াছ—আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া আতঙ্ক লাগিতেছে! রমেশসম্বন্ধে তোমরা যে গোড়াগুড়ি একেবারে অন্ধ ছিলে! এমন ছেলে আর হয় না—ছলনা কাহাকে বলে, রমেশ তাহা জানে না—দর্শনশাস্ত্রে রমেশ দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য বলিলেই হয়, আর সাহিত্যে স্বয়ং সরস্বতীর উনবিংশশতাব্দীর পুরুষ-সংস্করণ! রমেশকে প্রথম হইতেই আমার ভাল লাগে নাই—ঐরকম অত্যুচ্চ-আদর্শ-ওয়ালা লোক আমার বয়সে আমি ঢের-ঢের দেখিয়াছি! কিন্তু আমার কথাটি কহিবার জো ছিল না—তোমরা জানিতে, আমার মত অযোগ্য অভাজন কেবল মাহাত্ম্য-লোকদের ঈর্ষা করিতেই জানে, আমাদের আর-কোনো ক্ষমতা নাই। যা হোক্, এতদিন পরে বুঝিয়াছ, মহাপুরুষদের দূর হইতে ভক্তি করা চলে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের সম্বন্ধ করা নিরাপদ্ নহে। কিন্তু 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।' যখন এই একটিমাত্র উপায় আছে, তখন আর এ লইয়া খুঁৎখুঁৎ করিতে বসিয়ো না!

যোগেন্দ্র। দেখ অক্ষয়, তুমি যে আমাদের সকলের আগে রমেশকে চিনিতে পারিয়াছিলে, এ কথা হাজার বলিলেও আমি বিশ্বাস করিব না। তখন নিতান্ত গায়ের জ্বালায় তুমি রমেশকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতে না—সেটা যে তোমার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয়, তাহা আমি মানিব না। যাই হোক্, কলকৌশলের যদি প্রয়োজন থাকে, তবে তুমি লাগো, আমার দ্বারা হইবে না। মোটের উপরে নলিনাক্ষকে আমার ভালই লাগিতেছে না।

যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় উভয়ে যখন অন্নদার চা খাইবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল, দেখিল, হেমনলিনী ঘরের অন্তদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। অক্ষয় বুঝিল, হেমনলিনী তাহাদিগকে জান্‌লা দিয়া পথেই দেখিতে পাইয়াছিল। ঈষৎ একটু হাসিয়া সে অন্নদার কাছে আসিয়া বসিল। চায়ের পেয়ালা ভর্ত্তি করিয়া লইয়া কহিল—"নলিনাক্ষবাবু যাহা বলেন, একেবারে প্রাণের ভিতর হইতে বলেন, সেইজন্য তাঁহার কথাগুলা এত সহজে প্রাণের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"লোকটির ক্ষমতা আছে।"

অক্ষয় কহিল—"শুধু ক্ষমতা! এমন সাধু-চরিত্রের লোক দেখা যায় না।"

যোগেন্দ্র যদিও চক্রান্তের মধ্যে ছিল, তবু সে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"আঃ, সাধুচরিত্রের কথা আর বলিয়ো না—সাধুসঙ্গ হইতে ভগবান্ আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন্!"

যোগেন্দ্র কাল এই নলিনাক্ষের সাধুতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিল—এবং যাহারা নলিনাক্ষের বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহাদিগকে নিন্দুক বলিয়া গালি দিয়াছিল!

অন্নদা কহিলেন, "ছি যোগেন্দ্র, অমন কথা বলিয়ো না! বাহির হইতে যাঁহাদিগকে ভাল বলিয়া মনে হয়, অন্তরেও তাঁহারা ভাল, এ কথা বিশ্বাস করিয়া বরং আমি ঠকিতে রাজি আছি, তবু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্তার গৌরবরক্ষার জন্য সাধুতাকে সন্দেহ করিতে আমি প্রস্তুত নই। নলিনাক্ষবাবু যে সব কথা বলিয়াছেন, এ সমস্ত পরের মুখের কথা নহে;—তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার পক্ষে আজ তাহা নূতন লাভ বলিয়া মনে হইয়াছে। যে ব্যক্তি কপট, সে ব্যক্তি সত্যকার জিনিষ দিবে কোথা হইতে? সোনা যেমন বানানো যায় না, এ সব কথাও তেম্‌নি বানানো যায় না! আমার ইচ্ছা হইয়াছে, নলিনাক্ষবাবুকে আমি নিজে গিয়া সাধুবাদ দিয়া আসিব।"

অক্ষয় কহিল—"আমার ভয় হয়, ইঁহার শরীর টেঁকে কি না?"

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কেন, ইঁহার শরীর কি ভাল নয়?"

অক্ষয়। ভাল থাকিবার ত কথা নয়—দিনরাত্রি আপনার সাধনা এবং শাস্ত্রালোচনা লইয়াই আছেন, শরীরের প্রতি ত আর দৃষ্টি নাই।

অন্নদা কহিলেন—"এটা ভারি অন্যায়! শরীর নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের নাই—আমরা আমাদের শরীর সৃষ্টি করি নাই। আমি যদি উঁহাকে কাছে পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই অল্পদিনেই আমি উঁহার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতাম। আসলে স্বাস্থ্যরক্ষার গুটিকতক সহজ নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে প্রথম হচ্চে—"

যোগেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া কহিল—"বাবা, বৃথা কেন তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ! নলিনাক্ষবাবুর শরীর ত দিব্য দেখিলাম,—তাঁহাকে দেখিয়া আজ আমার বেশ বোধ হইল, সাধুত্ব-জিনিষটা স্বাস্থ্যকর। আমার নিজেরই মনে হইতেছে, ওটা চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয়।"

অন্নদা কহিলেন—"না যোগেন্দ্র, অক্ষয় যাহা বলিতেছে, তাহা হইতেও পারে। আমাদের দেশে বড় বড় লোকেরা প্রায় অল্পবয়সেই মারা যান—ইঁহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া দেশের লোকসান করিয়া থাকেন। এটা কিছুতে ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। যোগেন্দ্র, তুমি নলিনাক্ষবাবুকে যাহা মনে করিতেছ, তাহা নয়, উঁহার মধ্যে আসল জিনিষ আছে। উঁহাকে এখন হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার।"

অক্ষয়। আমি উঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিব। আপনি যদি উঁহাকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন ত

ভাল হয়। আর, আমার মনে হয়, আপনি সেই যে শিকড়ের রসটা আমাকে পরীক্ষার সময় দিয়াছিলেন, সেটা আশ্চর্য্য বলকারক। যে কোনো লোক সর্ব্বদা মনকে খাটাইতেছে, তাহার পক্ষে এমন মহৌষধ আর নাই। আপনি যদি একবার নলিনাক্ষবাবুকে—

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া-পড়িয়া কহিল—"আঃ, অক্ষয়, তুমি জ্বালাইলে। বড় বাড়াবাড়ি করিতেছ! আমি চলিলাম!

৪৫

অপরাহ্ণের দিকে দোতলায় বসিবার ঘরে অন্নদাবাবু একটা কেদারার উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—পাশে একটি ছোট চৌকিতে বসিয়া হেমনলিনী তাহার পিতার জন্য নূতন বালিশের ওয়াড় তৈরি করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার উদ্বিগ্নচিত্তে নিদ্রিত অন্নদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। খোলা জান্‌লা দিয়া তাঁহার মুখের উপর যে আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোতে আজ অন্নদাবাবুর মুখ স্পষ্টই হল্‌দে দেখাইতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মুখে জরার চিহ্নগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজকাল প্রত্যহ বেলা দুটো-তিনটের পর তাঁহাকে ঘুমে অভিভূত করিয়া ফেলে, হাজার কাজ থাকিলেও তিনি আপনাকে জাগাইয়া রাখিতে পারেন না;—হেমনলিনীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতেও তাঁহার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে। এমন কি, সকালবেলাতেও প্রায় মাঝে মাঝে দেখা যায়, চৌকিতে বসিয়া একখানা বই হাতে করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যহ নিয়মিত বেড়াইতে যাইতেন, এখন আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই —এখন ঘর হইতে বাহির হইতে ক্লান্তি ও অনিচ্ছা বোধ হয়। পূর্ব্বে যখন তাঁহার শরীর ভাল ছিল, তখন তিনি ডাক্তারি ও কবিরাজি নানাপ্রকার বটিকাদি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন—এখন আর ওষুধ খাইবারও উৎসাহ নাই—এবং নিজের অস্বাস্থ্য লইয়া আজকাল তিনি আর আলোচনা-মাত্রও করেন না, বরঞ্চ তাহা গোপন করিতেই চেষ্টা করেন।

হেমনলিনী আজকাল আর তাঁহার কাছছাড়া হয় না। তাঁহারি কাজে তাহার দিন কাটিয়া যায়। অন্নদাবাবু তাঁহার শয়নঘরে গিয়া দেখেন, প্রায় প্রত্যহই তাঁহার ঘরের ছোটখাট পরিবর্ত্তন হইতেছে। একদিন দেখিলেন, চোখে আলো লাগে বলিয়া তাঁহার জান্‌লাগুলিতে সবুজ ছিটের ছোট ছোট পরদা খাটানো হইয়াছে। একদিন দেখিলেন, তাঁহার বসিবার কেদারায়, যে জায়গাটাতে মাথার তেল লাগিয়া কালো হইয়া গিয়াছিল, সেখানে ফুলের কাজ-করা কাপড়ের আবরণ পড়িয়াছে। তাঁহার চিরকেলে টিপাইটার উপর একটা পশমের টিপাইঢাকা কোথা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শোবার ঘরের প্রবেশদ্বারের জন্য একটা নানারঙের পুঁথির পরদাও যে তৈরি হইতেছে, তাহারও সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। পূর্ব্বে বাহির হইবার সময় অন্নদাবাবু তাঁহার জামা-চাদরের ছিদ্রপ্রভৃতিসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না—এখন এ সকল বিষয়ে তাঁহার নিজের স্বাধীনতা আর চলিতেছে না। অন্নদাবাবু বলেন, "মা হেম আমাকে আমার

এই শেষবয়সে সৌখীন করিয়া তুলিতেছে—লোকে দেখিলে হাসিবে যে!”

আজ তাহার পিতা যখন কেদারায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তখন সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া হেমনলিনী কোল হইতে শেলাইয়ের সামগ্রী নামাইয়া তাহার দাদাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য দ্বারের কাছে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দাদার সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে পালাইবার উপক্রম করিতেই যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া কহিল—“হেম, নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, ইঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিই।”

হেম থমকিয়া দাঁড়াইল এবং নলিনাক্ষ তাহার সম্মুখে আসিতেই তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু জাগিয়া-উঠিয়া ডাকিলেন—“হেম।” হেম তাঁহার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন।”

যোগেন্দ্রের সহিত নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিতেই অন্নদাবাবু ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া নলিনাক্ষকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। কহিলেন, “আজ আমার বড় সৌভাগ্য,—আপনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। হেম, কোথায় যাইতেছ মা, এইখানে বোস। নলিনাক্ষবাবু, এটি আমার কন্যা হেম,—আমরা দুজনেই সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিতে গিয়া বড় আনন্দলাভ করিয়া আসিয়াছি। আপনি ঐ যে একটি কথা বলিয়াছেন, আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা কখনোই হারাইতে পারি না, যাহা যথার্থ পাই নাই তাহাই হারাই—এ কথাটির অর্থ বড় গভীর—কি বল মা হেম? বাস্তবিক কোন্ জিনিষটিকে যে আমার করিতে পারিয়াছি, আর কোন্‌টিকে পারি নাই, তাহার পরীক্ষা হয় তখনি, যখনি তাহা আমাদের হাতের কাছ হইতে সরিয়া যায়। নলিনাক্ষবাবু, আপনার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। মাঝে মাঝে আপনি আসিয়া যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যান, তবে আমাদের বড় উপকার হয়। আমরা বড় কোথাও বাহির হই না—আপনি যখনি আসিবেন, আমাকে আর আমার মেয়েটিকে এই ঘরেই দেখিতে পাইবেন।”

নলিনাক্ষ আলজ্জিত হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল—“আমি বক্তৃতা-সভায় বড় বড় কথা বলিয়া আসিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে মস্ত একটা গম্ভীরলোক মনে করিবেন না। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশিতে খুব ভালবাসি, গল্পগুজব করিয়া বেড়াই—অন্নদাবাবু যে আলোচনার কথা বলিতেছেন, আমার যদি সে সমস্ত অভ্যাস থাকিত, তবে লোকে আমার কাছে ঘেঁষিত না। সেদিন ছাত্ররা নিতান্ত ধরিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম—অনুরোধ এড়াইবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই—কিন্তু এমন করিয়া বলিয়া আসিয়াছি যে, দ্বিতীয়বার অনুরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা আমার নাই। ছাত্ররা স্পষ্টই বলিতেছে, আমার বক্তৃতা বারো-আনা বোঝাই যায় নাই। যোগেনবাবু, আপনিও ত সেদিন উপস্থিত ছিলেন—আপনাকে সতৃষ্ণনয়নে ঘড়ির দিকে তাকাইতে দেখিয়া আমার হৃদয় যে বিচলিত হয় নাই, এ কথা মনে করিবেন না!”

যোগেন্দ্র কহিল—"আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই, সেটা আমার বুদ্ধির দোষ হইতে পারে, সেজন্য আপনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবেন না।"

অন্নদা। যোগেন, সব কথা বুঝিবার বয়স সব নয়।

নলিনাক্ষ। সব কথা বুঝিবার দরকারও সব সময়ে দেখি না। যাহার জলের এখনো দরকার পড়ে নাই, এমন সহস্র উদাসীন লোকের সম্মুখ দিয়া নদীর ধারা অবশেষে একজন তৃষার্ত্তের জলপাত্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেজন্য নদী কখনো খেদ করে না। কার কাজে লাগি, আর কার কাজে লাগি না, সে কথা লইয়া আন্দোলন করিয়া কষ্ট পাইবার দরকার কি? নিজের গরজে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, তাহার সার্থকতা লইয়া কাহারো সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্নদা। কিন্তু নলিনবাবু, আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে। ঈশ্বর আপনাদিগকে কাজ করাইয়া লইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, তাই বলিয়া শরীরকে অবহেলা করিবেন না। যাঁহারা দাতা, তাঁহাদের এ কথা সর্ব্বদাই স্মরণ করাইতে হয় যে, মূলধন নষ্ট করিয়া ফেলিবেন না, তাহা হইলে দান করিবার শক্তি চলিয়া যাইবে।

নলিনাক্ষ। আপনি যদি আমাকে কখনো ভাল করিয়া জানিবার অবসর পান, তবে দেখিবেন, আমি সংসারে কোনো-কিছুকেই অবহেলা করি না। জগতে নিতান্তই ভিক্ষুকের মত আসিয়াছিলাম, বহুকষ্টে বহু লোকের আনুকূল্যে শরীরমন অল্পে অল্পে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। আমার পক্ষে এ নবাবী শোভা পায় না যে, আমি কিছুকেই অবহেলা করিয়া নষ্ট করিব। যে ব্যক্তি গড়িতে পারে না, সে ব্যক্তি ভাঙিবার অধিকারী ত নয়!

অন্নদা। বড় ঠিক কথা বলিয়াছেন। আপনি কতকটা এইভাবের কথাই সেদিন-কার প্রবন্ধেও বলিয়াছিলেন।

নলিনাক্ষ। আমি বলিয়াছিলাম—সংসারের জিনিষগুলিও আমার জন্য বসিয়া থাকে না, সময়ও আমার জন্য অপেক্ষা করে না। এমন অবস্থায় কেবল ক্ষতির উপরেই সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকিলে তার চেয়ে অনেক বৃহৎ জিনিষ হইতে আপ-নাকে বঞ্চিত করা হয়। আমরা এত বড় ধনী নই যে, এই সংসারের ঐশ্বর্য্য আমরা এম্নি করিয়াই অগ্রাহ্য করিতে পারি! অন্নদাবাবু, আমি আনন্দকেই ঈশ্বরের পূজা বলিয়া জানি। খেদ-আক্ষেপ-পরিতাপ লইয়া যেদিন বিশ্ব-দেবালয়কে মলিন করিয়া ফেলি, সেদিন আর-যাহা-কিছু হারাইয়াছে, সেই সঙ্গে ভগ-বান্‌কেও হারাই। আমি নিরানন্দ লইয়া অধিকক্ষণ কারবার করিতে সাহস করি না।

যোগেন্দ্র। আপনারা বসুন্, আমি চলিলাম—একটু কাজ আছে!

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, আপনি কিন্তু আমাকে মাপ করিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, লোককে অতিষ্ঠ করা আমার স্বভাব নয়! আজ অন্নদাবাবু নিতান্ত উত্তেজিত করিয়া আমাকে লোকসমাজের পক্ষে অসহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আজ না হয় আমি উঠি! চলুন্, খানিকটা রাস্তা আপনার সঙ্গে যাওয়া যাক্!

যোগেন্দ্র। না না, আপনি বসুন্। আমার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। আমি কোথাও বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

অন্নদা। নলিনাক্ষবাবু, যোগেনের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। যোগেন এম্‌নি, যখন খুসি আসে, যখন খুসি যায়, উহাকে ধরিয়া রাখা শক্ত।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিনবাবু, আপনি এখন কোথায় আছেন ?"

নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল—"আমি যে বিশেষ কোথাও আছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার জানাশুনা লোক অনেক আছেন, তাঁহারা আমাকে টানাটানি করিয়া লইয়া বেড়ান। আমার সে মন্দ লাগে না - কিন্তু মানুষের চুপ করিয়া থাকারও প্রয়োজন আছে। তাই যোগেনবাবু আমার জন্য আপনাদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতেই স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ গলিটি বেশ নিভৃত বটে।"

এই সংবাদে অন্নদাবাবু বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন ত দেখিতে পাইতেন যে, কথাটা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর মুখ ক্ষণকালের জন্য বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। ঐ পাশের বাসাতেই রমেশ ছিল।

ইতিমধ্যে চা-তৈরির খবর পাইয়া সকলে মিলিয়া নীচে চা খাইবার ঘরে গেলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, নলিনবাবুকে একপেয়ালা চা দাও।"

নলিনাক্ষ কহিল, "না অন্নদাবাবু, আমি চা খাইব না।"

অন্নদা। সে কি কথা নলিনবাবু! এক-পেয়ালা চা—না হয় ত কিছু মিষ্টি খান্।

নলিনাক্ষ। আমাকে মাপ করিবেন।

অন্নদা। আপনি ডাক্তার, আপনাকে আর কি বলিব। মধ্যাহ্নভোজনের তিন-চার-ঘণ্টা পরে চায়ের উপলক্ষ্যে খানিকটা গরমজল খাওয়া হজমের পক্ষে যে নিতান্ত উপকারী। অভ্যাস না থাকে যদি, আপনাকে না হয় খুব পাৎলা করিয়া চা তৈরি করিয়া দিই।

নলিনাক্ষ চকিতের মধ্যে হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, হেম-নলিনী নলিনাক্ষের চা খাইতে সঙ্কোচসম্বন্ধে একটা কি আন্দাজ করিয়াছে এবং তাহাই লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া নলিনাক্ষ কহিল—"আপনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আপনাদের এই চায়ের টেবিল্‌কে আমি ঘৃণা করিতেছি বলিয়া মনেও করিবেন না। পূর্ব্বে আমি যথেষ্ট চা খাইয়াছি—চায়ের গন্ধে এখনো আমার মনটা উৎসুক হয়- আপনাদের চা খাইতে দেখিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি। কিন্তু আপ-নারা বোধ হয় জানেন না, আমার মা অত্যন্ত আচারপরায়ণা—আমি ছাড়া তাঁহার যথার্থ আপনার কেহ নাই—সেই মার কাছে আমি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারিব না। এইজন্ত আমি চা খাই না। কিন্তু আপনারা চা খাইয়া যে সুখটুকু পাইতেছেন, আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। আপনাদের আতিথ্য হইতে আমি বঞ্চিত নহি।"

ইতিপূর্ব্বে নলিনাক্ষের কথাবার্ত্তায় হেমনলিনী মনে মনে একটু যেন আঘাত পাইতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, নলিনাক্ষ নিজেকে তাহাদের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করিতেছিল না। সে কেবলি বেশি কথা কহিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছিল। হেমনলিনী জানিত না, প্রথম পরিচয়ে নলিনাক্ষ একটা একান্ত সঙ্কোচের ভাব কিছুতেই তাড়াইতে পারে না। এইজন্য নূতন লোকের কাছে অনেকস্থলেই সে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে জোর করিয়া প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে। নিজের অকৃত্রিম মনের কথা বলিতে গেলেও তাহার মধ্যে একটা বেসুর লাগাইয়া বসে। সেটা নিজের কানেও ঠেকে। সেইজন্যই আজ যোগেন্দ্র যখন অধীর হইয়া উঠিয়া পড়িল, তখন নলিনাক্ষ মনের মধ্যে একটা ধিক্কার অনুভব করিয়া তাহার সঙ্গে পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু নলিনাক্ষ যখন মার কথা বলিল, তখন হেমনলিনী শ্রদ্ধার চক্ষে তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না, এবং মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্ত্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরস ভক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নলিনাক্ষের মাতার সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু সঙ্কোচে তাহা পারিল না।

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ! এ কথা পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই আপনাকে চা খাইতে অনুরোধ করিতাম না। মাপ করিবেন!"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "চা লইতে পারিলাম না বলিয়া আপনাদের স্নেহের অনুরোধ হইতে কেন বঞ্চিত হইব?"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে হেমনলিনী তাহার পিতাকে লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া বসিল এবং বাংলা মাসিকপত্রিকা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে অন্নদাবাবু অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে অন্নদাবাবুর শরীরে এইরূপ অবসাদের লক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

অন্নদাবাবু ঘুমাইয়া পড়িতেই আজ হেমনলিনী নিঃশব্দপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদের উপর উঠিল। হেমন্তের সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশে আজ বর্ণচ্ছটা নাই। কলিকাতার ধূলিমিশ্রিত ঘনধূম্র বাষ্পের ভিতর দিয়া অত্যন্ত মলিন তাম্রবর্ণ সূর্য্যাস্তের আভা অভিভূত হইতেছে।

ছাদের প্রান্তপ্রাচীরে ভর দিয়া হেমনলিনী পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। আজ ঘরের জান্‌লাগুলি খোলা; এতদিনের রুদ্ধঘরে বায়ুচালনার চেষ্টা করা হইতেছে। ঘরগুলি যেন এতকাল যে পুরাতনের বদ্ধস্মৃতিকে বুকে চাপিয়া-ধরিয়া বাহিরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সেই স্মৃতিকে আজ অনন্ত আকাশ, বাতাস ও আলোকের মধ্যে বিদায় দিবার জন্য বক্ষঃকপাট উন্মুক্ত করিয়াছে। হেমনলিনী সেই মুক্তবাতায়ন ঘরগুলির শূন্যতা ও অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধকার এই সায়ন্তনকালের বাষ্পস্তরভেদী ম্লানকরুণ রশ্মিরেখার ন্যায়, তাহার ব্যাকুলদৃষ্টি প্রেরণ করিল।

দিনান্তের শেষ আলোটুকু যখন অবসন্ন হইয়া গেল, তখন সেই অন্ধকারে হঠাৎ পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া হেমনলিনী চকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, তুমি একলা ছাদে আসিয়াছ? আজ আমার কেমন-একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, কিছু টের পাই নাই।"

প্রত্যহই যে তাঁহার তন্দ্রা আসে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিরুদ্ধেও তাহা অন্নদাবাবু অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন হেমনলিনীও এমন চুপ করিয়া থাকে, যেন সে তাঁহার ঘুম লক্ষ্যই করে নাই।

অন্নদাবাবুকে দেখিয়া হেম আজ অত্যন্ত লজ্জিত হইল। অন্নদাবাবুরও মনের মধ্যে একটা ঘা লাগিল। রমেশের ব্যাপারটা ক্রমে হেমনলিনীর জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, এই আশা করিয়া কয়দিন তাঁহার হৃদয়টা লঘু হইয়া আসিয়াছিল—আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে হেমকে একলা ছাদের উপর দেখিয়া আবার তাঁহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। হেম তাহা শুনিতে পাইল। সেই দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে এই বৃদ্ধের যে একটি ক্লান্তি ও পরাভবের নৈরাশ্য বাজিয়া উঠিল, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই হেমনলিনীর নয়নপল্লব আর্দ্র করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সে পিতার কাছে আসিয়া কহিল, "বাবা, চল আমাদের বসিবার ঘরে যাই—এখানে হিম পড়িতেছে।"

অন্নদাবাবু কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিলেন ও চুপ করিয়া অভ্যস্ত কেদারাটির উপরে বসিলেন। হেমনলিনী তাঁহার পাশে একটি চৌকি টানিয়া আনিয়া বসিল ও তাড়াতাড়ি একটা-কোনো কথোপকথনের প্রসঙ্গ তুলিবার জন্য বলিল—"বাবা, নলিনাক্ষবাবু কেমন চমৎকার লোক!"

নলিনাক্ষবাবুকে হেমনলিনীর ঠিক এতটা চমৎকার ঠেকে নাই—কিন্তু নিজের মনের বিষণ্ণতা অপ্রমাণ করিবার জন্য কথাটাতে কিছু অতিরিক্ত উদ্যম প্রয়োগ করিয়া বসিল। এ কথা যেন কেহ না বলে যে, পৃথিবীতে সকল লোক এবং সকল জিনিষের উপরেই হেমনলিনীর ঔদাসীন্য জন্মিয়া গেছে।

অন্নদাবাবুও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "ছেলেটিকে আমারও বড় ভাল লাগিয়াছে। বয়সে বোধ করি আমার যোগেনেরই সমান হইবে, কিন্তু মুখ দেখিলে যেন বালক বোধ হয়। অথচ চোখদুটো দেখিয়াছ হেম। আমি ত এমন চোখ দেখি নাই। তাহার চোখে তাকাইয়া আমার কি-একটা মনে হইতে লাগিল বলিতে পারি না। তুমি লক্ষ্য কর নাই?"

হেম কহিল—"না বাবা, আমি ঠিক তাঁর চোখের দিকে তেমন করিয়া চাহি নাই, কিন্তু তাঁহার হাসিটি বড় প্রসন্ন।"

অন্নদা। ঠিক বলিয়াছ, তাঁহার হাসির একটা বিশেষত্ব আছে বটে। মনে হয় যেন, যাহা-কিছু দেখিতেছেন, সকল হইতেই একটা প্রসন্নতা প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার মুখের উপরে আসিয়া পড়িতেছে।

হেম কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে কোনো লোকেরই সম্বন্ধে অন্নদাবাবু এ-পরিমাণ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করেন নাই।

এমন কি, হেমনলিনীর মনে ঈষৎ-একটু ঈর্ষার সঞ্চার হইল—সে ঈর্ষা নিজেকে লইয়া, কি রমেশকে লইয়া, তাহা বলা শক্ত। রমেশের প্রতি অন্নদাবাবুর শ্রদ্ধা ছিল বটে, কিন্তু এমনতর মুগ্ধভাবের স্নেহ ছিল না। রমেশ যে তাঁহার অন্তঃকরণকে তেমন গভীরতর স্থানে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, তাহা নহে।

অন্নদা। নলিনাক্ষবাবু যে আমাদের পাশের বাড়ীটি লইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় খুসি হইয়াছি।

হেমনলিনী। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে বড় বেশি বিরক্ত করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ত তিনি টিঁকিতে পারিবেন না। তিনি নির্জ্জন মনে করিয়াই এই গলির মধ্যে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছেন।

অন্নদা। দেখ হেম, নলিনাক্ষবাবুদের মত লোক নিজেরা যাহা চান, তাহাই যে নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পাইবেন, বিধাতা তাঁহাদের ললাটে এমনটা লেখেন নাই। তাঁহার কাছ হইতে আমরা যাহা চাই, তাহা তাঁহার এড়াইবার জো নাই। আমরা তাঁহাকে বিরক্ত যদি করি, তবে সে তাঁহাকে সহিতেই হইবে। এরকম লোক বাড়ীর কর্ত্রীর মত আগে সকলের আহার শেষ হইলে তবে নিজের আহারে বসিতে পারেন—বেলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া অতিথিকে ফিরাইতে পারেন না।

যখন-তখন যাহাকে-তাহাকে লইয়া অন্নদাবাবুকে এরূপ কেহ মাতিয়া উঠিতে দেখে নাই—বরঞ্চ তিনি সাধারণত খ্যাত লোকদিগকেও যথেষ্ট খ্যাতি দিতে কৃপণতা করেন। এইজন্য তাঁহার এই ভক্তির সহজ উচ্ছ্বাস হেমনলিনাকে স্পর্শ করিল। তখন হেমনলিনী নলিনাক্ষকে সাধারণ মনুষ্যশ্রেণী হইতে তফাত করিয়া আপনার অঙ্কুরিত ঈর্ষাকে দলন করিয়া ফেলিল ও ক্রমশই কথাপ্রসঙ্গে অন্নদাবাবুর উৎসাহ বিনা বিরোধে তাহার হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, চল একবার ও বাড়ীটা দেখিয়া আসি। কাল নলিনবাবু ওখানে আসিবেন, দেখি, সমস্ত পরিষ্কার করা হইয়াছে কি না।"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে কহিল, "এখন অন্ধকার হইয়া গেছে, এখন কি ভাল দেখা যাইবে?"

হেমের অনিচ্ছা দেখিয়া অন্নদাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা থাক্, কাল সকালে গিয়া দেখিয়া আসিব।"

ইহার পরে ক্ষণকাল কোনো কথা হইল না। হঠাৎ হেম উঠিয়া কহিল, "চল বাবা, বাড়ীটা দেখিয়া আসি গে।"

এই বলিয়া, যেখানে বেদনা, সেইখানেই হেম অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত আঘাত করিতে প্রস্তুত হইল।

ক্রমশ।

শুভযাত্রা।

শুক্ল হেমন্তের রাত্রি অবসানপ্রায়,
হিমক্লিষ্ট চাঁদখানি অস্তে যায় যায়।
সুখময়-শারদীয়-অবসর-শেষে
শুভযাত্রা করি' পুন ফিরিব বিদেশে।

অবিশ্রান্ত কলস্বরে গাহি নিরবধি,
ধৌত করি সৌধমূল বহে পূর্ণা নদী।
তরণী প্রস্তুত ঘাটে,—প্রস্তুত সকলি;
মাঝিগণ দিল সাড়া দুর্গা দুর্গা বলি'।
বরষাসঞ্চিত গর্ব্বে পূর্ণ কূলে কূলে
দুলায়ে দুলায়ে তরি স্রোতস্বিনী দুলে।
বহিল বিভাতবায়ু হিমকণা হানি'।
শীতাঙ্কিত-তনু-'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
শয্যালীন পুরবাসী তন্দ্রাতুর সুখে;
অশান্তি জাগিছে শুধু দুইখানি বুকে।
'সূর্য্য-অভ্যুদয়ে যাত্রা'—তার পর নাকি
পড়িবে 'অদিন';—আর আধঘণ্টা বাকি।
ভৃত্য আসি কহে দ্বারে—"প্রস্তুত সকলি;"
তাড়াতাড়ি উঠিলাম সুখশয্যা ভুলি'।
—সকলি প্রস্তুত? কিন্তু বিদায় যে বাকি!
কম্পান্বিত হাতখানি প্রিয়াহস্তে রাখি'
রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম, "তবে আমি আসি।"
—অমনি নয়ন গেল অশ্রুজলে ভাসি';
বহিয়া কপোল বক্ষ তিতিয়া বসন
বিগলিত প্রণয়ের সুধাপ্রস্রবণ!
নারিনু যাইতে ছাড়ি'—বসিনু আবার;
অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি চুম্বি' বারবার,
কত না সান্ত্বনাবাণী কহিনু কাতরে,
ভৃত্য ডাকি' কহে পুন উচ্চকণ্ঠস্বরে—
"কর্ত্তা পাঠালেন বলি'—'আর দেরি নাই'"—
"এই আসি বল্ গিয়ে"—"প্রিয়ে তবে যাই?"
আবার সে কণ্ঠখানি আসিল জড়ায়ে;
বাষ্পাকুল নেত্র হ'তে আর্দ্রপক্ষ্মচ্ছায়ে
আবার জাগিল অশ্রু আকুল উচ্ছ্বাসে।
—দোয়েল উঠিল ডাকি' বাতায়নপাশে।
"বিদায় বিদায় তবে।" মৃদুকণ্ঠস্বরে,
শুনিলাম "এস তবে" কম্পিত মর্ম্মরে।
এবার বাজিল কর্ণে দৃঢ় রুক্ষরবে—
"কিসের বিলম্ব এত, কতক্ষণ হবে?"
সূর্য্যোদয়ে 'মহাদণ্ডা'-দোষের সঞ্চার;
সমাজদেবের আজ্ঞা—"যাত্রা নাহি আর।"
হৃদয়দেবতা হাসি' কহিল উত্তরে,
"প্রসন্ন বিদায়দৃষ্টি সর্ব্বদোষ হরে।"

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলি' নৌকা দিনু খুলি';
অশুভযাত্রার কথা ত্বরা গেনু ভুলি'।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৪৬

অন্নদাবাবুর পাশের বাসার দ্বারের সম্মুখে কিছু কিছু জিনিষপত্র লইয়া গোরুর গাড়ি এবং মুটে আনাগোনা করিতে লাগিল। ঝাড়পোঁছ এবং দরজাজানলা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শোনা যাইতেছে। রান্নাঘরের দিক্‌টা হইতে বহুকাল পরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিয়াছে। একতলায় উঠানের কোণে খোলা কলের মুখ হইতে জলপড়ার শব্দ এ বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

সেই তার বহুপরিচিত এতদিনের শূন্য-বাসায় লোকবসতির এই সকল শব্দে ও দৃশ্যে হেমনলিনীর মনটাকে আজ অত্যন্ত উতলা করিয়া তুলিল। নূতন অঘ্রাণের সকাল-বেলাকার রৌদ্রে সমস্ত কলিকাতা বিচিত্র কাজে জাগিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই প্রভাত, এই রৌদ্র হেমনলিনীর চারিদিকের আকাশে কি সুর, কি কথা জাগাইয়া তুলিতেছে! হেম যেদিকে যায়, যেদিকে তাকায়, সকল দিক্ হইতেই তাহাকে কোন্ অশরীর আবির্ভাব বেষ্টন করে—যাহা ফুরাইয়া গেছে, যাহা ফিরিবার নহে, যাহা সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব, তাহাই পথহারা পিতৃহীন শিশুর মত আজিকার এই আলোকে, এই বাতাসে কোথা হইতে কেবলি ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে! এই সময়টাতে অন্নদাবাবু তাঁহার কাজের চিঠিপত্র ও হিসাব লেখায় কাজে নিযুক্ত থাকেন। হেমনলিনী তাঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, কোনো কথা আছে?"

হেমনলিনী কহিল—"না বাবা, একবার কেবল দেখিতে আসিলাম,—তুমি কি করিতেছ?"

অন্নদাবাবু তাঁহার চসমা খুলিয়া খাতা বন্ধ করিয়া কহিলেন—"এই যে এখানে চৌকি আছে, একটু বোসো না।"

হেমনলিনী কহিল, "না বাবা, আমি বাসব না। তুমি কাজ কর!"

সেখান হইতে গিয়া হেমনলিনী আল্‌মারিতে তাহার বইগুলি গোছাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গোছানো বড় বেশি অগ্রসর হয় না। হঠাৎ একএকটা বই হাতে পড়ে, অমনি তাহা খুলিয়া তাহার পাতাগুলি

ফুটিয়া যায়,—এই বইগুলির পাতায় গ্রন্থকাররচিত যে সকল কথা ছাপা আছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কতদিনের কত অরচিত কথা কত অদৃশ্য অক্ষরে জড়িত হইয়া আছে, তাহারা হেমনলিনীর বুকের মধ্যে—পোড়োবাড়ীর শূন্যঘরগুলার ভিতর দিয়া যেমন করিয়া সন্ধ্যাবেলাকার পাখী কেবলি অকারণে আনাগোনা করিতে থাকে, তেম্‌নি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার বইসাজানো শেষ হইল না। আল্‌মারি বন্ধ করিয়া আবার তাহার পিতার শয়নঘরে গিয়া কহিল, "যাও বাবা, তুমি নাইতে যাও, আমি তোমার ঘর একটু গুছাইয়া ফেলি!"

অন্নদাবাবু কহিলেন "ঘর ত বেশ গোছানো আছে, আবার কি গুছাইবে? হেম, আমার এই ছোট ঘরটাকে লইয়া আর কি করিবে বল দেখি। যে-রকম করিয়া তুলিয়াছ, এখানে আমার বিছানা না রাখিয়া দিল্লির ময়ূরতক্ত রাখিলে শোভা পাইত।"

হেমনলিনী কহিল—"না বাবা, তুমি যাও—সমস্ত পরিষ্কার করিতে হইবে।"

বাধ্য সন্তানটির মত অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেলে পর সমস্ত বিছানাপত্র তুলিয়া, জিনিষপত্র ঝাড়িয়া, যেটা যেখানে ছিল সেটাকে আবার আর-এক জায়গায় রাখিয়া, ঘরটাকে হেমনলিনী আবার নূতনরকম করিয়া সাজাইয়া দিল। ইহাতে অনেকটা সময় গেল কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যে রুদ্ধবেদনা তাহার হৃদয়কে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিল না।

আহারান্তে অন্নদাবাবু তাঁহার চৌকিতে ঘুমাইয়া পড়িলে আজ হেমনলিনী নিজের শোবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বিবাহব্যাপারঘটিত গোলমালের পর হইতে অন্নদাবাবু, বোধ করি, কন্যাকে পরিচিত লোকের কৌতূহলদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপাসনাগৃহে যান নাই। আজ হেম মেজের কার্পেটের উপর বসিয়া অভ্যস্ত রীতি অনুসারে উপাসনা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মনকে কিছুতেই ঠেকাইতে পারিল না, অন্তরের মধ্যে অন্তর্যামীকে ধরিতে পারিল না। অন্যসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া উপাসনাকার্য্যে সে প্রথাপালনস্বরূপ যোগ দিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে—উপদেশ ও গান শুনিয়া তাহার মনে যে একটা ভাবোদয় হইয়াছে, তাহাকেই সে কৃতার্থতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত আবশ্যকের সময়। আজ সে ধ্রুব একটা-কিছুকে দৃঢ়নিশ্চিতভাবে ধরিতে চায়, আজ কেবল প্রথাপালন, কেবল ভাবের তৃপ্তি নয়,—আজ ডাঙার মাছ যেমন করিয়া জল চায়, তেম্‌নি করিয়া সে শান্তি ও সান্ত্বনা চাহিতেছে। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন হেমনলিনী কাঁদিয়া-উঠিয়া কহিল—"এতদিন তবে আমি কি করিলাম! দুঃখের দিনের জন্যে আমি কিছুই অন্তরের মধ্যে সঞ্চয় করিতে পারি নাই!"—অনেকদিন পরে তাহার হার্ম্মোনিয়মের ধূলা ঝাড়িয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে বসিল। কিন্তু এ হার্ম্মোনিয়মে ব্রহ্মসঙ্গীতের রাগিণী ভেদ করিয়া ও কি সুর বাজে! অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও কি সুর!

দ্বারে আঘাতের সঙ্গে ডাক পড়িল—"হেম!"

হেমনলিনী দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিল—"কি বাবা।"

অন্নদাবাবু কহিলেন "তোমার গান শুনিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। অনেকদিন তোমার গানবাজনা শুনি নাই।"

এই বলিয়া তিনি বসিলেন। হেমনলিনী কহিল—"বাবা, কি গান গাহিব?"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"তোমার যে গান মনে আসে গাও।"

হেমনলিনী। আমার ত কোনো গানই মনে আসে না—তুমি যাহা বলিবে, তাহাই গাহিব।

হেমনলিনীর কাছ হইতে যে সব গান শোনা তাঁহার অভ্যাস, তাহারই মধ্যে বাছিয়া অন্নদাবাবু ফরমাস করিলেন। সেই পুরাতন গানের খানিকটা গাহিয়াই হেমনলিনী হার্ম্মোনিয়ম বন্ধ করিয়া দিল, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল হেম? গলা ভাল নাই বুঝি।"

হেম সংক্ষেপে কহিল—"না।" বলিয়াই সে উঠিয়া পড়িল, এবং ঘরের কোণে তাহার কাপড়ের আল্‌মারিটা খুলিয়া মিছামিছি কাপড় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার দুই চোখ দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অন্নদাবাবু কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—মনে করিলেন, হঠাৎ বুঝি কাপড়সম্বন্ধে একটা কোনো কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। কহিলেন, "চল, তবে ও ঘরে যাই!"

হেমনলিনী কহিল—"যাইতেছি।"

অন্নদাবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে হেমনলিনী তাহার বিছানায় শুইয়া বালিশে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া লইল। তাহার পরে ভাল করিয়া চোখে-মুখে জল দিয়া তাহার পিতার কাছে গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন "ও বাড়ীতে আজ নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, আমি গিয়া তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া নিয়া আসি।"

হেম কহিল—"তিনি নিশ্চয় আজ ব্যস্ত আছেন, আজ তাঁহাকে নাই বা ডাকিলে। তা ছাড়া একটু অপেক্ষা করিয়া দেখ না বাবা,—তিনি যদি লোকের সঙ্গ ভাল না বাসেন, তবে আমরা যেন জোর করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া না তুলি।"

অন্নদাবাবু অনিচ্ছাক্রমে হেমের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পরে যোগেন্দ্র উঠিয়া গেলে হেম অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, আজ তুমি আমাকে লইয়া একবারটি উপাসনা কর না।"

শুনিয়া অন্নদাবাবু ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, একবার চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের দিকে যেন দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পরে ধীরস্বরে কহিলেন, "মা হেম, আমি সত্যকথা বলিতেছি, ইচ্ছা করিলেই আমি উপাসনা করিতে পারি না। এমন কি, যখন একলা নিভৃতে চেষ্টা করি, তখনো অনেকসময় হৃদয়ের মধ্যে শুষ্কতা-শূন্যতা অনুভব করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। অন্য কাহাকেও লইয়া কথা উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করিতে গেলে সেই শব্দগুলা এবং শ্রোতার প্রতি আমার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। আমি সাধক নই মা।

আর কেহ যখন উপাসনা করেন, তখন তাঁহার উপদেশে ও গানে যেটুকু লাভ করি, সেই আমার সম্বল।"

হেমনলিনী কহিল—"কাল রবিবার আছে, কাল আমরা সমাজে যাইব। কি বল বাবা?"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"বেশ ত।"

পরদিন সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই হেমনলিনী ছাদে উঠিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, প্রশান্ত প্রত্যূষে উপাসনাদ্বারা সে আর একবার মনকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। ছাদে উঠিয়া দেখিল হেমনলিনীর বাড়ীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া নলিনাক্ষ পূর্ব্বমুখ হইয়া জোড়হস্তে নিশ্চলমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। এই শীতের প্রভাতে তাহার পিঠ হইতে স্খলিতপ্রায় একখানি তসরের চাদর ভূমিপর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সূর্য্যোদয়ের কিছুকাল পরে হেম আবার ছাদে উঠিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ ছাদের মেজের উপরে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছে। এবারে সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিল—পশ্চাৎ হইতেও বুঝিতে পারিল, নলিনাক্ষ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা একএকবার একএকটি নাসারন্ধ্র বোধ করিয়া শ্বাসক্রিয়া লইয়া কি-একটা অভ্যাস করিতেছে। হেমনলিনী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আবার ছাদ হইতে নীচের তলায় নামিয়া গেল।

অন্নদাবাবু মনে করিয়াছিলেন, নলিনাক্ষ আজ কোনো একসময়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে। হেম তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল, নলিনাক্ষ যদি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনীয় মনে করে, তবে আপনি দেখা করিতে আসিবে অন্নদাবাবু তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নলিনাক্ষকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর একটি আশ্চর্য্য আকর্ষণ হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার মধ্যে যে গভীরতম অভাব আছে, নলিনাক্ষের দ্বারাতেই তাহার পূরণ হইবে। তিনি হেমনলিনীকে বলিয়াছিলেন, শুদ্ধমাত্র নলিনাক্ষবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আমি জানি না কেমন করিয়া বুঝিয়াছি, তাঁহার সমস্ত কথা একটা পূর্ণতার মধ্য হইতে উঠিতেছে।

আজও নলিনাক্ষের দেখা না পাইয়া অন্নদাবাবু নিরাশমনে সন্ধ্যার সময় হেমনলিনীকে লইয়া উপাসনাগৃহে গেলেন। পূর্ব্বে হেম যে ভাবে উপাসনালয়ে প্রবেশ করিত, আজ সে ভাবে গেল না কিছু-একটা শুনিয়া আসিবে, করিয়া আসিবে, ভাবিয়া আসিবে বলিয়া নয়, কিছু-একটা লইয়া আসিবে বলিয়াই সে কম্পিত আগ্রহে সভাস্থলে প্রবেশ করিল। কথার উপর কথা, কথার উপর কথা, অনেক কথা সে শুনিল কিন্তু কোথায় সেই কথা, কোথায় তাহার অন্তরের অভাব, কোথায় তাহার তৃষাতুর মন। যখন হেমনলিনী কোনো মর্ম্মান্তিক প্রয়োজন না লইয়া এখানে আসিয়াছে, তখন সেই কথাপ্রবাহের অনর্গল আঘাতে মনের মধ্যে সে বিচিত্র আন্দোলন অনুভব করিয়া সুখ পাইয়াছে। আজ সে তাহার চেয়ে অনেক বেশি চাহিয়াছিল বলিয়া কিছুই পাইল না। তাহার

পক্ষে অনাবশ্যক কথার ধারা তাহাকে শ্রান্ত করিতে লাগিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় অন্নদাবাবু গলির মোড়ের কাছেই নলিনাক্ষকে দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি গাড়ি দাঁড় করাইয়া নামিয়া পড়িলেন—কহিলেন, "কই নলিনাক্ষ-বাবু, ঘরের পাশে আসিয়া অবধি আপনাকে যে আর দেখিতে পাই না।"

নলিনাক্ষ কহিল– "প্রয়োজন হইলেই ডাক দিবেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।"

অন্নদা। কোনো কাজ যদি না থাকে, তবে একবার আমাদের ওদিকে চলুন্। অধিক রাত হয় নাই। আপনার আহার হইয়াছে কি ?

নলিনাক্ষ কহিল, "আমি রাত্রে আহার করি না।"

অন্নদা। তবে দয়া করিয়া আমাদের আহারস্থলে সাক্ষী হইয়া বসিবেন।

সেদিন বাড়ী লইয়া গিয়া নলিনাক্ষকে অন্নদাবাবু নানা গভীর বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রবিবারে বন্ধুবাড়ীতে যোগেন্দ্রের নিমন্ত্রণ ছিল। নিভৃতঘরে পিতা ও কন্যা নিস্তব্ধ হইয়া নলিনাক্ষের মুখ হইতে তত্ত্বকথা শুনিতে লাগিল। রাত প্রায় দুই-প্রহর হইয়া গেলে যোগেন্দ্র আসিতেই তাঁহাদের সভা ভাঙিয়া গেল।

৪৭

কয়েকদিনের মধ্যেই নলিনাক্ষের সহিত অন্নদাবাবুদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল। প্রথমে হেমনলিনী মনে করিয়াছিল, নলিনাক্ষের মত লোকের কাছে কেবল বড় বড় আধ্যাত্মিক বিষয়েই বুঝি উপদেশ পাওয়া যাইবে—এমন মানুষের সঙ্গে যে সাধারণ বিষয়ে সহজ লোকের মত আলাপ চলিতে পারে, তাহা মনেও করিতে পারে নাই। অথচ সমস্ত হাস্যালাপের মধ্যে নলিনাক্ষের একটা কেমন দূরত্বও ছিল।

একদিন অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে যোগেন্দ্র কিছু উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, "জান বাবা, আজকাল আমাদিগকে সমাজের লোকে নলিনাক্ষবাবুর চেলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই লইয়া এই-মাত্র পরেশের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হইয়া গেছে।"

অন্নদাবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে আমি ত লজ্জার কথা কিছু দেখি না। যেখানে সকলেই গুরু, কেহই চেলা নয়, সেই দলে মিশিতেই আমার লজ্জাবোধ হয় ;– সেখানে শিক্ষা দিবার হুড়োমুড়িতে শিক্ষা পাইবার অবকাশ থাকে না।"

নলিনাক্ষ। অন্নদাবাবু, আমিও আপ-নার দলে– আমরা চেলার দল। যেখানে আমাদের কিছু শিখিবার সম্ভাবনা আছে, সেইখানেই আমরা তল্পি বহিয়া বেড়াইব।

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া কহিল—"না না, কথাটা ভাল নয়। নলিনবাবু, কেহই যে আপনার বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পারিবে না —যাহারা আপনার কাছে আসিবে, তাহারাই আপনার চেলা বলিয়া খ্যাত হইয়া যাইবে, এমন বদনামটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। আপনি কি-সব কাণ্ড করেন, ওগুলা ছাড়িয়া দিন্।"

নলিনাক্ষ। কি করিয়া থাকি বলুন্!

যোগেন্দ্র। ঐ যে শুনিয়াছি প্রাণায়াম করেন, ভোরের বেলায় সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, খাওয়াদাওয়া লইয়া নানাপ্রকার আচারবিচার করিতে ছাড়েন না, ইহাতে দশের মধ্যে আপনি খাপ্‌ছাড়া হইয়া পড়েন।

যোগেন্দ্রের এই রূঢ়বাক্যে ব্যথিত হইয়া হেমনলিনী মাথা নীচু করিল। নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল "যোগেনবাবু, দশের মধ্যে খাপ্‌ছাড়া হওয়াটা দোষের। কিন্তু তলোয়ারই কি, আর মানুষই কি, তাহার সবটাই কি খাপের মধ্যে থাকে? খাপের ভিতরে তলোয়ারের যে অংশটা থাকিতে বাধ্য, সেটাতে সকল তলোয়ারেরই ঐক্য আছে—বাহিরের হাতলটাতে শিল্পীর ইচ্ছা ও নৈপুণ্য অনুসারে কারিগরি নানারকমের হইয়া থাকে। মানুষেরও দশের খাপের বাহিরে নিজের বিশেষ কারিগরির একটা জায়গা আছে, সেটাও কি আপনারা বেদখল করিতে চান? আর, আমার কাছে এও আশ্চর্য্য লাগে, আমি সকলের অগোচরে ঘরে বসিয়া যে সকল নিরীহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা লোকের চোখেই বা পড়ে কি করিয়া, আর তাহা লইয়া আলোচনাই বা হয় কেন?"

যোগেন্দ্র। আপনি তা জানেন না বুঝি, যাহারা জগতের উন্নতির ভার সম্পূর্ণ নিজের স্কন্ধে লইয়াছে, তাহারা পরের ঘরে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে। যেটুকু খবর না পায়, সেটুকু পূরণ করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের আছে। এ নহিলে বিশ্বের সংশোধনকার্য্য চলিবে কি করিয়া? তা ছাড়া নলিনবাবু, পাঁচজনে যাহা না করে, তাহা চোখের আড়ালে করিলেও চোখে পড়িয়া যায়—যাহা সকলেই করে, তাহাতে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। এই দেখুন না কেন, আপনি ছাদে বসিয়া কি-সব কাণ্ড করেন, তাহা আমাদের হেমের চোখেও পড়িয়া গেছে—হেম সে কথা বাবাকে বলিতেছিল—অথচ হেম ত আপনার সংশোধনের ভার গ্রহণ করে নাই!

হেমনলিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ব্যথিত হইয়া একটা-কি বলিবার উপক্রম করিবামাত্র নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি কিছুমাত্র লজ্জা পাইবেন না; ছাদে বেড়াইতে উঠিয়া সকালে-সন্ধ্যায় আপনি যদি আমার আহ্নিককৃত্য দেখিয়া থাকেন, সেজন্য আপনাকে কে দোষী করিবে? আপনার দুটি চক্ষু আছে বলিয়া আপনি লজ্জিত হইবেন না; ও দোষটা আমাদেরও আছে।"

অন্নদা। তা ছাড়া হেম আপনার আহ্নিকসম্বন্ধে আমার কাছে কোনো আপত্তি প্রকাশ করে নাই। সে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনার সাধনপ্রণালীসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল।

যোগেন্দ্র। আমি কিন্তু ও সব কিছু বুঝি না। আমরা সাধারণে সংসারে সহজরকমে যেভাবে চলিয়া যাইতেছি, তাহাতে কোনো বিশেষ অসুবিধা দেখিতেছি না,—গোপনে অদ্ভুতকাণ্ড করিয়া, বিশেষ-কিছু যে লাভ হয়, আমার তাহা মনে হয় না—বরং উহাতে মনের যেন একটা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া মানুষকে একঝোঁকা করিয়া দেয়। কিন্তু আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না—আমি নিতান্তই সাধারণমানুষ; পৃথিবীর মধ্যে

আমি নেহাৎ মাঝারিরকম জায়গাটাতেই থাকি; যাঁহারা কোনোপ্রকার উচ্চমঞ্চে চড়িয়া বসেন, আমার পক্ষে ঢেলা না মারিয়া তাঁহাদের নাগাল পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার মত এমন অসংখ্য লোক আছে, অতএব আপনি যদি সকলকে ছাড়িয়া কোনো অদ্ভুতলোকে উধাও হইয়া যান, তবে আপনাকে অসংখ্য ঢেলা খাইতে হইবে।

নলিনাক্ষ। ঢেলা যে নানারকমের আছে! কোনোটা বা স্পর্শ করে, কোনোটা বা চিহ্নিত করিয়া যায়। যদি কেহ বলে, লোকটা পাগ্‌লামি করিতেছে, ছেলেমানুষি করিতেছে, তাহাতে কোনো ক্ষতি করে না—কিন্তু যখন বলে, লোকটা সাধুগিরি-সাধকগিরি করিতেছেন, গুরু হইয়া উঠিয়া চেলাসংগ্রহের চেষ্টায় আছেন, তখন সে কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতে গেলে যে-পরিমাণ হাসির দরকার হয়, সে-পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত হাসি জোগায় না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আবার বলিতেছি, আমার উপরে রাগ করিবেন না নলিনবাবু। আপনি ছাদে উঠিয়া যাহা খুসি করুন, আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কে? আমার বক্তব্য কেবল এই যে, সাধারণের সীমানার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিলে কোনো কথা থাকে না। সকলের যে-রকম চলিতেছে, আমার তেম্‌নি চলিয়া গেলেই যথেষ্ট;—তাহার বেশি চলিতে গেলেই লোকের ভিড় জমিয়া যায়। তাহারা গালি দিক্‌ বা ভক্তি করুক্‌, তাহাতে কিছু আসে-যায় না—কিন্তু জীবনটা এইরকম ভিড়ের মধ্যে কাটানো কি আরামের?

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, যান্‌ কোথায়? আমাকে আমার ছাদের উপর হইতে একেবারে সর্ব্বসাধারণের সান্‌-বাঁধানো একতলার মেঝের উপর সবলে হঠাৎ উত্তীর্ণ করিয়া-দিয়া পালাইলে চলিবে কেন?

যোগেন্দ্র। আজকের মত আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়! একটু ঘুরিয়া আসি গে!

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে পর হেমনলিনী মুখ নত করিয়া টেবিল্‌ঢাকার ঝালরগুলির প্রতি অকারণে উপদ্রব করিতে লাগিল। সে সময়ে অনুসন্ধান করিলে তাহার চক্ষুপল্লবের প্রান্তে একটা আর্দ্রতার লক্ষণও দেখা যাইত।

অন্নদা কহিলেন—"নলিনবাবু, আপনার সাধনভজনের কি প্রণালী, নিশ্চয় জানি না—বোধ করি আমাদের হইতে স্বতন্ত্র। যদি গোপনীয় না হয়, তবে—"

নলিনাক্ষ। কিছুই গোপনীয় নয়। আমার সাধনা অত্যন্ত প্রকাশ্য। আমি প্রাণায়াম করি, সে কথা সত্য—আমি প্রভাতের জ্যোতি দৃষ্টির দ্বারা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি, এ কথাও সত্য—আমি নদীর জলের মধ্যে বুক পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উপাসনা করি, ইহাও মিথ্যা নয়—আমি অনেকসময় রাত্রে মাঠের মধ্যে ধূলার উপর লুটাইয়া স্তব্ধ হইয়া ধরণীর স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া আসি ইহাও অস্বীকার করিব না। মৃত্তিকা, জলবায়ু, উত্তাপ-জ্যোতির দ্বারা নিখিলের সহিত আমি সম্বন্ধযুক্ত—আমি সেই বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধসূত্রকে যদি নিজের মধ্যে সজীবভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে অনুভব করিতে পারি—তবে জগতের মধ্যে

যে পরমরহস্যময় আছেন, তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিব। দেখুন না কেন, আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকি, কাব্য তাহারই চরমোৎকর্ষ. সেই উৎকর্ষ তাহাকে এমন শক্তিদান করে, যাহাতে সে বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে। আমরা সচরাচর কথাবার্ত্তার মধ্যেই ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য যে সুরের আভাস লাগাইয়া থাকি, তাহারই চরমোৎকর্ষ সঙ্গীত—সেই উৎকর্ষ লাভ করিয়া সঙ্গীত অনির্ব্বচনীয়কে আমাদের চিত্তের মধ্যে সঞ্চার করিয়া দেয়। তেমনি আমরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস, দর্শনস্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা সাধারণভাবে নিয়তই বিশ্বকে উপলব্ধি করিতেছি—কিন্তু সেই ক্রিয়াগুলির বিশেষভাবে যদি উৎকর্ষসাধন করিয়া তুলি, তবে নিখিল ব্যাপ্ত করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আছেন, তাঁহাকে আমাদের অন্তরের অন্তরে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমি মনে করি, ইহাই প্রত্যক্ষলাভ। যে বাণী জলে-স্থলে-আকাশে, অগ্নিতে-বায়ুতে, খাদ্যে-পানীয়ে আছে, আমি আমার চক্ষু-কর্ণ নাসিকা-রসনা-ত্বক্‌কে, আমার বুদ্ধিকে সর্ব্বাঙ্গেমনে সেই বাণী, সেই মন্ত্র গ্রহণে নিযুক্ত করিয়াছি—ইহাতে যাঁহারা দলের লোককে হারাইলেন বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন, তাহাদিগকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে,—সকলকেই লাভ করিব, এই আমার সাধনা, কাহাকেই হারাইব, এমন আমার অভিপ্রায় নহে।

হেমনলিনী একাগ্রমনে নলিনাক্ষের কথা শুনিতেছিল। নলিনাক্ষ চুপ করিবামাত্র সে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার বিশেষ ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের এই বাণী কি সকলেই শুনিতে পারিবে?"

নলিনাক্ষ কহিল—"দেখুন, আমরা সকলে অত্যন্ত বেশি শিক্ষিত হইয়াছি— এটা মাটি, ওটা জল, এটা তুচ্ছ, ওটা নির্জ্জীব, এই বলিয়া প্রায় সমস্ত বিশ্বকেই আমরা দূরে ফেলিয়াছি। তাই এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের উপর চিত্তকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিয়া ইহা হইতে যাহা গ্রহণ করিবার, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না—তাই একমাত্র মানুষের বাক্যের দাস হইয়া পড়িয়াছি। এ কথা *ভাবি না, বাক্য ত একটা প্রতিফলিত পদার্থ*মাত্র সেই বাক্য সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে কিন্তু যে বিশ্ব সত্যেরই নির্ঝরধারা, একেবারে সেই বিশ্বের মধ্যেই করপুট ডুবাইবা অমৃতরস গ্রহণ করিলে প্রবঞ্চিত হইব না। আমরা যে শৈশব হইতে কেবল মানুষের বাক্য শোনাকেই শিক্ষা মনে করিতে অভ্যাস করিয়াছি—ঈশ্বরের পাঠশালায়, এই সুবিপুল জল-স্থল-আকাশের কাছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত যাই না, ইহাতেই আমাদিগকে অন্ধ ও বধির করিয়াছে।"

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এই পূর্ব্বশিক্ষার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করা কি কঠিন?"

নলিনাক্ষ। কঠিন বটে। প্রকৃতিভেদে কাহারো কাছে বেশি কঠিন, কাহারো কাছে অল্প কঠিন। বাক্যের খাঁচায় যে মানুষপক্ষী আবদ্ধ থাকিয়া পরের দত্ত খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া আছে, বিশ্বের আলোকধৌত আকাশে উড়িয়া নিজের খাদ্য আনন্দে

অন্বেষণ করার প্রস্তাব সে অসম্ভব মনে করিয়া ভীত হইয়া উঠে। অল্প অল্প করিয়া তাহার ভয় ভাঙিতে হয়, তাহার ডানায় বলসঞ্চার করিতে হয়।

হেমনলিনী জান্‌লার বাহিরের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল। সে নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া অনুভব করিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত অনেক উপদেশবাক্য শুনিয়াও তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয় নাই। মাঝে মাঝে তাহার ভাবোদ্রেক হইয়াছে, চোখে জল আসিয়াছে, হৃদয় উত্তেজিত হইয়াছে—মনে করিয়াছে, বুঝি ইহাকেই বলে পাওয়া। কিন্তু হাতের মধ্যে কিছুই পায় না, মনের মধ্যে নিশ্চয়রূপে, ধ্রুবরূপে কিছুই থাকে না। তবু এতদিন সে জানিত না, উপাসনার ফল কেবলমাত্র ভাবানুভূতি নহে, জানিত না, ধর্ম্মের সত্য করতলন্যস্ত আমলকের মতই সুনিশ্চিত তাহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ, তাহা রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে আবির্ভূত। নলিনাক্ষের কথা শুনিয়া হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, তাহার মন একেবারেই রিক্ত—তাহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী বিশ্বের মধ্যেও তাহার কোনো অধিকার নাই। সে কাজকর্ম্ম করিতেছে, সুখদুঃখ ভোগ করিয়া চলিতেছে, কিন্তু সে একেবারেই শূন্য—সে এমনভাবে আছে, যেন সে এই অসীম বিশ্বসংসারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই—যেন কেবল সে এই কলিকাতার গলিতে, এই বাসার মধ্যেই আছে। দিনে দিনে নলিনাক্ষের সহিত আলাপ করিতে করিতে সে আপনার অন্তরের দৈন্য দেখিতে পাইল এবং নলিনাক্ষের পথ অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অত্যন্ত দুঃখের সময় যখন সে অন্তরে-বাহিরে কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখনই নলিনাক্ষ বিশ্বকে তাহার সম্মুখে যেন নূতন করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিল। হেমনলিনীর পূর্ব্বজীবন চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা গুরুতর আঘাত পাইয়া একজায়গায় ভাঙিয়াচুরিয়া পথ হইতে বিক্ষিপ্ত ও অচল হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার উপর দিয়া দিনের পর দিন বৃথা যাইতেছিল—তাহার জীবনের সম্মুখে কোনো লক্ষ্য ছিল না কেমন করিয়া, কি লইয়া সে যে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা প্রতিদিনই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না—এমন দুঃসময়ে নলিনাক্ষ তাহাকে চলিবার পথ ও বাঁচিবার উৎসাহ দান করিল। ব্রহ্মচারিণীর মত একটা নিয়মপালনের জন্য তাহার মন কিছুদিন হইতে উৎসুক ছিল—কারণ, নিয়ম মনের পক্ষে একটা দৃঢ় অবলম্বন ;—শুধু তাহাই নহে, শোক কেবলমাত্র মনের ভাব-আকারে টিঁকিতে চায় না, সে বাহিরেও একটা কোনো কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে আপনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এপর্য্যন্ত হেমনলিনী সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই,—লোকচক্ষুপাতের সঙ্কোচে বেদনাকে সে অত্যন্ত গোপনে আপনার মনের মধ্যেই পালন করিয়া আসিয়াছে। নলিনাক্ষের সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া আজ যখন সে শুচি আচার ও নিরামিষ আহার গ্রহণ করিল, তখন তাহার মন বড় তৃপ্তিলাভ করিল। নিজের শয়নঘরের মেজে হইতে মাদুর ও কার্পেট্‌ তুলিয়া-ফেলিয়া বিছানাটি একধারে পর্দ্দার দ্বারা আড়াল করিল—সে

ঘরে আর কোনো জিনিষ রাখিল না। সেই মেজে প্রত্যহ হেমনলিনী স্বহস্তে জল ঢালিয়া পরিষ্কার করিত একটি রেকাবিতে কয়েকটি ফুল থাকিত; স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিয়া সেই খানে মেজের উপরে হেমনলিনী বসিত—সমস্ত মুক্তবাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে অবারিত আলোক প্রবেশ করিত, এবং সেই আলোকের দ্বারা, আকাশের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা সে আপনার অন্তঃকরণকে অভিষিক্ত করিয়া লইত। অন্নদাবাবু সম্পূর্ণভাবে হেমনলিনীর সহিত যোগ দিতে পারিতেন না—কিন্তু নিয়মপালনের দ্বারা হেমনলিনীর মুখে যে একটি পবিত্র পরিতৃপ্তির দীপ্তি প্রকাশ পাইত, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধের মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। এখন হইতে নলিনাক্ষ আসিলে হেমনলিনীর এই ঘরেই মেজের উপরে বসিয়া তাঁহাদের তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলিত।

যোগেন্দ্র একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল "এ সমস্ত কি হইতেছে। তোমরা যে সকলে মিলিয়া বাড়ীটাকে ভয়ঙ্কর পবিত্র করিয়া তুলিলে আমার মত লোকের এখানে পা ফেলিবার জায়গা নাই।"

আগে হইলে যোগেন্দ্রের বিদ্রূপে হেমনলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত;- এখন অন্নদাবাবু যোগেন্দ্রের কথায় মাঝে মাঝে রাগ করিয়া উঠেন, কিন্তু হেমনলিনী নলিনাক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়া শান্তস্নিগ্ধভাবে হাস্য করে। এখন সে একটি দ্বিধাহীন নিশ্চিত নির্ভর অবলম্বন করিয়াছে—এ সম্বন্ধে লজ্জা করাকেও সে দুর্ব্বলতা বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে তাহার এখনকার সমস্ত আচরণকে অদ্ভুত মনে করিয়া পরিহাস করিতেছে, তাহা সে জানিত কিন্তু নলিনাক্ষের প্রতি তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস সমস্ত লোকাপবাদ আচ্ছন্ন করিয়া উঠিয়াছে এইজন্য লোকের সম্মুখে সে আর সঙ্কুচিত হইত না।

একদিন হেমনলিনী প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা শেষ করিয়া তাহার সেই নিভৃত ঘরটিতে বাতায়নের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, এমনসময় হঠাৎ অন্নদাবাবু নলিনাক্ষকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হেমনলিনীর হৃদয় তখন পরিপূর্ণ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে নলিনাক্ষকে ও পরে তাহার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, 'ব্যস্ত হইবেন না নলিনবাবু, হেম আপনার কর্ত্তব্য করিয়াছে।"

অন্যদিন এত সকালে নলিনাক্ষ এখানে আসে না। তাই বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত হেমনলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিল। নলিনাক্ষ কহিল, "কাশী হইতে মার খবর পাওয়া গেল, তাঁহার শরীর তেমন ভাল নাই, তাই আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কাশীতে যাইব স্থির করিয়াছি। দিনের বেলায় যথাসম্ভব আমার সমস্ত কাজ সারিয়া লইতে হইবে, তাই এখন আপনাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"কি আর বলিব, আপনার মার অসুখ, ভগবান্ করুন্ তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন্। এই কয়দিনে আমরা আপনার কাছে যে উপকার পাইয়াছি,

তাহার ঋণ কোনোকালে শোধ করিতে পারিব না।"

নলিনাক্ষ কহিল "নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের কাছ হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। প্রতিবেশীকে যেমন সদ্ভাব্য করিতে হয়, তাহা ত করিয়াইছেন—তা ছাড়া যে সকল গভীর কথা লইয়া এতদিন আমি একলা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম, আপনাদের শ্রদ্ধার দ্বারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন আমার ভাবনা ও সাধনা আপনাদের জীবন অবলম্বন করিয়া আমার পক্ষে আরো দ্বিগুণ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অন্য মানুষের হৃদয়ের সহযোগিতায় সার্থকতালাভ যে কত সহজ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।"

অন্নদা কহিলেন, "আমি আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, আমাদের একটা-কিছুর বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সেটা যে কি, আমরা জানিতাম না—ঠিক এমন সময়েই কোথা হইতে আপনাকে পাইলাম, এবং দেখিলাম, আপনাকে নহিলে আমাদের চলিত না। আমরা অত্যন্ত কুণো, লোকজনের কাছে যাতায়াত আমাদের বড় বেশি নাই—কোনো সভায় গিয়া বক্তৃতা শুনিবার বাতিক আমাদের একেবারে নাই বলিলেই হয়—যদি-বা আমি যাই, কিন্তু হেমকে নড়াইতে পারা বড় শক্ত। কিন্তু সেদিন এ কি আশ্চর্য্য বলুন্ দেখি—যেম্নি যোগেনের কাছে শুনিলাম আপনি বক্তৃতা করিবেন, আমরা দুজনেই কোনো আপত্তি প্রকাশ না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম—এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। এ সব কথা মনে রাখিবেন নলিনবাবু! ইহা হইতে বুঝিবেন, আপনাকে আমাদের নিঃসন্দিগ্ধ প্রয়োজন আছে, নহিলে এমনটি ঘটিতে পারিত না। আমরা আপনার দায়স্বরূপ!"

নলিনাক্ষ। আপনারাও এ কথা মনে রাখিবেন, আপনাদের কাছে ছাড়া আর কাহারো কাছে আমি আমার জীবনের গূঢ়কথা প্রকাশ করি নাই। সত্যকে প্রকাশ করিতে পারাই সত্যসম্বন্ধে চরম-শিক্ষা। সেই প্রকাশ করিবার গভীর প্রয়োজন আপনাদের দ্বারাই মিটাইতে পারিয়াছি। অতএব আপনাদিগকে আমার যে কতখানি প্রয়োজন ছিল, সে কথাও আপনারা কখনো ভুলিবেন না।

হেমনলিনী কোনো কথা কহে নাই; বাতায়নের ভিতর দিয়া রৌদ্র আসিয়া মেজের উপরে পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনাক্ষের যখন উঠিবার সময় হইল, তখন সে কহিল "আপনার মা কেমন থাকেন, সে খবর আমরা যেন জানিতে পাই।"

নলিনাক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেমনলিনী পুনর্ব্বার তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

৪৮

এ কয়দিন অক্ষয় দেখা দেয় নাই। নলিনাক্ষ কাশীতে চলিয়া গেলে আজ সে যোগেন্দ্রের সঙ্গে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে দেখা দিয়াছে। অক্ষয় মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, রমেশের স্মৃতি হেমনলিনীর মনে কতখানি জাগিয়া আছে, তাহা পরিমাপ করিবার সহজ উপায় অক্ষয়ের প্রতি তাহার বিরাগ-

প্রকাশ। আজ দেখিল, হেমনলিনীর মুখ প্রশান্ত—অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত হইল না সহজ প্রসন্নতার সহিত হেমনলিনী কহিল—"আপনাকে যে এতদিন দেখি নাই?"

অক্ষয় কহিল, "আমরা কি প্রত্যহ দেখিবার যোগ্য?"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "সে যোগ্যতা না থাকিলে যদি দেখাশোনা বন্ধ করা উচিত বোধ করেন, তবে আমাদের অনেককেই নির্জ্জনবাস অবলম্বন করিতে হয়।"

যোগেন্দ্র। অক্ষয় মনে করিয়াছিল, একলা বিনয় করিয়া বাহাদুরি লইবে, হেম তাহার উপরেও টেক্কা দিয়া সমস্ত মনুষ্য জাতির হইয়া বিনয় করিয়া লইল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটুখানি বলিবার কথা আছে। আমাদের মত সাধারণ লোকই প্রত্যহ দেখাশোনার যোগ্য—আর যাঁরা অসাধারণ, তাঁহাদিগকে কদাচ্ কখনো দেখাই ভাল, তাহার বেশি সহ্য করা শক্ত। এই-জন্যই ত অরণ্যে-পর্ব্বতে-গহ্বরেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়ান—লোকালয়ে তাঁহারা স্থায়িভাবে বসতি আরম্ভ করিয়া দিলে অক্ষয়-যোগেন্দ্রপ্রভৃতি নিতান্তই সামান্য লোকদের পক্ষে ভারি মুস্কিল।

যোগেন্দ্রের কথাটার মধ্যে যে খোঁচা ছিল, হেমনলিনীকে তাহা বিঁধিল। কোনো উত্তর না দিয়া তিনপেয়ালা চা তৈরি করিয়া সে অন্নদা, অক্ষয় ও যোগেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপন করিল। যোগেন্দ্র কহিল, "তুমি বুঝি চা খাইবে না?"

হেমনলিনী জানিত, এবার যোগেন্দ্রের কাছে কঠিন কথা শুনিতে হইবে, তবু সে শান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল,—"না, আমি চা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। এবারে রীতিমত তপস্যা আরম্ভ হইল বুঝি! চায়ের পাতার মধ্যে বুঝি আধ্যাত্মিক তেজ যথেষ্ট নাই, যা-কিছু আছে, সমস্তই হর্ত্তুকির মধ্যে? কি বিপদেই পড়া গেল। হেম, ও সমস্ত রাখিয়া দাও! একপেয়ালা চা খাইলেই যদি তোমার যোগ-যাগ ভাঙিয়া যায়, তবে যাক্ না—এ সংসারে খুব মজবুত জিনিষও টেঁকে না, অমন পল্কা ব্যাপার লইয়া পাঁচজনের মধ্যে চলা অসম্ভব।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া স্বহস্তে আর এক-পেয়ালা চা তৈরি করিয়া হেমনলিনীর সম্মুখে রাখিল। সে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, আজ যে তুমি শুধু চা খাইলে! আর কিছু খাইবে না?"

অন্নদাবাবুর কণ্ঠস্বর এবং হাত কাঁপিতে লাগিল,—"মা আমি সত্য বলিতেছি, এ টেবিলে কিছু খাইতে আমার মুখে রোচে না। যোগেনের কথাগুলো আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। জানি, আমার শরীরমনের এ অবস্থায় কথা বলিতে গেলেই আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি—শেষকালে অনুতাপ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী তাহার পিতার চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না! দাদা আমাকে চা খাওয়াইতে চান, সে ত ভালই আমি ত কিছু তাহাতে মনে করি নাই। না বাবা,

তোমাকে খাইতে হইবে খালিপেটে চা খাইলে তোমার অসুখ করে আমি জানি।"

এই বলিয়া হেম আহার্য্যের পাত্র তাহার বাপের সম্মুখে টানিয়া আনিল। অন্নদা ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলেন।

হেমনলিনী নিজের চৌকিতে ফিরিয়া-আসিয়া যোগেন্দ্রের প্রস্তুত চায়ের পেয়ালা হইতে চা খাইতে উদ্যত হইল। অক্ষয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল—"মাপ করিবেন, ও পেয়ালাটি আমাকে দিতে হইবে, আমার পেয়ালা ফুরাইয়া গেছে।"

যোগেন্দ্র উঠিয়া-আসিয়া হেমনলিনীর হাত হইতে পেয়ালাটা টানিয়া লইল এবং অন্নদাকে কহিল, "আমার অন্যায় হইয়াছে, আমাকে মাপ কর।"

অন্নদা তাহার কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে সরিয়া গেল। অন্নদাবাবু আহার করিয়া উঠিয়া হেমনলিনীর হাত ধরিয়া কম্পমানচরণে উপরের ঘরে গেলেন।

সেই রাত্রেই অন্নদাবাবুর শূলবেদনার মত হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তাঁহার যকৃতের বিকার উপস্থিত হইয়াছে—এখনো রোগ অগ্রসর হয় নাই, এইবেলা পশ্চিমে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বৎসরখানেক কিংবা ছয়মাস বাস করিয়া আসিলে শরীর নির্দ্দোষ হইতে পারিবে।"

বেদনা উপশম হইলে ও ডাক্তার চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেম, চল মা, আমরা কিছুদিন না হয় কাশীতে গিয়াই থাকি।"

ঠিক একই সময়ে হেমনলিনীর মনেও সে কথা উদয় হইয়াছিল। নলিনাক্ষ চলিয়া যাইবামাত্র হেম আপন সাধনসম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমনলিনীর সমস্ত আহ্নিকক্রিয়াকে যেন দৃঢ় অবলম্বন দিত। নলিনাক্ষের মুখশ্রীতেই যে একটা স্থির নিষ্ঠা ও প্রশান্ত প্রসন্নতার দীপ্তি ছিল, তাহাই হেমনলিনীর বিশ্বাসকে সর্ব্বদাই যেন বিকশিত করিয়া রাখিয়াছিল; নলিনাক্ষের অবর্ত্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে যেন একটা ম্লানচ্ছায়া আসিয়া পড়িল। তাই আজ সমস্তদিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর করিয়া এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে শ্রান্তি আসিয়া এমনি নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। চায়ের টেবিলে দৃঢ়তার সহিত সে আতিথ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়াছিল। আবার তাহাকে তাহার সেই পূর্ব্বস্মৃতির বেদনা দ্বিগুণবেগে আক্রমণ করিয়াছে—আবার তাহার মন যেন গৃহহীন, আশ্রয়হীনের মত হাহা করিয়া বেড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। তাই যখন সে কাশী যাইবার প্রস্তাব শুনিল, তখন ব্যগ্র হইয়া কহিল, "বাবা, সেই বেশ হইবে।"

পরদিন একটা আয়োজনের উদ্যোগ দেখিয়া যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কি, ব্যাপারটা কি?"

অন্নদা কহিলেন—"আমরা পশ্চিমে যাইতেছি।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"পশ্চিমে কোথায়?"

অন্নদা কহিলেন—"ঘুরিতে ঘুরিতে একটা-কোনো জায়গা পছন্দ করিয়া লইব।"—তিনি যে কাশীতে যাইতেছেন, এ কথা একদমে যোগেন্দ্রের কাছে বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন।

যোগেন্দ্র কহিল—"আমি কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি সেই হেড্‌মাষ্টারির জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

ক্রমশ।

যাত্রা ও থিয়েটার।

যাত্রা একটা ভয়ানক ভিড়—এখানে নিয়ম ও শৃঙ্খলার কোন চিহ্ন নাই। খেলোয়াড়গণের সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গী, এমন কি, পাদক্ষেপ পর্য্যন্ত সকলই কতকটা অদ্ভুতরকমের। যিনি দ্রৌপদী সাজিয়াছেন, তাঁহার ভাল করিয়া গোঁফ কামান হয় নাই, আবার বেশভূষার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া হয় ত তিনি কুন্তীর অভিনয় জুড়িয়া দিলেন। অধিকারিমহাশয়ের শিক্ষকের ভাবে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ, এবং সময়বিশেষে সঙ্গীতকারী কোন বালকের রহসি কর্ণপীড়ন; এই নারদ বৃন্দাবনে যশোদাকে প্রবোধ দিতেছেন, আবার তখনই উদ্ভটরূপে পাদক্ষেপপূর্ব্বক ফিরিয়া-দাঁড়াইয়া অনুনাসিকস্বরে "এই ত মথুরায় আগমন কল্লুম" বলিয়া এক স্থানেই অন্য দৃশ্যের অবতারণা, এ সকল অপার হাস্যরসের বিষয়। বালকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ সাবিত্রী সাজিয়াছে, কেহ বা তাহার সখী সাজিয়াছে; অধিকারিমহাশয় একটা গানে টান দিলেন, সেই সুযোগে সাবিত্রী তাহার সখীর হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া প্রাণপণে একবার তামাক টানিয়া লইল সেই ধূমপটল অনুকূলপবনে দর্শকমণ্ডলীর মুখের উপর লইয়া-আসিয়া সাবিত্রীর চিত্র মানসপটে ক্ষণকাল আঁধার করিয়া ফেলিল। রাগরাগিণী-আলাপকারী বালকের প্রাণান্ত চীৎকারের সময় মুখভঙ্গী—যাহা তাহার সঙ্গীত-অভ্যাসকালীন কানমলাকে দর্শকদের কল্পনার সম্মুখে উপস্থিত করে—ঋষিগণের শণপাটনির্ম্মিত দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি, যাহার প্রান্তস্থিত সূত্রের সঙ্গে কর্ণের বন্ধন সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ—নিজের বক্তব্য-সমাধা-অন্তেই তৎক্ষণাৎ ঋষিমহাশয়-কর্ত্তৃক বেহালার কর্ণপীড়ন, কিংবা বাঁয়া-তাড়ন,—আর সেই "নীরদবরণ, পীতবসন, ভবভয়ভঞ্জন, কংসদমন, লীলাময়" প্রভৃতি বাঁধা বিশেষণরাশির অজস্র উদ্গিরণ কিংবা কোন দৃশ্যবর্ণনোপলক্ষে "তরুপল্লব কি শোভাই ধারণ করেছে, কুসুমকুল ফুটিয়া

আছে, ডালে ডালে বিহগগণ গান কর্‌ছে, ভ্রমরনিকর গুন্‌গুন্ ধ্বনি তুলেছে, আহা কি মনোরম, কোকিলকোকিলা"—ইত্যাদি প্রকারের একঘেয়ে বিস্তৃত আবৃত্তি—এ সমস্তই এখন নাটকদর্শনাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের বসভঙ্গ না করিয়া যায় না। ইহার পর জুড়িবৃন্দ "রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা" বলিয়া যখন সমকণ্ঠে অপূর্ব্বভাবে মুখভঙ্গী ও হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক গাহিতে থাকে এবং অনেক সময়ে তান দেওয়ার উপলক্ষে সঙ্গীতকে হ্রেষারবে পরিণত করে, তখন রুমাল মাথায় বাঁধিয়া শিবঃপীড়া নিবারণ করিতে হয়। শুনিয়াছি, এইরূপ এক জুড়ীর দলের চীৎকার অসহ্য হওয়াতে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেল্‌সাহেব ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন—"মোক্তারলোগকো বৈঠ্‌নে কহো।"

ইহার তুলনায় থিয়েটার স্বর্গ। রাজস্থানের আরাবলিপর্ব্বতই হউক কি বা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর মন্দিরই হউক, সুন্দর দৃশ্যপটগুলি বর্ণিত স্থানসমূহের আভাস দিতে সচেষ্ট; অভিনেতৃগণ স্বাভাবিকভাবে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি যাহার সাজে উপস্থিত হয়, পরিচ্ছদ ও ভঙ্গীতে তাহারই বিভ্রম জন্মাইয়া থাকে। যদি একজন অভিনেতাকেই জগৎসিংহ ও বীরসিংহের অভিনয় করিতে হয়, তবে এমনভাবে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন করিয়া আসে যে, কে আর তাহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিবে? এদিকে কথাগুলি সব ছোটখাট—যাত্রার সেই অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার তুলনায় তাহা কি আরামদায়ক! এখানে ভীম গদা ঘাড়ে করিয়া উদ্ভট গুম্ফ উৎক্ষেপণপূর্ব্বক একঘণ্টাকাল দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিতে থাকে না। এখানে অনেক দৃশ্যপট এমন সুন্দর হয় যে, অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদের বর্ণের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া পশ্চাৎস্থিত প্রাসাদাবলী কিংবা তরুপল্লবাদি চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করে। এখানে দুই বীরবর যুদ্ধের পূর্ব্বে বাগ্‌যুদ্ধেই একদণ্ড কাটাইয়া দেন না ও তাঁহাদের মুখনিঃসৃত নিষ্ঠীবনকণা শ্রোতার গাত্র সিক্ত করে না। এই সকল নানা কারণে যাত্রা দেখার পর থিয়েটার দেখায় কি আরাম।

কিন্তু তবু বলিব, থিয়েটার চিত্রের হিসাবেই সুশ্রী। আমাদের দেশীহৃদয়ের খাঁটি ও বিচিত্র ভাবরাশি সর্ব্বপ্রকারশৃঙ্খলাবর্জ্জিত যাত্রার মধ্যে যেরূপ বিকাশ পাইত, থিয়েটারে তাহা পায় নাই। ইহা ছাড়া থিয়েটারে যে সকল পুস্তক অভিনীত হয়, তাহার অনেকগুলিই অতিমাত্রায় কৃত্রিম ও পরানুকরণদোষদুষ্ট; সেগুলি ইংরেজীধরণের বক্তৃতায় উদগ্র, অথচ ইংরেজীনাটকের আখ্যানভাগ যেরূপ ঘটনা ও কর্মের বিচিত্রতায় চিত্ত আকৃষ্ট করে, এগুলি তাহা করে না। ইংরেজীনাটকের নকল করিয়া আমরা নাটক রচনা করিতে যাই, কিন্তু তাহা প্রহসন হইয়া পড়ে। লেডিম্যাক্‌বেথ্ ক্ষিপ্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেন, এই দৃষ্টান্তে বা অপর কোন দৃষ্টান্তে প্রায়শই রঙ্গমঞ্চের শেষকাণ্ডটা ক্ষিপ্ততার অভিনয়ে অসহনীয় হইয়া উঠে; বড় বড় ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের শেষ অঙ্কে প্রায়ই দেখা যায়, কোন স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ উর্দ্ধচক্ষে দুই হাত প্রসারণ করিয়া আসিয়া বলিয়া থাকেন "ও কি দেখ্‌ছি, ঐ যে অন্ধকারপূর্ণ ছায়ার ন্যায়

মূর্ত্তি।" এইভাবে ক্ষণে ভয়ে জড়সড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া নতুবা স্বর্গদর্শনে স্মিতমুখে অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক ন্যাকামি করা—আজকাল নাটকগুলির একটা ফ্যাশান্ দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীতে অনেকে ভীষণ পাপ করে, অনেকে শোকদুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে না। পাপ বা শোকতাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে ক্ষিপ্ততা, এই ধারণা নাটককারগণের মস্তক হইতে কবে দূর হইবে এবং উদ্ধমুখ, ঘূর্ণ্যমান দৃষ্টি, -শেবাঙ্কের অপরিহার্য্য এই মূর্ত্তিটা হইতে রঙ্গমঞ্চগুলি কবে নিস্তার পাইবে? তার পর অগাধজলে সাঁতারও যেন আজকাল অনেক নাটকের ফ্যাশনের মধ্যে দাঁড়াইতেছে। জলের মধ্যে নায়কনায়িকার ভ্রূক্ষেপ ও হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রেমের বক্তৃতা আজকাল প্রতাপ ও শৈবলিনীর দেখাদেখি অপরাপর নায়কনায়িকাগণ অনুকরণ করিতেছেন। স্বভাবের প্রবঞ্চনায় যে ছবিটি আপনি সুন্দর হয়,—অনুকরণে তাহা সেরূপ হয় না। পৌরাণিক নাটকগুলিতে প্রায়ই দৈবশক্তির উপর বড় বেশী নির্ভর - দেবদেবীগণ এত ঘনঘন আসিতেছেন যে, মানুষের যতগুলি সংকল্প, তাঁহারাই যেন হাতে ধরিয়া করাইয়া দিতেছেন, সুতরাং তাহা হৃদয় স্পর্শ করে না। পৌরাণিক বিষয়ের কারুণ্যের অংশ সঙ্গীত দিয়া জাগাইলে সুন্দর হয়, এ বিষয়ে যাত্রার যে সফলতা হইত—নাটকে তাহা কিছুমাত্র হয় না। প্রাচীন যাত্রায় যখন প্রভাসযজ্ঞের চিত্র, কি শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রয়াণ, নানা বিচিত্ররাগিণী ও করুণ কান্নার ছন্দে মর্ম্মস্পর্শী হইয়া শ্রোতাদের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিত, তখন সেই উচ্ছৃঙ্খল জনস্রোতের কলকল্লোল একবারে থামিয়া যাইত। দৃশ্যপটের অভাব, রাধা কি যশোদার অযত্নকৃত সাজসজ্জা এ সকল শত শত ত্রুটি তখন আর অণুমাত্রও রসভঙ্গ করিতে পারিত না;—যাত্রার অধ্যক্ষগণ দর্শকের জন্য যে সকল অনুষ্ঠানে ত্রুটি করিতেন, কল্পনাদেবী আসিয়া প্রচুররূপে নিজহস্তে তাহা পূরণ করিয়া যাইতেন। কথা অপেক্ষা গানই সাধারণের চিত্তে ভাব উদ্রেক করিতে বেশী সমর্থ, থিয়েটারের যথাসর্ব্বস্ব কথা, কিন্তু যাত্রার যথাসর্ব্বস্ব গান। যাত্রাগুলি যে এখন এরূপ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, থিয়েটারের অনুকরণে কথার অবতারণা। যাহার যে অস্ত্র, তাহাকে তাহাই মানায়;—নারদ যদি বীণা ছাড়িয়া গাণ্ডীব ধরেন কিংবা অর্জ্জুন গাণ্ডীব ছাড়িয়া বীণা ধরেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যে দুর্দ্দশা হয়, থিয়েটারের অনুকরণ করিতে গিয়া আজকালকার যাত্রার তাহাই হইয়াছে। ভরতমিলন, রামবনবাস কিংবা কৃষ্ণলীলা শুনিয়া পূর্ব্বে যে আনন্দ, যে নৈতিক শিক্ষা হইত, এখন থিয়েটারে সেরূপ হয় না। যাত্রার হট্টগোলে আমোদ আসিয়া জীবন দিয়া যাইত, হৃদয় করুণা কিংবা পরপ্রীতিতে সিক্ত করিয়া দিত, কিন্তু থিয়েটারের আমোদ বিচিত্র বাজির ন্যায় চক্ষের সম্মুখে পুড়িয়া তখনই ছাই হইয়া যায়; যাত্রা যাহা বিদায়কালে দিয়া যাইত, রঙ্গভূমি তাহা দেয় না। যাত্রা চক্ষুর সম্মুখে অল্প দেখাইত, কিন্তু চক্ষু হইতে দূরে ঢের বেশী দেখাইত; যে সব দৃশ্য যাত্রাওয়ালারা আঁকিয়া দেখাইত না, দর্শকের কল্পনা

তাহা সুন্দর করিয়া আঁকিতে প্রবৃত্ত হইত। কল্পনা ও ভাবের রাজ্যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলে দর্শক কি শ্রোতার মনের চক্ষু ও মনের কর্ণের জন্য আর কি রাখা হইল? সহস্র চেষ্টায় বৈকুণ্ঠ-ধামকে দৃশ্যপটে আঁকিতে চেষ্টা করিলেও দর্শকের চক্ষে আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যাইবে, কিন্তু দর্শককে কথার ইঙ্গিত দিয়া যদি তাঁহার কল্পনাকে সজাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে কল্পনাদেবী যাহা আঁকিবেন, ইটালীর চিত্রকরও তাহা কখনই পারিবে না। যাত্রার গানগুলি শ্রোতার মনের ভিতর দিয়া নবসৃষ্ট নানা বিচিত্রছন্দ ও রাগিণীতে চিত্ত ভরিয়া ফেলিত। গানটি যেমন স্মৃতিতে গাঁথিয়া-আনিয়া কল্পনার দ্বারা তাহা পল্লবিত করা যায়, কথাগুলিকে সেরূপ করা যায় না। রঙ্গালয়ে গান না আছে, তাহা নহে কিন্তু গান সেস্থানে কথার আড়ালে পড়ে। আমি অপেরার কথা বলিতেছি না, আমাদের রঙ্গালয়ে অপেরা এখনও সেরূপ প্রাধান্যলাভ করে নাই।

এই যাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাসমিলনের সেই দ্বারীর নিকট রাণীর অনুনয়ের দৃশ্য মনে পড়ে। কোথায় দ্বার, কোথায় দ্বারী, কোথায় মথুরা! কোন দৃশ্য নাই, রাণী বালকবৃন্দের সঙ্গে একত্রে মিলিয়া গান গাহিতেছেন, কিন্তু শ্রোতা সেই যাত্রার বাহ্য দৃশ্যপটাদির অভাবের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, গানের করুণ ছন্দ তাঁহাকে সত্যসত্যই মথুরাপুরীতে লইয়া-গিয়া দুঃখিনী যশোদাকে জীবন্ত করিয়া দেখাইতেছে। সেই বিলাপ, সেই আর্তির উত্তরে যখন দ্বারী কঠোর ভাষায় তাঁহাকে সরাইয়া দিতেছে, সমস্ত মাতৃহৃদয় ব্যাকুল-ভাবে লুটাইয়া পড়িতেছে, তখন যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহসা মাতাকে মনে পড়িল—বোধ হয়, মাতৃহৃদয়ের এই ঘোর দুঃখ কোন অলক্ষিত তড়িৎস্পর্শে মাতার শোকমুহ্যমান চিত্রটি মনে জাগাইয়াছিল। যজ্ঞস্থলে আর এক দৃশ্য উপস্থিত হইল; মথুরার মহারাজের হস্ত হইতে যজ্ঞের বারিপূর্ণ ভৃঙ্গারটি খসিয়া পড়িয়াছে, তিনি কাঁদিয়া বলরামের হাত ধরিয়া গাহিতে লাগিলেন, "দাদা বল বল, আমার দুঃখিনী মা কোথায় গেল" সেই মনোহর রাগিণীর করুণ আবেগময় উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃকুল আকুল হইতেন, অভিনেতা, দর্শক, একসঙ্গে চক্ষুজলে সকলের মুখ ভাসিয়া যাইত বাৎসল্য সজাগ হইয়া উঠিত; পর্দার অন্তরালে মহিলাগণের হৃদয়ে শিশুর জন্য করুণ ব্যথা উথলিয়া উঠিত; মৃত মাতা-দিগকে মনে করিয়া যুবকগণের মুখ জলভরা মেঘের মত হইত, যাত্রাভঙ্গের বহুদিন, বহু-বৎসর পরেও শ্রোতা স্মরণ করিত—"আমার দুঃখিনী মা কোথায় গেল?" কই, সেরূপ ভাব ত থিয়েটারে হয় না। থিয়েটার নিষ্ঠুরতা বা বর্ব্বরতার চিত্র দেখাইয়া ক্ষণিক উত্তেজনার উদ্রেক করে, কিন্তু পাত্রে করুণাকে এরূপ মূর্ত্তি-মতী করিতে পারে না। দেশের খাঁটিভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের বাহুল্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদের রঙ্গভূমিগুলি আত্মবঞ্চনা করিয়া থাকে। যাত্রার এখন আর সে সরলভাব নাই।—স্বদেশ-হিতৈষামূলক বক্তৃতা এখন যাত্রায় ঢুকিয়াছে, গার্হস্থ্য সুখদুঃখের চিত্র জীবন্ত করা এখন তাহারা হেয় মনে করে;—ভারত-ইতিহাসের

কোন কোন ঘটনা লইয়া তাহারা পালা-লেখা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, নিজের যেখানে নিপুণতা, তাহা ছাড়িয়া পরানুকরণচেষ্টা আরম্ভ করা অবধি যাত্রা-গুলি একান্ত হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও সেই রাখালবালকের ছবিগুলি মনে জাগিয়া আছে। ক্রীড়াকৌতুকের হাট ভাঙিয়া রাখালরাজ চলিয়া গিয়াছেন,—গাভীগুলি নিস্পন্দ, বৃন্দাবনের তরুরাজি ধূসর, শ্রীদাম ব্যাকুলকণ্ঠে গাহিতেছে—"তাই ভেবে কি ভাইরে সুবল ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই। আমরা সামান্য ভেবে কখন মান্য করি নাই।" সেই গানে সরল রাখালহৃদয়ের পবিত্র সখ্য ও দুঃখ কোন চিরন্তন প্রিয়বিরহের স্মারকগাথাস্বরূপ আমাদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এলায়িতকেশা বিরহিণী রাধার সাশ্রুকণ্ঠের—"ছিলাম নিদ্রাবশে, দেখ্‌লেম স্বপ্নাবেশে, বধু অভাগিনীর বাসে এসেছিল"—কিংবা মেঘদর্শনে "বঁধু আমার হৃদয়কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল-আধ বোস বোস হে শ্রীপাদ" প্রভৃতি গানের রেশ্‌ এখনও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। প্রাচীন যাত্রার প্রধান অঙ্গ ছিল মনোহরসাই রাগিণী—এই রাগিণী বঙ্গদেশের স্বীয় সম্পত্তি, ইহার মধুরাক্ষরা করুণা হৃদয়ে কোমল ভাবরাশির যেরূপ উদ্রেক করিতে পারে, অন্য কোন রাগরাগিণী তাহা পারে না। এখনকার যাত্রা এই রাগিণীকে বহু-পরিমাণে ত্যাগ করিয়া থিয়েটারের অনু-করণে মিশ্র বা জঙ্‌লা রাগিণীতে গান বাঁধিয়া থাকে।

কিন্তু প্রাচীন যাত্রার ভাঁড় হইতে আধুনিক প্রহসনের ভাঁড় অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ এবং রঙ্গালয়ের যদি কিছু খাঁটি জিনিষ থাকে, তাহা প্রহসনগুলির অপূর্ব্ব অভিনয়। এখন বাংলাদেশের জীবনটা প্রহসনের উপাদান যথেষ্টপরিমাণে জোগাইতেছে। আমাদের কৃষ্ণ গ্রীবার উপর শুভ্র নেকটাই, অশুদ্ধ ইংরেজী-উচ্চারণ, সভাসমিতিতে হঠাৎ গ্যারিবল্ডীর মত গা-ঝাড়া দিয়া উঠা, বক্তৃতায় অকাতরে প্রাণ-ত্যাগের জন্য উদ্যত হওয়া, কিন্তু গৃহে কনেষ্টে-বলের ভয়ে বিনিদ্রনিশিকর্ত্তন প্রভৃতি শত শত বিষয়ে বঙ্গীয় প্রহসনগুলিকে পুষ্ট করিতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

রামায়ণের রচনাকাল।

বিচারপদ্ধতি।

"যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥"

আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ হইতে রামায়ণের আখ্যানবস্তুর আরম্ভ। তাহার বক্তা বা গায়কযুগলের নাম কুশীলব। তাঁহারা প্রথমে তপস্বিসমাজে ও তাহার পর রাম-চন্দ্রের রাজসভায় সুললিতস্বরসংযোগে রামায়ণকথা গান করিয়া, তাহার অপূর্ব্ব

রচনাকৌশলের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কুশীলবোক্ত আখ্যানবস্তু সংস্কৃতসাহিত্যে মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিত "আদিকাব্য" নামে সুপরিচিত। মানবসমাজে কাব্যশাস্ত্রের মাহাত্ম্য অনুভূত হইবার পর, সকল দেশের লোকেই তাহাদের আদিকবির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কে কোন্ দেশের আদিকবি, তাহার প্রধান প্রমাণ- জনশ্রুতি। ভারতবর্ষের জনশ্রুতি বাল্মীকিকে আদি-কবি বলিয়া অদ্যাপি ঘোষণা করিয়া আসিতেছে।

কোন দেশের আদিকবি কৃষক;—গ্রাম্যভাষার সরল সঙ্গীতে কাব্যকীর্ত্তন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। কোন দেশের আদিকবি ভিক্ষান্নজীবী,—জীবিকার্জ্জনের জন্য পথে পথে কাব্যকীর্ত্তন করিয়া কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের আদিকবি তপস্বী,—শান্তরসাস্পদ পুণ্যাশ্রমের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া, লোকশিক্ষার্থ কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, রচনাগৌরবে অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের নিকট অদ্যাপি দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন!

কোন্ পুরাকালে এই আদিকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য প্রবল কৌতূহল বিদ্যমান থাকিতেও, সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব অতীতের স্বপ্নসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু সকল চেষ্টাই তর্ককোলাহলে অভিভূত হইয়া, ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে!

তথাপি নূতন চেষ্টার প্রয়োজন পুনঃপুন অনুভূত হইয়া থাকে। রামায়ণ কোন্ সময়ের গ্রন্থ, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে রামায়ণপাঠের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু রামায়ণোক্ত সকল কথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার ব্যাঘাত হয়। যে দিন চলিয়া গিয়াছে, সে কোন্ অতীত গৌরবের পুণ্যযুগ,—তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে, সংস্কৃতসাহিত্যালোচনায় আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় না।* রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা পুনঃপুন ব্যর্থ হইলেও, পুনঃপুন অভিনব চেষ্টার আরম্ভ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা রচনাকাল নির্ণীত না হইলেও, রামায়ণের অতিপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হয়।

পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, পুরাতন গ্রন্থের আলোচনা পরিত্যাগ করা যায় না। সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবামাত্র, রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সে পথ নিতান্ত দুর্গম হইলেও,

* It has been a standing reproach against our studies that it is impossible to find anything historical in Indian literature. To a certain extent this reproach is well-founded; and this accounts no doubt for the indifference with which Sanskrita literature is regarded by the public at large. -Max Muller's History of Ancient Sanskrita Literature, p. 63.

তাহাই একমাত্র পথ। তাহাতে অগ্রসর হইবার উপায়,—বিচারপদ্ধতি। বিচার পদ্ধতির দোষে অনেক সময়ে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। রামায়ণের রচনা-কালনির্ণয়ের জন্য কিরূপ বিচারপদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা আবশ্যক।

"তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্॥"

রামায়ণের আরম্ভ এইরূপ। কাব্যারম্ভেই একটি প্রশ্ন। তপস্বী বাল্মীকি তপঃস্বাধ্যায়নিরত বাগ্‌বিদ্‌গণের বরণীয় মুনিপুঙ্গব নারদকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, দৃঢ়ব্রত, বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ এখন কে? ইহাই বাল্মীকির প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তদুত্তরে মহর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস হইতে রাবণবধান্তে রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিলে, সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া, কবিগুরু "পৌলস্ত্যবধ"নামক এক মহাকাব্য রচনা করেন। তাহাই "রামায়ণ" নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে।

গ্রন্থগত এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় অনুসারে, রামরাজ্য বর্ত্তমান থাকিতেই, রামায়ণ রচিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামচন্দ্রের সম্মুখে কুশীলবের রামায়ণ গান করিবার কথাও তাহার পক্ষসমর্থন করে। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ কবিকল্পিত বলিতে বাধা কি? গ্রন্থগৌরব বর্দ্ধন করিবার জন্য বাল্মীকির পক্ষে এরূপ অলীক আখ্যায়িকার অবতারণা করা কি নিতান্ত অসম্ভব? এই তর্ক উপস্থিত করা নিতান্ত সহজ। ইহার উত্তরপ্রদান করা সহজ নহে। একমাত্র উত্তর এই,—বাল্মীকি যে কোনরূপ অলীক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু বাল্মীকির এই উক্তি সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তদ্দ্বারা রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

কবে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, গ্রন্থগত-আখ্যায়িকা-অবলম্বনে রামায়ণের রচনাকাল নির্ণীত হইতে পারিত। কিন্তু নরাবতার রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর কতকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? পুরাণ তাহার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিয়া, স্বয়ং অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ অবস্থায় রামায়ণ যে ভাষার গ্রন্থ, সেই-ভাষা-নিবদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করিতে হইবে।

'সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস' নামধেয় নানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তথাপি তাহার উপর নির্ভয়ে নির্ভর করিবার উপায় নাই। তাহা ইউরোপীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর জল্পনা-জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের অধ্যবসায় ও অধ্যয়নানুরাগ সর্ব্বথা প্রশংসার্হ; কিন্তু তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ নিরপেক্ষ বিচারকার্য্যের প্রবল অন্তরায়! তাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের অতিপ্রাচীনত্বে আস্থা-স্থাপন করিতে অসম্মত!

এই সকল ইউরোপীয় অধ্যাপকের মধ্যে পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তাঁহার "প্রাচীন সংস্কৃত সাহি-

ত্যের ইতিহাস” বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ অনেকের নিকট প্রামাণিক ইতিহাসের সমাদর লাভ করিয়াছে। সে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত নিরতিশয় কৌতুকাবহ। তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র নামক চারিটি রচনাযুগ পরিকল্পিত হইয়াছে। লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ন্যায় একটির পর একটি সাহিত্যযুগ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছিল; তাহার প্রথম যুগে ছন্দ, দ্বিতীয় যুগে মন্ত্র, তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ যুগে সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়া যুগচতুষ্টয়ের রচনাকার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। এই যুগচতুষ্টয়ের পরমায়ু সহস্র-বৎসর; খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০০ বর্ষে আরম্ভ, খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ বর্ষে শেষ। তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

যে দেশের লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশের পুরাতত্ত্বসম্বন্ধে কেহ কিছু সাহস করিয়া লিখিয়া বসিলে, তাহাই ক্রমে ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া লয়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহস করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের জন্মকাল নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত হইলে, প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। যিনি কালনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রমাণ কি,—সে কথা অল্প-লোকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। যিনি তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত, তাঁহা-কেই প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে। অগত্যা একটি প্রমাণের অবতারণা করিতে হইল। মোক্ষমূলরের ইতিহাস রচিত হইবার পূর্ব্বে, সংস্কৃতজ্ঞ কোল্‌ব্রুকসাহেব একটি জ্যোতিষী গণনার অবতারণা করিয়া, খৃষ্টাবির্ভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদবিভাগের প্রমাণ আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।* প্রমাণটি সংস্কৃতজ্ঞগণের নিকট সুপরিচিত; তাহা ঐতিহাসিকতথ্যরূপে বহুবার স্বীকৃত হইয়াছে। মোক্ষমূলরের মতে খৃষ্টাবির্ভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদবিভাগ সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তৎকালে বেদের জন্ম পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। যিনি এরূপ নূতন কথা শুনাইতে বসিয়াছেন, তিনি কোল্‌ব্রুকের ভ্রান্তিপ্রদর্শন করিলে, তাঁহার কথায় আস্থা-স্থাপন করা সহজ হইত। কোল্‌ব্রুকের ভ্রান্তিপ্রদর্শন করা দূরে থাকুক, মোক্ষমূলর স্বকৃত সুবৃহৎ গ্রন্থের কোনস্থানে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। সুপণ্ডিত উইল্‌সন্‌, লাসেন্‌ প্রভৃতি সুধীগণ কোল্‌-ব্রুকের গণনালব্ধ ফল শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। তাহার উল্লেখ করিতে হইলে, পূর্ব্বাচার্য্যগণের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইত, নচেৎ মোক্ষমূলরের গ্রন্থ পাঠকসমাজে উপ-হাসাস্পদ হইয়া উঠিত। মোক্ষমূলর স্বপক্ষ-রক্ষার্থ কোল্‌ব্রুকের গণনার কথা একেবারে চাপা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! ইহার জন্য অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর্‌ সমালোচনাচ্ছলে মোক্ষমূলরকে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই।†

* Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I. p. 110—201.

† He has not only not invalidated the passage I have quoted, but he has not even made mention of it.—Goldstucker's Panini, p. 75.

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের গ্রন্থের ন্যায় সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক আরও একখানি গ্রন্থ সভ্যসমাজে সুপরিচিত। তাহা অধ্যাপক ওয়েবরের লেখনীপ্রসূত। তাহাতে কোল্‌ব্রুকের বিখ্যাত জ্যোতিষী গণনার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার ভ্রম প্রদর্শন না করিয়াই, অধ্যাপক ওয়েবর্ তাহার প্রতি আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত।* সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক এই সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া, রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে। সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? মূলগ্রন্থ-অধ্যয়নের ক্লেশস্বীকার না করিয়া, এই সকল পাশ্চাত্য মতের মায়াজালে জড়িত হইয়া, আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত হইতেছি। ইহাকে প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইলে, অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। তজ্জন্য সংস্কৃতভাষার মূলপ্রকৃতিরও আলোচনা করিতে হইবে। উত্তরকালে সংস্কৃতভাষা সর্ব্ববিষয়ে সুসংযত হইয়া যে বিশ্ববিখ্যাত রচনাগৌরব লাভ করিয়াছিল, তাহা সহসা সংঘটিত হয় নাই। একদা সংস্কারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল ভাষা কোনরূপ সংযম স্বীকার করিত না। তখন তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তাহার পর, ধীরে ধীরে সংস্কার সাধিত হইয়া, 'সংস্কৃত' ভাষা গঠিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে এই সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে অসংযত ভাষা ধীরে ধীরে সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্যে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।"

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি এই বেদ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, ভাষাসংস্কারের প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সক্তুর ন্যায় ভাষাও ঝাড়িতে ঝাড়িতে সংস্কৃত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অপভাষা বিতাড়িত হইয়া সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংস্কারসম্পন্ন সারাংশের নামই "সংস্কৃত ভাষা"।

অসংস্কৃতাবস্থায় কোনও সাহিত্য রচিত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। এক্ষণে যে সকল সাহিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সমস্তই সংস্কৃতাবস্থার সাহিত্য। তাহা ব্যাকরণশৃঙ্খলে সুসংযত। সুতরাং সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনার প্রধান সহায় সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ। কোন্ সময়ে ব্যাকরণরচনার সূত্রপাত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিচিত। তাহাতেও পূর্ব্বতন নানা ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের সাহিত্য যে বহু পুরাতন, তাহাতে সংশয় নাই। পাণিনিসূত্রে সেই পুরাতন সাহিত্যের কিরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়? পাণিনিসূত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে,

* Indische Studein, Vol. I. p. 85.

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এমন সুসংযত যথাবিন্যস্ত ব্যাকরণসূত্র কোনও ভাষার শৈশবদশায় সঙ্কলিত হইতে পারে না। অন্য কোন সভ্যদেশেই এরূপ ব্যাকরণ বর্ত্তমান নাই। পাণিনির পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাঁহার ব্যাকরণসূত্রে তাহারই আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কত সাহিত্য ও কত ব্যাকরণ, না জানি কতকাল ধরিয়া, সংস্কৃতভাষাকে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ-রচনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই পুরাতন ব্যাকরণের যে অনুমানমূলক রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে নানা অসঙ্গতির অবতারণা করিতে হয়।

পাণিনিসূত্রের আলোচনা নিতান্ত নীরস বলিয়া পরিচিত। সেই আশঙ্কায়, কোন কোন লেখক অন্যান্য প্রমাণের অবতারণা করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলন করিতে হইলে, পাণিনিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধকাম হইবার সম্ভাবনা কোথায়? নীরস হইলেও পাণিনিসূত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কদাপি নীরস বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। পাণিনিসূত্রে সংস্কৃতভাষার যে অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত উত্তরকালের সংস্কৃতভাষার তুলনা করিলে, পাণিনিসূত্রের আলোচনা কাব্যের ন্যায় মধুময় ও বিজ্ঞানের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

যে ব্যাকরণসূত্র সঙ্কলন করিয়া পাণিনি এইরূপ বিশ্ববিখ্যাত অমরকীর্ত্তিতে সভ্য-সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহার প্রয়োজন প্রদর্শনের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র রচিত হইয়াছিল। সে সূত্রটি এই:—

"অথ শব্দানুশাসনম্।"

এই সূত্রে 'শব্দের' অনুশাসন করাই ব্যাকরণরচনার প্রয়োজন বলিয়া উল্লিখিত। কোন্ 'শব্দের' অনুশাসনের জন্য এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল? সমগ্র সূত্র অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 'শব্দ'-শব্দে 'অপশব্দ' পরিত্যক্ত হইয়া, সাধু-'শব্দই' গৃহীত হইয়াছে। পাণিনির সময়ে জনসমাজে যাহা সাধুশব্দ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারই অনুশাসন-সম্পাদনার্থ পাণিনিসূত্রের অবতারণা। মহাভাষ্যকার এই সূত্রের বিচারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন:—

"কেষাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ।"

লৌকিক ও বৈদিক, এই দুই শ্রেণীতে সাধুশব্দ বিভক্ত; উভয় শ্রেণীর সাধুশব্দের অনুশাসনের জন্যই পাণিনিসূত্র রচিত হইয়াছিল। পাণিনি কিন্তু লৌকিক ও বৈদিক নামক পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি সাধু-শব্দকে 'ছন্দস্' ও ভাষা নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে দুই শ্রেণীর সাহিত্যে দুই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহৃত হইত; উভয় শ্রেণীর জন্যই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। পাণিনি যাহাকে 'ছন্দস্' ও 'ভাষা' বলিয়া পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, পতঞ্জলি তাহাকেই যথাক্রমে 'বৈদিক' ও 'লৌকিক' নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যাহা 'লৌকিক' বা 'বৈদিক' উভয়শ্রেণীর বহির্ভূত, পতঞ্জলি তাহাকেই 'অপশব্দ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

'শব্দ' অর্থাৎ সাধুশব্দ প্রয়োগভেদে তিনপ্রকার: (১) কেবল ছন্দে ব্যবহৃত শব্দ, (২) কেবল ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, (৩) ভাষায় ও ছন্দে তুল্যরূপে ব্যবহৃত শব্দ। পাণিনির সময়ে যে শব্দ কেবল ভাষায় ব্যবহৃত হইত, ছন্দে হইত না; অথবা কেবল ছন্দে হইত, ভাষায় হইত না; সূত্রমধ্যে তাহা সেইভাবে উল্লিখিত আছে। যেখানে সেরূপ উল্লেখ নাই, সেখানে ভাষা ও ছন্দে তুল্যরূপে ব্যবহারের নিয়ম থাকা বুঝিতে হয়। সূত্রবিভাগের এই পদ্ধতি স্মরণ থাকিলে, পাণিনিসূত্রের আলোচনায় নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাণিনি যাহাকে 'ছন্দস্' বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অর্থ কি? তিনি কোনস্থলে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার সময়ে 'ছন্দস্'শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, সেই অর্থেই 'ছন্দস্'শব্দ ব্যবহৃত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে 'ছন্দস্'শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির সময়ে এতগুলি ভিন্নার্থ প্রচলিত ছিল কি না, তাহাতে সংশয় আছে। 'ছন্দস্'শব্দের নানা অর্থ—

"ইচ্ছাসংহতযোবাবে ছন্দো বেদে চ ছন্দসি।"

'ছন্দস্'শব্দের এক অর্থ ইচ্ছা; এই অর্থে "স্বচ্ছন্দ" কথা উৎপন্ন হইয়াছে। এই অর্থে পাণিনিসূত্রে 'ছন্দস্'শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। 'ছন্দস্'শব্দের আর এক অর্থ, -পদ্যবন্ধের নিয়ম। এই অর্থে পাণিনি 'ছন্দস্'শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকিলে, যাহা গদ্য তাহা 'ছন্দস্' নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, গদ্যনিবদ্ধ বৈদিক সাহিত্যকে ভাষাসাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এবং পাণিনির সময়ে ভাষাসাহিত্যে পদ্য প্রচলিত না থাকাও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পাণিনি কি অর্থে 'ছন্দস্'শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার ব্যাকরণে ছন্দস্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্পের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণাদি পাণিনির মতে বেদমধ্যে পরিগণিত ছিল না। এরূপ তর্ক নিতান্ত একদেশদর্শী। সমগ্র সূত্র আলোচনা করিলে, এই শ্রেণীর তর্কের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পাণিনি কেবল শব্দের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ প্রদর্শনের জন্যই ছন্দস্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, সূত্র ইত্যাদি কথার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; তদ্দ্বারা সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পাণিনিসূত্রের সকল স্থানে 'ছন্দস্'-শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার সাধারণ অর্থ 'বেদ', কোনস্থলে তাহার বিশেষ অর্থ 'মন্ত্র'; কোনস্থলে বিশেষ অর্থ 'ব্রাহ্মণ'। বেদার্থে সাধারণভাবে যে সকল সূত্রে 'ছন্দস্'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১।২।৬১ সূত্র উল্লেখযোগ্য। ১।২।৩৬ সূত্রে ব্রাহ্মণার্থে ও ৪।২।৬৬ সূত্রে মন্ত্রার্থে 'ছন্দস্'-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। 'ছন্দস্' ও 'ভাষা' শব্দের ব্যবহারে পাণিনি দুই শ্রেণীর সাহিত্য প্রচলিত থাকা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা 'ছন্দস্' নামে অভিহিত, তাহা ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা কল্পের অন্তর্গত হইলেও, 'ভাষা' নহে। তাহারই সাধারণ নাম "বৈদিক সাহিত্য"। 'ভাষাসাহিত্য' তাহা হইতে পৃথক্।

'ছন্দস্' ও 'ভাষা'-সাহিত্যের প্রভেদ-প্রদর্শনার্থ পাণিনিসূত্রে সমস্ত সাহিত্য 'দৃষ্ট,' 'প্রোক্ত' ও 'কৃত' নামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত। বৈদিকসাহিত্য 'দৃষ্ট' বা 'প্রোক্ত' ভাষা-সাহিত্য 'কৃত'। কৃতগ্রন্থ কর্ত্তার নামে, প্রোক্ত প্রোক্তার নামে ও দৃষ্ট দ্রষ্টার নামে পরিচিত ছিল। পাণিনির সময়ে মনুষ্যকৃত ভাষাসাহিত্যে যে নানাশ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয় পাইলেও, সেই সকল গ্রন্থের অন্য কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই। দৃষ্ট ও প্রোক্ত নামক যে বৈদিক সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনির সময়ে রামায়ণ প্রচলিত থাকিবার কোন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তৎকালে যে সাহিত্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিতসমাজে সমাদৃত ছিল, তাহার অধিকাংশই বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। সে সাহিত্যের দ্রষ্টা বা প্রোক্তা ঋষি-গণের নাম ও পরিচয় পাণিনিসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে বাল্মীকির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে যাহা পাণিনি-ব্যাকরণ নামে মুদ্রিত, অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ত্রিমুনি-ব্যাকরণ। পাণিনির সূত্র, কাত্যায়নের বার্ত্তিক ও পতঞ্জলির ভাষ্য মিলিত হইয়া "ত্রিমুনি-ব্যাকরণ" নামে প্রচলিত হইয়াছে। মুনিত্রয়কে সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথমে পাণিনি, তাহার পর কাত্যায়ন, তাহার পর পতঞ্জলি। ইঁহাদের মধ্যে কাহার কতকাল পরে কে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

পাণিনিসূত্রের সহিত কি উদ্দেশ্যে কাত্যায়নের বার্ত্তিক সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বার্ত্তিক ভিন্ন সূত্রের অসম্পূর্ণতা দূর হইত না। কিন্তু পাণিনির সময়ে পাণিনিসূত্রে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা ছিল কি না, তাহার প্রমাণাভাব। কাত্যায়নের সময়ে সংস্কৃতভাষার যে অবস্থা বর্ত্তমান ছিল, তাহার পক্ষে পাণিনিসূত্রের নানা অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়াছিল। সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্যই বার্ত্তিকের অবতারণা। অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকর্ তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া গণনা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, পাণিনিকৃত ৩৯৯৩ সূত্রের মধ্যে প্রায় ১৫০০ সূত্রে কাত্যায়ন বার্ত্তিক যোগ করেন, অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ সূত্র কাত্যায়নের বিচারে অসম্পূর্ণ ছিল। পাণিনি এতগুলি সূত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন কেন? ইহা কি তাঁহার অনবধানতা, না অজ্ঞতার নিদর্শন? পাণিনি ও কাত্যায়নকে সম-সাময়িক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে, পাণিনির এরূপ অজ্ঞতা বা অনবধানতা স্বীকার করা চলে না। পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার ব্যাকরণসূত্র সেই সাহিত্যের সমগ্র শব্দানুশাসনে অসমর্থ, ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাঁহার অনব-ধানতা বা অজ্ঞতা স্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু সে সাহিত্য কোথায়? সে-কালের লৌকিকসাহিত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেকালের বৈদিকসাহিত্য বর্ত্ত-মান থাকিলেও, কোন্ কোন্ গ্রন্থ পাণিনির সময়ের, কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাঁহার পরবর্ত্তী কালের, তদ্বিষয়ে মতভেদের অভাব নাই।

পাণিনির সময়ে যে সকল শব্দ কেবল বৈদিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, ভাষায় ব্যবহৃত হইত না, উত্তরকালে সেরূপ অনেক শব্দ ভাষাসাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যেমন সংস্কৃত হইতে শব্দ আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে, ভাষাসাহিত্যও সেইরূপ বৈদিকসাহিত্য হইতে শব্দ আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কোন্ সময়ে কত বৈদিকশব্দ ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল, অভিধান থাকিলে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু অমর কোষের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অভিধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অগত্যা অমরকোষ ধরিয়াই বিচার করা আবশ্যক। অমরকোষ লৌকিক শব্দকোষ; যাহা লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না, এরূপ শব্দ অমরকোষে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উত্তরকালে 'অমর-কোষের' অতিরিক্ত নানাশব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে; পরবর্ত্তী অভিধানে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য 'অমর কোষের' পরিশিষ্টস্বরূপ 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল। সঙ্কলনকর্ত্তা পুরুষোত্তম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অলৌকিকত্বাদমরঃ স্বকোশে ন যানি নামানি সমুল্লিলেখ।
বিলোক্য তৈরপ্যধুনা প্রচারময়ং প্রযত্নঃ পুরুষোত্তমস্য॥"

এই শ্লোকে বুঝিতে পারা যায়,—অমরসিংহের সময়ে লৌকিকসাহিত্যে অপরিচিত শব্দ উত্তরকালে লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। "ত্রিকাণ্ডশেষে" এই সকল শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

পাণিনির সময়ে যে শব্দ লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না, রামায়ণে সেরূপ শব্দের ব্যবহার দেখিলে, রামায়ণকে পাণিনির পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ বলিতে ইতস্তত থাকে না। পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, উত্তরকালে তাহারও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তদ্দ্বারা রামায়ণের রচনাকালনির্দ্দেশের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। সুতরাং রামায়ণের রচনাকাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে, পাণিনিসূত্রের আলোচনা করা আবশ্যক।

পাণিনিসূত্রে কোন ব্যাখ্যা বা উদাহরণ সংযুক্ত ছিল না। তাহা শিষ্যগণ উপদেশক্রমে জ্ঞাত হইতেন। কাত্যায়ন বার্ত্তিক সংযোগ করিবার সময়ে উদাহরণের অবতারণা করেন। ভাষ্যকার তাহার সহিত অনেক নূতন উদাহরণ সংযুক্ত করিয়া দেন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি আপন আপন সময়ের প্রচলিত সাহিত্য হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বার্ত্তিকসূত্রসংযোগের সময়ে বার্ত্তিকসূত্রসংযোগের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইবার জন্য কাত্যায়নকে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হইয়াছিল,—বার্ত্তিক সংযোগ না করিলে, উদাহরণোক্ত শব্দ পাণিনিসূত্রের দ্বারা শাসন করা যায় না। এই সকল উদাহরণের বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পাণিনির পুরাতন সূত্রকে অভিনব সাহিত্যের উপযোগী করিয়া লইবার জন্যই অধিকাংশ বার্ত্তিকের অবতারণা। অন্যথা পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা কি সমসাময়িক?

"কথাসরিৎসাগরের" একটি আখ্যায়িকায় পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম-

সাময়িক বৈয়াকরণ বলিয়া উল্লিখিত। "কথা-সরিৎসাগর" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর গল্পপুস্তক। "ভোজপ্রবন্ধ"নামক গল্পপুস্তকে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত। "কথাসরিৎসাগরের" আখ্যায়িকাও সেইরূপ। অথচ তাহাকে প্রামাণিক ইতিহাস মনে করিয়া, অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "কথা-সরিৎসাগরের" আখ্যায়িকা সত্য হইলে, পাণিনি অপেক্ষা কাত্যায়নকেই অধিকতর ব্যুৎপন্ন বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। মোক্ষমূলর তাহাই করিয়া গিয়াছেন। *

কাত্যায়ন কিন্তু পাণিনির প্রতি এরূপ অসমাদর প্রদর্শন করেন নাই। মোক্ষমূলরের মতে পাণিনি অসমগ্রব্যাকরণরচয়িতা। অস্মদ্দেশে কাত্যায়নবিরচিত পাণিনি-নমস্কার-শ্লোক বলিয়া যে শ্লোক অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহাতে কাত্যায়ন পাণিনিকে সমগ্র-ব্যাকরণরচয়িতা বলিয়াই নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। যথা :

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

পাণিনি যে চতুর্দ্দশ "প্রত্যাহারসূত্র" অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে "অক্ষরসমাম্নায়" অর্থাৎ অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ, ও ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ পাঠের সিদ্ধ ও সনাতন ক্রম পরিত্যক্ত হইয়া নূতন ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা পাণিনিবিরচিত বলিয়া পরিচিত নহে। তিনি অবশ্যই কোন পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণের গ্রন্থ হইতে এই চতুর্দ্দশ সূত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ও অব্যবহিত পরে সে কথা লোকে জানিত; কালে তাহা বিস্মৃত হইয়া জনসাধারণ এক অলৌকিক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছিল। লোকে বলিত, পাণিনি ইহা ভূতভাবন ভবানীপতি মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাত্যায়ন বহুপরবর্ত্তী কালের বৈয়াকরণ না হইলে, তিনি নমস্কার-শ্লোকে এই অলৌকিক জনশ্রুতির উল্লেখ করিতেন না। অন্য প্রমাণ না থাকিলে, এই নমস্কারশ্লোক ধরিয়াই কাত্যায়নকে পাণিনির বহুপরকালবর্ত্তী বলা চলিত। কিন্তু অন্য প্রমাণেরও অভাব নাই।

সূত্র ও বার্ত্তিক তুলনায় সমালোচনা করিলে, পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিবার উপায় থাকে না। বরং বলিতে হয়,—কাত্যায়ন তাঁহার সময়ের প্রচলিত সাহিত্যের সমগ্র শব্দানুশাসনকার্য্যে পাণিনি-সূত্রের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া, পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব সাহিত্যের উপযোগী করিবার জন্যই বার্ত্তিক সংযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেক বার্ত্তিক যে বিনা প্রয়োজনেও সংযুক্ত হইয়াছিল, উত্তরকালে ভাষ্যকার তাহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অধিকাংশস্থলে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

রামায়ণোক্ত শব্দানুশাসনের জন্য পাণিনি-

* His Varttikas are supplementary rules, which show a more extensive and accurate knowledge of Sanskrita than even the work of Panini, ——Max Muller's History of Ancient Sanskrita Literature, p. 241.

সূত্র সমর্থ কি না, তাহার বিচারে অগ্রসর হইলেই, রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবে। তৎপূর্ব্বে কাত্যায়ন পাণিনির পরবর্ত্তী কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সংযম।*

বড় আশা ছিল, নবোদ্ভূত বঙ্গসাহিত্য-দ্বারা বঙ্গসমাজ আবার সুসংস্কৃত হইয়া পুণ্য ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবে। সাহিত্য-সেবিগণের প্রথম উদ্যমে এইরূপ আশা-সঞ্চারের যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ অপকার সাধিত হইতেছে। যে সাহিত্য জন-সমাজকে পুণ্য ও পবিত্রতার পথে আকর্ষণ করিয়া এক মহৎ লক্ষ্য ও উচ্চতম আদর্শের দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ সাহিত্যদ্বারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। পরন্তু যে সাহিত্য জাতীয়জীবনের উচ্চতম আদর্শ ভুলিয়া গিয়া সমাজের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খ-লতা, অমিতাচার ও অসংযমরূপ লেলায়মান বহ্নিকে পুষ্ট করিবার জন্য তাহাতে আপাত-মনোরম মাদকতাময় মোহময় প্রেমরূপ ঘৃতা-হুতি প্রদান করে, সে সাহিত্যদ্বারা সমাজ অধিকতর কলুষিত হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইব, বর্ত্তমান সময়েও তাহাই হইতেছে।

মানবহৃদয়ে যতপ্রকার বৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও দুর্দ্দমনীয়। প্রেমের ন্যায় আবেগময়, আবেশময়, মোহময়, মধুময়, মদিরাময় বৃত্তি আর নাই। প্রেমই আমাদের সমাজবন্ধনের রজ্জু এবং কাব্য-কলার উপাদান। এই প্রেমের উদ্দাম উদ্দী-পনাদ্বারা সমাজের যে গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের ঋষিগণ বিশেষ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুবকযুবতীর প্রেম-লীলাময় গান্ধর্ব্ববিবাহ সমাজ হইতে তুলিয়া দিয়া এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বাল্য-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুসমাজে দাম্পত্য-প্রীতিকে একটি শান্তিময় সুস্নিগ্ধ স্তিমিতপ্রবাহ দেবখাতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্য-আদর্শ-প্রিয় কবিগণ দেখিলেন, প্রেমকে এরূপ গার্হস্থ্যজীবনখাতে মৃদুমন্দগতিতে একঘেয়েভাবে প্রবাহিত হইতে দিলে সেই অদ্ভুতরসসেকহীন—romanceশূন্য—জীবনের সার্থকতা কি, আর কাব্যকলারই বা উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইবে কেন? সেজন্য কাব্যকলায় নবনব

* ইহা সবিত্রীলাইব্রেরির এবারকার বার্ষিক অধিবেশনে লেখককর্ত্তৃক পঠিত "বিশ্বামিত্রের তপস্যা।" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ।

রসসৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং সমাজমধ্যে স্বাধীন প্রেমের উন্মুক্ত তরঙ্গ ছুটাইবার জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে কাব্যরা " আরম্ভ করিয়াছেন। বড়ই ক্ষোভের বিষয়, যে সকল গ্রন্থকারের উজ্জ্বল প্রতিভায় আজ বঙ্গীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত, তাঁহারাই এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার পথপ্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অবাধপ্রেমের বিচিত্র-লীলা প্রদর্শন করিতে না পারিলে উপন্যাস জমে না স্বীকার করি, কিন্তু তাহারও একটা সুসংযত সীমা থাকা কর্ত্তব্য। সমাজে নরনারীচরিত্রের উপর আপাতমধুর সাহিত্যের কতদূর প্রভাব, ইহা গ্রন্থকারদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ঔপন্যাসিক প্রেমচিত্র দ্বারা স্বাধীনপ্রেমের লীলাভূমি পাশ্চাত্য-সমাজে যে কত গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতেছেন। এই প্রসঙ্গে Marie Corelli প্রণীত "Sorrows of Satan" এবং Mrs. Henry Wood প্রণীত "East Lynne" উপন্যাস বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যসমাজে প্রেমকে অতিমাত্র স্বাধীনতা দিতে দিতে এখন তাহার পাখা হইয়াছে; সে এখন সুদূর সূক্ষ্মতম আকাশে—Ethereal region এ—উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সে এখন আর সাধারণ-ঘরকন্না-রূপ খুঁটিনাটির মধ্যে অবরুদ্ধ ও আবদ্ধ থাকিয়া নিজকে ধূলিমলিন করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্যসমাজে স্বামী এখন স্ত্রীর নিকট হইতে আদর-অনুরাগ-স্নেহ সবই পাইতেছেন, কেবল পান না সেই অদ্ভুতরহস্যময় বস্তুটি অর্থাৎ love বা ভালবাসা। স্ত্রীর নিকট হইতে সেই সূক্ষ্মতম পদার্থটি লাভ করা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। কারণ love বড় ethereal—আকাশশরীরী, তাহা কাহাকেও ধরাছোঁয়া দেয় না—তাহা নরনারীর ইচ্ছাধীন নহে—তাহা নরনারীর ইচ্ছাশক্তির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে;—"It is a capricious passion and generally comes without the knowledge and against the will." অবাধ উন্মুক্ত স্বাধীনপ্রেমের কি অদ্ভুত পরিণাম!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেমবৃত্তিটি বড় দুর্দ্দমনীয়। একবার রাশ ছাড়িয়া দিলে সেই দুষ্ট অশ্বকে সংযত করিতে পারে, এরূপ সারথি কে আছে? সেই অসংযত দুষ্ট অশ্ব প্রবলবেগে ছুট পাইয়া পাশ্চাত্যসমাজে নরনারীকে অনবরত সংসারের খাতে ফেলিতেছে। কত কত মূল্যবান্ জীবন প্রেমবিপাকে পড়িয়া বিফল হইয়া যাইতেছে। আবার দাম্পত্যপ্রেম অত্যধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া নরনারীর হৃদয় একচেটিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে। ঈশ্বরে ভক্তি ত অতিদূরের কথা, এমন কি, পিতামাতা-ভাইভগিনীর জন্যও পাশ্চাত্যহৃদয়ে একটুকু স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। স্ত্রী আসিয়া স্বামীর হৃদয় একেবারে পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়া বসিলেন, তাহাতে আর কাহারও স্থান হইবার সম্ভাবনা রহিল না। একটি সুসংযত হৃদয়ে একই সময়ে ঈশ্বরে প্রীতি, পিতামাতার ভক্তি, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, ভাইভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি স্নেহ,- এবং একই পরিবারে ইঁহাদের সকলের একত্র অবস্থান, এই নেত্র-

প্রীতিকর দৃশ্য কেবল ঋষিদিগের তপঃপূত সুসংস্কৃত সুনিয়ন্ত্রিত হিন্দুপরিবারেই দেখা যায়। হিন্দুপরিবার বিশ্বপ্রীতিশিক্ষার নিলয়, তাই এখানে পাতির বহুমূর্তিতে—বিবিধ ভাবে পরিণতি। তুমি সহধর্ম্মিণী বিবাহ করিয়া আনিয়া তোমাকে আমার আত্মার অর্দ্ধাংশ দান করিয়াছি সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করি নাই—এই যুক্ত পরিবারে আমার আর পাঁচ-জন যেমন আমার আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া আছে, তুমিও তাহাদের মধ্যে মিলিয়া থাক আমার আর পাঁচজনকে পরিত্যাগ করিয়া, একলা তোমাকে লইয়া আমি কি করিব? হিন্দুহৃদয়ে সহধর্ম্মিণীর ইহাই ন্যায্য অধিকার। হিন্দুপত্নী ইহাতেই সন্তুষ্টা। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন লোকসানও নাই। তিনি স্বামিহৃদয়ের একমাত্র প্রেম-নায়িকা না হইতে পারিয়া পাশ্চাত্য-পত্নীর তুলনায় যেটুকু আদর ও সোহাগ কম পাইতেছেন, সন্তানগণের জননীরূপে, ভ্রাতার ভগিনীরূপে, পিতা-মাতার কন্যারূপে এবং একপরিবারস্থ অন্যান্য সকলের আনন্দদায়িনী সহচরী বা আত্মীয়ার রূপে সেই আদর ও সোহাগের শত-গুণ সুদসমেত লাভ করিতেছেন। ইহাই হিন্দুগৃহিণীর বিশেষ গৌরব। কিন্তু এই গৌরবান্বিত পদ লাভ করিবার জন্য হিন্দু-পত্নীকে দ্রৌপদীর ন্যায় তপস্বিনী হইতে হইবে। তাই বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয়-সাহিত্যরথিগণের পাশ্চাত্যাদর্শবহুল-নাটক-নবেল-পাঠের ফলে হিন্দুপরিবারে এইরূপ আদর্শগৃহিণীর সংখ্যা দিনদিন হ্রাস হই-তেছে। সংযম, সহিষ্ণুতা, শীলতা প্রভৃতি শোভনীয় গুণসকল হিন্দুপরিবার হইতে দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। সাহিত্য-রথিগণ হিন্দুর সুসংযত চিত্তে নিত্য নব ভোগ-লালসা জাগরিত করিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

হয় ত কেহ বলিবেন, কঠোর ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে হিন্দুজাতির মানসিক শক্তিসমূহ নিষ্পেষিত ও দলিত হইয়া গিয়া সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সে সকল কঠোর শাসনের ব্যবস্থা আর কেন? এখন অন্যান্য সুসভ্য জাতিসকল যেমন ব্যক্তি-গত স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীন আচারব্যবহার, স্বাধীন কর্ম্মপন্থাসকল অবলম্বন করিয়া সমু-ন্নত হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, শুদ্ধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহারদ্বারা কখন কোন জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যে জাতি যত বড় হইয়াছে, সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই জাতীয় কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নিকট তত অধিক মস্তক অবনত করিতে বাধ্য। মুখের কথা,—প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন, কিন্তু কার্য্যত প্রত্যেক ব্যক্তি জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন। ইংরেজ, রুষ, জাপান জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জাতির হিতা-কাঙ্ক্ষায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প বলিয়াই এই সকল জাতি এতদূর রাষ্ট্রীয় সমুন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। জাপান-জাতীয় প্রত্যেক পুরুষ কতক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতে বাধ্য। আজ জাপা-নীর শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রম দেখিয়া সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত, কিন্তু জাপানীদিগের এই

সকল গুণ কত কঠোর সাধনাবলে অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা আমরা কয়জনে অনুসন্ধান করি? সম্প্রতি জাপানপ্রবাসী একজন বাঙালী কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় জাপানী দিগের, স্বদেশের হিতকল্পে, কঠোর সাধনার কথাপ্রসঙ্গে বলেন—

"জাপানের ক্ষত্রিয়সমাজ 'সামুরাই' নামে পরিচিত। ইহাদের শৌর্য্যসাহসের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সামরিক জাতির অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালের স্পার্টানদিগের অনুরূপ; বরং অনেকবিষয়ে তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর। অতি বাল্যকাল হইতে সামুরাইকে সহিষ্ণুতার আধার করিয়া তুলিবার জন্য পিতামাতারা বিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়া থাকে। সহিষ্ণুতা-শিক্ষার জন্য বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া নগ্নপদে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হয়। শীতকালে এই-রূপ খালিপায়ে বরফের উপর দিয়া গুরুগৃহে যাইতে হয়। তাহাদের যাহাতে রাত্রিজাগরণের অভ্যাস হয়, সে বিষয়েও অভিভাবকেরা যত্নের ত্রুটি করেন না। মাসের মধ্যে অন্তত দুইদিন সমস্তরাত্রি জাগিয়া বালক-বালিকাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিতে হয়। ক্ষুধাবিজয় জাপানী ক্ষত্রিয়-বালকদিগের শিক্ষার তৃতীয় অঙ্গ। দীর্ঘকাল অক্লেশে অনশনে যাপন করিতে অসমর্থ হওয়া সামুরাইবালকের পক্ষে ঘোর লজ্জার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সকল শিক্ষায় বালকবালিকাদিগের দেহ সুদৃঢ় হইলে সামুরাই-জনকজননী তাহাদিগকে নির্ভীক করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে সকল স্থানে ভূতের উপদ্রবের ভয়ে সাধারণ লোকে যাইতে সাহসী হয় না, সেই সকল স্থানে ও ভীষণ শ্মশানভূমিতে অতি অল্পবয়স্ক সামুরাই-বালককে পুনঃপুন গমন করিতে বাধ্য করা হয়। কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদের দণ্ড হইলে রাত্রিকালে একাকী বালকদিগকে বধ্যভূমিতে গমনপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির দেহস্পর্শ ও ছিন্ন-মস্তকে কোনপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিতে হয়।" ইত্যাদি।

'হিতবাদী'—৮ই মাঘ, ১৩১০।

জাপানীদিগের জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির চরণতলে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলি-দানকে কি বলিব? ইহাই ত তপস্যা। জাপানীজাতি পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগ-বিলাসতরঙ্গে গা ছাড়িয়া না দিয়া, তাহার মধ্য হইতে যতটুকু স্বকীয় জাতি ও স্বকীয় সমাজের হিতকল্পে উপযোগী, তাহাই ছাঁকিয়া লইয়াছে। আর আমরা? আমরা সেই বাহ্যচাকচিক্যময় সভ্যতার কুহকে পড়িয়া আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া সেই সভ্যতার ভোগবিলাসপ্রবাহে কাষ্ঠতৃণবৎ ভাসিয়া যাইতেছি।

পাশ্চাত্যজাতি আমাদিগকে অহরহ ইহাই বলিয়া টিটকারি দেন যে, আমরা অসভ্য, আমাদের—standard of comfort নিতান্ত low - অর্থাৎ আমাদের বাহ্যিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার মাপকাঠিটা নিতান্ত ক্ষুদ্র। তাঁহাদের তুলনায় আমরা শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি অধিক লক্ষ্য করি না, নিত্য নূতন সুখের জিনিষ ও সখের জিনিষের

জন্য আমরা অধিক অর্থব্যয় করিতে পারি না। তাঁহাদের এই তিরস্কারে ভীত হইয়া এবং পাশ্চাত্যসভ্যতার বাহ্যিক জাঁকজমকে মুগ্ধ হইয়া আজ আমরা ক্রমাগতই তাঁহাদের অনুকরণে নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাদের পরিপূরণের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। এই standard of comfort বৃদ্ধি করিতে গিয়া পাশ্চাত্যজাতিসকল কি ঘোরতর অশান্তিতে কালযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এখন পাশ্চাত্য-সভ্যতাবিস্তারের অর্থ এই—তোমরা তোমাদের ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নিত্য নূতন বস্তুর আবিষ্কার কর, সেই সেই বস্তু প্রাপ্তির জন্য সদুপায়ে হউক, অসদুপায়ে হউক, অর্থসংগ্রহ কর, সেই অর্থ স্বদেশে না মিলিলে তাহা লাভের জন্য অন্যদেশ অধিকার কর, অন্যজাতির সর্ব্বস্ব অপহরণ কর, অন্য জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কর। যদি অন্য কোন ক্ষমতাশালী জাতি সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তবে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সে জাতি যদি দশলক্ষ সৈন্য, দশহাজার কামান সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে তোমরা বিশলক্ষ সৈন্য এবং বিশহাজার কামান সংগ্রহ কর। যদি সেই জাতি পাঁচখানা রণতরি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তবে তোমরা দশখানা প্রস্তুত কর। এইরূপে সুসভ্যজাতিবৃন্দের দুর্দ্দমনীয় ভোগলালসা হইতে পৃথিবীতে রাবণের চিতাবহ্নির ন্যায় প্রতিনিয়ত সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই কি মহা-গৌরবান্বিত পাশ্চাত্যসভ্যতার পরিণাম? পরমেশ্বর কি এইরূপ পাশববৃত্তিসকল চরিতার্থ করিবার জন্য মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন? জগতে শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতার রাজত্ব কি কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে না? জগতে কি কখনও সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার পবিত্রবন্ধনে মানবমণ্ডলী সংবদ্ধ হইবে না?

আমাদের দেশে আজ যাহারা জাপানের সুখসমৃদ্ধিশৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া সেদিকে সতৃষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাদিগকে বলি—যে তপস্যাবলে জাপান আজ বহুকালব্যাপী সুষুপ্তির ক্রোড় হইতে জাগ্রত হইয়া জগতের সমক্ষে গৌরবমণ্ডিত মস্তক উন্নত করিয়াছে, আমাদিগকেও সেইরূপ তপস্যা করিতে হইবে। পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগবিলাসে মাজিলে কখন এ জাতির উন্নতি হইবে না। একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পাশ্চাত্য-জাতিরা সভ্যতার যে মাপকাঠি বাহির করিয়াছে, তাহাই জগতে একমাত্র মাপকাঠি নহে। তাহারা যে standard of comfort আমাদিগকে দেখাইতেছে, তাহাই একমাত্র standard of comfort নহে। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের তপোবলে প্রাচীন ভারতে যে আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যাহার প্রভাব এখনও চীন-জাপানে, এমন কি, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অল্পমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে, আমরা সেই মহাগৌরবান্বিত আর্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্যসভ্যতার যেমন একটা standard of comfort আছে, সেই আর্যসভ্যতারও তেমনি একটা standard of comfort ছিল।

পাশ্চাত্যসভ্যতার standard হইতেছে, শরীর ও মনের তৃপ্তি। আর্যসভ্যতার standard ছিল আত্মার তৃপ্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার নিরিখে তিনিই তত উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত যিনি যত অধিকপরিমাণে অর্থ শুক্তি।-লইয়া নিজের স্বার্থ পূরণ করিবেন যিনি উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিবেন,—যিনি অধিকপরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া নিজের ও পরিজনবর্গের উত্তম বেশভূষা, আহার বিহার ও আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিবেন যিনি সর্বসাধারণকে নিজের প্রভুত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন। আর আর্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও পূজিত, যাহার এ সংসারে আপনার বলিবার কপর্দকও নাই, অথচ যাহার কিছুমাত্র অর্থলিপ্সা নাই—যাহার বাস করিবার জন্য একখানি গৃহও নাই, অথচ যিনি তাহার কিছুমাত্র অভাববোধ করেন না। যিনি আহারবিহারবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বীতস্পৃহ—যিনি পরের অনিষ্ট করিবার জন্য কিছুমাত্র ক্ষমতা চাহেন না,—যিনি বসনভূষণসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, মান-অপমান যাঁহার নিকট তুল্য—যাঁহার নিকট শত্রুমিত্রের ভেদ নাই—যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মারাম। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্যসভ্যতার আদর্শ-পুরুষ আমেরিকার সেই ধনকুবের Peirpont Morgan, আর্যসভ্যতার আদর্শপুরুষ সেই কাশীধামের ত্রৈলিঙ্গস্বামী। শুদ্ধ আত্মার তৃপ্তির জন্য ভারতবাসিগণ প্রাচীনকালে ধনমান, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, সুখ-সম্পদ্ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতেন। ইহার বহু উদাহরণ রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বর্তমান সময়ে যদি কোন রাজকুমার কিংবা বড়-লোকের ছেলে ও দিশনে গমন করেন, তবে তাহার বেশভূষা-চাকরখানসামা প্রভৃতির বোন আনা ধন দেখিয়া চক্ষু স্থির হয়। কত একদিন অযোধ্যার—এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট দশরথের দুইটি কিশোর-বয়স্ক কুমার তাড়কাবধের নিমিত্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত নানাদিগ্‌দেশপর্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা কি বেশে কতজন ভৃত্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন? আমরা দেখিতে পাই, রাম-লক্ষ্মণ তাহাদের রাজোচিত বেশভূষা ত্যাগ করিয়া সেই তপস্বীর সঙ্গে তপস্বিবেশে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং বহুদিন পর্যন্ত তাহার সাথে কখন ফলমূলাশনে, কখন বা অনশনে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রামলক্ষ্মণ ছিলেন অসভ্য, কারণ তাঁহাদের standard of comfort নিতান্ত ছোট ছিল। আর আমরা মহা-সভ্য, কারণ আমাদের standard of comfort তাহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

পাশ্চাত্যসভ্যতার ঐন্দ্রজালিক মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়াতে আমাদের নৈতিক অবস্থাও দিনদিন শোচনীয় হইতেছে, আমরা মনুষ্যত্ব হারাইতেছি। যতই আমাদের অট্টালিকা-আস্‌বাব্, পোষাক পরিচ্ছদ, আদবকায়দার ঘটা বাড়িতেছে, ততই আমাদের আত্মার বল কমিয়া আসিতেছে। ১০।১৫ বৎসর পূর্বে চা-পান-করাটা কেবল সাহেবিয়ানা-গ্রস্ত উচ্চশ্রেণীর বড়লোকদিগেরই রীতি ছিল, কিন্তু এই ১৫ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রত্যেক মধ্য-

বিত্ত, এমন কি, অনেক দরিদ্র পরিবারের নিত্যক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। এতাবৎকাল শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কঠিন পরীক্ষা করা হইয়াছে, নচেৎ আমি আর অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতে পারিতাম, শুদ্ধ পাশ্চাত্যসভ্যতার খাতিরে আমরা আরও কতপ্রকার অভাব উদ্ভাবন করিয়া আমাদের দারিদ্র্যতার বৃদ্ধি করিতেছি। আমরা মুখে "ভারতের দরিদ্রতা" বলিয়া কত আন্দোলন করি, কত রিজোলিউশন্ পাস্ করি, কত হাহুতাশ করি,—কিন্তু দেশের দরিদ্রতা আমরা কতটা নিজেরাই বৃদ্ধি করিতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমাদের পিতৃপিতামহগণ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সারা দিনরাত্রি খালি গায় কাটাইতেন, অথচ তাঁহারা দীর্ঘজীবী ও নীরোগ ছিলেন। আমাদের কিন্তু অষ্ট-প্রহর গঞ্জী কিংবা শার্ট গায় না দিয়া থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। অথচ আমাদের রোগ চিরদিন একটা-না-একটা লাগিয়াই আছে, এবং আমাদের আয়ু প্রায় পঞ্চাশ পার হয় না। যাহা হউক, আমার অর্থ আছে, আমি যেন এরূপ জামাকাপড় ব্যবহার করিতে পারিলাম। কিন্তু আমার অনুকরণে পরাণ-মাঝির পুত্র যে আট আনা দিয়া ঐ কালো-ডোরাযুক্ত বিলাতী গঞ্জী কিনিয়া নৌকা বাহিবার সময় গায় দিয়াছে, ও কি আর উহার পিতার মত শীতকালের রাত্রে হিমের মধ্যে জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিতে পারিবে? কখনই না। দেশের ভদ্রলোকদিগের অনুকরণে গরিবশ্রেণীও বিলাসিতার পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। পূর্ব্বে কলিমদ্দী শেখ যখন তাহার ক্ষেত্রে চাষ করিতে যাইত, তখন মাটির বাসনে ও পিতলের ঘটীতে তাহার প্রাতরাশের জন্য ভাত ও জল আসিত। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এখন enamelled plate, enamelled cups, enamelled glass না হইলে তাহার সেই ভাত ও জল আসে না। এইরূপ আর কত দৃষ্টান্ত দিব?

আমরা এইরূপে নিজেদের বিলাস-প্রিয়তাদ্বারা দেশের অভাববৃদ্ধি ও দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি, অথচ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল উপায়ে দরিদ্রদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, আমরা সেগুলি একে একে পরিত্যাগ করিতেছি। আমাদের দেশে গৃহস্থমাত্রেরই অতিথি-সৎকার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা যেমন অনেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি গৃহস্থের আলয়ে আশ্রয় পাইত, তেমন গৃহস্থও সর্ব্বজন-প্রীতির অনুশীলনদ্বারা হৃদয়ের প্রশস্ততা লাভ করিতেন। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই অতিথিসৎকার এখন হিন্দুসমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। এখন আমরা আমাদের কতশত কৃত্রিম অভাব পূরণ করিতেই ব্যস্ত, অতিথিসেবার ব্যয় বহন করিতে পারিব কেন? আমাদের ভারত-সম্রাট্ মহামতি এড্ওয়ার্ডের শুভ-অভি-ষেকোপলক্ষে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের শুভ আকাঙ্ক্ষায় অনেকগুলি দরিদ্রলোক এক বেলা আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, সেজন্য বিলাতে এক মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল। কারণ, এরূপ অনুষ্ঠান সে দেশে

অশ্রুতপূর্ব্ব। কিন্তু আমাদের দেশে যে নিতান্ত গরিব, তাহারও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে কিংবা পূজাপার্ব্বণে অনেক প্রতিবেশী নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। হিন্দুর কোন শুভকর্ম্ম যাগযজ্ঞ এইরূপ সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভোজ ব্যতিরেকে সফল ও সুসিদ্ধ হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই—হিন্দু জানেন যে, এই সকল পূজাপর্ব্বাদিতে যে দেবতার অর্চ্চনা করা হয়, এই বিশ্ব তাঁহার দেহ। তিনি বৈশ্বানর—বিরাট্—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। তাই বিশ্বজনের তৃপ্তিতে তাঁহার তৃপ্তি,—বিশ্বজনের প্রীতিতে তাঁহারই প্রীতি,—বিশ্বজনের সন্তোষে তাঁহার সন্তোষ। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অন্তঃকরণ যেমন উদার ছিল, তাঁহাদের নিমন্ত্রিতমণ্ডলীও তেমনই ব্যাপক ছিল। আমরা সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্যের "পদ"-সংখ্যা ও রসমাধুর্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিতের সীমাটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে এখন মাত্র ৫।৭টি select friends-এ—বাছাই করা অন্তরঙ্গে—পরিণত হইয়াছে। এইরূপে আমরা মুখে যতই দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া আত্মগুণ ঘোষণা করিতেছি, ততই যে সকল দ্বার দিয়া আমাদের উপার্জ্জিত অর্থ অতি অল্পপরিমাণেও দরিদ্রের হাতে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল আটঘাট খুব airtight নিশ্ছিদ্র করিয়া বন্ধ করিতেছি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কলকারখানা-শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রপোষণের ব্যবস্থা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। এবং এই-শুভ-উদ্দেশ্যসাধনার্থে সম্প্রতি যে চারি আনা করিয়া চাঁদা-সংগ্রহের আয়োজন হইতেছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের দরিদ্রতানিবারণের জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তিগত আয়ত্তাধীন রহিয়াছে, তাহাদের অনুষ্ঠান না করা যে গুরুতর সামাজিক ও নৈতিক পাপ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পাপ ক্ষালনের জন্য এখন আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। দীর্ঘকালব্যাপী বহুবিধ সামাজিক দুর্গতির জন্য আমাদের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহা হইতে পুনরুত্থানের জন্য আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। বাহ্যচাক্‌চিক্যময়ী পাশ্চাত্যসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের যে সকল মানসিক ও সামাজিক দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। আমরা যে মনুষ্যত্ব হইতে দিনদিন স্খলিত হইতেছি, তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। এই ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি লইয়া একটা বিশাল জাতীয়তাসৃষ্টি অনেক দূরের কথা, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাতে কেবল নানাদেশবাসী বিভিন্নবর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুসমাজ লইয়া একটা জাতীয়বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, যাহাতে আমাদের মধ্যে একটা সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান—জাতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, যাহাতে আমরা গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, প্রীতি ও দাক্ষিণ্যাদি গুণের বিকাশ করিতে সমর্থ হই, সেজন্য

আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, এখন কালের স্রোত ফিরান অসম্ভব—কালের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই বিশ্বরাজ্যের একজন স্রষ্টা, পাতা ও বিধাতা আছেন। তিনি কালের কর্ত্তা এবং কালের নিয়ামক। তাঁহারই ভয়ে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধন করিয়া যাইতে পারি, তবে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে। তাঁহার প্রীতির জন্য হৃদয়ের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা চাই। তিনি আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার পুনরাদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
> তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
> তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগকে চালাইতেছেন। অতএব হে অর্জ্জুন, একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হও,—তাঁহার প্রসাদে তুমি শান্তি ও অবিনশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে। ঋষিকল্প এমার্সন্ বলিয়াছেন—

"A little consideration of what takes place around us every day would show us, that a higher law than our will, regulates events that our painful labours are unnecessary and fruitless, that only in our easy, simple, spontaneous action are we strong, and by contenting ourselves with obedience we become divine. Belief and love—a believing love will relieve us of a vast bond of care. O my brothers, God exists. There is a soul at the centre of nature, and over the will of every man, so that none of us can wrong the universe....We need only obey. There is a Guidance for each of us, and by lowly listening we shall hear the right word."
—*Spiritual Laws.*

সেই সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বিশ্ববিধাতার প্রীতির জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রকৃতিবৈচিত্র্য সেই বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির এক গূঢ়রহস্য। পৃথিবীর সকল জাতি একই পন্থা অবলম্বন করিয়া সমুন্নত হইবে, ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি সকল জাতিকেই একই উপাদানে সৃষ্টি করিয়া একইপ্রকার প্রাকৃতিক প্রভাবের মধ্যে স্থাপন করিতেন। কে জানে, এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির দুর্গতির মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলবিধানের বীজ নিহিত নাই? যখন সমগ্রদেশ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়, তখন কৃষক তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট শস্যের বীজ একটু অল্পপরিসর উচ্চভূমিতে

বপন করিয়া রাখে, এবং পরে বন্যা ছাড়িয়া গেলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর তাহার সমস্ত ক্ষেত্রে লাগাইয়া দেয়। আজ যখন সমগ্র পৃথিবী সুসভ্যজাতিগণের আসুরিক-বল প্রসূত ভীষণ বিদ্বেষ, জিঘাংসা স্বার্থপরতা ও শোণিতাপিপাসার বহ্নিতে সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তখন কে জানে বিধাতার মঙ্গল বিধানে এই ক্ষুদ্রদেশে, হিন্দুজাতির মধ্যে, প্রাচীনসভ্যতাপ্রসূত শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের বীজ জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্য রক্ষিত হইতেছে না? কে জানে, এই সকল দুর্দ্ধর্ষজাতি যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, যখন অবিরত ভোগলালসার চরিতার্থতাদ্বারা তাহাদের হৃদয়ে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা এই ঋষিপ্রবর্ত্তিত প্রাচীনসভ্যতার শান্তিপ্রীতি-পবিত্রতাময়ী সুধা পানের জন্য কাতরকণ্ঠে লালায়িত না হইবে?

তাই আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয়-জীবনের এই মহাপরিবর্ত্তনসময়ে, transition period এ—আজ যখন আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যস্থলে, ভোগসংযম ও ভোগ-পিপাসার সঙ্গমস্থলে নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তি-মার্গের সন্ধিস্থলে—দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, তখন আমাদের জাতীয় ইতিহাস রামায়ণরূপ অভ্রভেদী শৈলশিখরে, সেই আদর্শব্রাহ্মণ, সাবিত্রীমন্ত্রের দ্রষ্টা, শ্রীরাম-চন্দ্রের শিক্ষাগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—"হে আর্য্যবংশধরগণ তোমরা কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইও না, আমারই মত সংযমমার্গের অনুসরণ কর। দেখ, আমি যে তপস্যাবলে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে রাজর্ষিত্বে, রাজর্ষিত্ব হইতে ঋষিত্বে, ঋষিত্ব হইতে মহর্ষিত্বে, মহর্ষিত্ব হইতে ব্রহ্মর্ষিত্বে উন্নীত হইয়াছি, তোমরাও সেই তপস্যার আশ্রয় কর। আমি যেরূপ দুর্জ্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অপ্রতিহত অধ্যব-সায়কে আশ্রয় করিয়া পুরস্কারের শাণিত কৃপাণে দৈবের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম, তোমরাও সেই দুর্জ্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় কর। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা বর্ত্তমান ভীষণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া এই সিদ্ধর্ষিসেবিত পুণ্যভূমির মুখোজ্জ্বল কর।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

২

ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে।

তিনঘটিকার সময় এখান হইতে যাত্রা করিলাম। এখন সূর্য্যের তাপ আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। শকটের ভিতরে মাদুর ও শতরঞ্জি পাতা। ছাদ এত নীচু যে, সিধা হইয়া বসিবার জো নাই কাজেই, আহত ব্যক্তির ন্যায় পা ছড়াইয়া শুইয়া রহিলাম। গাড়ির বলদেরা দুল্‌কি-চালে নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। এইভাবে দুইরাত্রি অবিরাম চলিয়া আমার নিদ্রার বিলক্ষণ ব্যাঘাত করিবে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আমার বাহন ও বাহক বদ্‌লি হইবে। সমস্ত পথটায় ডাকের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। এখন যেখানে আমি আছি—এই পূর্ব্বভারত, আর যেখানে যাইতেছি -সেই ত্রিবঙ্কুররাজ্য, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এই যে যাতায়াতের পথ এটি দক্ষিণদিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সুখের "খয়রাৎ-মহলে" এখনও রেলপথ হয় নাই যে, তদ্দ্বারা পরপুষ্টদিগের আমদানি হইবে, কিংবা ইহার ধনধান্য বিদেশে চলিয়া যাইবে। উত্তর দিক্ দিয়া, খালপথে নৌকাযোগে, ক্ষুদ্ররাজ্য কোচিনের সহিত ইহার যোগাযোগ আছে। এই খাল-বিল অনেকগুলি। তা ছাড়া, আত্মরক্ষণ-উপযোগী ইহার কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা আছে,—তদ্দ্বারা বাহিরের সংস্পর্শ হইতে ইহা সুরক্ষিত।

ইহার পশ্চিমে বন্দরহীন সমুদ্র, দুরধিগম্য সৈকতবেলাভূমি—যাহার উপর ফেনময় তরঙ্গরাজি অবিরাম ভাঙিয়া পড়িতেছে। "ঘাটে"র গিরিমালা—ভারতের একপ্রকার মেরুদণ্ড বলিলেও হয়—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত;—উহার শৈলচূড়া, উহার অরণ্য, উহার ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু কতকটা প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।

আমার গাড়ির বলদদুটি কখন দুল্‌কি-চালে, কখন বা ছুটিয়া চলিতেছে। যেই একটা গ্রাম পার হইতেছি, অমনি আবার দীর্ঘপথ আরম্ভ হইতেছে—বৈচিত্র্যহীন, অফুরন্ত। সূর্য্য জ্বলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে। পথের দুইধারে যে বৃক্ষগুলি সারিসারি চলিয়াছে, উহা দেখিতে কতকটা আমাদের আখ্‌রোট্‌ ও "অ্যাশ্‌"-গাছের মত। যেগুলিকে আখ্‌রোট্‌-গাছের মত বলিতেছি, উহা আসলে তরুণ বটবৃক্ষ,—কাল সহকারে প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে। শিকড়ের জটা স্থানে-স্থানে বাহির হইতে সুরু করিয়াছে; উহার ফ্যাঁকড়াগুলি মাটির দিকে নামিতেছে; তাহা হইতে আবার নূতন ফ্যাঁকড়া বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইবে।

এই দুই-সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া, আমরা সুবিস্তৃত কান্তারভূমি অতিক্রম করিয়া

চলিয়াছি। মধ্যে-মধ্যে বিরলসন্নিবেশ তাল-নারিকেল দৃষ্ট হইতেছে।

দেখিবার জন্য ও নিশ্বাস ফেলিবার জন্য গাড়ির পার্শ্বদেশে ছোট-ছোট রন্ধ্র-জান্‌লা আছে। পশ্চাদ্ভাগে ছোট একটি গোল দরজা, তাহার মধ্য দিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই সচক্র শবাধারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।

আমার গাড়ির প্রায় গা ঘেঁষিয়া, ঠিক পিছনে, আমার চাকরবাকরদিগের ও জিনিষপত্রের গাড়িটি চলিয়াছে। যে দুইটি দীর্ঘকায় নিরীহ বলদ ঐ গাড়ি টানিতেছে, উহারা আমার খুব নিকটবর্ত্তী; আমি গাড়ির মধ্যে শুইয়া সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, বলদ-দুটি যেন আমার পা ছুঁইয়া রহিয়াছে। উহারা কি নিরীহ জানোয়ার! বাহক উহাদের শুধু নাকে দড়ি দিয়া চালাইতেছে; পাছে অনিচ্ছা-ক্রমেও কাহারো অনিষ্ট হয়, তাই যেন উহা-দের শিং-দুটিও পিছনদিকে পিঠের দাঁড়ার উপর বাঁকিয়া পড়িয়াছে। গাড়ির বাহক নগ্নপ্রায়, তাম্রবর্ণ; আশ্চর্য্যরূপে দেহভার রক্ষা করিয়া, সঙ্কীর্ণ যুগকাষ্ঠের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, বাহুদুটি হাঁটুর উপর রাখিয়াছে; আর, একটা বেতের চাবুক দিয়া বলদদিগকে প্রহার করিতেছে; কিংবা বানরগুলা রাগিলে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ মুখের শব্দ করিয়া উহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

কান্তারভূমি, একটার-পর-একটা ক্রমা-গত আসিতেছে; যতই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন কষ্টকর—এমন কি—অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দূর-দূরান্তরে, কোথাও বা ছোটখাটো ধানের ক্ষেত, কোথাও বা ছোটখাটো কার্পাসের ক্ষেত দেখা যাইতেছে; নতুবা আর সমস্তই মরু—কেবলই মরু—সায়াহ্নসূর্য্যের বিষাদ-ম্লান কিরণচ্ছটায় আলোকিত।

দিগন্তগগনে "ঘাটে"র গিরিমালা অঙ্কিত হইয়া যেন ত্রিবঙ্কুররাজ্যের প্রাকারাবলী। আজ আমরা রাত্রে, একটি যার-পর নাই সঙ্কীর্ণ সুঁড়িপথ দিয়া ঐ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব।

সিংহলের বৃষ্টিবর্ষা ও হরিৎ-শ্যামল ক্ষেত্রাদি দেখিয়া-আসিয়া তাহার পর এই সকল শুষ্কভূমি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। উহাতে একটি তৃণ পর্য্যন্ত জন্মায় না। শাদাটে রঙের গুঁড়ি এইরূপ কতকগুলি অদ্ভুত তাল-জাতীয় বৃক্ষ ইতস্তত একাকী দণ্ডায়মান;—উহাদিগকে উদ্ভিজ্জরাজ্যের সামিল বলিয়াই মনে হয় না। সোজা, মসৃণ, প্রকাণ্ড-উচ্চ খোঁটার মত, তলদেশ স্ফীত, তাহার পরেই চরকা-কাঠির ন্যায় হঠাৎ সরু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহাদের অতি দীর্ঘ কাণ্ডের অগ্রভাগে, জ্বালাময় গগনের উচ্চদেশে, শুষ্ক-কঠোর ছোট ছোট একএক গুচ্ছ তালপত্র রহিয়াছে। এই শুষ্কশীর্ণ তরুদিগের ছায়া-চিত্রগুলি, বরাবর রাস্তার দুই ধারে, বিষাদ-ম্লান দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-সারি তরুণ বটবৃক্ষের মধ্য দিয়া এই যে পথটি গিয়াছে, ইহার মধ্যে জন-মানব দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে হয়, যেন এই পথটি ধরিয়া চলিলে আমরা কোথাও গিয়া উপনীত হইব না। অবসাদজনক উত্তাপ, তালে-তালে অল্প-অল্প ঝাঁকানি, ক্রমাগত গাড়ির একঘেয়ে ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ শব্দ।

এই সবে আমার তন্দ্রা আসিল—আমার চিন্তাপ্রবাহ ক্রমশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রায় ॥ ঘটিকার সময় রাস্তার উপর দিয়া অদ্ভুত-ধরণের চারজন পাথিক চলিয়া গেল। আমার চক্ষু এখনো তন্দ্রাবেশে প্রায় অর্দ্ধনিমীলিত, তা ছাড়া, এই একঘেয়ে পথে কিছুই বিশেষ দেখিতে পাই না—তাই হঠাৎ যখন চারিটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন ইহাই একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইল। ইহারা খুব দীর্ঘকায় লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুত চলিতেছে; নগ্ন গাত্র, একটা শাদা ও লাল-রঙের ধুতি-পরা, মাথায় একটা লাল পাগড়ি। এই বিজন কান্তারের মধ্য দিয়া এই অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ, এরূপ উজ্জ্বলবেশে, এত দ্রুতপদে, না জানি কোথায় যাইতেছে?

পরে, অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, এই "ঘুপ্সি" দম্‌-আট্‌কানিয়া শয্যাকক্ষের মধ্যে নিদ্রাদেবী আবির্ভূত হইয়া আমার সংজ্ঞা হরণ করিলেন—চারিদিকে কি হইতেছে, আমি আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

একঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার সময়, জাগিয়া উঠিয়া মুমূর্ষু দিবসের অন্তিম ছবিটি দর্শন করিলাম।

দেখিলাম, "ঘাটের" গিরিমালা হঠাৎ যেন আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছে—যেন এক লম্ফে ২॥০ক্রোশ পথ লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমদিকের সমস্ত সমভূমি এই গিরিমালায় অবরুদ্ধ।

অস্তমান সূর্য্যের লোহিত কিরণে দিগন্ত-পট এখনো অম্বুরঞ্জিত। ঐ লোহিত দিগন্ত পটের উপর, এই সুনীল গিরিকায় কেমন পরিস্ফুটরূপে প্রকটিত। উহার শৈলচূড়া-গুলির আকার ভারতবর্ষীয় ধরণের; দেখিতে কতকটা মন্দিরাদির চূড়া ও গম্বুজের মত।

সরু সরু খুঁটির মত তালগাছ, আর কঠোরদর্শন মনসব্বর-তরু এখানকার একমাত্র বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; যাহা-কিছু আলো এখনো অবশিষ্ট আছে, সেই আলোকে, ম্লান সোনালি রঙের আকাশের গায়ে, তাহাদের কালো-কালো কাঠিগুলা সর্ব্বত্র প্রসারিত।

হঠাৎ অন্ধকার হইয়া পড়িল। এই অন্ধকার একটু বিষাদরঞ্জিত, কেন না, আজ রাত্রে চাঁদ উঠিবে না।

প্রভাত পর্য্যন্ত এই সঙ্কীর্ণ শবাধারের মধ্যে ঝাঁকানি খাইতে খাইতে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই; চক্ষের সমক্ষে সবই যেন বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিভাত হইতেছিল।

পথে যাইতে যাইতে, অন্য গরুর গাড়ি যখনি আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখনি গোকণ্ঠের ঘণ্টিকাধ্বনি ও লোকজনের কি ভয়ানক চীৎকারই শুনিতে পাওয়া যায়! সেই গাড়িগুলা এত মন্থরগতি যে, আমাদের পথ হইতে সরিয়া যাইতেও তাহাদের অনেক বিলম্ব হয়। মধ্যে মধ্যে বাহন ও বাহক বদলি করিবার জন্য, কোন গ্রামের নিকট আমাদের গাড়ি আসিয়া থামিতেছে। গ্রামগুলি রাস্তার ধারে অবস্থিত। গাড়ি হইতে অস্পষ্টরূপে, নিদ্রিত ব্রাহ্মণদিগের আবাস-কুটীর দেখা যাইতেছে; সম্মুখে, দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেত তাড়াইবার জন্য, ছোট-ছোট নারিকেল-তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে।

ভৃত্যেরা আমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জাগাইয়া দিল। এখন প্রভাত; শীতল শান্ত উষার ইহাই মধুরতম মুহূর্ত্ত। আমরা এখন নাগরকৈল-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আজ সমস্তদিন এইখানে থাকিয়া, সূর্য্যাস্ত-সময়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করিব। যে পর্ব্বত-মালা গতকল্য আমাদের সম্মুখে, অস্তমান সূর্য্যের কিরণ-উদ্ভাসিত লোহিতগগনে অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। এখন দিগন্তদেশ ম্লান-পাটলবর্ণে রঞ্জিত। রাত্রিতে আমরা এই পর্ব্বতমালা পার হইয়া আসিয়াছি,—এখন আমরা ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে। এই বারাণ্ডা-ওয়ালা বাড়ীটি একটি পান্থশালা; ইহার সম্মুখে আমাদের গাড়ি আসিয়া থামিল। শুভ্রবসনধারী একজন ভারত-বাসী দুই হস্তে স্বকায় ললাট স্পর্শ করিয়া আমার সম্মুখে নতশির হইলেন। ইনি পান্থ-শালার অধ্যক্ষ। মহারাজের আদেশানুসারে, ইনি আমার বাসের জন্য এই বাড়ীটি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতীয় অন্যান্য গ্রামের পান্থশালার ন্যায়, এ পান্থশালাটিও সাদাসিধা একতলা গৃহ। তিন-চারিটি শাদা-ধব্‌ধবে চূনকাম-করা কামরা —পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রায় খালি, শুইবার জন্য শুধু কতকগুলি বেতে ছাওয়া খাট পাতা। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ-প্রযুক্ত গৃহের ছাদ গৃহ হইতে চারিদিকে খানিকটা বাহির হইয়া আসিয়াছে, আর কতকগুলো মোটা মোটা খাটো থাম ঐ ছাদকে ধারণ করিয়া আছে।

তাহার পর স্নান; স্নানের পর প্রাতরাশ। এই সময়ে ব্যগ্রতা-বিরহিত ভৃত্যেরা তালপত্রের পাখা দিয়া আমাকে অলসভাবে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার পর মধ্যাহ্নের বিষণ্ণতা; আলোক-উদ্ভাসিত মহা নিস্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে কাকেরা আমার কক্ষ-কুট্টিমের তক্তার উপর আসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূজার পোষাক।

১

আষাঢ়মাসের প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ভার্য্যা সুলোচনাকে যে রেজেষ্টারিপত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহার ভিতর একখানি ৫০০৲ টাকার চেক ও একখানি পত্র ছিল। চিঠিখানা নিতান্ত সাদাসিধারকম, লুকাইয়া পড়িবার মত একটা কথাও ছিল না। বোধ হয় অনেকদিন ঘর করিতে করিতে ঐরকম হইয়া যায়, ভাসা ভাসা সমস্ত ভাব জলাইয়া যেন মূলবদ্ধ হয়। বোধ হয় সুলোচনার মনেও একটা কিছু ঐরকম অস্পষ্ট ভাব উদয় হইয়াছিল। চেকখানি তখনি বাক্সে তুলি-লেন, কিন্তু সেই সহজ কথায় সোজা ভাষায় লেখা প্রেমসম্ভাষণশূন্য পত্রখানি বারবার

পড়িলেন—সেই লেখার ভিতর কিংবা সেই স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরের ছাঁদের মধ্যে হয় ত অপরের চক্ষের অগোচর কোন ইঙ্গিত ছিল, তাহা তিনিই বুঝিলেন। চিঠির মর্ম্ম এই—"এই যে টাকা পাঠাইলাম, ইহার মধ্যে দেড়শত টাকা তোমার একছড়া হারের। সেই যে সরু হার আমি পসন্দ করিয়াছিলাম, সেই রকম একছড়া গড়াইবে। বেশী দামী জিনিষ দিলে হয় ত তুমি অসন্তুষ্ট হইবে। পঞ্চাশ টাকা দিয়া নিজের মনোমত একখানি শাড়ী প্রস্তুত করাইবে। বাকী তিনশত টাকায় ছেলেমেয়েদের যাহা আবশ্যক, হইবে।"

নরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। ছেলেদুইটি বড়, দুইটিই স্কুলে পড়ে, মেয়েদুইটি ছোট, একটি বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য সুলোচনা ছেলেমেয়ে লইয়া কয়েকমাস হইতে দেশে ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমে বড় উকীল। পূজার সময় আসিবার কথা, তাহার পূর্ব্বে পূজার কাপড়চোপড় কিনিবার জন্য টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সুলোচনা প্রথমে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূজার সময় তোমাদের কি চাই? উনি টাকা পাঠিয়েছেন।"

বড় ছেলে কলেজে পড়ে, সে বলে, "কোথায় পূজো, এখন থেকেই কাপড়ের তাড়া! আমার একটা জরির পোষাক, জরির পাগ্‌ড়ি, আর জরির জুতা চাই।"

সুলোচনা অল্প অল্প হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তোর কি পরিবার বয়স নেই নাকি?"

"হাঁ, খুব আছে! আমি সেজেগুজে রাস্তায় বেরুব, রাস্তার লোকে হাততালি দেবে, ক্লাসের ছেলেরা ছয়মাস ধোরে ক্ষেপাবে, আর তোমার খুব আহ্লাদ হবে।"

সুলোচনা হাসিমুখে কহিলেন, "ছেলের আক্কেল দেখ! আমি কি তোকে জরির পোষাক পর্‌তে বল্‌চি নাকি?

"তবে কি চাই, তার আবার জিজ্ঞাসা করা কি। তুমি যা দেবে, তাই ভাল। এমন জননী কি কারুর আছে।" বলিয়া বড় ছেলে, দেবেন্দ্র, হাত ঘুরাইয়া মাতাকে বরণ করিবার ভাণ করিল।

ছোট ছেলে, সুরেন্দ্রও কোন ফরমায়েশ করিতে স্বীকার করিল না। মেয়েরা শাড়ী জ্যাকেট কোন্ রঙের চায়, তাহা বলিল।

পাশে দাঁড়াইয়া একটি বিধবা সব কথা শুনিতেছিল। বয়স তেমন অধিক নয়, বড় ঠাণ্ডা স্বভাব, মুখের ভাব বড় মধুর। ইটি নরেন্দ্রনাথের খুড়তাত ভগিনী, নাম মনোরমা। এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহে নাই। ছেলেমেয়েদের পূজার পোষাকের কথা শেষ হইলে বলিল, "হাঁ বউ, পূজায় দাদা তোমায় কিছু দেন নি?"

অমনি সুলোচনার মুখ বিয়ের কনের মত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। বলিলেন, "দিয়েছেন বই কি। শাড়ী আর হারের জন্য দুশো টাকা পাঠিয়েছেন।"

"সেইরকম সরু হার বুঝি?"

"হাঁ।"

"দাদার যেমন পসন্দ।" মনোরমা হাসিয়া কথাটা বলিল।

দেবেন্দ্র কহিল, "হাঁ মা, তুমি কেমন কাপড় নেবে? বেশ টুকটুকে রাঙা

বেনারসী শাড়ী, আর বেশ চওড়া জরির আঁচলা ?”

সুলোচনা কহিলেন, “যা যা! তোর যখন টাকা হবে, তখন কিনে দিস্।”

মনোরমা কহিল, “সেই কথা ভাল। দেবিনের বউয়ের যেমন সাজ হবে, তার শাশুড়ারও সেইরকম হবে।”

তখন খুব একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

২

দুইচারদিন যায়। একদিন মধ্যাহ্নের পর সুলোচনা ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন, মেয়েদুইটি এক পাশে বসিয়া পুঁতুলখেলা করিতেছিল ও মৃদুস্বরে আগাগোড়া খেলা আবৃত্তি করিতেছিল। এমনসময় পাশের বাড়ীর গৃহিণী আসিলেন। মোটাসোটা মানুষ, সিঁড়ীতে উঠিয়া একটু হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। হাঁপ ছাড়িয়া কহিলেন, “যেন বসান দুর্গাঠাকুরুণ। বউ, তোমাকে দেখ্‌লেই আমার লক্ষ্মীঠাকরুণ মনে পড়ে।”

সুলোচনা কহিলেন, “এস এস, বস।”

এদিক্ ওদিক্ খানিক কথাবার্ত্তার পর পাশের বাড়ীর গৃহিণী মেয়েদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “দেখ বউ, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বল্‌তে এসেছিলাম, কারুর সাক্ষাতে বল্‌বার নয়।”

সুলোচনা মেয়েদের বলিলেন, “তোরা নিজের খেলাঘরে গিয়ে খেলা কর্।” মেয়েরা উঠিয়া গেল।

পাশের বাড়ীর গৃহিণী তখন মুখ কাঁদ কাঁদ করিয়া, চক্ষু ভিজা-ভিজা করিয়া কহিলেন, “বউ, তোমায় বল্‌ব কি, আমার ভারি বিপদ্!”

অমনি সুলোচনার মুখ সহানুভূতিতে কোমল হইল। বলিলেন, “কি হয়েচে ?”

“এই আমার বিপিন ষাটটি টাকা মাইনে পায়, তাইতে কষ্টেস্থষ্টে চলে। আমার ত দুচারখানা যা গহনা ছিল, তা গিয়েচে, দেশের বাড়ীখানিও বাঁধা। এদিকে পূজা এল, কিছু না করলেও পাঁচসাতদশ টাকা খরচ আছে। এমনসময় সাহেব বল্‌চে কিনা, পঞ্চাশটাকা না দিলে বিপিনের চাকরী থাক্‌বে না।”

“সে কেমন কথা ? আর বিপিনবাবুই সাহেবকে টাকা দিতে গেলেন কেন ?”

“তা ভাই, তোমরা কি জান্‌বে বল ? তোমরা হলে উকীলমানুষ, বড়মানুষ, কারুর তোয়াক্কা রাখ না। কথায় বলে, পরের চাকর। এই পূজার পর বিপিনের পাঁচটাকা মাইনে বাড়্‌বার কথা আছে, যদি সাহেব ওর নামে মিথ্যে কোরে একটা কিছু লিখে দেয়, তা হলে মাইনে বাড়া মাথায় থাকুক, হয় ত চাকরী নিয়েই টানাটানি হবে। সাহেবের টাকার দরকার, সে পঞ্চাশটাকার কম কিছুতেই ছাড়্‌বে না। এখন উপায় ?”

সুলোচনা চুপ করিয়া রহিলেন।

“শুন্‌লেম, এই পূজার জন্য তোমার কাছে নাকি হাজারটাকা এসেছে—”

“অত টাকা নয়, অত টাকার ত কোন দরকার নেই।”

“না, তাই বল্‌চি, কানে শোনা কথা বই ত নয়। তা তুমি রাজরাণী হও, আমার তেমন স্বভাব নয় যে, আমার তাতে চোক

টাট্টাবে। তোমার দয়ার শরীর, তোমার কাছে টাকা থাক্‌লেই লোকের উপকার। ঐ পঞ্চাশটি টাকা আমাকে দিতেই হবে। শুধু হাতে না দাও, এই তাগাজোড়া রেখে দাও। ভাদ্রমাস পড়্‌তেই আমি যেমন কোরে পারি দেব।” গৃহিণী অঞ্চল হইতে নিতান্ত মরা-সোনার গালাভরা একজোড়া তাগা বাহির করিলেন। বিক্রয় করিলে পঞ্চাশ-টাকা হয় কি না, সন্দেহ।

সুলোচনা কহিলেন, “বন্ধক রেখে আমি ত কিছু কখন দি নি, তুমি তাগা তুলে রাখ। পূজার টাকা ত সব আমার কাছে নেই, ছেলেদের টাকা ঠাকুরঝিকে দিয়েচি। ওর বেশ পসন্দ, জিনিষপত্র তৈরি করিয়ে দেবে। আর সে টাকায় আমি হাত দিতে পার্‌ব না। আমার টাকারও হিসেব দিতে হবে, তা তোমার যখন এত দরকার, আর ভাদ্রমাসের গোড়াতেই ফিরে দেবে বল্‌চ, তখন—” কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া, বাক্স খুলিয়া পাঁচখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহিণী আর বিলম্ব করিলেন না। নোট আর তাগা একসঙ্গে আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিলেন। “তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হোক্‌, তুমি রাজরাজেশ্বরী হও!” মুখে ঐ কথা, কিন্তু পা দরজার দিকে, পাছে সুলোচনার মতের পরিবর্ত্তন হয়, কিংবা আবার সুদ-বন্ধকের কথা ওঠে। সুলোচনা কহিলেন, “এ কথা যেন ঠাকুরঝী না টের পায়, সে শুন্‌লে রাগ কোর্‌বে।”

“রাম, তাকে কেন বল্‌তে গেলাম!”

গৃহিণী সিঁড়ী নামিয়া যেমন যাইতেছেন, অমনি পড়্‌বি ত পড়্‌ একেবারে মনোরমার সম্মুখে।

মনোরমা কহিল, “ওমা. কি ভাগ্যি! এস এস!”

“না বাছা, আর আস্‌ব না, এখন যাচ্ছি।”

“তাই ত,” অমনি অঞ্চলের প্রতি মনোরমার নজর পড়িল। কহিল, “আঁচলে বাঁধা কি গা? বালা না তাগা?”

“তাগা।”

“ঈশ্‌, আবার উঁচুপানা কি? নোটের তাড়া নাকি?”

পাশের বাড়ীর গৃহিণীর তখন ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। কহিলেন, “তা বাছা, তুমি ত আর দাও নি, তোমার অত খোজে কাজ কি?”

মনোরমা ম্লানমুখে কহিল, “আমি কোথায় পাব?” তাহার পর মুখ ফিরাইয়া, মুখ টিপিয়া হাসিয়া, সরিয়া গেল। ভারি দুষ্ট।

সুলোচনা মনে করিতেছিলেন, মনোরমা কিছুই জানিতে পারে নাই!

৩

সুলোচনা মনে মনে একটা হিসাব করিতে-ছিলেন। হারছড়া গড়াইতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে, অতএব সে টাকাটা হাতে থাকা উচিত। কিন্তু শাড়ী নগদ কিনিতে পাওয়া যায়, কিংবা দুইদিনে তৈয়ারি করান যায়। পাশের বাড়ীর গৃহিণীকে যে টাকাটা দিয়াছিলেন, সেটা শাড়ীর হিসাবে ফেলিলেন। ভাদ্রমাসের গোড়ায় দিবে ত বলিয়াছে! তাহার পর শাড়ী করাইতে কতক্ষণ? এই-রকম হিসাবী দুইচারিটি গৃহিণী হইলে সংসারে বড় গোল বাধিত। সুলোচনার হিসাবের

কথা বাড়ীর লোকে জানিত, এবং সেইজন্য তিনি সকলকে কিছু ভয় করিতেন।

একসময় মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বউ, দাদা তোমায় টাকা পাঠালেন, আর তুমি বাক্সে তুলে রাখ্‌লে। হারছড়া কেন গড়াতে দাও না? স্যাক্‌রার কথার ঠিক জান ত, কাল বল্‌লে দশদিন কোর্‌বে।"

সুলোচনা কহিলেন, "হাঁ ঠাকুরঝি, স্যাক্‌রা ডাক্‌তে বল, হারছড়া গড়াতে দেব।"

"আর শাড়ীখানা?"

সুলোচনা একটু কৌতুক করিয়া কহিলেন, "শাড়া ত আর স্যাক্‌রায় গড়্‌বে না, তার জন্য অত তাড়া কেন?"

"না, সেজন্য নয়, তবে পূজার বাজারে এর পর সব আক্রা হবে, মনের মতন জিনিষ না পাওয়া যেতে পারে, এখন হলে ধারে-সুস্থে, দেখে-শুনে হত।"

"না না, এখন কাজ নেই।" কথাটা কিছু রুক্ষ হইল দেখিয়া সুলোচনা আবার কহিলেন, "তুমিও যেমন ঠাকুরঝি, আমার কি পূজার সময় সাজগোজ কর্‌বার বয়স? বুড়ো বয়সে ওঁর যেমন বাই! বুড়ো মাগী আমি, আমার আবার গহনা, আবার শাড়ী! লজ্জাও করে, হাসিও পায়!"

মনোরমা কহিল, "ও কেমন কথা হল? স্বামীর কাছে পূজার মৈত্রী পাবে, এ ত মেয়েমানুষের শুভলক্ষণ। আর দাদার চোকে কি তুমি বুড়ো হয়েচ?"

অমনি সুলোচনা থতমত খাইয়া বলিলেন, "সত্যি কথাই ত, আমার মত ভাগ্যবতী কে?"

মনোরমা তাড়াতাড়ি একখানা আরসি আনিয়া সুলোচনার মুখের সম্মুখে ধরিল, কহিল, "আমার দাদার চোকের দোষ হয়েচে, তিনি না হয় ভাল দেখ্‌তে পান না, কিন্তু তুমি ত আর চোকের মাথা খাও নি, কোন্‌খানটা বুড়ো বল দেখি!"

সুলোচনা হাসিয়া কহিলেন, "এত রঙ্গও জানিস্‌।"

ওদিকে স্যাক্‌রা ডাকাইবার পূর্ব্বে আর একজন বিনা ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুলোচনার পিত্রালয়ে তাঁহার মাসীর একজন পাতান সই ছিলেন। তাঁহাকেও সুলোচনা মাসী বলিতেন। আজ দশ-বিশ বৎসর তাঁহার কোন খবর পান নাই। হঠাৎ একদিন সকালবেলা রেলের গাড়ী হইতে নামিয়া ঠিকা-গাড়ীতে করিয়া তিনি উপস্থিত। সুলোচনা অত্যন্ত আহ্লাদ করিয়া মাসীর পায়ের ধূলা লইয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "নেয়ে আহ্নিক কর, আমি রান্নার উজ্জুগ কোরে দি গে।"

প্রাচীনা বিধবা সেকেলে লোক, রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা কহিতে বড় জানেন না, কাঁদিয়া কহিলেন, "আর বাছা, রাঁধ্‌ব-খাব কি, এইবার বুঝি পথে দাঁড়াতে হল!"

"কেন মাসি, কি হয়েচে?"

"আমার যা-কিছু ছিল, দেওরেরা ত ফাঁকি দিয়ে নিয়েচেন, তা তাঁদের ধর্ম্ম তাঁরা জানেন, আমি কোন কথা বলি নি। মেয়েটার এমন ব্যারাম গেল, তাঁরা একবার জিজ্ঞাসাও করেন নি কেমন আছে। আমার একখানি ঘর, তাই পঞ্চাশটাকায় বাঁধা

রেখে তার চিকিৎসাপত্র করি। এখন সুদে-আসলে একশো টাকা হয়েছে। আট-দিনের মধ্যে না দিতে পার্‌লে বিক্রী হয়ে যাবে। তখন পথে দাঁড়ান ছাড়া আর কি উপায় থাক্‌বে ?”

সুলোচনার চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল। চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, “সে কথা এর পরে হবে। এখন তুমি কাপড় ছেড়ে আহ্নিক কর।” অনেক পীড়াপীড়িতে মাসী স্নান করিয়া পূজা করিতে বসিলেন। সুলোচনা গিয়া স্বহস্তে তাঁহার রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। পূজা সমাপ্ত হইতে মাসীকে গিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “মাসি, আমি টাকা দেব, তুমি ভেব না, কিন্তু এ বাড়ীর কাউকে কিছু বলো না।”

তখন আনন্দে মাসীর আর এক শোক উথলিয়া উঠিল, চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহি-লেন, “এমন রাজরাণী অন্নপূর্ণা মেয়েকে এখন কমলদিদি (সুলোচনার মাতা) দেখ্‌তে পেলে না।”

মার নাম হইতেই ছল্‌ছল্‌চক্ষে সুলোচনা উঠিয়া গেলেন।

মাসী সেদিন থাকিলেন। পরদিবস তাঁহার যাইবার সময় সুলোচনা তাঁহার হাতে পথখরচ বলিয়া পাঁচটাকা ও সেই একশো টাকা দিলেন।

এবার আর কোন হিসাব হইল না। প্রথম পঞ্চাশটাকা যেন ধার বলিয়া দিয়া-ছিলেন, কিন্তু এ টাকা ত ফেরত পাইবার কথা নয়। হার গড়াইবার আর কোন সম্ভাবনাই রহিল না। মনোরমা মাঝে মাঝে কথা পাড়িত, সুলোচনা কোনমতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতেন। একদিন স্যাক্‌রা আসিয়া উপস্থিত। সুলোচনা কহিলেন, “আমি এখন গড়াইব না।”

মনোরমা কহিল, “তবে কবে গড়াইবে ? ভাদ্রমাস যে আসিল।”

সুলোচনা কহিলেন, “আমি যদি নাই গড়াই ?”

মনোরমা কহিল, “তা হলে দাদা কি মনে কোর্‌বেন ? তিনি আহ্লাদ কোরে তোমায় একটা জিনিষ গড়াতে আগাম টাকা পাঠিয়ে দিলেন, আর তুমি গড়াবে না ?”

সুলোচনা শুষ্কমুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, “তা যদি আমি টাকাটা জমাই করি। আচ্ছা, যা হয় একটা কোর্‌ব এখন।”

করিবার মধ্যে সেইদিন কুড়িটাকা দিয়া একখানা ভাল গরদ আনাইলেন। সেই গরদখানা হাতে করিয়া মনোরমার ঘরে গেলেন। সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, “ঠাকুরঝি, এইখানা তুমি নাও ত আমার বড় আহ্লাদ হয়।”

মনোরমা গরদ হাতে করিয়া দেখিয়া বলিল, “দাদা ত ফীবছর আমায় একখানা কোরে দেন।”

সুলোচনা কহিলেন, “কেন, আমায় কি একখানা দিতে নাই ?”

“সে কি কথা বউদিদি, তুমি দিলে আমি আহ্লাদ কোরে নেব না ?” মনোরমা সুলোচনার পায়ের ধূলি মাথায় লইল, বলিল, “বউদিদি, তুমি আমাদের ঘরের বউ, তোমার সাক্ষাতে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু তোমায় দেখ্‌লে যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদর্শন হয়, এ কথা কে না জানে ?”

সুলোচনা তাহার মুখে হাত দিলেন, "চুপ চুপ, অমন কথা বল্‌তে নেই, পাপ হয়।"

যখন সুলোচনা ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন, তখন মনোরমা হাসিতে লাগিল, "ঠাক্‌রুণটি কম নন! ঘুষ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ কোর্‌বেন!" মনোরমা ভারি দুষ্ট।

৪

ভাদ্রমাস আসিল, মাসের কয়েকদিন গেল, কিন্তু পাশের বাড়ীর গৃহিণীর আর দেখা নাই। ভাদ্রমাসে বড় বৃষ্টি, ভারি বাত চাগিয়াছে, আর উত্থানশক্তি নাই বলিলেই চলে। শুনিয়া সুলোচনা তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। বোধ হয়, গৃহিণী সম্প্রতি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন, কেন না, এখন তিনি দাঁড়াইয়া খড়িকা খাইতেছিলেন। সুলোচনাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ও বাড়ীর বউ! তুমি বুঝি সেই টাকাটার জন্য এসেচ? তা বাছা, আমাকে মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, সে টাকা এখন আমি কোনমতেই দিতে পার্‌ব না।"

সুলোচনা লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কহিলেন, "আমি সেজন্য আসি নাই, তোমার অসুখ শুনে দেখ্‌তে এলাম।"

"তা এস, এস! তোমরা না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে? অসুখ বলে অসুখ! সর্ব্বাঙ্গ বাতে যেন পঙ্গু, পঙ্গু। আজ এই একবার উঠে দাঁড়িয়েছি।" বাতের বেদনা-স্মৃতি সহসা জাগরিত হওয়াতে গৃহিণী কোমরে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। "কিছু খাবার জো নেই বাছা, কিছু খাবার জো নেই! কবিরাজের সব বারণ। আর এই পোড়া বর্ষায় কি বা পাওয়া যায়! আমড়া একেবারে বারণ। রাজ্যের জিনিষে অরুচি। আজ একটু ভাল আছি বলে ৩টো আমড়া ছেঁচে পোস্তলঙ্কা দিয়ে চর্চ্চড়ি কোরে এক মুঠো ভাত খাই।"

সুলোচনা কহিলেন, "বাতের পক্ষে বলে আমড়া বড় খারাপ। যদি আবার অসুখ হয়?"

"আর পারি নে বাছা! ডাক্তার-কবিরাজে আমার কি কোর্‌বে? এখন যেতে পার্‌লেই বাঁচি। আর এই বিপিনের জ্বালায় হাড় কালী হল।"

বিপিন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহার সংসার লইয়াই গৃহিণীর সংসার। তাহার সম্বন্ধে এমন কথা শুনিয়া সুলোচনা কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "বোলো না, বোলো না, তার কথা আর বোলো না। চাকরী যায় বলে তোমার কাছ থেকে টাকা এনে দিলুম, তার পর সে তাগা-দুগাছাও গেল। এ দিকে অর্দ্ধেকদিন রাত্রে ত বাড়ী থাকে না, বউটা ছেলেমানুষ, কেঁদে কেঁদে সারা হল। মাইনের টাকাও সব বাড়ীতে দেয় না। এমন কোর্‌লে কি চাকরী থাকে?"

এ সকল কথায় সুলোচনা কোন কথা কহিলেন না। গৃহিণীর কথা সমাপ্ত হইলে উঠিয়া আসিলেন।

ভাদ্রমাসও ফুরাইয়া আসিল। ছেলে-মেয়েদের পূজার পোষাক তৈয়ারি হইয়া গেল। তখন তাহারা সুলোচনাকে চাপিয়া ধরিল, "মা, তোমার পূজার শাড়ী আর হার কোথায়?"

সুলোচনা কহিলেন, "সে যা হয় হবে এখন। তোদের কাপড়চোপড় হয়েচে, তোরা আমোদ-আহ্লাদ কোর্‌বি, তাই দেখে আমার আহ্লাদ হবে। আমার না হয় নাই হল, আমি ত আর ছেলেমানুষটি নই।"

দেবেন্দ্র কহিল, "কেন, বাবা কি তোমার জন্য আলাদা টাকা পাঠান নি? এই যে পিসিমা স্যাক্‌রা ডাক্‌তে বলেছিলেন।"

মনোরমা কহিল, "স্যাক্‌রা ডাক্‌লে কি হবে? বউ টাকা পুঁজি কোরে রেখেচে, ওর কোন সাধ নেই।" মনোরমার ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসিটুকু সুলোচনা দেখিতে পাইলেন না।

সুলোচনা কহিলেন, "টাকা পুঁজি কোরে রাখা কি দোষের কথা নাকি? আমার কাপড়চোপড় গহনাগাটি অনেক আছে, এ বছর না হয় কিছু নাই করালাম।"

মনোরমা কহিল, "হাঁ, তা হলে দাদা খুব খুসী হবেন। তিনি জান্‌বেন, তোমার টাকায় খুব মায়া হয়েচে।"

সুলোচনা অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিলেন। ছেলেরা চলিয়া গেলে মনোরমাকে বলিলেন, "দেখ ঠাকুরঝি, উনি এলে পর আমার কাপড় কি গহনার কথা তুমি ওঁকে কিছু বোলো না। যা বল্‌বার, আমি বল্‌ব।"

মনোরমা কহিল, "আমি আর কিছু বল্‌ব না।"

শুনিয়া সুলোচনা কতক নিশ্চিন্ত হইলেন। ছেলেদের ত মুখ বন্ধ করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহাদের কথা কোনমতে উড়াইয়া দেওয়া যায়। মনোরমা বলিলে কিছু গোল।

৫

পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলেন। প্রসন্ন, প্রফুল্ল গৌরমূর্ত্তি, মুখে-চক্ষে প্রখর বুদ্ধির স্পষ্ট পরিচয়। সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র, চাকরবাকর মিলিয়া নামাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ অন্দরমহলে প্রবেশ করিলে বাড়ীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল। সুলোচনা গৃহিণীর মত মাথায় একটুখানি কাপড় দিয়া আনন্দপূর্ণমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

সুলোচনা কহিলেন, "ভাল আছি।"

এই পর্য্যন্ত সম্ভাষণ হইল।

নরেন্দ্রনাথ বিশ্রাম করিয়া, হাতমুখ ধুইয়া, জলখাবার খাইতে বসিলেন। সুলোচনা একখানি ঝালর দেওয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ছেলেরা তখন পূজার কাপড়ের কথা পাড়িল। নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ও সব কথা আজ নয়, কাল সকালবেলা হবে।"

সুলোচনা সেখানকার বাড়ীর সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দাসদাসীরা সব কেমন আছে? গাইবাছুর সব কেমন আছে? বিছানাপত্র নিয়মিত রৌদ্রে দেওয়া হয় ত? শোবার ঘরের পাশে যে আর একখানি ঘর তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার কত বাকি? রামচরণবাবু, মধুসূদনবাবুর বাড়ীর সকলে কেমন আছেন? ছেলেরাও আগ্রহের সহিত সে কথায় যোগ দিল। হরিণটা এখন কত বড় হইয়াছে? বাড়ীতে যে ময়ূর আছে, সেটা পালাইয়া যায় নাই ত? দেবেনের

টাটুঘোড়াতে এখন কে চড়ে? খানিক পরে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "মনোরমা যে বড় চুপ কোরে রয়েচ? তোমার কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার নেই?"

মনোরমা হাসিল, কহিল, "আছে বই কি। আমি যে সেই তুলসীগাছটি পুঁতিয়াছিলাম, সেটি আছে ত?"

"বিলক্ষণ। আছে না ত কি? তুলসীগাছের যত্ন সকলেই করে, কাউকে কিছু বল্‌তে হয় না।"

রাত্রে আর কোন কথা হইল না। পর দিবস প্রভাতে অভ্যাসমত নরেন্দ্রনাথ হাঁটিয়া একটু বেড়াইয়া আসিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া যখন চা খাইতে বসিলেন, আবার সকলে তাঁহাকে ঘিরিল। চা খাইয়া, নরেন্দ্রনাথ আল্‌বোলার নল মুখে লইয়া বসিলেন, কহিলেন, "এইবার পূজার জিনিষ। কাপড়-চোপড় কই সব দেখি?"

মনোরমা ছেলেদের কাপড়, জুতা, মেয়েদের শাড়ী, জ্যাকেট সমস্ত লইয়া আসিল। সুলোচনা তাহাকে যে গরদ দিয়াছিলেন, সেখানিও লইয়া আসিল, কহিল, "বউ আমাকে এখানি দিয়াছেন।"

সুলোচনা লজ্জিতভাবে মৃদুমৃদু কহিলেন, "ও বুঝি আবার দেখাতে হয়?"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কেন দেখাবে না? ঠিক দেখান হয়েচে। তুমি ওকে পূজার জিনিষ দিয়েচ, ও দেখাবে না?"

সকলের সামগ্রী আসিল, তখন নরেন্দ্রনাথ সুলোচনাকে কহিলেন, "তোমার জিনিষ কই?"

সুলোচনা ধীরে ধীরে আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া মনোরমা নীরব বিস্ময়ের ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। তিনি সে ইঙ্গিত বুঝিয়া অল্প হাসিলেন।

সুলোচনা ফিরিয়া আসিলে সকলে দেখিল, তাহার হাতে শাড়ী কি হার কিছু নাই, আছে সিমলার একখানি কোঁচান উৎকৃষ্ট ধুতি, আর একখানি সেইরকম কোঁচান চাদর। সেই ধুতিচাদর স্বামীর পদতলে রাখিয়া, গলায় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া, স্বামীর পাদ-পদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করিলেন। আবার যখন সুলোচনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহার সে সঙ্কোচলজ্জা যেন দূর হইয়া গেল, রূপলাবণ্য-সুখসৌভাগ্যের স্থির দেবীমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইলেন। সুলোচনা যখন তাঁহার পদানত, সেইসময় নরেন্দ্রনাথ একবার মনোরমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন, ইঙ্গিতে কহিলেন, "এ কথা ত তুমি আমায় বল নাই!" তাহার পর তাহার গম্ভীর মুখের দৃষ্টি বড় গভীরকোমল হইল। পত্নীপ্রদত্ত পূজার উপহারস্বরূপ ধুতিচাদর তুলিয়া লইলেন। তাহার পর সুলোচনার মুখের দিকে না চাহিয়া কহিলেন, "তোমার শাড়ী আর হার কোথায়?"

"তৈয়ারি হয় নাই।'

"কেন?"

"আমার আর-বছরের কাপড় বেশ আছে, বছর বছর শাড়ীর কি আবশ্যক? হার গড়ান হয় নি।" সুলোচনা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

তাহার পরে যে কথা হইল, নরেন্দ্রনাথের যেন একটু বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল,

সুলোচনা স্পষ্ট উত্তর দিতে লাগিলেন। আর সকলে নীরব। কর্ত্তা গৃহিণীতে বোঝাপড়া হইতেছে, তাহার মাঝে কে কথা কহিবে?

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কেন, আমি ত টাকা আলাদা পাঠাইয়াছিলাম। যদি টাকা কম পড়িয়াছিল, আমাকে লিখিলে আরও পাঠাইতাম।"

"সেজন্য নয়। আমি ইচ্ছা কোরে গড়াই নি।"

"টাকা কি হল?

"আমি খরচ কোরেচি।"

"সব?"

"সব।"

নরেন্দ্রনাথ নিজের হাতের কাপড়চাদর তুলিয়া ধরিলেন, "এক খরচ ত এই, আর এক খরচ মনোরমার হাতে" তাহার গহনা দেখাইয়া দিলেন—"বাকি?"

"সে খরচের হিসেব তোমায় পরে দেব।"

"তা যেন দিলে, কিন্তু আজ ষষ্ঠী, আজ পর্‌বে কি?"

"সিন্দুকে নতুন কাপড় আছে, বার কোরে পর্‌ব।"

"আর কিছু না? পূজায় নিমন্ত্রণ যাবার সময়, বিজয়ার দিন?"

"তুমি ত আমাকে অনেক কাপড় দিয়েচ, আমার কাপড়ের ভাবনা কি!"

"আচ্ছা, তাও যেন হল, তুমি যে আমাকে এই ধুতিচাদর দিলে, তার বদল আমি কি দেব?"

"ওর কি বদল দিতে হয়?"

"হয় না? তত্ত্ব কোর্‌লে পাল্টা তত্ত্ব করে না?"

সুলোচনার মুখ বন্ধ হইল। নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "দেখিন, বাইরে আমার টেবিলের উপর ব্যাগ আছে, নিয়ে আয়।"

ব্যাগ আসিল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ব্যাগ খুলিলেন। ব্যাগের ভিতর হইতে কাগজে মোড়া একখানি বিচিত্র বহুমূল্য শাড়ী বাহির করিলেন। খুব ফিকে বাদামী রং, সেই রং সুলোচনা পসন্দ করিতেন। আঁচ্‌লায় খুব চওড়া সাচ্চা জরির কাজ, সাচ্চা কাজের সরু পাড়। শাড়ী দেখিয়া ছেলেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। সুলোচনা হর্ষ-আনন্দে লজ্জায় নতমুখী হইয়া কহিলেন, এ আর কারুর কাজ নয় ঠাকুরঝীর কাজ!"

মনোরমা কহিল, "হাঁ, আমার কাজ। কিন্তু আমি দাদাকে কোন কথা বলি নি, শুধু চিঠি লিখেছিলাম। পূজার সময় তুমি নিজের জন্য কিছু করালে না, সে খবর না দিলে তিনি কি মনে কোর্‌তেন?"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ঠিক কথা।" তাহার পর ব্যাগে আবার হাত দিয়া উত্তম চামড়ার একটি ছোট বাক্স বাহির করিলেন। সেটি পাশে রাখিয়া, ব্যাগ হইতে একটি ছোট মখমলের কাজকরা থলি বাহির করিলেন। তাহার ভিতর একশত চক্‌চকে টাকা ছিল। কহিলেন, "মনোরমা আমাকে লিখিয়াছিল – তুমি হার গড়াও নি, শাড়ী তৈরি করাও নি, টাকা জমা কোরেছ। কিরকম জমা, সেটা আমাকে বুঝে নিতে বলেছিল। আমি তাই বুঝে এই সুদের টাকা নিয়ে এসেছি। আসল টাকাটা যেমন জমা কোরেচ, এই সুদটাও সেইরকম জমা কোরো। আর

এই পূজার সময় যেমন টাকা জমাবার সুবিধা, এমন আর কোন সময় নয়।” থলিসুদ্ধ টাকা মনোরমার হাতে দিয়া চামড়ার বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে হার বাহির করিলেন। এবার আর দেড়শত টাকার সক হার নয়। হীরামুক্তার হার ঝল্‌মল্ করিতেছে। হার-ছড়া দুই হাতে তুলিয়া-ধরিয়া সুলোচনাকে ডাকিলেন, “এ দিকে এস।”

ব্রীড়াবনতমুখী সাধ্বী পতির সমীপে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গলায় হার পরাইয়া দিয়া, চিবুক ধরিয়া সকলের সম্মুখে মুখ ফিরাইয়া ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখাচ্চে?

পুত্র কন্যা-ননদ একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “ঠিক যেন দুগ্গাঠাকরুণ।”

দেবীষষ্ঠীর প্রভাতসূর্য্য উদয় হইতে ছিল, পথে কলাবউকে স্নান করাইতে লইয়া যাইতেছিল, অগ্রে ঢুলী নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল। দ্বারে ভিক্ষুক আগমনী গাহিতেছিল—“ওমা ত্রিনয়না, অরুণচরণা, এস এস এস মা!”

অরুণলাঞ্ছিত পাদপদ্মে, স্নেহপ্রেম-প্রীতিপূর্ণ নয়নে, প্রসন্ন বদনে আনন্দ-ময়ী সেই আনন্দ-আলয়ে আগমন করিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

হিন্দুদর্শন।

বেদের মন্ত্রবর্ণ এবং উপনিষদ্ এবং তদনুসারে হিন্দুর দর্শনসমূহ, আর পুরাণ, স্মৃতি, গীতা, তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে কহেন, এই সৃষ্টির আদি-অন্ত নাই। ইহা নিদ্রা ও জাগরণের ন্যায় কখনও প্রলয়ে লীন, কখনও ব্যক্ত হয়। অতএব ইহা প্রবাহরূপে নিত্য। এমন সৃষ্টি হয় নাই, যাহাকে আদি বা প্রথম সৃষ্টি কহা যাইতে পারে; আর এমন প্রলয়ও হইবে না, যার পর আর সৃষ্টি হইবে না। সকলেই একবাক্যে কহেন যে, প্রত্যেক প্রলয়ে ভাবিসৃষ্টির দ্রব্য-বৃত্তিসম্পন্ন উপাদান ও সহকারী কারণসমূহ, জীবগণের সহ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকবার নবসৃষ্টি দেখা দেয়। কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে আছে “জন্যানাধারঃ কালো মহাপ্রলয়ঃ”—মহাপ্রলয়ে জন্যপদার্থসকল থাকে না। “জন্য”শব্দে উৎপত্তিবিশিষ্ট। উৎপত্তিবিশিষ্ট ভেদজাত স্থূল পদার্থসকল থাকে না। কিন্তু পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা, এই পঞ্চপদার্থ নিত্য। মহাপ্রলয়ে এ সমস্ত থাকে। পরমাণুসকল চারিপ্রকার—পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস। এতদ্ভিন্ন আত্মার আশ্রয়ে বর্ত্তমান মন। এই সর্ব্বশুদ্ধ নয় পদার্থ নিত্য। এ সমস্ত দ্রব্যবৃত্তিসম্পন্ন

এবং ইহারাই সৃষ্টির সমবায়িকারণ। ইহাদের বিদ্যমানতায় সৃষ্টির বিদ্যমানতা হয়। অতএব ইহারা প্রত্যেক প্রলয়ে রক্ষিত ভাবিসৃষ্টির অক্ষয়বীজস্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তিকারণ। এই নয়প্রকার দ্রব্যপদার্থের নাম "বিশেষ পদার্থ"। সৃষ্টির ব্যক্তাবস্থায় ঘটপটাদি ও মনুষ্যপশ্বাদি অবয়বের যে পৃথক্ জ্ঞান হয়, তাহার নাম "ভেদ"। কিন্তু অবয়বরহিত উক্ত নববিধ নিত্যদ্রব্যের মধ্যে প্রলয়কালে যে পরস্পর অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে, তাহার নাম "বিশেষ"। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের কথিত এই "মহাপ্রলয়"শব্দ পুরাণ ও মন্বাদি শাস্ত্রের উক্ত "নৈমিত্তিক প্রলয়মাত্র"। তাহা প্রকৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত "প্রাকৃতিক প্রলয়" নহে। তাহা হইলে পরমাণুসকল অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র প্রকৃতিতে লীন হইয়া যাইত। তাহাতে পরমাণু হইতে সর্গারম্ভ চলিত না। ফলত রঘুনাথ শিরোমণি "সিদ্ধান্তলক্ষণে" লেখেন—"মহাপ্রলয়ে মানাভাবাৎ"। মহাপ্রলয়ের অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয়ের প্রমাণ নাই। অথবা এমন প্রলয় অপ্রমাণ, যাহার অন্তে আর সৃষ্টি হইবে না। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিকমতে পরমাণু-আদি "বিশেষ"পদার্থের প্রাকৃতিক লয় হয় না।

সাংখ্যদর্শন পরমাণু প্রভৃতি "বিশেষ পদার্থের" সীমা অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রকৃতিকে তাবৎ সৃষ্টির বস্তুবীজ কহিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতি এবং পুরুষ (আত্মা) অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহারা উভয়েই নিত্য। "আত্মহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ" (সাং০ সূ০ ১।৭৪)—বৈশেষিকদর্শনে যেমন পারম্পর্য্যানুসারে পরমাণুকেই জগতের মূল উপাদান বলেন, সাংখ্যেরাও তদ্রূপ মহদাদিকে মধ্যে রাখিয়া, পরম্পরাসম্বন্ধে প্রকৃতিকেই মূল উপাদানকারণ কহেন। সেই উপাদান হইতে এই জগৎ বারবার সৃষ্ট এবং প্রত্যেক মহাপ্রলয়ে তাহাতে প্রলীন হয়।

বেদান্তদর্শনমতেও সৃষ্টি প্রবাহরূপে নিত্য। জীবাত্মা উৎপত্তিবিনাশরহিত। মায়াই প্রকৃতি। জীবাত্মা এবং মায়া উভয়েই ব্রহ্মের অংশ। মায়া ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি এবং ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্রা। পরব্রহ্ম ঈশ্বরসংজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক, স্বীয় মায়াশক্তির যোগে, জীবাত্মার ভোগার্থ আপনার সেই মহাশক্তির মধ্য হইতে এই সৃষ্টির বহিঃপ্রকটন এবং মহাপ্রলয়ে সেই শক্তিকোষের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিরূপ বিশাল কার্য্যের উপসংহার করেন। তখন ঐ শক্তি অন্তর্মুখতারূপে ব্রহ্মে লীন থাকেন এবং সৃষ্টিকালে জীবাত্মাকে সঙ্গে লইয়া জগৎরূপে পরিণত হন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ স্বীয়পূর্ব্বকারণরূপিণী ঐ ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াতে নামরূপবিহীন হইয়া সূক্ষ্মরূপে প্রলীন থাকে। নতুবা তৎকালে জগদ্বীজের অত্যন্তাভাব থাকে না। তবে যে কোন কোন স্থলে প্রলয়োপলক্ষে "অসৎ" অর্থাৎ কিছু ছিল না, এইরূপ উক্তি আছে, তাহার অর্থ "অব্যাকৃত সৎ"। যথা বেদান্তাধিকরণমালায়—

"যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং, নতু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ম্। অভাবস্তু কারণত্বনিষেধাৎ। তাৎপর্য্যবিষয়ে তু জগৎস্রষ্টরি ব্রহ্মণি ন কাপি বিবাদোঽস্তি।"

"অসৎ"শব্দের যাহা অর্থ, তাহা "অব্যাকৃত

সৎ", "অপ্রকটিত সৎ", ইহাই অভিপ্রায়; নতুবা "অত্যন্তাভাব" অভিপ্রেত নহে। কেন না, অভাবের কারণত্ব নিষিদ্ধ। তাৎপর্য্যত ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রকাশে কাহারো বিবাদ নাই। কেন না, তাঁহারই শক্তিতে জগৎ প্রলীন থাকে, তাঁহা হইতেই বহিঃপ্রসারিত হয়, – তিনিই ইহা সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অংশত প্রবেশ ও ইহাকে পালন করেন।

এইরূপ জগতের প্রবাহরূপ নিত্যত্বশ্রুতি ও ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধ। "সত্বাচ্চাবরস্য" (শা৹ সূ৹ ২।১।১৬)—সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে সেই ব্রহ্মশক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্মভাবে জগৎ থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টির সার অবয়বসকল ভাবিসৃষ্টির নিমিত্তে মায়াবীজরূপে অপেক্ষা করে। তাহাদের নামরূপ থাকে না। ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী মহামায়ার গর্ভে তাহারা বিলীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিপ্রকাশার্থে উক্ত মায়া সৎস্বরূপ ব্রহ্মের একাংশব্যাপিনী সর্ব্বজ্ঞস্বরূপিণী মহাশক্তি। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার বস্তুশক্তি মায়াধর্ম্মী—অর্থাৎ যেন কিছুই ছিল না এবং পরব্রহ্ম স্বীয়শক্তিবলে সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। এ সব কথা বেদান্তপ্রকরণে পরে বুঝা যাইবে।

অতঃপর জীবের কৃতকর্ম্মরূপিণী অবিদ্যাশক্তি উক্ত মায়ার বিভাগবিশেষ। তাহাও অনাদি। "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" (শা৹ সূ৹ ২।১।৩৫)—এই সৃষ্টি পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মফলের অনুবর্ত্তী নহে, এমন আশঙ্কা অমূলক। যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়কালে, ভাবিসৃষ্টির হেতুস্বরূপ সুকৃতিদুষ্কৃতিরূপ অদৃষ্ট বিভাগক্রমে অপেক্ষা করে। সৃষ্টি, জীবাত্মা ও তাঁহার কর্ম্মফলের আদি নাই। বীজবৃক্ষবৎ সে সমস্ত অনাদি।

তথাচ মন্ত্রবর্ণে

"অভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।" 'অভি' সর্ব্বতোভাবেন, 'ইদ্ধাৎ' লব্ধবৃত্তেঃ। প্রলয়সময়ে হি নিরুদ্ধবৃত্ত্যদৃষ্টং ভবতি।"

প্রলয়ে লীন জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মসহিত মানসিক বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধভাবে ব্রহ্মশক্তিতে লীন হইয়া থাকে। তাহাই তাহাদের পূর্ব্বসৃষ্টির অনুসারী অদৃষ্ট। যথাকালে সেই অদৃষ্টসমষ্টির বলে (সহকারিতায়) দ্রষ্টাস্বরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ঈক্ষণ বা তপস্যা হইয়াছিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রলয়নিশাবসানে জীবগণের অদৃষ্ট কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বের অঙ্কুরোন্মুখতা সহ প্রকটিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল। সেই অদৃষ্ট জীবের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও দ্রষ্টাস্বরূপ ব্রহ্মদৃষ্টির অন্তর্গত। সেই মহাদৃষ্টি প্রয়োজনবিজ্ঞানবান্। তাহাই "ঈক্ষণ" বা "তপস্যা" শব্দের বাচ্য। জীবগণের অদৃষ্টের তাদৃশ ঋতুকালে দ্রষ্টার মায়াশক্তির বিকাশরূপ জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া দ্বারা ক্রমপূর্ব্বক সৃষ্টি বহির্গত হইল। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—ঠিক সেইপ্রকার, যেমন পূর্ব্বকল্পে ছিল।

এতাবতা দর্শনসমূহের মতে সৃষ্টির উপাদান ও অদৃষ্টরূপ হেতু অনাদি। সুতরাং সৃষ্টিও প্রবাহরূপে অনাদি ও নিত্য। কেবল যথাকালে, প্রলয়প্রান্ত হইতে ব্যক্তপ্রান্তে এবং ব্যক্তপ্রান্ত হইতে প্রলয়প্রান্তে—এইরূপ চিরকাল তাহার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের সদ্রূপ অস্তিত্ব, অন্তর্যামিত্ব, অধিদৈবত্ব, নিয়ন্তৃত্ব

এবং চিদাভাসত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের গমনাগমন হইতেছে। অতঃপর আমরা সাংখ্যদর্শনের অল্প-বিবরণে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া!

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া!
যার কেশ যার সাজ—
সে কোথা রহিল আজ—
সে কোথা জন্মের মত গিয়াছে চলিয়া?—
গেছে কি চলিয়া?

কে বলে চলিয়া গেছে—
কেশেতে মিশায়ে আছে;
এই সেই সেই এই
অথচ কিছুই নেই
কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া!

দেখি দেখি সেই মন্ত্র বারেক জপিয়া!
যে মন্ত্রে দীক্ষিত করি
গেল মোরে পরিহরি,
মিলায়ে হৃদয়যন্ত্রে
উচ্চারিব মহামন্ত্রে,
দেখি দেখি কতক্ষণ থাকে সে ভুলিয়া!—
পারি কি না পারি তাবে
আঁখিপথে আনিবারে
কৃতান্তের বজ্রদ্বার কৌশলে খুলিয়া।
যেমন কৃতান্তে তুষি
এনেছিল য়ুরিডিসি
অর্ফ্যাস্ বিনোদ বাদ্যযন্ত্রে বাজাইয়া।
আর কি সে আসিবে না—
শূন্যগৃহে পশিবে না—
আসে না কি পোষা পাখী পিঞ্জরে উড়িয়া?

গভীর আঁধার নিশি! গগন-সাগরে
যেন শ্বেতপুষ্পপারা
ভাসিছে অসংখ্য তারা
একটি শবদ নাহি বিশ্বচরাচরে!
সুদূর শূন্যেতে শুধু
শুনা যায় মৃদুমৃদু
নৈশ-বিহঙ্গম-রব যেতেছে চলিয়া!
যেন প্রাণ কায়া ছাড়ি

ভবসিন্ধু দেয় পাড়ি
করিছে আনন্দরব থাকিয়া থাকিয়া।

বসি মুক্ত বাতায়নে
করে কেশ শূন্যমনে
হেনকালে জ্ঞান হ'ল যেন অকস্মাৎ
জীবন মরণ তার
মাঝে সেই গুপ্তদ্বার,
যেন কেহ সেই দ্বারে করে করাঘাত।
যথা সে প্রবাসী করে
আসি বহুদিন পরে
সহসা হেরিয়া রুদ্ধ ভবনের দ্বার;
তেমনি কে জ্ঞানহারা
ব্যাকুল প্রবাসি পারা
আঘাত করিছে সেই দ্বারে বারবার!

যেন পদশব্দ কার
আসে-যায় বারবার
লঙ্ঘিবারে চাহে সীমা লঙ্ঘিতে না পারে;—
শুনিবারে যেই শব্দ
হৃৎপিণ্ড হ'ত স্তব্ধ—
টানিয়া জীবনপ্রান্তে ফেলিল আমারে!
ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়
মুক্ত বিহঙ্গিনী-প্রায়,
উপায় নাহিক পায় পশিতে পিঞ্জরে;—
পিঞ্জরেতে পাখী যেই
পাখা বিস্তারিয়া সেই
প্রহারে পিঞ্জরগায় উড়িবার তরে।

দুই জন দুই স্থানে—
টানাটানি প্রাণে প্রাণে,
এমন সময়ে কার কণ্ঠ সুধাময়—
যেন স্বপ্ন-সমুদিত
চিরবিরহের গীত
ভাসাইল স্মৃতিস্রোতে নিমগ্ন হৃদয়!

কার কণ্ঠ পদশব্দ—কার করাঘাত?
এ হেন নিশিতে একা—
চোখেতে পাই নে দেখা—
জীবন উপান্তে আসি ক'রে যাতায়াত!
চিনি চিনি মনে করি,
কিন্তু চিনিবারে নারি,
যেন পথে পান্থবাসে
বাধা মন তার পাশে;
যেন রে শুনেছি কোথা
সে কণ্ঠসুধার কথা,
আজিও জীবনস্রোত বহে তার পানে।

অনন্তর সেই স্বর
উঠি শূন্যে মনোহর,
পশিয়া নক্ষত্রধাম

উচ্চারিল সেই নাম,
মিশাইয়া গেল শেষে অনন্ত গগনে!

করে যে কুন্তল ছিল
কর হ'তে পড়ে গেল,
লহরে লহরে কেশ ক্রমে বিস্তারিল!
তাহে সেই রূপরাশি
সে তনু শোভিল আসি,-
যেন পৌর্ণমাসী শশী মেঘে দেখা দিল।
যেন বনরাজিশিরে
নির্জ্জন তটিনীতীরে
অকলঙ্ক চাঁদখানি হাসি সমুদিল!

*   *   *   *
*   *   *   *

কৈ সে কোথায় গেল আমারে ত্যজিয়া?
শূন্যগৃহ শূন্য আছে,
কেহ ত নাহিক কাছে,
সব শূন্য করে' গেছে শূন্যে মিশাইয়া!
অন্ধকার করি' হেথা
সে শশী উঠিল কোথা,
করিল আলোকময় কোন্ রাজ্যে গিয়া?
এত ভালবাসাবাসি,
এত প্রাণে মেশামিশি,
এত সাধ এত আশা,
এত যে প্রাণের তৃষা,
সব কি জন্মের মত রহিল ভুলিয়া?

কারামুক্ত কারাবাসে
কে কবে ফিরিয়া আসে?
কে চাহে ভুঞ্জিতে দুঃখ নিগড় পরিয়া?
কোথাও দেখি না তারে!—
নাহি চিহ্ন এ সংসারে!—
কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া।

গোপালকৃষ্ণ।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৪৮

রমেশ প্রত্যুষেই এলাহাবাদ হইতে গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল। তখন রাস্তায় অধিক লোক ছিল না, এবং শীতের জড়িমায় রাস্তার ধারের গাছগুলা যেন পল্লবাবরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাড়ার বস্তি-গুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া শাদা কুয়াশা ডিম্বগুলির উপরে নিস্তব্ধ-আসীন রাজহংসের মত স্থির হইয়া ছিল। সেই নির্জ্জন পথে গাড়ির মধ্যে একটা মস্ত মোটা ওভারকোটের নীচে রমেশের বক্ষস্থল চঞ্চল হৃৎপিণ্ডের আঘাতে কেবলি তরঙ্গিত হইতে-ছিল।

বাংলার বাহিরে গাড়ি দাঁড় করাইয়া রমেশ নামিল। ভাবিল, গাড়ির শব্দ নিশ্চয়ই কমলা শুনিয়াছে;—শব্দ শুনিয়া সে হয় ত বারন্দায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্বহস্তে কমলার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য এলাহা-বাদ হইতে রমেশ একটি দামী নেক্‌লেস্ কিনিয়া আনিয়াছে—তাহারই বাক্সটা রমেশ তাহার ওভার্‌কোটের বৃহৎ পকেট হইতে বাহির করিয়া লইল।

বাংলার সম্মুখে আসিয়া রমেশ দেখিল, বিষণ-বেহারা বারান্দায় শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে—ঘরের দ্বারগুলি বন্ধ। বিমর্ষ-মুখে রমেশ একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। একটু উচ্চস্বরে ডাকিল "বিষণ!" ভাবিল, এই ডাকে ঘরের ভিতরকার নিদ্রাও ভাঙিবে। কিন্তু এমন করিয়া নিদ্রা ভাঙাইবার যে অপেক্ষা আছে, ইহাই তাহার মনে বাজিল; রমেশ ত অর্দ্ধেকরাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই।

দুই-তিন ডাকেও বিষণ উঠিল না—শেষ-কালে ঠেলিয়া তাহাকে উঠাইতে হইল। বিষণ উঠিয়া-বসিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মত তাকাইয়া রহিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল "বহুজি ঘরে আছেন?"

বিষণ প্রথমটা রমেশের কথা যেন বুঝি-তেই পারিল না—তাহার পরে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি ঘরেই আছেন।"—এই বলিয়া সে পুনর্ব্বার শুইয়া-পড়িয়া নিদ্রা দিবার উপক্রম করিল।

রমেশ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই! তথাপি একবার উচ্চৈঃস্বরে

ডাকিল, "কমলা।" কোথাও কোনো সাড়া পাইল না। বাহিরের বাগানে নিমগাছতলা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, রান্নাঘরে, চাকরদের ঘরে, আস্তাবলঘরে সন্ধান করিয়া আসিল, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইল না। তখন রৌদ্র উঠিয়া পড়িয়াছে—কাকগুলা ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বাংলার ইঁদারা হইতে জল লইবার জন্য কলস মাথায় পাড়ার মেয়ে দুইএকজন দেখা দিতেছে। পথের ওপারে কুটীরপ্রাঙ্গণে কোনো পল্লীনারী বিচিত্র উচ্চস্বরে গান গাহিতে গাহিতে জাঁতায় গম ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমেশ বাংলাঘরে ফিরিয়া-আসিয়া দেখিল, বিষণ পুনরায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তখন সে নত হইয়া দুই হাতে খুব করিয়া বিষণকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল—দেখিল, তাহার নিশ্বাসে তাড়ির প্রবল গন্ধ ছুটিতেছে।

ঝাঁকানির বিষম বেগে বিষণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল—"বহুজি কোথায়?"

বিষণ কহিল—"বহুজি ত ঘরেই আছেন?"

রমেশ। কই, ঘরে কোথায়?

বিষণ। কাল ত এখানেই আসিয়াছেন?

রমেশ। তাহার পরে কোথায় গেছেন?

বিষণ হাঁ করিয়া রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময়ে খুব চওড়াপাড়ের এক বাহারে ধুতি পরিয়া চাদর উড়াইয়া রক্তবর্ণ-চক্ষু উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তোর মা কোথায়?"

উমেশ কহিল, "মা ত কাল হইতে এখানেই আছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কোথায় ছিলি?"

উমেশ কহিল "আমাকে মা কাল বিকালে সিধুবাবুদের বাড়ী যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।"

গাড়োয়ান আসিয়া কহিল, "বাবু, আমার ভাড়া?"

রমেশ তাড়াতাড়ি সেই গাড়িতে চড়িয়া একেবারে খুড়ার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, বাড়ীসুদ্ধ সকলেই যেন চঞ্চল। রমেশের মনে হইল, কমলার বুঝি কোনো অসুখ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কাল সন্ধ্যার কিছু পরেই উমা হঠাৎ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার মুখ নীল ও হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ায় সকলেই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। তাহার চিকিৎসা লইয়া কাল বাড়ীসুদ্ধ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। সমস্ত রাত কেহ ঘুমাইতে পায় নাই।

রমেশ মনে করিল, উমির অসুখ হওয়াতে নিশ্চয়ই কাল কমলাকে এখানে আনানো হইয়াছিল। বিপিনকে কহিল—"কমলা তা হইলে উমিকে লইয়া খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া আছে!"

কমলা কাল রাত্রে এখানে আসিয়াছিল কি না, বিপিন তাহা নিশ্চয় জানিত না—তাই রমেশের কথায় একপ্রকার সায় দিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি উমিকে যেরকম ভালবাসেন, খুব

ভাবিতেছেন বই কি! কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছে, ভাবনার কোনো কারণই নাই।"

যাহা হউক্, অত্যন্ত উল্লাসের মুখে কল্পনার পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বাধা পাইয়া রমেশের মনটা বিকল হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহাদের মিলনে যেন একটা দৈবের ব্যাঘাত আছে।

এমনসময় রমেশের বাংলা হইতে উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানকার অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি ছিল। এই বালকটাকে শৈলজা স্নেহও করিত। বাড়ীর ভিতরে শৈলজার ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া উমির ঘুম ভাঙিবার আশঙ্কায় শৈল তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

উমেশ জিজ্ঞাসা করিল "মা কোথায় মাসিমা!"

শৈল বিস্মিত হইয়া কহিল—"কেন রে, তুই ত কাল তাহাকে সঙ্গে লইয়া ও বাড়ীতে গেলি। সন্ধ্যার পর আমাদের লছমনিয়াকে ওখানে পাঠাইবার কথা ছিল, খুকির অসুখে তাহা পারি নাই।

উমেশ মুখ ম্লান করিয়া কহিল—"ও বাড়ীতে ত তাঁহাকে দেখিলাম না!"

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে কি কথা! কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?"

উমেশ। আমাকে ত মা থাকিতে দিলেন না। ও বাড়ীতে গিয়াই তিনি আমাকে সিধুবাবুদের ওখানে যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন!

শৈল। তোরও ত বেশ আক্কেল দেখিতেছি! বিষণ কোথায় ছিল?

উমেশ। বিষণ ত কিছুই বলিতে পারে না। কাল সে খুব তাড়ি খাইয়াছিল।

শৈল। যা, যা, শীঘ্র বাবুকে ডাকিয়া আন্।

বিপিন আসিতেই শৈল কহিল—"ওগো, এ কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বিপিনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন, কি হইয়াছে?"

শৈল। কমল কাল ও বাংলায় গিয়াছিল, তাহাকে ত সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

বিপিন। তিনি কি কাল রাত্রে এখানে আসেন নাই?

শৈল। না গো! উমির অসুখে আনাইব মনে করিয়াছিলাম, লোক কোথায় ছিল? রমেশবাবু কি আসিয়াছেন?

বিপিন। বোধ হয়, ও বাংলায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ঠিক করিয়াছেন, কমলা এখানেই আছেন। তিনি ত আমাদের এখানেই আসিয়াছেন।

শৈল। যাও যাও, শীঘ্র যাও, তাঁহাকে লইয়া খোঁজ কর'গে! উমি এখন ঘুমাইতেছে—সে ভালই আছে।

বিপিন ও রমেশ আবার সেই গাড়িতে উঠিয়া বাংলায় ফিরিয়া গেল এবং বিষণকে লইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায় জোড়াতাড়া দিয়া যেটুকু খবর বাহির হইল, তাহা এই :—কাল বৈকালে কমলা একলা গঙ্গার ধারের অভিমুখে চলিয়াছিল। বিষণ তাহার সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করে, কমলা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া ফিরাইয়া দেয়।

সে পাহারা দিবার জন্য বাগানের গেটের কাছে বসিয়া ছিল—এমন সময়ে গাছ হইতে সদ্যঃসঞ্চিত ফেনোচ্ছল তাড়ির কলস বাঁকে করিয়া তাড়িওয়ালা তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার পর হইতে বিশ্বসংসারে কি যে ঘটিয়াছে, তাহা বিষণের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নহে। যে পথ দিয়া কমলাকে গঙ্গার দিকে যাইতে দেখিয়াছিল, বিষণ তাহা দেখাইয়া দিল।

সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া রমেশ, বিপিন ও উমেশ কমলার সন্ধানে চলিল। উমেশ হৃত-শাবক শিকারী জন্তুর মত চারিদিকে তীক্ষ্ণ ব্যাকুলদৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। গঙ্গার তটে আসিয়া তিনজনে একবার দাঁড়াইল। সেখানে চারিদিক্ উন্মুক্ত। ধূসর বালুকা প্রভাতরৌদ্রে ধুধু করিতেছে। কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না। উমেশ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল "মা, মাগো, মা কোথায়?"— ও পারের সুদূর উচ্চতীর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল—কেহই সাড়া দিল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে উমেশ হঠাৎ দূরে শাদা কি-একটা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া দেখিল, জলের একেবারে ধারেই একগোছা চাবি একটা রুমালে বাঁধা পড়িয়া আছে। "কিরে, ওটা কি?" বলিয়া রমেশও আসিয়া পড়িল। দেখিল, কমলারই চাবির গোছা।

যেখানে চাবি পড়িয়া ছিল, সেখানে বালুতটের প্রান্তভাগে পলিমাটি পড়িয়াছে। সেই কাঁচা মাটির উপর দিয়া গঙ্গার জল পর্য্যন্ত ছোট দুইটি পায়ের গভীর চিহ্ন পড়িয়া গেছে। খানিকটা জলের মধ্যে একটা-কি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল, তাহা উমেশের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না—সে সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ধরিতেই দেখা গেল, সোনার উপরে এনামেল্ করা একটি ছোটো ব্রোচ্—ইহা রমেশেরই উপহার।

এইরূপে সমস্ত সঙ্কেতই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল, তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না—"মা, মাগো" —বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জল সেখানে অধিক ছিল না—উমেশ বারংবার পাগলের মত ডুব দিয়া দিয়া তলা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল—জল ঘোলা করিয়া তুলিল।

রমেশ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন কহিল "উমেশ, তুই কি করিতে-ছিস্? উঠিয়া আয়।"

উমেশ মুখ দিয়া জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল—"আমি উঠিব না—আমি উঠিব না! মাগো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না!"

বিপিন ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু উমেশ জলের মাছের মত সাঁতার দিতে পারে—তাহার পক্ষে জলে আত্মহত্যা করা অত্যন্ত কঠিন। সে অনেকটা হাঁপাইয়া-ঝাঁপাইয়া শ্রান্ত হইয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িল এবং বালুর উপরে লুটাইয়া-পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নিস্তব্ধ রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, চলুন! এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে! একবার পুলিসকে

খবর দেওয়া যাক্, তাহারা সমস্ত সন্ধান করিয়া দেখুক্!"

শৈলজার ঘরে সেদিন আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া কান্নার রোল উঠিল। নদীতে জেলেরা নৌকা লইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত জাল টানিয়া বেড়াইল। পুলিস্ চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিল। ষ্টেশনে গিয়া বিশেষ করিয়া খবর লইল, কমলার সহিত বর্ণনায় মেলে, এমন কোনো বাঙালীর মেয়ে রাত্রে রেল্‌গাড়িতে ওঠে নাই।

সেইদিনই বিকালে খুড়া আসিয়া পৌঁছিলেন। কয়দিন হইতে কমলার ব্যবহার ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কমলা গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।

লছ্‌মনিয়া কহিল, "সেইজন্যই খুকি কাল রাত্রে অকারণে কান্না জুড়িয়া এমন একটা অদ্ভুতকাণ্ড করিল—উহাকে ভাল করিয়া ঝাড়াইয়া লওয়া দরকার।"

রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল—তাহার মধ্যে অশ্রুর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল "একদিন এই কমলা এই গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মত আর একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।"

সূর্য্য যখন অস্ত গেল, তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আসিল—যেখানে চাবির গোছা পড়িয়া ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া সেই পায়ের চিহ্নক'টি একদৃষ্টে দেখিল—তাহার পরে তীরে জুতা খুলিয়া ধুতি গুটাইয়া-লইয়া খানিকটা জল পর্য্যন্ত নামিয়া গেল এবং বাক্স হইতে সেই নূতন নেকলেস্‌টি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

রমেশ কখন্ যে গাজিপুর হইতে চলিয়া গেল, খুড়ার বাড়ীতে তাহার খবর লইবার মত অবস্থা কাহারো রহিল না।

৪৯

এখন রমেশের সম্মুখে কোনো কাজ রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহজীবনে সে যেন কোনো কাজ করিবে না, কোথাও স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবে না। তাহার মনে হইল, তাহার জীবনের নাট্যলীলা একেবারে শেষ হইয়া গেছে বাতি নিবিয়াছে, যবনিকা পড়িয়াছে, সমস্ত সঙ্গীত নিস্তব্ধ—এখন তাহার কোনো বন্ধন নাই, কর্ত্তব্য নাই, সুখও নাই। হেমনলিনীর কথা তাহার মনে একেবারেই যে উদয় হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহা সে সরাইয়া দিয়াছে,—সে মনে মনে বলিয়াছে, "আমার জীবনে যে নিদারুণ ঘটনা আঘাত করিল, তাহাতে আমাকে চিরদিনের জন্য সংসারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বজ্রাহত গাছ প্রফুল্ল উপবনের মধ্যে স্থান পাইবার আশা কেন করিবে?"

রমেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইল। একজায়গায় কোথাও বেশিদিন রহিল না। সে নৌকায় চড়িয়া কাশীর ঘাটের শোভা দেখিল, সে দিল্লিতে কুতবমিনরের উপরে চড়িল, আগ্রায় জ্যোৎস্নারাত্রে তাজ দেখিয়া আসিল। অমৃতসরে গুরুদরবার দেখিয়া রাজপুতানায় আবুপর্ব্বতশিখরের মন্দির দেখিতে গেল—এম্‌নি করিয়া রমেশ নিজের শরীরমনকে আর বিশ্রাম দিল না।

কিন্তু দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ানো রমেশের স্বভাবসিদ্ধ নহে। সে নিতান্তই কুণো এবং অন্যলোকের মুখাপেক্ষী। সে বাল্যকাল হইতে বইয়ের পাতার উপরে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়াছে। ছাত্রাবস্থায় যখন 'মেসে' থাকিত, তখন তাহার দুইএকজন হিতৈষী বন্ধু বরাবর তাহার তত্ত্বাবধান করিয়াছে। নিজের টাকাকড়ি, অশনবসনের ব্যবস্থাভার সে কোনোদিন নিজে লইতে পারে নাই। তাহার পিতার আমলের পুরাতন বিশ্বাসী লোকের হাতে তাহার বিষয়-আশয়ের ভার থাকাতে জীবিকার জন্য তাহাকে ভাবিতে হইতেছে না। অন্য ছাত্রেরা খেলা, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতিতে যখন উৎসাহপ্রকাশ করিত, তখন রমেশ মনে করিত, ইহা বর্ব্বরতামাত্র ও ইহাতে মানসিক উচ্চপ্রবৃত্তিগুলির সৌকুমার্য্য নষ্ট হইয়া যায়। সেই রমেশ আজ নিজের সমস্ত ভার নিজে সম্পূর্ণ বহন করিয়া, টিকিট কিনিয়া, মুটে ডাকিয়া, গাড়ির ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলির জোরে নিজের স্থান করিয়া লইয়া, নূতন নূতন স্থানে ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের নির্দ্দেশক্রমে বাসা ঠিক করিয়া এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেও যে ঠিক নিজের স্বভাবের উত্তেজনায়, তাহা নহে। সে অনেক গ্রন্থে পড়িয়াছে যে, জীবনে গুরুতর দুর্ঘটনার পরে ঢের লোকে এম্‌নি করিয়া দেশে-বিদেশে নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া নিজেকে সর্ব্বদাই সচল রাখিয়া সান্ত্বনালাভ করিয়া থাকে। তাই সেও সেই শোকাতুর লোকের শাস্ত্রসম্মত পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু এই উপায়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই রমেশ নিজেকে একেবারে পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলিল। অপরিচিত দেশের অনাশ্রয় ও অপরিচিত লোকের অসমস্ত হইতে ছুটি লইয়া কোনো একটা নিভৃত জায়গায় আরামে স্থায়ী হইয়া বসিবার জন্য তাহার সমস্ত শরীরমন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। গোড়ায় যখন সে ভ্রমণে বাহির হয়, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, চিরদিনই তাহাকে এম্‌নি ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে—এখন রমেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, চিরদিন বলিতে অধিকদিন নহে—তাহাকে একটা বাসা করিতেই হইবে।

একদিন কানপুরের ডাকবাংলার নিকটবর্ত্তী পথে পায়চারি করিতে করিতে রমেশ এই সকল কথা আলোচনা করিতেছে;—লাইব্রেরি সাজাইয়া, চারিদিকে বাগান করিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ বাসাটির একটি মনোরম চিত্র গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার অধ্যয়নশীল শান্তিময় নিভৃত জীবনযাত্রার মধুর কল্পনায় আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমনসময় হঠাৎ অদূরে একটি সামান্য পথিককে দেখিয়া রমেশ একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। "আরে জান্‌কিয়া -জান্‌কিয়া" করিয়া দ্রুতপদে রমেশ তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি রমেশকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সেলাম করিল—কহিল, "বাবুজি এখানে যে!"

রমেশের সহিত অন্নদাবাবুদের যখন প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন এই জান্‌কিয়া তাঁহাদের বেহারা ছিল। অল্পকয়েকদিন পরেই পীড়িত হইয়া জান্‌কিয়া বাড়ী চলিয়া যায়, তাহার পরে আর সে ফেরে নাই।

এইটুকু দূরপরিচয়ের সম্পর্কমাত্রে

রমেশ এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে, পথের মধ্যে এই জান্‌কিয়া-বেহারার সঙ্গ তাহার একটা লাভ বলিয়া মনে হইল। জান্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়াবাবু কেমন আছেন? দিদিঠাকরুণ ভাল আছেন ত? দাদাবাবু কি করিতেছেন?"

রমেশ কতকটা আন্দাজেই এ সকল কথার উত্তর দিল। জান্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিঠাকরুণের 'সাদি' হইয়া গেছে?"

রমেশের বুকটার ভিতরে একটা নাড়া খাইল, সে কহিল, "না, এখনো হয় নাই।"

জান্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে কি?"

রমেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কই, তাহা ত শুনি নাই।"

জান্‌কিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কি কর?"

সে কহিল, "আমার এখানে শ্বশুরবাড়ী—আমি এখানকার কলে কাজ করি।"

সে কত করিয়া পায়, তাহার কিরকম করিয়া চলে, তাহার ছেলেপুলে আছে কি না, সমস্ত রমেশ জিজ্ঞাসা করিল। জান্‌কিয়া মনে মনে কিছু বিস্মিত হইল। এই চসমা-পরা বাবুটি অন্নদাবাবুর বাড়ীতে কোনোদিন জান্‌কিয়ার কোন খবর লয় নাই। জান্‌কিয়ার বিদায়কালে রমেশ তাহার হাতে একটি টাকা দিল—সে পুনর্ব্বার কাজ সারিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরিবার সময় ডাকবাংলায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে আশ্বাস দিয়া, সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

রমেশ ডাকবাংলায় আরামকেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া অনেক কথা ভাবিল। এমন কি, তাহার মধ্যে এই জান্‌কিয়া-বেহারাটার প্রতি একটু ঈর্ষাও ছিল। ঐ যে জান্‌কিয়াটা কেমন স্বচ্ছন্দচিত্তে কাজ করিতে গেল,—উহার এখানে ঘর আছে—কাজ সারিয়া সন্ধ্যাবেলায় আপনার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে—সেখানে দীপ জ্বলিতেছে—অন্ন প্রস্তুত, এই কল্পনাটা রমেশের কাছে তুচ্ছ মনে হইল না। এই সঙ্গে, জান্‌কিয়া কলিকাতায় যে বাড়ীতে কাজ করিত, সেই বাড়ীর ছোটবড় নানা কথা তাহার মনে উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় রমেশ ডাকবাংলায় একলা বসিয়া থাকিতে পারিল না। বেড়াইতে বাহির হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটা বাংলাবাড়ীর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেখানে ঘরের মধ্যে হার্ম্মোনিয়ম বাজিতেছে এবং তাহার সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনা যাইতেছে। হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য বিভ্রম হইল, যেন হেমনলিনীই গাহিতেছে। যখন বুঝিল, হেমনলিনী নয়, তখনো তাহার মনের সেই মোহ একেবারে ভাঙিয়া গেল না।

বাড়ীর একটি ভৃত্যের কাছ হইতে খবর পাইল, কোনো বাঙালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক বেড়াইতে আসিয়া এখানে বাসা করিয়া আছেন। রাস্তা হইতে, এই সঙ্গীতমুখরিত দীপজ্বলিত ঘরের দিকে রমেশ সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিল। বাবুটির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য রমেশ পরদিন সকালে সেই বাংলার দিকে যাত্রা করিল। গেটের

কাছে আসিয়াই দেখিল, একটি যুবতী বাংলার সহিত সংলগ্ন ফুলবাগানে ধীরপদে বেড়াইতেছেন। রমেশ যে কয়দিন ঊর্দ্ধশ্বাসে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল, সে কয়দিনের মধ্যে কোনো আধুনিক বাঙালী ভদ্রস্ত্রীলোককে সে দেখে নি;—আজ হঠাৎ এই বাঙালীর মেয়েটি যে তাহার চক্ষে এমন নূতন, এমন মধুর লাগিবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারিত না। এই কাপড় পরিবার ভঙ্গি, এই চুলবাধা, এই ধীর গতি দেখিয়া এই প্রবাসের প্রভাতে তাহার মনে কোথাকার কোন্ ছবি জাগিয়া উঠিল। রমেশের ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই মেয়েটিকে কেবল একবার নমস্কার করিয়া আসে। আহা ইনি কোন্ ভাগ্যবানের ঘরটিকে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সুধাময় করিয়া রাখিয়াছেন। এমন সময়ে হঠাৎ রমেশকে দেখিতে পাইয়া মেয়েটি বাগান হইতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে ক্রমে এম্‌নি হইল যে, যেখানে-সেখানে যাহা তাহা কেবল হেমনলিনীর কথাই তাহাকে স্মরণ করাইতে লাগিল। লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিলে সেই সকল বই চোখে পড়ে,—যাহাতে হেমনলিনীর স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। কাপড়ের দোকানের সুমুখ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ এমন একটা রঙের কাপড় দেখিয়া তাহার মনটা চম্‌কিয়া উঠে,—যাহাতে হেমনলিনীর কোনো-একটা দিনের বিশেষ সাজ তাহার মনে পড়িয়া যায়। প্রত্যহ সকালে-বিকালে বেড়াইতে গিয়া একটা ফিরিঙ্গির বাড়ীর কাছ দিয়া যাইবার সময় যেমন দেখে, তাহারা গুটিদুই-তিন মেয়ে-পুরুষ টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া চা খাইতেছে—অম্‌নি তাহার মনের ভিতরটায় ধক্ করিয়া উঠে।

এই ভ্রমণশ্রান্ত যুবকটির অন্তঃকরণ কেবল ঘর চাহিয়া হাহা করিতে লাগিল। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা কেবলি আঘাত দিতেছে। অবশেষে একদিন তাহার শোককালযাপনের ভ্রমণ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল এবং সে একটা মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া রেলগাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

৫০

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রমেশ সেই কলুটোলার গলিটার ভিতরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না। সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে, কি শুনিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই! মনের মধ্যে কেবলি একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, সেখানে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একদিন ত সে গলির মোড় পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা রমেশ নিজেকে জোর করিয়া সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেখিল, বাড়ীর সমস্ত দরজাজানলা বন্ধ—ভিতরে কোনো লোক আছে, এমন লক্ষণ নাই। তবু সেই সুখন্ বেহারাটা হয় ত শূন্যবাড়ী আগ্‌লাইতেছে মনে করিয়া রমেশ বেহারাকে ডাকিয়া দ্বারে বারকতক আঘাত করিল। কেহ সাড়া দিল না। প্রতিবেশী চন্দ্রমোহন তাহার ঘরের বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল—সে কহিল, "কে ও! রমেশবাবু নাকি! ভাল আছেন ত? এ বাড়ীতে অন্নদাবাবুরা ত' এখন কেহ নাই!"

রমেশ। তাঁহারা কোথায় গেছেন জানেন?

চন্দ্রমোহন। সে খবর ত বলিতে পারি না, পশ্চিমে গেছেন এই জানি।

রমেশ। কে কে গেছেন মশায়?

চন্দ্র। অন্নদাবাবু আর তাঁর মেয়ে।

রমেশ। ঠিক জানেন, তাঁহাদের সঙ্গে আর কেহ যান নাই!

চন্দ্র। ঠিক জানি বই কি! যাইবার সময়ও আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে।

তখন রমেশ ধৈর্য্যরক্ষায় অক্ষম হইয়া কহিল—"আমি একজনের কাছে খবর পাইয়াছি, নলিনবাবু বলিয়া একটি বাবু তাঁহাদের সঙ্গে গেছেন।"

চন্দ্র। ভুল খবর পাইয়াছেন। নলিনবাবু আপনার ঐ বাসাটাতেই দিনকয়েক ছিলেন। ইঁহারা যাত্রা করিবার দিনদুইচার পূর্ব্বেই তিনি কাশীতে গেছেন।

রমেশ তখন এই নলিনবাবুটির বিবরণ প্রশ্ন করিয়া করিয়া চন্দ্রমোহনের কাছ হইতে বাহির করিল। ইঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়। শোনা গেছে, পূর্ব্বে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন, এখন মাকে লইয়া কাশীতেই আছেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল "যোগেন এখন কোথায় আছে বলিতে পারেন?"

চন্দ্রমোহন খবর দিল, যোগেন্দ্র ময়মনসিঙের একটি জমিদারের স্থাপিত হাই-স্কুলের হেডমাষ্টারপদে নিযুক্ত হইয়া বিশাইপুরে গিয়াছে।

চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল "রমেশবাবু, আপনাকে ত অনেকদিন দেখি নাই—আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন?"

রমেশ আর গোপন করিবার কারণ দেখিল না—সে কহিল, "প্র্যাক্‌টিস্ করিতে গাজিপুরে গিয়াছিলাম।"

চন্দ্র। এখন তবে কি সেইখানেই থাকা হইবে?

রমেশ। না, সেখানে আমার থাকা হইল না—এখন কোথায় যাইব, ঠিক করি নাই।

রমেশ চলিয়া যাইবার অনতিকাল পরেই অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময়, মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ীর তত্ত্বাবধানের জন্য অক্ষয়ের উপর ভার দিয়া গিয়াছিল। অক্ষয় যে ভার গ্রহণ করে, তাহা রক্ষা করিতে কখনো শৈথিল্য করে না—তাই সে হঠাৎ যখন তখন আসিয়া দেখিয়া যায়, বাড়ীর বেহারা-দুজনের মধ্যে একজনও হাজির থাকিয়া খবরদারি করিতেছে কি না।

চন্দ্রমোহন তাহাকে কহিল, "রমেশবাবু এই খানিকক্ষণ হইল এখান হইতে চলিয়া গেলেন।"

অক্ষয়। বলেন কি? কি করিতে আসিয়াছিলেন?

চন্দ্র। তাহা ত জানি না। আমার কাছে অন্নদাবাবুদের সমস্ত খবর জানিয়া লইলেন। এমন রোগা হইয়া গেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে চেনাই কঠিন—যদি বেহারাকে না ডাকিতেন, আমি চিনিতে পারিতাম না।

অক্ষয়। এখন কোথায় থাকেন, খবর পাইলেন?

চন্দ্র। এতদিন গাজিপুরে ছিলেন—এখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন, কোথায় থাকিবেন, ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না।

অক্ষয় বলিল—"ওঃ!"—বলিয়া আপন কর্ম্মে মন দিল।

রমেশ বাসায় ফিরিয়া-আসিয়া ভাবিতে লাগিল—"অদৃষ্ট একি বিষম কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিকে আমার সঙ্গে কমলার ও অন্যদিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর এই মিলন, এ যে একেবারে উপন্যাসের মত—সেও কুলিখিত উপন্যাস! এমনতর ঠিক উল্টাপাল্টা মিল করিয়া দেওয়া অদৃষ্টেরই মত বে-পরোয়া রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব—সংসারে সে এমন অদ্ভুতকাণ্ড ঘটায়, যাহা ভীরু লেখক কাল্পনিক উপাখ্যানে লিখিতে সাহস করে না।" কিন্তু রমেশ ভাবিল, এবার সে যখন তাহার জীবনের সমস্যাজাল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন খুব সম্ভব, অদৃষ্ট এই জটিল উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রমেশের পক্ষে নিদারুণ উপসংহার লিখিবে না।

যোগেন্দ্র বিশাইপুর জমিদারবাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি একতলা বাড়ীতে বাসা পাইয়াছিল—সেখানে রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমনসময় বাজারের একটি লোক তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। খামের উপরকার অক্ষর দেখিয়াই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, রমেশ লিখিয়াছে—সে বিশাইপুরের একটি দোকানে অপেক্ষা করিতেছে, বিশেষ কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। রমেশকে যদিও সে একদিন অপমান করিতে বাধ্য হইয়াছিল—তবু সেই বাল্যবন্ধুকে এই দূরদেশে এতদিন অদর্শনের পরে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। এমন কি, তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দই হইল—কৌতূহলও কম হইল না। বিশেষত হেমনলিনী যখন কাছে নাই, তখন রমেশের দ্বারা কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় না।

পত্রবাহকটিকে সঙ্গে করিয়া যোগেন্দ্র নিজেই রমেশের সন্ধানে চলিল। দেখিল, সে একটি মুদির দোকানে একটা শূন্য কেরোসিনের বাক্স খাড়া করিয়া তাহার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে;—মুদি ব্রাহ্মণের হুঁকায় তাহাকে তামাক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু চসমা-পরা বাবুটি তামাক খায় না শুনিয়া মুদি তাহাকে সহরজাত কোনো অদ্ভুতশ্রেণীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়াছিল। সেই অবধি পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকার আলাপপরিচয়ের চেষ্টা হয় নাই।

যোগেন্দ্র সবেগে আসিয়া একবারে রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল কহিল, "তোমার সঙ্গে পারা গেল না! তুমি আপনার দ্বিধা লইয়াই গেলে! কোথায় একেবারে সোজা আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইবে, না পথের মধ্যে মুদির দোকানে গুড়ের বাতাসা ও মুড়ির চাক্তির মাঝখানে অটল হইয়া বসিয়া আছ!"

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া একটুখানি হাসিল। যোগেন্দ্র পথের মধ্যে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, কহিল—"যিনিই যাই বলুন, বিধাতাকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই! তিনি আমাকে সহরের মধ্যে মানুষ করিয়া এতবড় সাহরিক করিয়া তুলিলেন, সে কি এই ঘোর পাড়াগাঁয়ের

মধ্যে আমার জীবাত্মাটাকে একেবারে মাঠে মারিবার জন্য?”

রমেশ চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, “কেন, এ জায়গাটি ত মন্দ নয়।”

যোগেন্দ্র। অর্থাৎ?

রমেশ। অর্থাৎ নির্জ্জন—

যোগেন্দ্র। সেইজন্য আমার মত আরো একটি জনকে বাদ দিয়া এই নির্জ্জনতা আর-একটু বাড়াইবার জন্য আমি অহরহ ব্যাকুল হইয়া আছি।

রমেশ। যাই বল, মনের শান্তির পক্ষে—

যোগেন্দ্র। ও সব কথা আমাকে বলিয়ো না,—কয়দিন প্রচুর মনের শান্তি লইয়া আমার প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে! আমার সাধ্যমত এই শান্তি ভাঙিবার জন্য ত্রুটি করি নাই। ইতিমধ্যে সেক্রেটারির সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। জমিদারবাবুটিকেও আমার মেজাজের যেপ্রকার পরিচয় দিয়াছি, সহজে তিনি আমার উপরে আর হস্তক্ষেপ করিতে আসিবেন না! তিনি আমাকে দিয়া ইংরাজি খবরের কাগজে তাঁহার নকিবী করাইয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, সেটা আমি তাঁকে কিছু প্রবলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। তবু যে টিঁকিয়া আছি, সে আমার নিজগুণে নয়। আমার সঙ্গে অধিক ঘেঁষাঘেঁষি না থাকাতে এখানকার জয়েন্ট্-সাহেব আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন—জমিদারটি সেইজন্য ভয়ে আমাকে বিদায় করিতে পারিতেছেন না—যেদিন গেজেটে দেখিব, জয়েন্ট বদ্‌লি হইতেছেন, সেইদিনই বুঝিব, আমার হেডমাষ্টারিসূর্য্য বিশাইপুরের আকাশ হইতে অস্তমিত হইল। ইতিমধ্যে এখানে আমার একটিমাত্র আলাপী আছে—আমার পাঞ্চ্ কুকুরটি! আর সকলেই আমার প্রতি যেরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, তাহাকে কোনোমতেই শুভদৃষ্টি বলা চলে না।

যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া রমেশ একটা চৌকিতে বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, “না, বসা নয়। আমি জানি, প্রাতঃস্নান নামে তোমার একটা ঘোরতর কুসংস্কার আছে—সেটা সারিয়া এস। ইতিমধ্যে আর একবার গরম-জলের কাংলিটা আগুনে চড়াইয়া দিই। আতিথ্যের দোহাই দিয়া আজ দ্বিতীয়বার চা খাইয়া লইব।”

এইরূপে আহার, আলাপ ও বিশ্রামে দিন কাটিয়া গেল। রমেশ যে বিশেষ কথাটা বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল, যোগেন্দ্র সমস্তদিন তাহা কোনোমতেই বলিবার অবকাশ দিল না। সন্ধ্যার পরে আহারান্তে কেরোসিনের আলোকে দুইজনে দুই কেদারা টানিয়া-লইয়া বসিল। অদূরে শৃগাল ডাকিয়া গেল ও বাহিরে অন্ধকার-রাত্রি ঝিল্লীর শব্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

রমেশ কহিল, “যোগেন্, তুমি ত জানই, তোমাকে কি কথা বলিতে আমি এখানে আসিয়াছি। একদিন তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। আজ আর উত্তর দিবার কোনো বাধা নাই।”

এই বলিয়া রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সে

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠ কম্পিত হইল মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় সে দুইএকমিনিট চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া স্থির হইয়া শুনিল।

যখন বলা হইয়া গেল, তখন যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "এই সকল কথা যদি সেদিন বলিতে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।"

রমেশ। বিশ্বাস করাব হেতু তখনো যেটুকু ছিল, এখনো তাহাই আছে। সেজন্য তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে গ্রামে একবার তোমাকে যাইতে হইবে। তাহার পরে সেখান হইতে কমলার মাতুলালয়েও লইয়া যাইব।

যোগেন্দ্র। আমি কোনোখানে এক-পা নড়িব না—আমি এই কেদারাটার উপরে অটল হইয়া বসিয়া তোমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিব। তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করা আমার চিরকালের অভ্যাস;—জীবনে একবারমাত্র তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমার কাছে মাপ চাই।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া রমেশের সম্মুখে আসিল—রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুই বাল্যবন্ধু একবার পরস্পর কোলাকুলি করিল। রমেশ রুদ্ধ-কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "আমি কোথা হইতে ভাগ্যরচিত এমন একটা দুশ্ছেদ্য মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা দেওয়া ছাড়া আমি কোনোদিকেই কোনো উপায় দেখিতে পাই নাই। আজ যে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি, আর যে আমার কাহারো কাছে কিছুই গোপন করিবার নাই, ইহাতে আমি প্রাণ পাইয়াছি। কমলা কি জানিয়া, কি ভাবিয়া আত্মহত্যা করিল, তাহা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আর বুঝিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই—কিন্তু ইহা নিশ্চয়, মৃত্যু যদি এমন করিয়া আমাদের দুই জীবনের এই কঠিন গ্রন্থি কাটিয়া না দিত, তবে শেষ-কালে আমরা দুজনে যে কোন্ দুর্গতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতাম, তাহা মনে করিলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়। মৃত্যুর গ্রাস হইতে একদিন যে সমস্যা অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর গর্ভেই একদিন সেই সমস্যা তেম্নি অকস্মাৎ বিলীন হইয়া গেল!"

যোগেন্দ্র। কমলা যে নিশ্চয়ই আত্ম-হত্যা করিয়াছে, তাহা অসংশয়ে স্থির করিয়া বসিয়ো না। সে যাই হোক্, তোমার এদিক্‌টা ত পরিষ্কার হইয়া গেল, এখন নলিনাক্ষের কথা আমি ভাবিতেছি।

তাহার পরে যোগেন্দ্র নলিনাক্ষকে লইয়া পড়িল। কহিল, "আমি ওরকম লোকদের ভাল বুঝি না এবং যাহা বুঝি না, তাহা আমি পছন্দও করি না। কিন্তু অনেক লোকের অন্যরকম মতিই দেখি, তাহারা যাহা বোঝে না, তাহাই বেশি পছন্দ করে। তাই হেমের জন্য আমার যথেষ্ট ভয় আছে। যখন দেখিলাম, সে চা ছাড়িয়া দিয়াছে, মাছমাংসও খায় না, এমন কি, ঠাট্টা করিলে পূর্ব্বের মত তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসে না, বরং

মৃদুমন্দ হাসে, তখন বুঝিলাম, গতিক ভাল নয়। যাই হোক্, তোমাকে সহায় পাইলে তাহাকে উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তাহাও আমি নিশ্চয় জানি—অতএব প্রস্তুত হও—দুই বন্ধু মিলিয়া সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।"

রমেশ হাসিয়া কহিল—"আমি যদিও বীর-পুরুষ বলিয়া খ্যাত নই, তবু প্রস্তুত আছি!"

যোগেন্দ্র। রোস, আমার ক্রিষ্ট্‌মাসের ছুটিটা আসুক্।

রমেশ। সে ত দেরি আছে—ততক্ষণ আমি একলা অগ্রসর হই না কেন?

যোগেন্দ্র। না না, সেটি কোনোমতেই হইবে না। তোমাদের বিবাহটি আমিই ভাঙিয়াছিলাম, আমি নিজের হাতে তাহার প্রতিকার করিব। তুমি যে আগে-ভাগে গিয়া, আমার এই শুভকার্য্যটি চুরি করিবে, সে আমি ঘটিতে দিব না। ছুটির ত আর দশদিন বাকি আছে।

রমেশ। তবে ইতিমধ্যে আমি একবার—

যোগেন্দ্র। না না, সে সব আমি কিছু শুনিতে চাই না—এ দশদিন তুমি আমার এখানেই আছ! এখানে ঝগড়া করিবার যতগুলা লোক ছিল, সব আমি একটি একটি করিয়া শেষ করিয়াছি—এখন মুখের তার বদ্‌লাইবার জন্য একজন বন্ধুর প্রয়োজন হইয়াছে, এ অবস্থায় তোমাকে ছাড়িবার জো নাই। এতদিন সন্ধ্যাবেলায় কেবলি শেয়ালের ডাক শুনিয়া আসিয়াছি—এখন, এমন কি, তোমার কণ্ঠস্বরও আমার কাছে বীণাবিনিন্দিত বলিয়া মনে হইতেছে, আমার অবস্থা এতই শোচনীয়!

ক্রমশ।

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তসঙ্কলন।

আমাদের ধনীদিগের যে দেশহিতকর বিষয়ে রুচি নাই, নতুবা তাঁহাদের অবগতির জন্য আমি একটি প্রস্তাব করিতাম। সে প্রস্তাবটি এই—যেমন স্বর্গীয় জে. এন্. তাতা মহোদয় একটি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য অনেক-লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যেমন তাঁহাদ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি 'রিসার্চ স্কলার্শিপ' স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি ধনিগণ কয়েকজনে সমবেত হইয়া একটা মহৎ কার্য্য করুন। ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের জন্য তিনটি রিসার্চ স্কলার্শিপ স্থাপন করুন। প্রথমটির বৃত্তি মাসিক ৩০০৲ তিনশত টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির বৃত্তি মাসিক একশত টাকা করিয়া। এই তিন ব্যক্তি কি করিবেন? দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তির অধীন থাকিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক দেশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবেন। ইঁহাদের তিন-জনেরই সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাতে অভিজ্ঞ

এবং বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার ভাবজ্ঞ ও রসজ্ঞ লোক হওয়া চাই। ইঁহারা প্রত্যেক পাঁচবৎসর অন্তর আপনাদের গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। আশা হয়, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর এইরূপ কার্য্য করিলে ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেকপরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে।

আমরা সচরাচর এই বলিয়া দুঃখ করি যে, এদেশে বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। অলৌকিকঘটনাপূর্ণ পুরাণসকল ইতিবৃত্তের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সে সকল গ্রন্থে সত্য ও কল্পনা এরূপ প্রচুরমাত্রায় মিশ্রিত যে, সেই সকল বর্ণনাস্তূপের মধ্য হইতে সত্য উদ্ধার করা, নদীস্রোতধৌত বালুকারাশির মধ্য হইতে স্বর্ণরেণুসংগ্রহ অপেক্ষাও ক্লেশকর। এই এক মহাপ্রশ্ন পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উদিত হয়, এই প্রাচ্যদেশবাসী আর্য্যসন্তানগণ পুরাবৃত্তরচনায় বিমুখ ছিলেন কেন? যাঁহারা রামায়ণ-মহাভারতের স্থায় বৃহৎকায় গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়নে যাঁহাদের কিছুমাত্র আলস্য ছিল না, এক এক শাখাপ্রশাখাসমন্বিত দর্শনের জটিল সমস্যাসকলের মধ্যে প্রবেশের ধৈর্য্য যাঁহাদের ছিল, সেই প্রাচীন হিন্দুগণ কেন আপনাদের দেশের ইতিবৃত্তরচনায় বিমুখ ছিলেন? ইঁহাদের আচরণের সহিত পাশ্চাত্য জাতিসকলের আচরণের কি পার্থক্য লক্ষিত হয়! তৎতদ্দেশে সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বকার ঘটনাসকল কেমন যথাযথরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সে সকল বর্ণনার উপরে কেমন অসঙ্কোচে নির্ভর করিতে পারা যায়। এরূপ ইতিবৃত্তরচনাপ্রবৃত্তি কেন আমাদের দেশে লক্ষিত হয় নাই?

ইহার কারণ বোধ হয় জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইবে। ভারতবাসী আর্য্যদিগের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহা ইতিবৃত্তরচনার অনুকূল নহে। তাহা না হইলে এখানকার সাহিত্যে ইতিবৃত্ত দেখা দিতই দিত। অপর দিকে ইউরোপ-বাসীদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহা ইতিবৃত্তরচনার অনুকূল। এই প্রশ্ন হৃদয়ে লইয়া উভয় দেশের জাতীয় প্রকৃতির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, অন্তর্মুখীনতা বা ধ্যাননিষ্ঠতা ভারতীয়দিগের জাতীয় প্রকৃতি। বাহ্যবস্তুর প্রতি অনাস্থা আমাদের প্রকৃতি ও শিক্ষাগত সংস্কার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎপরে এখানে অতি প্রাচীনতম কাল হইতে অনাসক্তিধর্ম্মের প্রচার হইয়া আসিতেছে। এখানকার জ্ঞানিগণ ও ধর্ম্মার্থিগণ চিরদিন বাহিরের জগৎকে ভুলিয়া ভিতরেই শ্রেয়ের পথ অন্বেষণ করিয়াছেন। আমাদের অস্থিমজ্জাতে এই কথা আছে যে, জ্ঞানরাজ্যই সত্য রাজ্য, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, বহির্বিষয় ক্ষণিক ছায়ামাত্র। এই-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ স্বভাবত বহির্জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। জগতের ধনধান্য কে কি পরিমাণে অধিকার করিল? হিন্দু রাজা কি যবননরপতি কে রাজসিংহাসনে বসিলেন, তাহাতে কি আসে যায়? জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা কে কাড়িয়া লইতে পারে? এবং তাহা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ অন্য বিষয় থাকিল কি না থাকিল, তাহাতে কি?—

ইঁহাদের এইপ্রকার ভাব,—আমাদের দেশে প্রজাদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল। প্রাচীন গ্রীকৃজ্ঞানী ডাইওজিনিসের বিষয়ে এরূপ উক্ত আছে যে, দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্‌জাণ্ডার যখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, তখন দেখিলেন যে, সুধীবর একটি টবে বসিয়া রোদ পোহাইতেছেন। আলেক্‌জাণ্ডার সদলে গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; জ্ঞানী পুরুষের সেদিকে দৃষ্টিই নাই। অবশেষে আলেক্‌জাণ্ডার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপে আপনার সাহায্য করিতে পারি? আমি কি করিলে আপনি প্রীত হন?" উত্তর "রোদের আড়াল না করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেই সুখী হই।" আমাদের নবদ্বীপের বুনো রামনাথের বিষয়েও এরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। বুনো রামনাথ বনে বৃক্ষতলে বসিয়া শিষ্যদিগকে পড়াইতেন; তাঁহার সামান্য কুটীরে তাহাদের জন্য স্থানসমাবেশ হইত না। একবার নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকারোহণে নবদ্বীপপথে যাইতে যাইতে, রামনাথের পাণ্ডিত্যখ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, পণ্ডিতবর পাঠনাকার্য্যে নিমগ্ন। তাঁহার অর্থসাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু অনুপপত্তি আছে?" পণ্ডিত বুঝিলেন—ন্যায়ের অনুপপত্তির কথা বলিতেছেন। উত্তর—"কিছুই অনুপপত্তি নাই।" তৎপরে প্রশ্ন—"অভাব আছে?"—আবার ন্যায়ের অভাব আসিল। শেষে রাজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংসার চলে কিরূপে?" পণ্ডিতবর নিকটস্থ তেঁতুলবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন —"গৃহিণী ঐ তেঁতুলপাতার বেশ ঝোল করেন, আমাদের সুখেই আহার চলে।" ভারতীয় সুধীগণের, বিষয়ে এইপ্রকার অনাস্থার ভাব ছিল। Plain living and high thinking ইহা যদি কোনও দেশে কখনও কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই ভারতবর্ষে।

সে যাহা হউক, যেজন্য এত কথার অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই যে, বাহ্যবস্তুর প্রতি অনাস্থা আমাদের অস্থিমাংসে প্রবিষ্ট হইয়া থাকাতে আমরা ইতিবৃত্তরচনায় মনোনিবেশ করি নাই, অর্থাৎ আমরা ধ্যানদ্বারা পরমার্থতত্ত্ব অধিগত করিবার চেষ্টা করিয়াছি; সাধনদ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নপর হইয়াছি; আত্মানাত্মবিবেকে নিমগ্ন হইয়া লৌকিক সুখদুঃখ ভুলিয়াছি; কে কবে জন্মিল, কে কবে মরিল, কোন্ রাজা সিংহাসনে বসিল, কোন্ যুদ্ধে কোন্ রাজা হারিল বা জিতিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় হয় নাই, আবশ্যকতাও বোধ করি নাই।

বোধ হয় ইহারও পশ্চাতে আর এক কারণ বিদ্যমান, তাহা এদেশের জলবায়ুর সাম্যাবস্থা। প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ এখানে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয় না। একজন যোগী অনাবৃতদেহে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে পারেন; আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। সুতরাং তিনি অবাধে বহির্জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া আত্মচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। এইরূপেই বোধ হয়

আমাদের বহির্জগতের প্রতি ঔদাসীন্য আসিয়াছে।

প্রতীচ্যদেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কারণ বিদ্যমান। সেখানে প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। একটু অসাবধান হইলেই শাস্তিভোগ করিতে হয়। বাটীর বাহির হইতে গেলেই দেহের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ রাখিতে হয়, নতুবা গুরুতর শাস্তি আসিয়া পড়ে। এই কারণে সে সকল দেশের লোকের পরিদর্শনবৃত্তি (faculty of observation) স্বতই প্রস্ফুটিত হয়। তাহা হইতেই তাহাদের ইতিবৃত্তরচনার অভ্যাস। এই কারণেই দেখি, সে সকল দেশের অধিকাংশ লোকের দৈনিকলিপি (Diary) রাখিবার অভ্যাস। সর্ব্বদাই সংবাদপত্রে শুনিতে পাই, অমুকের অপঘাতমৃত্যু ঘটিয়াছে; মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, পকেটে তাহার দৈনিকলিপি রহিয়াছে, তাহাতে এই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে, ইত্যাদি। John Morley মহামতি Gladstoneএর জীবনচরিত লিখিয়াছেন,-- তাহার কত পৃষ্ঠা গ্লাড্ষ্টোনের দৈনিকলিপিদ্বারা পরিপূরিত! গ্লাড্ষ্টোন্ হইতে সামান্য শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকলকেই দৈনিকলিপি রাখিতে হইবে! অতএব দেখিতেছি, ইতিবৃত্তরচনা ঐ সকল দেশের জাতীয় বাতিকের মধ্যে।

সে সকল দেশের সাধারণ মানুষের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদের পরিদর্শনবৃত্তি (faculty of observation) দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় একজন ভারতবর্ষীয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইত না, তাহাও তাহারা উল্লেখ করিতেছে; ঘটনাবিশেষের দিন-তারিখ, প্রকার-প্রণালী আনুপূর্ব্বিক যথাযথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, ইউরোপীয় জাতিসকলের ইতিবৃত্তপ্রিয়তা সেমিটিক্‌ধর্ম্মের প্রভাবজাত। য়িহুদীজাতি সেমিটিক্‌জাতি এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম য়িহুদীজাতি হইতে উৎপন্ন। য়িহুদীধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মই ইতিবৃত্তমূলক। জগতের বিভিন্ন জাতি ধর্ম্মভাবকে বিভিন্নভাবে সাধন করিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণ ঈশ্বরকে অন্তরাত্মার পরমাত্মারূপে দর্শন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের সাধন অন্তর্মুখীন, ধ্যানপ্রধান, ভাব ও তন্ময়তাময় হইয়াছে। গ্রীকগণ ঈশ্বরকে সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের মধ্যে শিল্প, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের শত শত ভাব ফুটিয়াছে। য়িহুদীগণ ঈশ্বরকে ইতিবৃত্তের মধ্যে, মানবজগতের উত্থানপতনের মধ্যে বিধাতারূপে দেখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের ধর্ম্মে ও তজ্জাত খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তা এবং নীতির রক্ষকরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। পাশ্চাত্যধর্ম্ম যে ভাবে ও যতদূর ইতিবৃত্তকে ধর্ম্মের সহিত জড়িত করিয়াছে, তাহা ভারতীয় আর্য্যদিগের চক্ষে অজ্ঞজনোচিত বলিয়া গৃহীত হয়। এদেশে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা ও গভীরতাই তাহার প্রধান লক্ষণ। এই দ্বিতীয়শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মতে ধর্ম্মের এই ইতিবৃত্তমূলকতা হইতেই পাশ্চাত্যদেশসকলের ইতিবৃত্তপ্রিয়তা উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা এ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া এ কথা সকলে স্বীকার করি যে, পাশ্চাত্যরাজ্যে ইতিবৃত্ত রাখিবার যে প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে, আমাদের এই প্রাচ্যদেশে সে প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে কি আমরা এদেশে ইতিবৃত্তসঙ্কলনবিষয়ে একেবারে নিরাশ হইব? তাহা কেন? দেশের আসল ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের অনেক উপাদান আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে। আসল ইতিবৃত্ত এইজন্য বলিতেছি যে, সচরাচর জগতে ইতিবৃত্তনামে যাহা পরিচিত, তাহার মধ্যে অল্পই আসল ইতিবৃত্ত আছে। অদ্য পর্য্যন্ত ইতিবৃত্তনামে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ রাজাদের উত্থান ও পতন, জাতিদ্বয়ের বিদ্রোহ বা অন্তর্বিপ্লব প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। তাহাদের অধিকাংশ পাঠ করিলে মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গূঢ় নিয়মসকল ধরিতে পারা যায় না। অথচ যে ইতিবৃত্ত সেই সকল গূঢ়তত্ত্বের আভাস না দেয়, তাহা প্রকৃত ইতিবৃত্তের কাজ করে না। যেমন কোন বেগবতী স্রোতস্বতীর বক্ষে কখনও বা সিকতাময় পুলিন প্রকাশ পায়, কখনও বা আবার গ্রামজনপদ প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যায়,—এই যে ভাঙা ও গড়া, ইহা কোন আকস্মিক কারণে ঘটে না, জলরাশির গতি অতি সূক্ষ্ম অথচ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মসকলের অধীন; তেমনি মানবসমাজের উত্থান ও পতন, জাতি-সকলের গতি ও কার্য্য, এ সকলও অলক্ষিত অথচ অবিশ্রান্ত কার্য্যকারী নিয়মসকলের অধীন। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিবর্ত্তনের ন্যায় মানবের সামাজিক জীবনেও বিবর্ত্তন চলিতেছে। যে ইতিবৃত্ত সেই বিবর্ত্তন-ক্রিয়ার গতি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা empericism, কিন্তু science নহে; অর্থাৎ দাগরাজিমাত্র, গাঁথুনি নহে।

বর্ত্তমান সময়ে অগষ্ট কমট্, হার্বার্ট স্পেন্সার, বকল্ প্রভৃতি ইতিবৃত্তকে দাগরাজি হইতে তুলিয়া গাঁথুনিতে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং আরও অনেক প্রতিভাশালী লেখক তাঁহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া ইতিবৃত্ত হইতে সমাজতত্ত্ব গাঁথিয়া তুলিতেছেন।

এই ত গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে ইতিবৃত্ত সমাজের বাহিরের জীবনে আবদ্ধ, সামাজিক জীবনের ভিতরের কথা আমাদের গোচর করে না, তাহা কি প্রকৃত ইতিবৃত্ত? দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, আমরা এক্ষণে প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি,—জাপানবাসিগণ রুশিয়ান্‌দিগের উপরে জয়লাভ করিতেছে। যদি কেবল এই সকল যুদ্ধের তারিখ ও যুদ্ধের বিবরণ এবং হতাহতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহাই কি জাপানের ইতিবৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে? তাহা পাইয়াই কি আমাদের মন পরিতৃপ্ত হইবে? কখনই না। কোন্ শক্তিতে জাপান এত অল্পকালের মধ্যে এত পৌরুষ লাভ করিল? কি কি সামাজিক কারণের সমাবেশ হইয়া এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল? কোন্ কোন্ ভাব, কোন্ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নরনারীর মনে কার্য্য করিতেছে? তাহাদের শিক্ষার প্রণালী কি? রাজনীতির প্রকার কি? সামাজিক

বিধিব্যবস্থা কি? এ সকল জানিবার জন্য কি আমাদের মন ব্যগ্র হয় না? যাহাতে সেই ভিতরকার জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে, তাহাই প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বরং এ কথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না যে, বাহিরের জীবনের ঘটনাগুলি না বলিয়া যদি ভিতরের জীবনের বিষয়গুলি বলে, তাহা হইলে যেন প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলা হয়।

এখন আবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। ভারতবর্ষের যে ইতিবৃত্ত নাই, আমরা বলি, সে ঐ বাহিরের ইতিবৃত্ত। ভিতরের ইতিবৃত্ত স্তরে স্তরে গাঁথা রহিয়াছে। এখনও দেশের নানাস্থানে প্রস্তরফলকে, তাম্রশাসনে, বিলুপ্ত নগরসকলের ভগ্নাবশেষে ইতিবৃত্তের অনেক ঘটনা নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণার দ্বারা প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক কথা আবিষ্কার করিতেছেন। দগ্ধ, ভগ্ন, উৎসন্ন সারনাথতীর্থের সন্নিধানে কাশীর বিশ্বেশ্বরের তীর্থ, বুদ্ধগয়ার সন্নিকটে বিষ্ণুপদ, বহুসংখ্যক বৌদ্ধকীর্ত্তির মধ্যে জগন্নাথের শ্রীমন্দির, এ সকলে কি প্রকাশ করিতেছে? ইহাতে কি এই প্রকাশ করিতেছে না যে, এদেশে এমন যুগ আসিয়াছিল, যখন পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলোপ করিয়া হিন্দুকীর্ত্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রধান হিন্দুতীর্থগুলি আর কিছুই নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের উপরে হিন্দুধর্ম্মের জয়ঘোষণা মাত্র। আবার সেই কাশীতেই হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়া তৎস্থানে মুসলমানমসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান। ইহাতে কি ইতিবৃত্তের কোনও ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে না?

এই যেমন একপ্রকারে ইতিবৃত্ত স্তরে স্তরে গাঁথা রহিয়াছে, তেমনি অপরদিকে প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন ইতিবৃত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাই উদ্ধার করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত রিসার্চ স্কলার্শিপের প্রস্তাব করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তি অতি প্রাচীনতম বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য-নাটকাদি সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া প্রাচীন সামাজিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়-সকল সংগ্রহ করিবেন; এবং প্রত্যেক পাঁচ-বৎসর পরে আপনাদের গবেষণার ফল সঙ্কলিত আকারে সাধারণের গোচর করিবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও অপরাপর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসকলও পাঠ করিতে হইবে।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত কিপ্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিতেছি। আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ নহি; এরূপ কোন প্রশ্ন লইয়া প্রাচীন সাহিত্য কখনও পাঠ করি নাই। যাঁহারা এইপ্রকার গবেষণায় এক্ষণে প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা আমি লইতে ইচ্ছুক নহি। আমি এসম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা দিঙ্‌মাত্রপ্রদর্শন বলিয়া জানিবেন; অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক পথ দেখাইয়া দেওয়া মাত্র,—যে পথে অগ্রসর হইলে যোগ্যতর ব্যক্তিরা প্রচুর ফললাভ করিতে পারেন।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, প্রাচীন-ইতিবৃত্ত-সংগ্রহার্থ বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি কিছুই বাদ দেওয়া হইবে না। প্রথম বেদ,—আমি বেদমন্ত্রসকলের বিস্তৃত

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি না, তবে এ কথা সকলেই জানেন যে, বেদমন্ত্রসকল যদিও দেবতাবিশেষের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল, তথাপি তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গবেষণার চক্ষে বিচার করিলে আদিম আর্য্যসমাজের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সেই সকল বিষয়কে একত্র সম্বদ্ধ করিলে প্রাচীন সমাজের ভিতরকার অবস্থা অনেকপরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। তবে বেদমন্ত্রসম্বন্ধে এই একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদিগকে কোন এক বিশেষ যুগের লিখিত মনে করা যাইতে পারে না। তাহাতে অতি প্রাচীনতম কালের রচিত মন্ত্র আছে, আবার অপেক্ষাকৃত অধুনাতন সময়ের মন্ত্রও আছে। অর্থাৎ ঐ মন্ত্রসকলের সঙ্কলনকর্ত্তা সংগ্রহ করিবার সময় রচনাকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সঙ্কলন করেন নাই; কেবলমাত্র উপাস্যদেবতা ও মন্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়াছেন। তাহা হইলেও ভাষার তারতম্য ও ছন্দের রীতির বিভিন্নতা প্রভৃতির দ্বারা মন্ত্রসকলের কালের বিষয়েও কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, বেদমন্ত্রসকলের আলোচনাদ্বারা পুরাতত্ত্ববিদ্গণ অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সে সমুদয়ের এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীনতম বেদ যে ঋগ্বেদ, তাহার মন্ত্রসকলের আলোচনাদ্বারা আমরা জানিতেছি যে, যে কালে এই সকল মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, সে কালে ভারতীয় আর্য্যসমাজে বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা, ধনার্জ্জন ও ধনের সুদ্গ্রহণ, যানবাহনাদির ব্যবহার, সমৃদ্ধিশালী নগরসকল স্থাপন ও বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি নাগরিক পাপের শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি সভ্যতার সকল লক্ষণ ফুটিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি, এতটা জানিতে পারিলে কি সামাজিক ইতিবৃত্তের অনেকটা জানা হইল না? এইরূপে বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনার দ্বারাও অনেক সমাজতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে।

এমন কি, কাব্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া অনুসন্ধান করিলেও অনেক সামাজিক তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। তাহারও দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাকবি কালিদাসের কালকে অবলম্বন করা যাউক। কিন্তু কালিদাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন?—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই। এতদ্দেশে পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইরূপ একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কালিদাস উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভাতে নবরত্নের মধ্যে এক রত্ন ছিলেন। উক্ত নবরত্ন এই—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ ও মিহির। যাঁহার নামে সংবৎ প্রচলিত, সেই বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৭বৎসরে মালবরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কালিদাস তাঁহার রাজ্যকালে রাজসভার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, কি বিক্রমাদিত্যনামধেয় অপর কোন রাজার রাজসভাতে ছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। কালিদাসের প্রাদুর্ভাবকালের বিষয়ে একটু চিন্তা করিবার কথা এইমাত্র আছে যে, পুরাতত্ত্ববিৎ কিল্হরন্

(Kielhorn) খ্রীষ্টীয় ৪৭২ সালে খোদিত কুমারগুপ্তনরপতির এক অনুশাসনপত্র হইতে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, কালিদাস তৎপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। কারণ ঐ অনুশাসনপত্রে ঋতুসংহারের একটি শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক আছে। তদ্ভিন্ন বুদ্ধগয়ার মহাশমনামক খোদিত পত্রে রঘুবংশের একটি শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক আছে। ইহা যে খুব প্রত্যয়জনক প্রমাণ হইল, তাহা নহে। পরে দেখা যাইবে যে, যে কালে বৌদ্ধধর্ম্মের ম্লানতা হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কালিদাস সেই কালের মানুষ। তাহাও এই পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ঘটিয়াছিল।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' হইতে দেখাইতে যাইতেছি যে, এরূপ অনুমানের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি আছে। পাঠক ভুলিবেন না, এ সকল দিঙ্মাত্রপ্রদর্শন মাত্র।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এর প্রারম্ভেই দেখিতেছি, কবি শিবের আরাধনাপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় তিনচারি শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ম্লানতা হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের এই ম্লানতার সমুদয় কারণ এখনও অবগত হওয়া যায় নাই। কিন্তু এই কালের যে সকল বৌদ্ধ খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বকার পালিভাষার পরিবর্ত্তে আবার সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে অবজ্ঞা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে আবার সমাদর প্রদর্শন করা হইতেছে। অপরদিকে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে যে, এই কালের মধ্যে কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল নরপতি উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রাতে শিব ও শিবের বৃষ অঙ্কিত করিয়াছেন। শক, জাঠ, হুন প্রভৃতি জাতিসকল খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ঐ অব্দের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমপ্রদেশে রাজ্য করিয়াছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ইহাদেরই বংশধরগণ বিস্তৃত হইয়া পঞ্জাব, দিল্লী, কান্যকুব্জ, রাজপুতানা, মালব প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত মুদ্রার পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সিন্ধুর পশ্চিমপারবর্ত্তী জাতিসকলের রাজগণ অগ্নি-উপাসনার সহিত শিবপূজাও অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং নিজ নিজ মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই– শক, জাঠ, হুন প্রভৃতি জাতিগণ প্রকারান্তরিত শিবপূজা কি তাহাদের আদিভূমি সাইথিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আনিয়াছিল, অথবা ভারতবাসীদের সংস্পর্শ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল? এ বিচার পরিত্যাগ করিয়াও এ কথা অবাধে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-শতাব্দীর মধ্যে এদেশে হিন্দুধর্ম্মের যে পুনরভ্যুদয় হয়, শিবারাধনা তাহার প্রধান অঙ্গ ছিল, এবং কান্যকুব্জ, দিল্লী, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের রাজগণ ঐ পুনরভ্যুদিত হিন্দুধর্ম্মের ও তৎসম্বন্ধ শিবারাধনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমন কি, এরূপ অনুমান করা যায় যে, এই সকল প্রদেশের রাজগণ

সৈন্যদল প্রেরণপূর্ব্বক পূর্ব্বভাগস্থ দেশসকলে বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলোপ ও হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কালিদাস নিশ্চয় এই শিবারাধনার প্রবল প্রচারের সময় অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কালসম্বন্ধে পূর্ব্বকার অনুমানকে সমর্থন করিতেছে।

এই ত গেল শিবারাধনার সাক্ষ্য। তৎপরে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এর অপরাংশে অগ্রসর হওয়া যাক্। তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ পাইয়াছি শিবারাধনা; একটু অগ্রসর হইয়াই আর একটি লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। সেটি নৈবেদ্যাদি লইয়া তীর্থে গিয়া দেবমন্দিরে ধরণা দেওয়া।

মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্ত যখন কণ্বঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তখন কুলপতি কণ্বের শিষ্যদ্বয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কণ্ব আশ্রমে আছেন কি না ?" তদুত্তরে শিষ্য বলিলেন—"তিনি স্বীয় কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার দিয়া শকুন্তলার বিঘ্নকারী দৈবের প্রশমন-উদ্দেশে সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন।" শকুন্তলার কি বিঘ্ন, তাহা কবি খুলিয়া বলিতেছেন না। বোধ হয়, বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, যৌবন পূর্ণ হইতে চলিল, তথাপি অনুরূপ বর জুটিতেছে না, এই বিঘ্ন। এই বিঘ্ন দৈবের প্রতিকূলতাবশত উৎপন্ন হইতেছে; এবং সেই দৈবের প্রসন্নতাপাদনের জন্য সোমতীর্থে গিয়া ধরণা দেওয়া আবশ্যক। এ সোমতীর্থ বোধ হয় দ্বারকাপুরীস্থ সোমনাথতীর্থ হইবে। এই সকল উক্তিতে আমাদের চক্ষের সমক্ষে তৎকালপ্রচলিত যে ধর্ম্মের ছবি আনয়ন করিতেছে, তাহা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞাদির ছবি নহে, কিন্তু এখনকার লৌকিক ধর্ম্মের অনুরূপ একটি ছবি। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, আমরা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে যে আকারে দেখিতেছি, সে আকার ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালে তাহাতে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

আর একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ছবি আরও উজ্জ্বল হয়। দুষ্মন্তের জননী মৃগয়াবিহারী পুত্রের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, বিশেষ দিনে তাঁর উপবাসব্রতের পারণার দিন; তাঁহার ইচ্ছা যে, সেদিন পুত্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকেন। দুষ্মন্তের পক্ষে ইহা শাপে বর হইল। তিনি নিজে না গিয়া জননীদের পুত্রস্থানীয় বিদূষককে পাঠাইলেন; তিনি নিরুদ্বেগে শকুন্তলার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার সুবিধা পাইলেন।

এই যে উপবাসব্রত ও তাহার পারণা, ইহাও বর্ত্তমানপ্রচলিত ধর্ম্মকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এখনও হিন্দুমহিলাগণ ব্রত-উপবাস প্রভৃতি করিতেছেন।

তৎপরে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী তপস্বী কণ্বের তপস্যাবলদ্বারাও শকুন্তলার বিঘ্ন দূর হইল না, তাঁহাকে দৈব প্রসন্ন করিবার জন্য সোমতীর্থে যাইতে হইল। কবির এ কথাটা মনে লাগে নাই, তাহাতেই প্রমাণ যে, দৈবের প্রতিকূলতানিবারণের জন্য তীর্থাদিতে ধরণা দিতে যাওয়া, তখন সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে এত প্রচলিত ছিল যে,

কবি কণ্বের আশ্রমে অনুপস্থিতির এই কারণটাকে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য কারণ মনে করিয়াছিলেন।

যাক্, তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মের ছবি ত এই। দেখা যাউক, সে সময়কার সামাজিক অবস্থার আর কি কি তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। শকুন্তলার বিঘ্নকারী দৈবের প্রশমনের জন্ত কণ্ব সোমতীর্থে গিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রশ্ন করিয়াছি, সেটা কি বিঘ্ন? অনুমান করিয়াছি যে, শকুন্তলা যৌবনসীমায় উপনীত হইয়াছেন, তথাপি অনুরূপ বর জুটিতেছে না, এই বিঘ্ন। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে, কবির বিবেচনায় কন্যার যৌবনপ্রাপ্তি হইয়াও বিবাহ না হওয়া এমন একটা দুঃখের কারণ যে, সেজন্য বিঘ্ন-কারী দৈবের আরোপ করিতে হয়। ইহাতেই প্রমাণ, কালিদাস যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন, সে সময়ে হিন্দুসমাজমধ্যে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। আর এক ঘটনাদ্বারা ইহা সমর্থিত হইতেছে। দুষ্মন্ত যখন আশ্রমে গিয়া ঋষিকন্যাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন শকুন্তলার বিষয়ে অপর সখীদ্বয়কে এই প্রশ্ন করিলেন— "ইনি কি চিরকৌমার্য্য ধারণ করিয়া ব্রত-পরায়ণা থাকিবেন, অথবা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্রত ধারণ করিবেন?"—অর্থাৎ রাজার মনের ভাব এই -"ইনি যে এতদিন অবিবাহিতা আছেন, তাহার কারণ কি? ইঁহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে কি না?" সখী উত্তর করিলেন, "মহাশয়, ধর্ম্মাচরণ-বিষয়েও ইঁহার স্বাধীনতা নাই; পিতার ইচ্ছা, ইঁহাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করা।" অর্থাৎ "এতদিন যে ইঁহার বিবাহ হয় নাই, তাহার উপরে ইঁহার হাত নাই, ধর্ম্মাচরণেও যখন ইঁহার স্বাধীনতা নাই, বিবাহবিষয়ে কি স্বাধীনতা থাকিবে? পিতার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে, অনুরূপ বর জুটিলেই বিবাহ হইবে।"

এই উক্তিপ্রত্যুক্তির ভিতরে প্রবেশ করিলেও অনুভব করা যায় যে, নিশ্চয় সে সময়ে সমাজমধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, নতুবা বেচারি শকুন্তলার অবিবাহিতাবস্থা লইয়া এত কৈফিয়ৎতলব ও পক্ষসমর্থন চলিবে কেন?

ইহার পরেই আমরা আর একটি বিষয় দেখিতে পাইতেছি। কণ্বশিষ্য যখন সংবাদ দিলেন যে, কুলপতি আশ্রমে নাই, তিনি স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার দিয়া সোমতীর্থে গিয়াছেন, তখনি রাজা বলিলেন—"আচ্ছা, তাঁর সঙ্গেই দেখা করি?" এইটি একটু চিন্তা করিবার উপযুক্ত কথা। রাজা কিরূপে হঠাৎ একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন? ইহা-তেই প্রমাণ, তখন নারীগণ অসঙ্কোচে পুরুষ-দিগের সহিত মিশিতে পারিতেন। সে বিষয়ে বাধা ছিল না। থাকিলে কবি রাজার মুখে আর এক উক্তি দিতেন; তাহা হইলে রাজা কণ্বশিষ্যকে বলিতেন,—"আচ্ছা, তবে আপনারা কুলপতিকে জানাইবেন যে, আমি আশ্রমের কুশল জানিতে আসিয়াছিলাম।" তৎপরে ঋষিকন্যারা রাজার সহিত প্রথম দর্শনের দিনেও একান্তে নিরুদ্বেগে বসিয়া যেরূপ সকল কথা ভাঙিয়া বলিতেছেন, তাহাও কিছু আশ্চর্য্য। কেহ হয় ত বলিবেন,

তাঁহারা ঋষিকন্যা,—বনবাসিনী, তাঁহারা ভদ্র-সমাজের রীতি কি জানেন? অরণ্যচারী জনের অকপট সরলতা দেখাইবার জন্যই কবি এরূপ করিয়াছেন, এইখানেই ত কবির প্রতিভার বাহাদুরী। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কিন্তু এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে, কুলপতি কণ্বের শিক্ষার অধীনে থাকিয়াও তাঁহারা নারীধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞা ছিলেন। আগন্তুক পুরুষের সহিত কথা কহা যদি তৎকালে নারীধর্ম্মবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে কবি তাঁহাদের লাজুকতারক্ষার জন্য হয় ত আর একটু ঘুরাইয়া আবরণ দিয়া ও তাহা ভেদ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজসমীপে উপনীত করিতেন।

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে সে দেশে সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে নারীর অবরোধ ছিল না। অথচ রাজ-অবরোধের উল্লেখ দেখা যাইতেছে, এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চম অঙ্কে যেখানে শকুন্তলা শার্ঙ্গরব ও গোতমীর সহিত দুষ্মন্তের সদনে উপস্থিত হইতেছেন, তখন অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া যাইতেছেন। এই সকলের একত্র যোগ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক নয় যে, সে সময়ে সাধারণ প্রজা-কুলের মধ্যে নারীর অবরোধ ছিল না, নারী-গণ অসঙ্কোচে পুরুষদিগের সহিত মিশিতেন; কিন্তু কোন প্রকাশ্যস্থানে যাইতে হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে অবগুণ্ঠনের দ্বারা আবৃত করিতেন। কিন্তু ধনিগৃহের নারীদের এ স্বাধীনতা ছিল না, সেখানে বহুবিবাহ ও নারীর অবরোধ, দু-ই বিরাজমান ছিল। ইহা মধ্যভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রথার কেমন অনু-রূপ! ইহাতেই বোধ হয়, কালিদাসের উজ্জ-য়িনীর রাজসভার পারিষদ বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সত্য থাকিতে পারে।

নারীকুলের অবস্থাসূচক আরও কোন কোন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম—তৃতীয় অঙ্কে দেখিতেছি, বিরহকাতরা শকু-ন্তলা সখীদের পরামর্শে দুষ্মন্তকে প্রণয়পত্রী লিখিতে বসিতেছেন। ইহা কিছু নূতন নহে, আরও অনেক নাটকে নায়িকাদের প্রণয়-লিপির উল্লেখ আছে। ইহাতেই প্রমাণ, সে সময়ে ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের অনেকে লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। এখনও গুজরাটদেশে ও দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে লিখিবার ও পড়িবার রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের অনেকে পিতা বা শ্বশুর প্রভৃতির নিকট শাস্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞা রমণীও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ইংরাজিশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ইহা তাঁহা-দের দেশের চিরন্তন প্রথা। কালিদাসের উক্তিতেও তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

ইহার উপরে তখন সম্ভ্রান্তগৃহের রমণী-গণ সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সুকুমার কলাতে শিক্ষিতা হইতেন। তাহার প্রমাণ, পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে দেখিতেছি, রাজা ও বিদূষক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি আসিতে লাগিল। তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন যে, রাণী হংসপদিকা বর্ণ-পরিচয় করিতেছেন, অর্থাৎ সারেগামা সাধিতেছেন। রাণী এরূপ উচ্চস্বরে গাহিতে-ছেন যে, বাহির হইতে তাহা শোনা যাইতেছে!

ইহা রীতিবিরুদ্ধ হইলে কবি কখনই ইহা এরূপে সন্নিবেশিত করিতেন না।

তবে ত কালিদাসের কালের অনেক সামাজিক কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। প্রবন্ধটি বাড়িয়া চলিল; অতএব আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই অদ্যকার মত উপসংহার করিতেছি। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এইরূপ সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল। অবশিষ্ট বিষয়টি এই, ষষ্ঠ অঙ্কে যেখানে দুষ্মন্ত ধীবরের হস্তে অঙ্গুরীয়কটি পাইলেন, সেখানে দেখিতেছি যে, ধীবরকে পারিতোষিকস্বরূপ অর্থ দিবামাত্র তাহার একজন বন্ধু প্রস্তাব করিতেছে—"চল ভাই, শুঁড়ির দোকানে যাই।" অথচ রাজার নানা অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, রাজসভার বর্ণনা রহিয়াছে, রাজপারিষদদিগের উল্লেখ রহিয়াছে, আমোদপ্রমোদের বর্ণনা রহিয়াছে, কোথাও সুরাপানের উল্লেখ নাই। ইহাতে এরূপ নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক নহে যে, কালিদাসের কালে সুরাপান কেবল নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সম্ভ্রান্তসমাজে ছিল না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এ প্রকার আমোদকে ঘৃণা করিতেন। ইহাও বর্ত্তমান সময়ের সভ্যদেশসকলের প্রথার অনুরূপ।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

লক্ষ্মী-সরস্বতী।

অয়ি লক্ষ্মি! নিশারূপে ধীরে ধীরে আপনা বিকাশি'
উন্মুক্ত করিয়া রাখ অপরূপ তব রূপরাশি।
গগন কুন্তলে তব তারকা জ্বলুক্ অগণন
শ্যামারণ্য-শাটীমাঝে খদ্যোতিকা দীপুক্ শোভন।
কৌমুদী-কন্দলী-নিভ-হস্তে শশী হৈম পদ্মফুল
বিশ্ব-হৃদি-কোকনদে রাখ লক্ষ্মি! চরণ রাতুল।
স্মিত-বিকশিত স্তব্ধ বিশ্ব তব করুক্ আরতি
রহুক্ জাগিয়া তব পূজামন্ত্রে প্রেমের ভারতী।

এ নিশা-লক্ষ্মীর পার্শ্বে দিবারূপে তুমি সরস্বতি!
বিকচ-প্রোচ্ছল তূর্ণ প্রকটিয়া তব পূর্ণজ্যোতি
এস মূর্ত্তিমতি এস! রবিদীপ্ত তব দিব্যভাল
ফুটাক্ নী-রব হতে রবাকীর্ণ বিশ্ব সুবিশাল।
রণঝনি' কর্ম্মতন্ত্রী তীব্র-কর-অঙ্গুলি-তাড়নে
মঞ্জুল গুঞ্জনে তব বিশ্ববীণা বাজুক্ সঘনে।
শুভ্র জ্ঞান-শতপত্র নিখিলহৃদয়ে হর্ষভরে
তব পদস্পর্শেস্পর্শে স্ফুটিত হউক থরে থরে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে।

দুই ঘটিকার সময় ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের দেওয়ানের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন: আমার যাত্রাপথের ধারে, 'নৈজেতাবারে'-নামক একটি গ্রামে, আমার ব্যবহারের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুত থাকিবে। সেখানে যাইতে হইলে, এখান হইতে ১১টা রাত্রে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু আমি এখনি ছাড়িব বলিয়া স্থির করিলাম। আজ রাত্রেই সেইখানে গিয়া পৌঁছিব। সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার পর যাত্রা করা এবং প্রভাত পর্য্যন্ত গাড়িতেই নিদ্রা যাওয়া—ইহাই এখানকার প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না।

আমি যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। এই সময়ে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ। পান্থশালার অধ্যক্ষ আমাকে দুই হাতে সেলাম করিতে লাগিল। নীরব যাচ্ঞা মুখে প্রকটিত করিয়া, তাম্রবর্ণ ভৃত্যবর্গ আমার গাড়ির সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। উহাদের মধ্যে একটি নগ্নপ্রায় দরিদ্র বৃদ্ধা ছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত পান্থশালাতেই, স্নানাগারের জলাধারে জল ভরিয়া রাখাই ইহাদের কাজ। ত্রিবঙ্কুরের রৌপ্যমুদ্রা, আজ এই সর্ব্বপ্রথম, এই সব লোকদিগকে আমি নিজহাতে বিতরণ করিলাম। এই ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি, মোটা-মোটা ঝক্‌ঝকে গুটিকার মত। আমাদের বলদেরা, এই অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে, দুল্‌কি-চালে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে, অপেক্ষাকৃত শাখাপল্লববহুল প্রদেশে—এমন কি, স্বকীয় উদ্ভিজ্জপ্রাচুর্য্যে সিংহলেরও সমকক্ষ—এরূপ একটি প্রদেশে উপনীত হইলাম। এই জঙ্গলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উচ্চ তালবৃক্ষের কাণ্ডগুলি গতকল্য পাংশু ও শুষ্ক দেখিয়াছিলাম, আজ দেখি, এখানে প্রচুর পত্রভূষণে সুশোভিত। বড় বড় হরিৎশ্যামল শাখাপক্ষ বিস্তার করিয়া, নারিকেল-তরুপুঞ্জ আবার আবির্ভূত হইয়াছে। ভূতল পর্য্যন্ত শিকড়কুন্তল বিস্তার করিয়া, মার্গপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষগুলি আমাদের মাথার উপর ছত্রাকারে প্রসারিত। দেখিলে মনে হয়, এই প্রদেশটিতে তরুসমাচ্ছন্ন বিজনতা ও দুর্ভেদ্য জটিল অরণ্য ভিন্ন বুঝি আর কিছুই নাই। কিন্তু এখন এই ছায়াময় পথে অনেক লোকজন দেখা যাইতেছে। আমাদেরই মত, গরুর গাড়ি চড়িয়া কতকগুলি লোক যাইতেছে। গরুর পাল লইয়া রাখাল এবং দ্রব্যসামগ্রীভরা চুপ্‌ড়ি মাথায় করিয়া অগণ্য স্ত্রীলোক সারি-সারি চলিয়াছে।

ইতস্তত একএকটি ছোট প্রস্তরমন্দির;—বহু পুরাতন—খিলান চ্যাপ্‌টা-পাথরে গঠিত;—ইহাদিগকে মিশরদেশীয় স্মৃতিমন্দিরের ক্ষুদ্র নমুনা বলিয়া মনে হয়।

আবার, প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে, মুসলমান ফকিরের একটি সমাধিস্তম্ভ; উহা শুধু বার্দ্ধক্যের বলে পূজাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। উহা টাট্‌কা ফুলের মালায় সজ্জিত। আর, একটি গজমুণ্ডধারী গণেশমূর্ত্তি দেখিলাম; সেঁউতি ও গোলাপের মালা গাঁথিয়া, কোন ভক্তজন উঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে।

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—অথবা আমার চক্ষেরই ভ্রম—রাস্তায় এতগুলি স্ত্রীলোক দেখিলাম, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটিকেও দেখিতে ভাল নয়, অথচ পুরুষেরা অধিকাংশই দেখিতে সুন্দর। পুরুষের মুখে তাম্রবর্ণটি যেরূপ মানাইয়াছে, রমণীর মুখে সেরূপ মানায় নাই। পুরুষের ওষ্ঠস্থূলতা পুরুষের গোঁফে ঢাকিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের অনাবৃত ওষ্ঠের স্থূলতা আরও বেশি বলিয়া মনে হয়। যাহাদের দেহগঠন গ্রীশীয় রমণীমূর্ত্তির ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দর এরূপ কতকগুলি বালিকা ছাড়া প্রায় আর সকলেরই উদরদেশ অকালবৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তা ছাড়া, এমন কোন বস্ত্রাবরণও নাই, যাহাতে ঐ অধোলম্বিত উদর কোনপ্রকারে ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে। উহারা নাক ফুঁড়িয়া সোনার নথ ও কান ফুঁড়িয়া কানবালা পরিয়া থাকে। কানবালাগুলি ওজনে এত ভারি যে, উহাতে কান একেবারে ঝুলিয়া পড়ে। তবে কিনা, উহারা 'পারিয়া'-রমণী; উচ্চশ্রেণীর মহিলারা মাল বোঝাই গরুর গাড়িতে কখনই যাতায়াত করে না। এই উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে কিন্তু এখনও আমি দেখি নাই।

রাস্তায় এই মজুর রমণীদিগের জন্য দূর-দূরান্তরে একএকটি বিরামস্থান স্থাপিত হইয়াছে। নিরেট পাথরের বেদী, উচ্চতায় এক-মানুষ-সমান,—এই বেদীর উপর উহারা নিজ-নিজ বোঝা নামাইয়া রাখে। তাহার পর, আবার যখন ঐ বোঝাগুলি মাথায় উঠাইয়া লয়, তখন তাহাদিগকে ভূমি পর্য্যন্ত আর মাথা নোয়াইতে হয় না।

চারিদিকে কি রমণীয় নিস্তব্ধতা! এই সবল বিহঙ্গনীড়বৎ তরুপ্রচ্ছন্ন বিরল গ্রামগুলির মধ্যে কি স্বর্গীয় প্রশান্তি!

একটি বটবৃক্ষের তলে, মহাদেবের একটি পুরাতন মূর্ত্তির সন্নিকটে, বেগ্‌নি-রঙের পরিচ্ছদ পরা, শাদা লম্বাদাড়ি, ইরাণীর ন্যায় মুখশ্রী, একটি লোক শান্তভাবে বসিয়া কি-একটা গ্রন্থ পাঠ করিতেছে; ইনি একজন প্রধান পাদ্রি—একজন সিরিয়াদেশীয় প্রধান-পাদ্রি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই রহস্যময় ব্রাহ্মণ্যের দেশে একি অদ্ভুত দৃশ্য!

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, ত্রিবঙ্কুর মহারাজের রাজ্যে প্রায় পাঁচলক্ষ খৃষ্টানপ্রজার বসতি। এই সকল খৃষ্টানদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সময়ে এখানে গির্জা প্রতিষ্ঠা করে, য়ুরোপ তখনও পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা 'সেণ্ট-টমাসে'র শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। সেণ্ট টমাস্ প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত ইহারা 'নেষ্টোরীয়'-সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, সিরিয়াদেশ হইতে আসিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বরাবর এখানে পাদ্রি-প্রচারক পাঠাইয়া থাকে। অন্তত

ইহারা যে বহুপুরাতন, লোকপূজ্য মহৎ বংশ হইতে প্রসূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তা ছাড়া, রাজ্যের উত্তরপ্রদেশে কতকগুলি ইহুদিও আছে। 'জেরুসেলেমে'র মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংস হইবার পর, উহারা এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদিগকে কিংবা খৃষ্টানদিগকে কেহ কখন উৎপীড়ন করে নাই। কেন না, এদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতসহিষ্ণুতা সর্ব্বকালেই বিদ্যমান। এই স্থানটি মনুষ্যরক্তপাতে যে কখন কলুষিত হইয়াছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমাদের বলদেরা দুল্‌কি-চালে অনবরত চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য অস্ত গেল। সেই সঙ্গে সিংহলের ন্যায় এখানকার বাতাসও গ্রীষ্মদেশসুলভ আর্দ্রতায় পূর্ণ হইল। কবোষ্ণ বৃষ্টিধারার পরমমিত্র নারিকেলবৃক্ষগুলি, অন্যান্য বৃক্ষকে অপসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে এখানে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। আমরা এখন, সুবৃহৎ-শাখাপক্ষ-বিস্তারিত অফুরন্ত তালবৃক্ষের খিলানমণ্ডপতলে প্রবেশ করিয়াছি। ইহা পশ্চিমভারতের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের—মালাবার-উপকূলের শত-শত যোজন পর্য্যন্ত প্রসারিত। 'ঘাট'-পর্ব্বতমালার অনুবন্ধী ক্ষুদ্র গিরিসমূহের পাদদেশ দিয়া আমরা যতই চলিতেছি, ততই শৈলচূড়াসমূহে, শৈলবিলম্বিত অরণ্যে, ঝটিকাসঙ্কুল নিবিড় জলদজালে, অত্রত্য নভোমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

চারিঘণ্টা ধরিয়া অনবরত ঝাঁকানি খাইতেছি, তাহার সঙ্গে তালে-তালে বলদেরা দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। শুইয়া-শুইয়া আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন; আর সহ্য হয় না। কি করি, আমার এই শবাধারের সম্মুখস্থ রন্ধ্রপথ দিয়া গলিয়া বাহির হইলাম এবং বাহকের পার্শ্বে, সুগকাষ্ঠ আসনের উপর, বানরেরা যেভাবে বসে, সেইভাবে একটু বসিলাম। দিবালোক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। এই সকল মেঘের মধ্যে, এই সকল তালগাছের মধ্যে, সন্ধ্যা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। মার্গস্থ বটবৃক্ষের হরিৎ-শ্যামল সুরঙ্গপথ আমাদের সম্মুখ দিয়া বরাবর সমান চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে, অরণ্যের মধ্যে, সন্ধ্যাছায়ায় কতকগুলি পদার্থ অতীব অদ্ভুত কিম্ভুত কিমাকার বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন কতকগুলা শ্যমলকায় বিকটাকার গঠনহীন পশু, কখন বা একাকী নিঃসঙ্গ, কখন বা দলে দলে একত্র, অথবা পরস্পর উপর্য্যুপরি সমারূঢ় রহিয়াছে। এই গুলা শৈলস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু কি অদ্ভুত, বিচিত্র! এই শৈলস্তূপগুলি স্থূলচর্ম্মী পশুদিগের ন্যায় বর্ত্তুল ও তাহাদিগের চর্ম্মের ন্যায় মসৃণ ও চিক্‌চিকে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন কোনপ্রকার যোগবন্ধন নাই; প্রত্যেকেই যেন পৃথক্‌ভাবে এখানে অধিষ্ঠিত। কোন সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর, হতব্যক্তিদিগের দেহগুলি যেরূপ ভাবে থাকে, উহারা সেইরূপ নিষ্পেষিত, বিনিক্ষিপ্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে, মোটামোটা গাছের ডাল, মোটামোটা গাছের শিকড়গুলা হস্তিশুণ্ডের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।...যেন অত্রত্য প্রকৃতিদেবী স্বকীয় শৈশবদশায়, বিবিধ শৈশবচেষ্টার বিকাশকালে, নির্জ্জনে কোন জন্তুবিশেষের আকার

লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। যেন হস্তিমূর্ত্তির কল্পনা-অঙ্কুরটি বহুকাল হইতে এইখানে বিদ্যমান। এমন কি, বিধাতা যখন গোড়ায় এই শৈলগুলি নির্ম্মাণ করেন, তখনও বোধ হয় তাঁহার চিন্তার মধ্যে এই কল্পনাটি গূঢ়-ভাবে বিদ্যমান ছিল।

বাস্তবিকই মনে হয়, হস্তী কিংবা হস্তীর ভ্রূণনিচয় যেন এখানে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। আমাদের চতুর্দ্দিকে, অরণ্যের অন্ধকার যতই ঘনাইয়া উঠিতেছে, ততই যেন এইরূপ সাদৃশ্য আমাদের মনে অধিকতররূপে প্রতি-ভাত হইতেছে;—আমাদের মনকে যেন একেবারে অধিকার করিয়া বসিতেছে।

এখন আটটা রাত্রি। ঝটিকা আসন্ন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছিল, কিন্তু জানি না, কি করিয়া সমস্ত আবার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। স্বচ্ছ আকাশ, তারাময়ী রজনী। ঝিল্লী ও শলভগণ উল্লাসভরে গান করিতেছে। কীটগণের হর্ষকোলাহলে সমস্ত তরুপল্লব অনুরণিত।

আমাদের সম্মুখে মশালের আলো দেখা যাইতেছে। তরুপল্লবের মধ্য দিয়া একদল লোক আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঢাকঢোল ও করতালের ধ্বনি, মনুষ্যকণ্ঠ-নিঃসৃত ঐকতান গান শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

ইহারা বরযাত্রীর দল;—বট ও তাল গাছের নীচে দিয়া মহাসমারোহে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন, রাজা কিংবা দেবতার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে:- সোনালি জরির লম্বা জামাজোড়া, মাথায় সোনার মুকুট।

ইহা একটি বিবাহের উৎসব; বর স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লইয়া, ধর্ম্মবিধি অনুসারে, রাস্তা দিয়া যাত্রা করিতেছে।

এখন এগারটা। আমার শকটের মধ্যেই আমি নিদ্রা গেলাম। আমার ভৃত্য শকটের একটা ক্ষুদ্র জান্‌লা খুলিয়া, হাত-লণ্ঠনের আলোয় একখানা পত্র আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিল। সেই পত্রে ত্রিবঙ্কুররাজচিহ্ন মুদ্রা ঙ্কিত:—দুইটি হস্তী ও একটি সামুদ্রিক শঙ্খ। এক্ষণে আমরা 'নৈজতাবরে'-গ্রামে আছি। এই পত্রখানি দেওয়ানের নিকট হইতে আসি-য়াছে। তিনি এই পত্রযোগে, মহারাজের পক্ষ হইতে, আমাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া-ছেন, আর গাড়ি প্রস্তুত আছে, এই কথা জানাইয়াছেন। দেশীয় শকট হইতে বাহির হইয়া, এই শোভন-সুন্দর ঝাঁকুনিহীন গাড়িতে উঠিলাম। আহ্লাদের বিষয়। দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাকে লইয়া দীর্ঘপদ-বিক্ষেপে দুল্‌কি-চালে চলিতেছে, ইহাতেই আমার আনন্দ। মহারাজের চিহ্নিত পরি-চ্ছদ পরিধান করিয়া 'কোচোয়ান' স্বকীয় আসনে বসিয়া আছে;—তাহার দীর্ঘ চাপ্-কান, জরির পাগ্‌ড়ি, অন্ধকারে ঝক্‌মক্ করিতেছে। পিছনের পায়দানে দুইজন চটুল সহিস্; উহারা গাড়ির আগে-আগে এইরূপ ভাবে দৌড়িয়া চলে, যেন উহাদের উড়িবার একজোড়া ডানা আছে। তা ছাড়া, পথের অগণ্য গরুর গাড়ি সরাইয়া দিবার জন্য উহারা কি ভয়ানক চীৎকার করে! একটা ছোট সিন্দুকের ভিতরে ক্রমাগত ঝাঁকানি খাইয়া, তাহার পর খোলা গাড়িতে তারা দেখিতে দেখিতে সারি-সারি তাল-

নারিকেলের মধ্য দিয়া সহজভাবে ও দ্রুতগতি চলিতে কি উন্মাদক আনন্দ! রজনীর সুমধুর বায়ুরাশি ভেদ করিয়া, সমস্তক্ষণ পুষ্পসৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে আমরা যেন অক্ষুবন্ধ কোন একটি পরী-উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

আবার বাদ্যধ্বনি; আবার মশালের রক্তিম অনলশিখা। এত অধিক রাত্রি, আর এই ঘোর নিস্তব্ধ সময়, তবু এখনো আর এক-দল বরযাত্রী এই পথ দিয়া চলিয়াছে। এবার বরটি অশ্বারূঢ়। উহার জরির জামাজোড়া অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বেশভূষায় বরটিকে রাজার মত দেখিতে হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় একটা। যে সকল তাল-বৃক্ষের পরস্পরবিজড়িত শাখাপক্ষপুঞ্জ আমাদের মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ যেন তাহাদের গতিরোধ হইল। এটি অরণ্যের মধ্যস্থিত একটি ফাঁকা জমি। আমরা ক্রমে একটা পাকা রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িলাম।

মনে হইতেছে, যেন এই রাজপথটি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চন্দ্রহীন রাত্রে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, তারকারাজি যে শীতল-শান্ত ভস্মাভ আলোক বিকীর্ণ করে, সেইরূপ আলোকে এই রাস্তাটি আলোকিত। যে সকল বাড়ী দিবসে ধবধবে শাদা দেখাইবার কথা, এই রাত্রিকালে তাহারা একটু যেন নীলাভ বলিয়া মনে হইতেছে। বারাণ্ডার উর্দ্ধে আর একটি তলা আছে, তাহাতে মিশ্রধরণের ছোট-ছোট থাম; এবং কৌণিক খিলানের আকারে, ত্রিপত্রের আকারে, ঝালোরের আকারে খুব ছোট-ছোট রন্ধ্র-গবাক্ষ। নীচে, রুদ্ধদ্বারের দুই পার্শ্বে, দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেতের প্রবেশনিবারণার্থ সলিতা-বিশিষ্ট ছোট-ছোট প্রদীপ জোনাকির মত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

কতকগুলি পরিচিত জীবজন্তু নিস্পন্দ-ভাবে সিঁড়ির ধাপের উপর শুইয়া আছে। উহাদের প্রতি কে-যেন-কি অনিষ্টাচরণ করিবে, এইরূপ কোন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়, উহারা যেন মানব-আবাসের যতদূর-সম্ভব নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।—গরু, ভ্যাড়া, ছাগল, ঘোড়া, এই সকল জীবজন্তু। আমাদের গমনকালে উহারা জাগিয়া উঠিল না। বালুকাময় রাস্তা দিয়া আমাদের গাড়ি চলিয়াছে। গাড়ির চাকার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। এই সকল বাড়ী, নিদ্রিত পশুর পাল, নিস্পন্দ পদার্থসমূহ, যেন কোন দূরবর্ত্তী রং মশাল-আলোকের আভার ন্যায়, একপ্রকার অস্পষ্ট নীল আলোকে পরিস্নাত।

আমাদের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ঘের, একটা উত্তুঙ্গ তোরণ, শ্রেণীবদ্ধ লণ্ঠনের আলোকে দেখা যাইতেছে। এই তোরণের মধ্য দিয়া একটা বিস্তৃত জনশূন্য তরুবীথি সিধা চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের উর্দ্ধে তাল-বৃক্ষাদি ও প্রাসাদের ছাদ, এবং দূরপ্রান্তে, তরুবীথির কেন্দ্রস্থলে ও পশ্চাদ্ভাগে, ব্রাহ্মণিক মন্দিরের চূড়াসকল দেখা যাইতেছে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এইবার আমরা ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজধানী—প্রকৃত 'ত্রিবন্দ্রম'-নগরে প্রবেশ করিতেছি। পূর্ব্বে যেখানে নিদ্রিত-জীবজন্তু-সমাচ্ছন্ন নীলাভ রাজপথ দেখিয়া-ছিলাম, উহা ইহারই সংলগ্ন উপনগরমাত্র।...

আমি জানিতাম না, এই পুণ্য ঘেরের মধ্যে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগেরই বাসাধিকার আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমার গাড়ি পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া, হঠাৎ ডানদিকে ফিরিল; আবার আমরা তরু-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইলাম। আরো দূরে লইয়া-গিয়া, নানা রাস্তা অনুসরণ করিয়া, উপবনের অলিগলির মধ্য দিয়া, অবশেষে উদ্যানমধ্যস্থিত একটা সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু হায়! অট্টালিকার মুখশ্রীটি ভারতীয়-ধরণের নহে।

এইখানেই আমার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইখানেই, মহারাজার পক্ষ হইতে আমার প্রতি যার-পর-নাই সাদর অভ্যর্থনা ও আতিথ্য বিতরিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহার বাহ্য 'কাঠাম'টি—আতিথ্যের স্থানটি য়ুরোপীয় ধরণের। বরাবর ইহাই আমার নিকট অসঙ্গত ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয়, এই পরমাশ্চর্য্য প্রাচীন হিন্দুস্থানের উদার হৃদয়ের ইহাই একটি মার্জ্জনীয় ত্রুটি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেডিয়ম্।

রন্‌জেন্-(Rontgen)-রশ্মির অদ্ভুত ধর্ম্মের কথা প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে হেন্‌রি বেকেরেল্ (Becquerel) ইউরেনিয়ম্ ও থরিয়ম্ নামক দুইটি মৌলিক ধাতবপদার্থের আরো বিস্ময়কর কার্য্য আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে চমকিত করিয়াছিলেন। সে আজ চারপাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার কথা। ঐ-দু'টি ধাতুমিশ্র পদার্থ, কাষ্ঠ বা ধাতুময় কোন বাক্সের ভিতর আবদ্ধ করিয়া বেকেরেল্-সাহেব দেখাইয়াছিলেন,—রন্‌জেন্‌রশ্মি যেমন কতকগুলি অস্বচ্ছ পদার্থের বাধা ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, থরিয়ম্ ও ইউরেনিয়ম্‌ও সেই-প্রকার একজাতীয় রশ্মি বিকিরণ করিতে পারে। বাক্সের নাতিস্থূল কাষ্ঠ বা ধাতুফলক দ্বারা ঐ রশ্মি মোটেই অবরুদ্ধ হয় না।

রসায়নশাস্ত্রসম্মত ৭৫টি ভূতপদার্থের মধ্যে কেবল উপরোক্ত দু'টি-ধাতুমিশ্রিত পদার্থে ঐ বিশেষ ধর্ম্মের লক্ষণ দেখিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিলেন,—এই সর্ব্ববাধাভেদী অদ্ভুত রশ্মিবিকিরণশক্তি কেবল ঐ দু'টি ধাতুরই বিশেষ ধর্ম্ম। অবিমিশ্র থরিয়ম্ ও ইউরেনিয়ম্ বড়ই দুর্লভ সামগ্রী। আবিষ্কর্ত্তা বেকেরেল্‌সাহেব অনেক গবেষণার পর বলিলেন,- যদি কোন উপায়ে আমরা উক্ত ধাতুদ্বয়কে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করিতে পারি, তবে তাহাতে আমরা রন্‌জেন্-রশ্মিরই পূর্ণবিকাশ দেখিব। রশ্মিবিকিরণ-শক্তি থরিয়ম্ ও ইউরেনিয়মেরই বিশেষ ধর্ম্ম বটে।

এই আলোচনার কিছুদিন পরে পিচ্-

ব্লেণ্ডি (Pitch-blende)-নামক ইউরেনিয়ম্‌মিশ্রিত একপ্রকার আকরিক পদার্থের রশ্মিবিকিরণশক্তির আধিক্য আবিষ্কৃত হওয়ায় অধ্যাপক বেকেরেলের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্লেষ করিলে পিচ্-ব্লেণ্ডিতে ইউরেনিয়ম্ তো অতি অল্পই পাওয়া যায়,—তবে পিচ্-ব্লেণ্ডি হইতে কিপ্রকারে বিশুদ্ধপ্রায় ইউরেনিয়ম্-বিচ্ছুরিত রশ্মি অপেক্ষাও প্রচুর রশ্মি বহির্গত হয়? রশ্মিনির্গমনকার্য্যে বিশুদ্ধপ্রায় ইউরেনিয়ম্ ও তাহারই যৌগিক পিচ্‌ব্লেণ্ডির এই সামঞ্জস্য দেখিয়া, অধ্যাপক ক্যুরি (Curie) ও তাঁহার বিদুষী পত্নী পদার্থটি লইয়া কিছুদিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন; এবং শেষে ইউরেনিয়ম্ ব্যতীত আর কোন মৌলিকধাতুর মিশ্রণদ্বারা উহার রশ্মিবিকিরণশক্তির আধিক্য জন্মায় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। পিচ্‌ব্লেণ্ডি-স্থিত ইউরেনিয়মে ক্যুরিদম্পতি এইপ্রকারে যে নূতন ধাতুর লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহাই রেডিয়ম্ (Radium)-নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ইহার পর এই নূতন ধাতুর বিষয় অধিক কিছু জানা যায় নাই। পদার্থটির গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, এবং তাহা হইতে রন্‌জেন্-রশ্মির অনুরূপ কোন একপ্রকার রশ্মি বিকিরিত হয়, কেবল ইহাই জানা ছিল। কিন্তু রসায়নবিদ্‌গণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না, পদার্থটির রশ্মিবিকিরণশক্তির মূলকারণ আবিষ্কারের জন্য অনেক পরীক্ষাদি চলিতেছিল। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ক্রুক্‌স্ (Crookes) দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে রেডিয়মের আরো কতকগুলি বিস্ময়কর ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছেন। এই সকল অদ্ভুতশক্তির মূলকারণ-আবিষ্কার দূরের কথা, পদার্থটির প্রত্যেক কার্য্যে পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধ দেখিয়া বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন।

ক্রুক্‌স্‌সাহেব ব্যতীত অধ্যাপক রদার্‌ফোর্ড (Rutherford) ও সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ সার্ উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জে প্রমুখ আরো কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আজকাল রেডিয়ম্ লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের সমবেত পরীক্ষায় জানা গিয়াছে,—এই অদ্ভুত পদার্থটি হইতে এত তাপ অবিশ্রান্ত নির্গত হইতে থাকে যে, তদ্দ্বারা তাহার সমান ওজনের বরফ অতি অল্পকালমধ্যে গলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই অবিরাম তাপক্ষয়ের জন্য তাহার শক্তিভাণ্ডারের অণুমাত্র ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায় না। তা ছাড়া, কোন একটি বস্তুকে ক্ষণকালের জন্য রেডিয়মের সংস্পর্শে রাখিলে, সেটিকেও রেডিয়মের ন্যায় রশ্মিবিকিরণক্ষম হইতে দেখা গিয়াছে। অবশ্য এই রশ্মিবিকিরণক্ষমতা তাহার স্থায়ী ধর্ম্ম হয় না। এই রশ্মি ব্যতীত, রেডিয়মের আরো কয়েকটি রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিরই কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। কোনটি সেকেণ্ডে ১২০,০০০ মাইল বেগে এবং কেহ ঐ সময়ে ১২০০০ হাজার মাইল ছুটিয়া পদার্থটি হইতে বাহির হইয়া পড়ে, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ কোন বস্তুই রশ্মিপথ অবরুদ্ধ করিতে পারে না। ক্রুক্‌স্‌সাহেব অণুপ্রমাণ এককণা রেডিয়ম্ কিয়ৎকালের জন্য পকেটে রাখিয়াছিলেন, তাহার কোন একপ্রকার

রশ্মি জামার স্থূলকাপড়ের বাধা ভেদ করিয়া গাত্রে ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছিল। রেডিয়ম্-রশ্মি ব্যাধিজীবাণুর (Bacilli) একটি প্রধান শত্রু। দুষ্টক্ষতে রশ্মিপাত করিলে যে রোগী শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে, কয়েকজন চিকিৎসক ইতোমধ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। যক্ষ্মারোগোৎপাদক জীবাণু রেডিয়ম্‌রশ্মিদ্বারা অতি সহজে বিনষ্ট হয় বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন এবং বিষয়টি লইয়া নাকি আজও পরীক্ষা চলিতেছে।

যাহা হউক, রেডিয়মের এই সকল বিশেষ-গুণ আলোচনার এখনও সময় আসে নাই বলিয়া মনে হয়; এখন ইহাদের সাধারণ ধর্ম্ম কি, দেখা যাউক। অধ্যাপক রদারফোর্ড ও সদির (Soddy) গবেষণায় এসম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য তথ্য জানা গেছে। রদারফোর্ড বলেন, রেডিয়ম্ হইতে আমরা মোটামুটি যে তাপ ও বিদ্যুৎময় রশ্মির নির্গমন দেখি, সেটি প্রকৃতপক্ষে একজাতীয় রশ্মি নয়, উহা স্পষ্ট তিনজাতীয় রশ্মির সংমিশ্রণ-ফল। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় রশ্মি রেডিয়মেরই সূক্ষ্মতম অংশের প্রক্ষেপ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। রদারফোর্ডসাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পদার্থটির অতিক্ষুদ্র অণুসকল কোন অজ্ঞাতকারণে বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইয়া মহাবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে, এবং অণুর এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই আমাদের নিকট একপ্রকার রশ্মি আকারে প্রতিভাত হয়। রেডিয়মের এই আণবিক রশ্মির বেগ অত্যন্ত অধিক বটে, কিন্তু ইহা কোন বাধা ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে না; যে-কোন পদার্থদ্বারা ইহার পথ রুদ্ধ করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়জাতীয় রশ্মিগুলিও প্রথমের ন্যায় রেডিয়ম্-কণাময় হইয়া বহির্গত হয়। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, দ্বিতীয়ের কণাগুলি প্রথম-রশ্মিস্থ অণু অপেক্ষা অনেক ছোট। এইজন্য কোন জিনিসই এই দ্বিতীয় রশ্মিপথে বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। এক-ইঞ্চি স্থূল লৌহ বা সীসফলক দ্বারা রশ্মিপথ অবরুদ্ধ কর, রেডিয়মের অতিসূক্ষ্ম দ্রুতগামী কণাসকল লৌহের মধ্য দিয়া অনায়াসে বাহির হইয়া চলিতে থাকিবে। গণনাদ্বারা জানা গিয়াছে, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুকে হাজারভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ লইলে হাইড্রোজেন্-কণার আকার যত ক্ষুদ্র হয়, রেডিয়মের দ্বিতীয়রশ্মিস্থিত অণুগুলির আকার তাহা অপেক্ষা কোনক্রমে বৃহত্তর নয়।

তৃতীয়জাতীয় রেডিয়ম্‌রশ্মির বাধা-অতিক্রম শক্তি আরো অদ্ভুত। প্রায় সাড়ে তিন-ইঞ্চি স্থূল আলুমিনিয়ম্-ধাতুফলকের বাধা ভেদ করিয়া ইহারা অনায়াসে বহির্গত হইতে পারে। এই রশ্মিতে সম্ভবত রেডিয়ম্‌কণা নাই। সাধারণ আলোকরশ্মি যেমন ঈথরের কম্পনবিশেষদ্বারা উৎপন্ন হয়, এগুলিও সেইপ্রকার কোন ঈথর্‌কম্পনের ফল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রন্‌জেন্‌রশ্মির সহিত ইহাদেরই কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

এই ত গেল তিনজাতীয় রেডিয়ম্-রশ্মি। এতদ্ব্যতীত পদার্থটি হইতে সর্ব্বদাই একপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থ ও তাপের বিকিরণ হইয়া থাকে। এই অক্ষয় তাপ এবং পূর্ব্বোক্ত রশ্মিগুলির মূল কোথায়, আজও কোন পণ্ডিত নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। রেডিয়মের সকল কার্য্যই বৈজ্ঞানিকগণের

নিকট একটা বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাঠক অবশ্যই জানেন, রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণুকে (Atoms) জড়পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এখন রেডিয়মের এক এক পরমাণু সহস্র সহস্র অংশে বিভক্ত হইয়া দুইজাতীয় অদ্ভুত রশ্মি উৎপন্ন করিতেছে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মহা-গোলযোগে পড়িয়াছেন। অনেকে বলিতেছেন, আমরা জগতীস্থ সামগ্রীসমূহকে যে কয়েকটি মৌলিক পদার্থে বিভাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতেছিলাম, এখন আর সে বিভাগ চলিবে না। মূল জিনিষ জগতে একটি। সেই এক মৌলিক পদার্থ হইতেই হাইড্রোজেন্-অক্সিজেন্ এবং লৌহস্বর্ণ প্রভৃতি তথা-কথিত মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল পদার্থমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া আবার সেই প্রাথমিক মৌলিক অবস্থায় উপনীত হইতেছে। রেডিয়ম্ রশ্মির সেই অতিসূক্ষ্ম অণু, পদার্থটির বিয়োগ- (Disintegration)-জাত উক্ত প্রাথমিক জড়োপাদান। সৃষ্টিকালীন যে এক মৌলিক উপাদান হইতে রেডিয়ম্ ও অপরাপর ভৌতিকপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, এখন রেডিয়ম্ ধীরে ধীরে বিযুক্ত হইয়া সেই মৌলিক জড়শরীর পাইতেছে।

অধ্যাপক রদারফোর্ড ও সদির একটি আশ্চর্য্যজনক পরীক্ষার ফলে, জড়ের উৎপত্তি ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় উপরোক্ত অনুমানটির উপর আজকাল অনেকের আস্থা দেখা যাইতেছে। গত নবেম্বরমাসে অধ্যাপক সদি একটি কাচনলের ভিতর কিঞ্চিৎ রেডিয়ম্ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; পদার্থটির সূক্ষ্ম জড়কণাময় রশ্মিগুলি জমাট বাঁধিয়া কিপ্রকারগুণসম্পন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। রশ্মিস্থ পদার্থগুলি নলে জমিলে পর, সদিসাহেব রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র দ্বারা সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে অণুমাত্র রেডিয়মের চিহ্ন দেখিতে পান নাই, তৎস্থলে হেলিয়ম্ (Helium) নামক এক ভূতপদার্থের বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) দেখা গিয়াছিল। বর্ণচ্ছত্রপরীক্ষা পদার্থের গঠনোপাদান স্থির করিবার একটি অতি সূক্ষ্ম উপায়। স্তূপীকৃত কোন এক পদার্থে অপর পদার্থের অণুপ্রমাণ মিশ্রণ হইলে, ঐ যন্ত্রদ্বারা তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট ধরা যায়। আধুনিক রাসায়নিক গবেষণার প্রধান অবলম্বন সেই রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র দ্বারা রেডিয়ম্‌কণাকে অকস্মাৎ হেলিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া আজ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় বিশ্বাস করিলে, ভূতপদার্থমাত্রেরই বিয়োগ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার ফল প্রচারিত হওয়ার পর, বৈজ্ঞানিকমহলে আর একটা কথা উঠিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, বিয়োগপ্রাপ্তিকালে কোন বিশেষ পদার্থের সকল অংশ একবারে সেই মৌলিক জড়কণায় পরিণত হয় না। প্রাথমিক জড়কণা ও তদ্‌গঠিত বিশেষ বিশেষ পদার্থের মধ্যে অনেকগুলি ক্রম আছে। তাই রেডিয়ম্ একবারে সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিবর্ত্তিত না হইয়া, প্রথমে লঘুতর পদার্থ হেলিয়মে পরিণত হয়। তার পর ক্রমে সেই হেলিয়মই

আরো লঘুতর পদার্থপরম্পরার প্রাথমিক জড়কণায় চরমবিয়োগ লাভ করে। ভূত-পদার্থের এই ক্রমিক পরিবর্ত্তনের কথা বড়ই অদ্ভুত। এখন মনে হইতেছে, অতিপ্রাচীন রসায়নবিৎ ও যাদুকরগণ (alchemists) লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য শত শত বৎসর বৃথা ব্যয় করেন নাই। স্পর্শ-মণির অস্তিত্ব এ জগতে অসম্ভব নয়।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—পূর্ব্বে যে সকল পরীক্ষাদির কথা বলা হই-য়াছে, সে ত কেবল রেডিয়ম্ লইয়া, কিন্তু ভূতপদার্থমাত্রই যে রেডিয়মের ন্যায় রূপা-ন্তরগ্রহণক্ষম ও বিয়োগধর্ম্মী, তাহার প্রমাণ কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রুক্‌স্‌প্রমুখ রসায়নবিদ্‌গণ বলিতেছেন, বিয়োগ (Disin-tegration) কেবল রেডিয়মেরই একমাত্র ধর্ম্ম নয়। ইহার বিয়োগ খুব প্রত্যক্ষ, তাই ধরা পড়িয়া গেছে। অপর পদার্থের বিয়োগ অতি ধীরে ও নানা প্রাকৃতিক কার্য্যের জটিলতার ভিতর দিয়া হইতেছে, তাই আমরা সেগুলিকে হঠাৎ ধরিতে পারি না। কাচ-দণ্ডে যখন রেশমী বস্ত্র ঘষিয়া আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি, তখন সেই কাচের উপাদানের ঠিক্ রেডিয়মের মতই বিয়োগ হয়, কিন্তু এই বিয়োগ খুব প্রত্যক্ষ নয়, তাই সেটা এ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। জলে-স্থলে, অগ্নিবিদ্যুতে, মেঘে-বৃষ্টিতে এই বিয়োগ নিয়তই চলিতেছে। তবে পরীক্ষাদ্বারা রেডিয়মের যে সকল অদ্ভুতধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা পদার্থের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধীয় প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি যে কম্পিত হইয়াছে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। যুগযুগান্তের সমবেত শ্রমে বৈজ্ঞা-নিকগণ যে ৭১টি মূলপদার্থের উপর আধুনিক বিশাল রসায়নশাস্ত্রকে দাঁড় করাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান আবিষ্কার সেগুলিকে চূর্ণীকৃত করিয়া, শাস্ত্রটিকে শীঘ্রই একটি প্রশস্ততর ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর বসাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

আজকাল বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সাম-য়িকপত্রমাত্রেই অবৈজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় রেডিয়মের অনেক আজগুবি কথার আলোচনা দেখা যাইতেছে। যানপরিচালন-কার্য্যে রেডিয়মকে কেহ কয়লার স্থানে বসাইতেছেন এবং কেহ বা আলোক-উৎপাদন-ব্যাপারে ইহাকে বিদ্যুতের স্থানে প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিতেছেন। ইঁহাদের এই সকল কল্পনার সাফল্য যে অসম্ভব, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে সেগুলি যে সুসাধ্য নয়, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ আমরা যেপ্রকার প্রতিদিনই সহস্রদিকে দেখিতে পাইতেছি, রেডিয়মের তাপ ও রশ্মিবিকিরণ সেইপ্রকার একটা শক্তির বিকাশ ব্যতীত তো আর কিছুই নয়। সৌরকিরণের বিপুল তাপ, বায়ুর প্রবল গতি প্রভৃতি প্রকৃতির সুলভ ও উদ্দাম শক্তিকে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান অতি অল্পই বশীভূত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ রেডিয়মের শক্তিকে সুশৃঙ্খলিত করিয়া যে অনায়াসে ঘরের কাজ চালাইয়া লইবেন, তাহা হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

অধ্যাপক রদারফোর্ড ও ক্রুক্‌স্‌সাহেবের গণনায় রেডিয়মের শক্তির পরিমাণ সম্প্রতি

জানা গিয়াছে। উক্ত অধ্যাপকদ্বয় দেখাইয়াছেন, কেবল একগ্রেন্-রেডিয়ম্ নিহিত শক্তিকে এক সঙ্গে কাজে লাগাইবার উপায় থাকিলে আমরা তদ্দ্বারা চৌদ্দহাজারমণ-ভারবিশিষ্ট কোন পদার্থকে অনায়াসে এক-মাইল উর্দ্ধে উঠাইতে পারিতাম। কণাপ্রমাণ রেডিয়মে এই বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে সত্য, কিন্তু উহাকে নিঃশেষে এককালীন কাজে লাগাইবার উপায় কই? গণনায় জানা গিয়াছে, রেডিয়মের বিয়োগ এত ধীরে হয় যে, উহার রতিপ্রমাণ-কণাস্থিত শক্তির বিকিরণ শেষ হইতে প্রায় ২০লক্ষ বৎসর লাগে। এই অতি ধীর শক্তিবিকিরণধর্ম্মকে কোন উপায়ে দ্রুত করিলেও পদার্থটির দুর্লভতা ইহার কার্য্যোপযোগিতার বিশেষ অন্তরায় হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। রেডিয়মের অস্তিত্ব এপর্য্যন্ত যে পিচ্-ব্লেণ্ডি-নামক আকরিক পদার্থে দেখা গিয়াছে, সেটা পৃথিবীতে খুব সুলভ নয়; বোহেমিয়া, করন্-ওয়াল্ ও সাক্সনি প্রদেশের কেবল দুইএকটি স্থানে ইহার সামান্য সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। সুতরাং এই দুর্লভ সামগ্রী হইতে ততোধিক দুর্লভ রেডিয়মের উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা আমাদের গৃহকার্য্য সাধন করা কতদূর সহজসাধ্য হইবে, এখন পাঠক তাহা বিবেচনা করুন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রায় দেড়লক্ষমণ পিচ্-ব্লেণ্ডি হইতে কেবল অর্দ্ধ-সেরমাত্র রেডিয়মের উদ্ধার হয়, এবং প্রস্তুত করিতেও প্রায় এককোটি পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণোচিত চরিত্রগৌরবে লোক-সমাজের সম্মুখে উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজশিক্ষকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তবে সেকালের ন্যায় একালেও তাঁহাকে ভারতবর্ষের লোকে বিনা বাক্যব্যয়ে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধাভরে সমাজপতি বলিয়া বরণ করিয়া লইবে। তখন আর সভা করিয়া জনসমাজকে কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাড়না করিতে হইবে না।

সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যে দিন দারিদ্র্য নিয়তিশয় লজ্জায় ব্যাপার হইয়া ব্রাহ্মণকে জনসমাজে কুণ্ঠিত করিত না, সে দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, একালের ব্রাহ্মণকেও অর্থোপার্জ্জনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সংসারসংগ্রামে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। এখন আর সহসা ব্রাহ্মণকেও তপস্যার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া প্রবুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা নাই। এখন বিদ্যা তাহার পুরাতন লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়াছে; সংযম তাহার পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; আত্মত্যাগ তাহার দীর্ঘ অনশনকে নির্ব্বাপিত করিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার

করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও বিদ্যার অভাব হয় নাই; কিন্তু সে কেবল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যার অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর। এখনও সংযম সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই; কিন্তু সে কেবল পূর্ব্বসংস্কার লব্ধ সদ্‌বৃত্তিনিচয়কে কায়ক্লেশে সুসংযত করিয়া, আধুনিক আত্মম্ভরিতার অভিনব শিক্ষায় চঞ্চলস্রোতকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ততা। এখনও আত্মত্যাগ একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু সে কেবল ইহপরলোকের সম্পত্তির পরিবর্ত্তে ইহলোকের আত্মপ্রশংসালাভের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিবার যত্নশীলতা। এখন আর সে দিন নাই। যে দিন নিজে বড় হইয়া, অপরকে বড় করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ জ্ঞানালোচনায় নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন; স্বয়ং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, অপরকে সমুন্নত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, সে দিন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। বন্যাস্রোত দূরে সরিয়া গেলে পল্লীপথ যেমন পূতিগন্ধময় ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া চলাচলের উপায় তিরোহিত করে, পূর্ব্বশিক্ষা বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষের অবস্থাও তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে! এ সময়ে যিনি স্বদেশের কল্যাণকামনায় ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুরাতন অধিকার পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য সকাতরে আহ্বান করিতেছেন, তিনি ভারতভূমির সুযোগ্য সুসন্তান। তাঁহার "স্বদেশী সমাজের" প্রবন্ধ তাঁহার পরিণত পুণ্যজীবনের পরিপুষ্ট অমৃতফল। বিচার-বিতণ্ডায় তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ না করিয়া, জনসমাজ যাহাতে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অগ্রসর হয়, তাহার জন্যই আয়োজন করা আবশ্যক। আলোচনায় সকল কথা সরস হয় না, সকল কথা সহসা বোধগম্য হয় না; বলিবার দোষে এবং বুঝাইবার দোষে অনেক কথাই অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল প্রতীয়মান অসঙ্গতির অন্তরালে হৃদ্গত প্রকৃত বক্তব্যের যে সুস্পষ্ট আভাস মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রপ্রভার ন্যায় অদৃষ্ট হইয়াও অলৌকিক সৌন্দর্য্যে লোকচিত্ত মুগ্ধ করিয়া দেয়, তাহা ধরিয়াই গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার উপায় হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণগণই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূলকারণ। তাঁহারা যে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া স্বদেশের অধঃপতন সাধন করিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই ভারতবর্ষের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। ইংরাজের মুখের এই সুমিষ্ট উপদেশ ভারতবর্ষের অধিকাংশ নরনারীকে প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী করিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে পুনরায় সমাজপতি হইবার পথে সযত্নে কণ্টকরোপণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন স্বদেশী-সমাজ সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উন্নতিকামনায় যত্নশীল হইলেও, ব্রাহ্মণকে বিনা বিচারে সমাজপতি বলিয়া বরণ করিতে সম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের এই কলঙ্ক কতদূর সত্য, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ মানবজীবনের ক্রমোন্নতিলাভের যে সকল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া পুরাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরু হইয়া ইতিহাসে আপন

নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্র—"অথাতোঽধিকারঃ।" অথ—অতঃপর, অতঃ—এইজন্য, অধিকারবিচার। অধিকারবিচার না করিয়া, সকল শ্রেণীর নরনারীকে একইপ্রকার উপদেশে শিক্ষাদান করা অসম্ভব। আধুনিক বিদ্যালয়েও অধিকার ভেদে শ্রেণীবিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। অধিকার যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অধিকারীও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে সমুন্নত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। গুণ এবং কর্ম্ম বিচার করিয়াই অধিকার নির্ণীত হইত। ইহার জন্যই জনসমাজ বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একালের ন্যায় সেকালেও, দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে ক্রমোন্নতিলাভের চেষ্টা না করিয়া, একেবারেই সর্ব্বোচ্চ পদবী আক্রমণ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহাকে অশিষ্ট আস্ফালনে কিছুমাত্র উত্তেজিত করিত না বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাস না থাকিলেও, ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে, অনধিকারীর মহোচ্চপদবীলাভের অশান্ত আগ্রহের প্রমাণপরম্পরার অভাব নাই। ব্রাহ্মণোচিত চিত্তসংযম লাভ না করিয়াই, ব্রাহ্মণোচিত সামাজিক পদগৌরব লাভের জন্য অনেকেই আগ্রহপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একালের ন্যায় সেকালেও অনধিকারচর্চ্চা নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। তাহার কথা সংস্কৃতসাহিত্যে নানা আখ্যায়িকার আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই চেষ্টা সকলদেশেই সমাজমন্দিরের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া থাকে; তজ্জন্য আচার্য্যগণকে অপরাধী করা যায় না। তাঁহাদের হস্তে রাজদণ্ড ন্যস্ত থাকিলে, তাঁহারা সমাজের কল্যাণকামনায় অপরাধীকে সমুচিত দণ্ডদান করিয়া শাসন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল—শিক্ষার সদুপদেশ। তাঁহারা কেবল উপদেশদানেই জনসমাজকে বুঝাইতেন, উন্নতিলাভের প্রথম সূত্র—"অথাতোঽধিকারঃ।"

এই মূলসূত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও, অসন্দিগ্ধ স্বল্পাক্ষরনিবদ্ধ বহুমূল্য উপদেশের আধার। যখন এই মূলসূত্র গ্রথিত হইয়াছিল, তখন জ্ঞানমাত্রেই 'বেদ'নামে অভিহিত হইত। তাহাতে সকলশ্রেণীর নরনারীর অধিকার ছিল; কেবল গুণকর্ম্মবিচারে এক এক শ্রেণীকে এক এক শ্রেণীর জ্ঞানানুশীলনের উপদেশ প্রদত্ত হইত। ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি তাহারই নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহা অনাদি অনন্তকাল হইতে বিশ্বসংসারে স্বপ্রকাশ হইয়া মানবের দর্শনগোচর হইবার জন্য অদ্যাপি কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। যখন যে বেদ মানবের দর্শনগোচর হইয়াছে, তখনই তাহা 'দৃষ্ট' বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনি ঋষিপদবাচ্য হইয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এইরূপে ঋষিপদবী লাভ করিয়া, সমাজশিক্ষক হইয়াছিলেন। বেদ যাঁহারা প্রচার করিতেন, তাঁহারা 'প্রোক্তা'নামে পরিচিত। তাঁহারাও ঋষিপদবাচ্য। 'দৃষ্ট' বেদ সর্ব্বত্র 'প্রোক্ত' হইয়া, জনসমাজের শিক্ষাদানের কার্য্যে ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সেই পুণ্যব্রত গ্রহণ ও পালন করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন বলিয়াই, ব্রাহ্মণের পদগৌরব

প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ত লোকে অধিকারলাভ না করিয়া, ব্রাহ্মণ হইবার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ব্রাহ্মণের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে পারিত না। একালের ন্যায় সেকালেও, জনসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াই ব্রাহ্মণকে অধঃপাতিত করিয়াছে, ব্রাহ্মণ জনসমাজকে অধঃপাতিত করেন নাই। বুঝিবার দোষে এবং বুঝাইবার দোষে ব্রাহ্মণের স্কন্ধে সকল অপরাধ ন্যস্ত করিয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাসনামধেয় যে সকল অভিনব গ্রন্থ রচিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক-কল্পনাপ্রসূত অলীক জল্পনাজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে।

ব্রাহ্মণত্ব ব্যক্তিগত অধিকার বলিয়াই পরিচিত ছিল। অন্যথা অব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্বলাভের সম্ভাবনা থাকিত না। কালে ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত অধিকারে পর্য্যবসিত হইবার জন্যই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বগৌরববিচ্যুত পতিতজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। জনসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার প্রধান কারণ। জনসমাজ যখনই প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাহিয়াছে, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মতেজে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। জনসমাজ যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ পাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কেবল প্রথারক্ষার্থ যজ্ঞসূত্রমাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক করিয়া তুলিয়াছে, তখন হইতেই ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া স্বদেশের পূর্ব্বসৌভাগ্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন! জনসমাজ যদি আবার ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুরাতন অধিকার দান করিবার জন্য যথার্থই লালায়িত হয়, ব্রাহ্মণ আবার ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন। জনসমাজ কি যথার্থই ব্রাহ্মণকে সকাতরে আহ্বান করিতেছে ?

পৃথিবীর সকল পদার্থই প্রয়োজনের দিক্ দিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। যাহার প্রয়োজন নাই, সে কেবল প্রথারক্ষার জন্য অধিকদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। যাহার প্রয়োজন আছে, তাহাকে বাধ্য হইয়াই জনসমাজের সম্মুখে উপনীত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন অনুভূত হইবামাত্র ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু যথার্থ প্রয়োজন অনুভূত হওয়া আবশ্যক। জনসমাজ আত্মোন্নতিসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উদারচিত্তে আকুলকণ্ঠে আহ্বান না করিলে, সে প্রয়োজন কদাচ অনুভূত হইবে না। মৌখিক আমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ আসিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন।

বর্ত্তমান জনসমাজ সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ; কিন্তু তপস্যা - সর্ব্বনাশ। তাহা নিতান্ত পুরাতন অনাবশ্যক আত্মবঞ্চনার বাহ্যাড়ম্বর। তাহা লইয়া কি হইবে? তপস্যাই যে ভারতবর্ষের সমুন্নতির মূল, তাহা নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। আমরা এখন তপস্যা বলিতে তপস্যার বাহ্যাড়ম্বরকেই প্রকৃতপদার্থ বলিয়া বুঝিয়া আসিতেছি। সুতরাং তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা স্বাভাবিক। তপস্যা যে মানবপ্রকৃতির ক্রমোন্নতিসাধনের একমাত্র উপায়, সে কথা এখন আবার নূতন করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অভাবে ভারতবর্ষ কর্ণধারহীন উড়ুপের ন্যায় তরঙ্গসঙ্কুল অনন্ত সাগরে বিপর্য্যস্ত হইতেছে!

এই পতিতজাতির সমুন্নতিসাধন করিবার যোগ্যপাত্র কে? জনসমাজ ভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষকে সমুন্নতিসাধন করিবার যোগ্যপাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। ব্যক্তি-বিশেষ কেবল জনসমাজের মুখপাত্র, ব্যক্তি-বিশেষ জনসমাজকে পরিচালিত করিতে পারেন,—গঠন করিতে পারেন না। জন-সমাজের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইবার পথ না পাইয়া ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া যখন অকস্মাৎ পরিস্ফুট হয়, তখনই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিবার আড়ম্বর প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহা যে জনসমাজেরই হৃদয়-নিহিত অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার পরিস্ফুট আর্ত্তনাদ, সে কথা কেহ বিচার করিয়া দেখে না। বর্ত্তমান জনসমাজের হৃদয়নিহিত কোনরূপ অব্যক্ত আর্ত্তনাদ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া থাকিলে, তাহা অবশ্যই একদিক্-না-একদিক্ দিয়া অচিরে ফুটিয়া বাহির হইবে।

আধুনিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে অব্যক্ত আর্ত্তনাদ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জনসমাজের প্রথমস্তরের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করে। এই-শ্রেণীর সামাজিকগণের সাধারণ নাম শিক্ষিত-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় কি চায়? বয়সের তারতম্য অনুসারে এই সম্প্রদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমশ্রেণীর বয়স হই-য়াছে;—প্রখর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসি-য়াছে। বিচারক, ব্যবহারাজীবী, চিকিৎসক ইত্যাদি বিবিধ পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীরমন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা কি চান, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইঁহাদের পলিতকেশ অতিবিক্ত গাম্ভীর্য্যে ইঁহাদের হৃদগত প্রার্থনাকে চাপিয়া রাখিয়াছে; তথাপি মনে হয় ইঁহারা সকলেই অল্লাধিক-মাত্রায় নিশ্চেষ্ট-নিশ্চল হইয়া বিশ্রামলাভার্থ ই সবিশেষ লালায়িত। দশের কথা এবং দেশের কথা ভাবিবার সময় থাকিলেও, দশের জন্য এবং দেশের জন্য খাটিবার উদ্যম অন্তর্হিত হই-য়াছে। এই শ্রেণীর শিক্ষিতসম্প্রদায় একরূপ উদাসীনের মতই অভ্যাসবশত দেশের কথার আলোচনা করিয়া থাকেন, প্রাণের সঙ্গে দেশের জন্য পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। ইঁহারা সংসারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্বদেশীসমাজের সংস্কারসাধনে প্রয়োগ করিতে অসম্মত।

দ্বিতীয়শ্রেণীর শিক্ষিতসম্প্রদায় সম্প্রতি কার্য্যক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিয়া নানারূপে পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে ব্যতিব্যস্ত। রাও-সাহেব হইতে রাজা-বাহাদুর পর্য্যন্ত, নিতান্ত-পক্ষে যাহা-কিছু-একটা না হইলে আর শান্তি নাই। ইঁহারা প্রগল্ভ; না চান এমন বস্তু ভূভারতে দুর্লভ। সুতরাং ইঁহারা যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কি চান, তাহার আবিষ্কার-সাধন বিলক্ষণ আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

তৃতীয়শ্রেণী সবে মাত্র সংসারদ্বারে দণ্ডায়মান; এখনও একপদ বিদ্যালয়ে, এক-পদ সংসারে। কখন আশা, কখন বা নিরাশায় দোদুল্যমান এই সকল শিক্ষিত যুবক কেবল বর্ষীয়ান্ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ধনমান উপার্জ্জনের সুখস্বপ্নেই বিভোর হইয়া রহিয়াছেন!

দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় কি চায়, তাহা সর্ব্বাংশে নির্ণয় করা কঠিন হইলেও, একটা

বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ নাই। শিক্ষিতসম্প্রদায় কি চায়? অর্থ—অর্থ—অর্থ। তাহার জন্য সমগ্রজীবনব্যাপী উচ্চ শিক্ষাকেও প্রতিপদে ব্যর্থ করিতে প্রস্তুত। স্বদেশীসমাজের পুরাতন আদর্শ এতই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশের কার্য্য ও বাক্যের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করা অসম্ভব। যে সৎসাহস মানুষকে প্রকৃতপথের চিন্তায় উৎসাহযুক্ত করিয়া, সুচিন্তিত সদুপদেশ নির্ভয়ে লোকসমাজে প্রচার করিবার শক্তিদান করে, সেই সৎসাহসের অভাবে সাহিত্যসেবক শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশ রচনাশ্রম নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ রচনা কেবল বাক্যজঞ্জাল পুঞ্জীকৃত করিতেছে। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, ধর্ম্মতত্ত্বে বা বক্তৃতায় কেবল কথার বাহুল্য; সার কথা দুর্লভ। এই সকল কারণে দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আশা-ভরসা লুপ্ত হইয়া যায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে 'আশাহীনের' দলভুক্ত করিতে হয়।

তথাপি উষালোকের মত আশার তরুণ-কিরণ ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। এখনও তাহার আশা দীর্ঘরজনীর অবসানপ্রতীক্ষায় প্রভাতী গাহিয়া, নিদ্রাতুরকে পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সহায়তা করিতেছে। সেই আশাই আশা। তাহাই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের হৃদ্গত গুপ্ত-বেদনার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সকলেরই মূল্য আছে। আকর হইতে উত্তোলিত ধাতুপিণ্ডের সঙ্গে কত মূল্যহীন আবর্জ্জনা চিরসংযুক্ত থাকিলেও, তাহা যেমন মূল্যবান্ মূলধাতুকে মূল্যহীন করে না; সংস্কৃত হইবামাত্র সকল শ্রম সফল করিয়া দেয়;—বর্ত্তমান শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অবস্থাও সেইরূপ। তাঁহারা সকলেই আকরোত্তোলিত ধাতুপিণ্ড; সংস্কারের অভাবে ভালমন্দের সম্মিশ্রণে আপাতত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিলেও, সংস্কৃত হইবামাত্র মূল্যবান্ হইবার আশা আছে। তাপরে না পোড়াইলে সংস্কারসাধনের উপায় নাই। বিদেশের যে সকল মূল্যহীন আবর্জ্জনা সর্ব্বাঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সযত্নে দগ্ধ করা আবশ্যক। বাহিরের আবর্জ্জনা দগ্ধ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। ভিতরের আবর্জ্জনায় এখনও অগ্নি সংযুক্ত হইতে বিলম্ব আছে। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চিত্তক্ষেত্র হইতে ভারতীয় ভাবপ্রসূন পদবিদলিত করিয়া, তাহার স্থলে বিদেশীয় কণ্টকবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার পার্থক্য কোথায়, তাহা এখন বিস্মৃতপ্রায়। এখন প্রতীচ্যসভ্যতাই সভ্যতা বলিয়া স্বীকৃত; তাহার তুলনায় প্রাচ্যসভ্যতা পুরাতন অসভ্যসমাজের সভ্যতালাভের প্রথম চেষ্টার অপরিপক্ব ফল বলিয়া উপেক্ষিত। তাহা যে স্বতন্ত্রশ্রেণীর পরিপক্ব সভ্যতা, সে কথা কেহ স্বীকার করিতে সম্মত হইবার পূর্ব্বে, বিচার-বিতণ্ডায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, নীরস তর্কে পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আদর্শ একরূপ হইতে পারে না। বাঙালী সাহেব নহে বলিয়া

যেমন বাঙালীজন্ম বিফল ভাবিয়া উদ্বন্ধনে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা মস্তিষ্কবিকারের প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে, প্রাচ্য প্রতীচ্য নহে বলিয়া হাহাকার করাও সেইরূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মূলসূত্রেই প্রবল পার্থক্য। প্রাচ্যসভ্যতা সংযমকেই মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, প্রতীচ্যসভ্যতা সম্ভোগকে তাহাও উর্দ্ধে আসনপ্রদান করিয়া থাকে। প্রতীচ্য কাড়িয়া খায়; প্রাচ্য বিলাইয়া দিয়াই আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। আমাদের প্রতীচ্যশিক্ষা আমাদিগকে কাড়িয়া খাইবার লালসা দান করিয়া অশান্ত করিতেছে; কাড়িয়া খাইবার মত বাহুবল ও স্বাধীনতা দিলে, আমরাও এতদিনে দানব হইয়া উঠিতাম।

আমাদিগের ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম, মানবের ক্রমোন্নতিলাভেই তাহা আত্মতৃপ্ত হইয়া সাফল্যলাভ করে। সে ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইলে, পরকে আপন করিতে হয়; ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হয়; নরনারীর কল্যাণকামনায় আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইতে হয়। বাহুবলে প্রাচ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইতে পারে না। তাহা পাশবধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। ব্রাহ্মণ মানবধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্ম সর্ব্বভূতের কল্যাণকামনায় দীর্ঘতপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন উদারনীতির উপদেশ বিতরণ করিতেন, তখন জনসমাজ তাহার মর্য্যাদারক্ষা করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইতে পারিত। এখনও ব্রাহ্মণকে সমাজপতি করিলে, তাঁহার শাসন জনসমাজের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। তাহার পূর্ব্বে জনসমাজকে প্রাচ্যসভ্যতার মূলতত্ত্ব নূতন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেই সকল কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। ব্রাহ্মণের বাক্যপালনের জন্য জনসমাজকে সুশিক্ষিত করাও আবশ্যক। ব্রাহ্মণ পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আসনে সুখোপবিষ্ট হইবামাত্রই তারারবে শ্রুতিপাঠ করিয়া কহিবেন—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব"; জনসমাজ তাহাতে কিছুমাত্র উপকার লাভ করিবে না। কৌতূহলবশত একবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে, পরক্ষণেই তাঁহার উপদেশবাক্য নিতান্ত অর্থহীন বলিয়া সমালোচনা করিতে করিতে গৃহকোটরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সাধুজীবন লাভ করিবার লালসা স্বাভাবিক হইলেও, সাধুজীবন লাভ করা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তাহারই নাম তপস্যা। তাহার আরম্ভেই বিধিনিষেধের তীব্রতাড়না, তাহারই নাম সংযম। জনসমাজ কি সে তাড়না সহ্য করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে? ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জনসমাজ নিতান্ত অচেতন অবস্থায় দিনপাত করিতেছে। চেতনা থাকিলে, ধিক্কারেই তাহাকে স্বদেশের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিত। স্বদেশপ্রেমিক হওয়া দূরে থাকুক, আমরা সকলেই অল্পাধিকমাত্রায় স্বদেশদ্রোহী। যাহাতে ভারতবর্ষের কল্যাণ, তাহা আমাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না; যাহাতে তাহার সমূহ অকল্যাণ, তাহাই নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কখন জ্ঞাতসারে, কখন বা অজ্ঞাতসারে, আমরা সকলেই তাহার সহায়তাসাধন করিতেছি।

ছাত্রজীবন ক্রমশ ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। গার্হস্থ্যজীবন গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ক্রমশ আত্মম্ভরী হইয়া উঠিতেছে; এই দুই আশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রম এক্ষণে অবলম্বিত হয় না। জনসমাজ আশ্রমচতুষ্টয়ের শিক্ষায় সমুন্নত হইবে বলিয়াই ব্রাহ্মণ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়াছে প্রথম এবং দ্বিতীয় আশ্রম সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এখন প্রথম আশ্রমে বর্ত্তমান, একবার তাঁহাদের সংস্কারসাধনের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেই দেশের দুর্দ্দশা যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের হাব ভাব বিলাস ছাড়িয়া, নগ্নপদে গৈরিকবসনে ব্রহ্মচর্য্যের আত্মসংযমলাভার্থ সিগারেট্ ছাড়িয়া, হরীতকী গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না।

তথাপি "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,"—সম্মুখে অগ্রসর হইবার অন্য পন্থা বিদ্যমান নাই। নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম হইলেও, তাহার উপর দিয়াই গমন করিতে হইবে। যাঁহারা সেই পথের পরিচালক হইয়া, শিক্ষকনাম গ্রহণ করিয়া, ছাত্রজীবনের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র সুসংস্কৃত না হইলে, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্যে সুসংযত না হইলে গার্হস্থ্যজীবন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবে না। জনসমাজ এইরূপে সংস্কৃত হইয়া না উঠিলে, ব্রাহ্মণ কদাপি স্বদেশীসমাজকে সমুন্নত করিতে সমর্থ হইবেন না। সময় আসিয়াছে কি না, এ বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করা অনাবশ্যক। সময় আসে না; তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়। তাহার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। আর কত নিম্নে নিপতিত হইব? এখনও সময় না আসিয়া থাকিলে, তাহা কখনও আসিবে বলিয়া বোধ হয় না। সময় আসিয়াছে। না আসিলে, ব্রাহ্মণের কাতর কণ্ঠে এরূপ করুণ আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিত না! ব্রাহ্মণ নিদ্রিত স্বদেশীসমাজকে প্রবুদ্ধ হইবার জন্য শঙ্খনিনাদে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ কম্পিত করিয়া ডাকিয়াছেন এখন জনসমাজের সাড়া দিবার সময়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সার সত্যের আলোচনা।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "সাক্ষাৎ উপলব্ধি শুধু-কেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। চিন্তাকে নিরোধ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিলে কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদেই তাহা সম্ভাবনীয়।" সংক্ষেপে এ যাহা বলা হইয়াছিল, ইহার ভিতরে দুইএকটি কথা আছে এরূপ, যাহার ভাবার্থের একটু এদিক্-ওদিক্ হইলে ভ্রম অনিবার্য্য। এই যে একটি কথা বলা হইয়াছিল যে, "সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধু-কেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে", ইহার অর্থ এ নহে যে, সাক্ষাৎ-উপলব্ধির সঙ্গে চিন্তা'র কোনো সম্পকই নাই;- সম্পর্ক খুবই আছে—শক্তরকমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; তাহা যদি না থাকিবে, তবে চিন্তা-বেচারী সাক্ষাৎ-উপলব্ধির আঁচল ধরিয়া রাত্রিদিন ঘুরিয়া বেড়াইবেই বা কেন, আর, সাক্ষাৎ-উপলব্ধি হইতে দূরে পড়িলে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেই বা কেন? চিন্তা কিছু-আর সাক্ষাৎ-উপলব্ধির পর নহে; ঠিক্ তাহার বিপরীত। চিন্তা সাক্ষাৎ-উপলব্ধির স্নেহের ললনা। তুমি হয় তো বলিবে—"তবে কেন চিন্তা'কে নিরোধ করিতে বলিতেছ?" নিরোধ করিতে বলিতেছি এইজন্য—যেহেতু চিন্তা নিতান্তই চঞ্চলপ্রকৃতি বালিকা। একটি কচি মেয়ে যদি মাতার হস্তের অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে যায়, তবে পার্শ্ববর্ত্তী হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তিনি তদ্দণ্ডে মেয়েটিকে বলপূর্ব্বক টানিয়া-আনিয়া মাতৃক্রোড়ে সমর্পণ করেন। আমি তাই বলিতেছি যে, এলোমেলো পাগ্‌লী চিন্তাকে বিপথের কণ্টকবন হইতে বল-পূর্ব্বক টানিয়া-আনিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে সমর্পণ করা শুভান্বেষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ইহারই নাম চিন্তাকে নিরোধ করা। চিন্তাকে রোধ করিলে চিন্তাকে বধ করা হয় না;—হয় কেবল চিন্তাকে বিপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনা; অমূলক কল্পনা এবং অসম্বদ্ধ জল্পনা'র পথ হইতে বাস্তবিক-সত্যের পথে ফিরাইয়া আনা। এই গেল চিত্ত-নিরোধ। এত-দ্ব্যতীত, বিগত প্রবন্ধে ঐ কথাটির লেজুড় টানিয়া আর-একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বালোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; যেহেতু উভয়ে উভয়ের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত।" তুমি হয় তো বলিবে যে, হইতেছে চিন্তা-নিরোধের কথা—মাঝে হইতে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আনিয়া তাহার গুরুভার ঐ ক্ষুদ্র বেচারিটির স্কন্ধে চাপাইয়া-দেওয়া হইতেছে কেন?

তাহা যদি বলো—তবে নিম্নে প্রণিধান কর :—

ছয়টি মন্তব্য কথা।

(১) সত্য আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য পাত্র তৈয়ারি করিতেছেন অনবরত।

(২) সে পাত্র মনুষ্য, বা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড।

(৩) সত্য আপনাকে আপনি যেরূপে প্রকাশ করেন, তাহাই সত্য।

(৪) সত্যের হস্ত হইতে টাট্‌কা-টাট্‌কি সত্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ;—ইহারি নাম সাক্ষাৎ-উপলব্ধি (intuition)।

(৫) তাহা না করিয়া (সত্যের হস্ত হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সত্যগ্রহণ না করিয়া) চিন্তা খাটাইয়া আপনার বলে সত্য গড়িয়া তুলিতে যাওয়া নিতান্তই পাগলামি। সেরূপে-গড়িয়া-তোলা সত্য একপ্রকার ব্যাসের কাশী অথবা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।

(৬) অতএব চিন্তাকে থামাও কল্পনাকে থামাও—যাহা-কিছু পড়িয়াছ-শুনিয়াছ, সব ভুলিয়া যাও—মনের সমস্ত সংস্কার ধুইয়া-পুঁছিয়া মন'কে ধব্‌ধবে পরিষ্কার কর —মন'কে নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় প্রশান্ত কর—নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা'র ন্যায় একাগ্র এবং স্থিরীভূত কর—সত্য আপনাকে আপনি কিরূপে প্রকাশ করেন, তাহারই প্রতি চাতকের ন্যায় চাহিয়া থাক। যাবৎ-পর্য্যন্ত সত্য আপনার বলে এবং আপনার রকমে প্রকাশিত না হ'ন- তাবৎপর্য্যন্ত তুমি কোনো কথা মুখে উচ্চারণ্‌ করিও না ; বলিও না যে, সত্য নিরাকার বা সত্য সাকার বা সত্য জ্যোতি বা সত্য অন্ধকার, ইত্যাদি। আপনার একটা পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার লইয়া সত্যের সম্মুখে আড়াল হইয়া দাঁড়াইও না। সত্যকে আগে প্রকাশ পাইতে দাও ; স্বয়ং প্রকাশ পাইতে দাও ; তাহার পরে তৎসম্বন্ধে তোমার যাহা বলিবার, তাহা বলিও ; তাহার পূর্ব্বে কোনোপ্রকার পুঁথিগত বিদ্যা খরচ করিতে যাইও না—কোনোপ্রকার শেখা-কথা তোতাপাখীর মতো আওড়াইতে থাকিও না।

বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অবতারণা।

উপরি-উক্ত-রূপে চিন্তাকে নিরোধ করিলে, করা হয় একপ্রকার অতলস্পর্শ মহাসাগরে নিমজ্জন—অনাকাশ এবং অকালের মহাসাগরে নিমজ্জন। যেখানে পূর্ব্বপশ্চিম, উত্তরদক্ষিণ, উপরনীচে নাই- ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নাই সেই অকূল মহাসাগরে নিমজ্জন। সেই অতলস্পর্শ গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে— প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে —যে-এক বিশ্ব-বিধরণী মহতী শক্তি—যে-এক অটল প্রতিষ্ঠা—যে-এক জ্ঞান—যে-এক জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তাহাই তুমি সত্য বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করিবে। তুমি হয়তো বলিবে—"বেজায় কল্পনা! ভূতগত কল্পনা! এক-তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এই যে, আকাশ এবং কালের অতীত প্রদেশে কল্পনারই কেবল দৌড় চলে, তা ভিন্ন, কোনো মর্ত্ত্য জীবেরই সেখানে গতিবিধি নাই ; তাহাতে আবার, যদি-বা কল্পনার কুহকে ভুলিয়া সমস্ত ভাবনা-চিন্তার পরপারে অপার শান্তির গন্ধর্ব্বনগর পত্তন করিবার আশা আমার মনোমধ্যে সতেজে

অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বাড়িয়া উঠিতে-না-উঠিতেই দুরন্ত কল্পনা প্রশান্ত অন্ধকারের মধ্য হইতে জ্যোতি জাগাইয়া-তুলিয়া আশা বেচারিটি'র মস্তকে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিল। রক্ষা এই যে, সে আশাও যেমন, আর সে বজ্রও তেমনি, দুইই বাতাস। বাতাসের অস্ত্রের চোট বাতাসের উপর দিয়াই ক্ষপিত হইয়া গিয়াছে -ভালই হইয়াছে; এখন তবে আমি বিদায় হই।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, "অত ব্যস্ত হইও না- একটু স্থির হও। স্বীকার করিলাম যে, যাহা-কিছু আমি বলিলাম, সমস্তই আগা-গোড়া নিছক কল্পনা। কিন্তু সুপ্তি এবং জাগরণ প্রত্যহ যাহা তোমার ঘটিতেছে, তাহা কি? তাহাও কি কল্পনা? প্রতি রজনীতে তুমি যে অগাধ প্রশান্তির সাগরগর্ভে তলাইয়া যাইতেছ, তাহাও কি কল্পনা? আবার, প্রাতঃকালে যে, সেই অন্ধকারের গর্ত্ত হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহাও কি কল্পনা? দুয়ের কোনোটিই যদি কল্পনা না হয়, তবে যাহার জন্ম এত সাধ্যসাধনা—সাগরে ডুব-দেওয়া-দিয়ি—তাহা হাতের কাছে অনাহূত আসিয়া উপস্থিত; কি? না, পরমাত্মার প্রকাশ—জাগ্রত-জীবন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এই তো চিন্তা-নিরোধের কথা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া নিরবচ্ছেদে সীধা চলিয়া বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারোপান্তে আসিয়া পড়িলাম। এইখানে থামিয়া-দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত সাতটি বিষয় ক্রমান্বয়ে দ্রষ্টব্য :—

(১) অব্যক্তের অন্ধকারগর্ত্ত হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া পড়ে—এটা কবির কল্পনা নহে, পরন্তু প্রাত্যহিক ঘটনা।

(২) যদি কোনো কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবৃত্তান্ত মনে ভাবিতে যা'ন, তবে তিনি ঐ প্রাত্যহিক ঘটনাটিকেই অনির্দেশ্য অতীত-কালে চালাইয়া-দিয়া তাহার প্রতি কল্পনার দূরবীক্ষণ প্রেরণ করেন; এবং তাহাকেই কাব্যালঙ্কার দিয়া মাত্রাতীত মহান্ এবং সুন্দর করিয়া সাজা'ন—তাহার অধিক কিছুই করেন না। প্রকৃত কথা এই যে, প্রলয়ের অন্ধকার সুষুপ্তির অন্ধকার হইতে কোনো অংশে বেশীও নহে, কমও নহে। সুষুপ্তির অন্ধকারের মধ্য হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে আশ্চর্য্যময় প্রকাশ, এ প্রকাশ মান্ধাতার আমলেও যেমন ছিল এখনো তেমনি রহিয়াছে। পরিমাণঘটিত ছোটো-বড় এবং মাত্রাঘটিত কম বেশীর কথা এখানে হইতেছে না। প্রকাশ জিনিস্‌টা কি এবং অপ্রকাশই বা জিনিস্‌টা কি, তাহাই এখানে একমাত্র দ্রষ্টব্য এবং একমাত্র বিবেচ্য।

(৩) বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ পরস্পরের প্রতিযোগিতাগুণেই প্রকাশ এবং অপ্রকাশ। ছবিতোলা যন্ত্রের প্রথম উন্মেষের আতপাঙ্ক অন্ধকারের ঘোম্‌টা'র মধ্যে কেমন পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়! ফট্‌ফ'টে আলোকের সম্মুখে ধরিলে তাহা একেবারেই অপ্রকাশ হইয়া যায়। প্রকাশের কারণ তবে কি অন্ধকার বা অপ্রকাশ? ইহার উত্তর এই যে, আলোকও প্রকাশের ষোলো-আনা কারণ নহে, অন্ধকারও প্রকাশের ষোলো-আনা কারণ নহে। প্রকাশের ষোলো-

আনা কারণ হ'চ্চে আলোক এবং অন্ধকারের প্রতিযোগিতা। আলোক কেবল প্রকাশের আট-আনা কারণ; অন্ধকারও তাই।

(৪) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার প্রথম মুহূর্ত্তে দর্শকের চক্ষে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহাতে (১) এপিটে প্রকাশ, (২) ওপিটে অপ্রকাশ, এবং (৩) দুয়ের মাঝখানে শক্তির সঙ্কোচ-বিকোচ বা স্পন্দন, এই তিনটি ব্যাপার গা-ঘঁ্যাসাঘেঁসি করিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হয়। ওপিটের ঐ যে অপ্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয়নাম তমোগুণ, এপিটের এই যে প্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয়নাম সত্ত্বগুণ; মাঝের সেই যে স্পন্দনক্রিয়া, তাহার শাস্ত্রীয়নাম রজোগুণ। তিন গুণের সবটা একসঙ্গে ধরিয়া ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি।

(৫) সমগ্র প্রকৃতিকে আমরা বলিতেছি—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড (অর্থাৎ আমরা প্রতিজনে) সেই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত; এবং পরমাত্মা সেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব।

(৬) হংসশাবক যেমন অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তেমনি, ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড অচেতন-অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করিয়া বাহির হইবামাত্র বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি উন্মুখ হয়। এরূপ যে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ অতীব স্পষ্ট। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র—তাহা অভাবের আলয়; বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ—তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের যত-কিছু অভাব আছে— সমস্তেরই পূরণ হইতে পারে—পূরণ হওয়া চাই—এবং পূরণ হইতেছে অনবরত—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে। কচি-ছেলের অভাব-মোচনের জন্য মাতৃক্রোড়ে যেমন সমস্ত ভোগ-সামগ্রী পূর্ব্ব হইতেই সাজানো রহিয়াছে—শয়নের শয্যা, ক্রীড়ার দোলা, হৃদয়ের স্নেহ, জ্ঞানের উন্মেষণী মাতৃভাষা, সমস্তই পূর্ব্ব হইতে সাজানো রহিয়াছে; ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের অভাবমোচনের জন্য বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডেও অবিকল সেইরূপ। কাজেই সূর্য্যমুখীফুলের ন্যায় ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি স্বভাবতই উন্মুখ।

(৭) আমাদের সুষুপ্তিকালে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা একচুলও বিলুপ্ত হয় না—পরন্তু ষোলো-আনা মজুত থাকে। কিন্তু তৎকালে —না আমাদের সম্মুখে তাহা প্রতিভাত হয়, না আমাদের অন্তরে তাহা প্রতিভাত হয়। সুষুপ্তিকালে আমাদের আত্মসত্তাও অন্তরে প্রতিভাত হয় না এবং বহির্বস্তুর সত্তাও সম্মুখে প্রতিভাত হয় না। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ যে মাত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখীন হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের বাহিরে এবং ভিতরে উভয়ত্র এপিট-ওপিট ভাবে— সমগ্র বিশ্বের বাস্তবিক সত্তা প্রকাশমান হইয়া উঠে। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ইহাকে যখন এক প্রকাশ, বা এক শক্তি, বা এক সত্তা বলিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় স্পষ্ট যে, সে-যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ, তাহা চেতনের নিকটে চেতনের প্রকাশ, আত্মার নিকটে আত্মার প্রকাশ, জীবাত্মার নিকটে পরমাত্মার প্রকাশ। যেহেতু প্রকৃতি এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রাচীরের ব্যবধান নাই।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে, অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা এখনো বলিবার আছে ;—তাহা ক্রমশ প্রকাশ্য।

প্রথমে আমি বলিয়াছিলাম "মন হইতে সমস্ত সংস্কার এবং ভাবনা-চিন্তা দূরে সরাইয়া-দিয়া সত্যের হস্ত হইতে সত্য গ্রহণ কর—সত্যের সম্মুখে আপনি আড়াল হইয়া দাঁড়াইও না।" এটা আমি বলিয়াছিলাম শুদ্ধকেবল জমি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া। ঐ সোজা কথাটির অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, মনের ঐরূপ সংস্কারশূন্য অবস্থার নামই সত্যের উপলব্ধি। তখনই বলিব সত্যের সাক্ষাৎ-উপলব্ধি হইল, যখন দেখিব যে, সেই তৈয়ারি-করা জমি'তে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল এবং প্রশান্ত অন্তঃকরণে—বাস্তবিকই সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটিল। তুমি হয় তো বলিবে এই যে, সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মার প্রকাশ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না ;—পরমাত্মার প্রকাশের সঙ্গে তুমি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ জুড়িয়া দিতেছ, সেইটিই হ'চ্চে গোলোযোগের মূল। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, পরমাত্মা স্বয়ং যখন নির্ম্মলচিত্ত সাধকের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হ'ন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকুক বা না থাকুক্—সাধকের তাহাতে কিছুই যায়-আসে না। তা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, পরমাত্মা আপনার প্রকাশ'কে দূরে সরাইয়া-রাখিয়া শুধুই কি আপনার সত্তামাত্র সাধকের অন্তঃকরণে উদ্বোধিত করেন, অথবা সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনই একযোগে উদ্বোধিত করেন? অবশ্য বলিতে হইবে যে, পরমাত্মা সাধকের তৈয়ারি-করা জমিতে—নির্ম্মল অন্তঃকরণে—আপনার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আবির্ভূত হ'ন ; কেন না, পরমাত্মার সত্তামাত্র বিনা-সাধনেই লোকের মনে (মনুষ্যমাত্রেরই মনে) পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত রহিয়াছে ; তাহার জন্য শিক্ষারও প্রয়োজন নাই —গুরূপদেশেরও প্রয়োজন নাই—যুক্তি-তর্কেরও প্রয়োজন নাই সাধনেরও প্রয়োজন নাই চিত্তশুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, সযত্নে তৈয়ারি করা সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মা আপনার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আবির্ভূত হ'ন। তবেই হইতেছে যে, সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া আবির্ভূত হ'ন ; যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নামই পরমাত্মার প্রকাশ এবং পরমাত্মার প্রকাশের নামই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমাত্মা কি সাধকের অন্তঃকরণে নূতন কোনো-একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত হ'ন—অথবা আবহমান-কালের এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—যাহা আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি—এই চিরন্তন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত হ'ন? ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক সাধকের জন্য নূতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এক-তো বাড়া'র ভাগ, তা ছাড়া, একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বই দুই হইতে পারে না। বেদের এ কথা খুবই সত্য যে, "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে প্রকাশ—যাহা আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি ইহাই পরমাত্মার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া"—ইহা ব্যতীত আর-একটা নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা —যেমন ব্যাসের কাশী বা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ—নিতান্তই অস্বাভাবিক। ইহার বিরুদ্ধে তুমি হয় তো বলিবে যে, "এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতি ছার পদার্থ;—ইহা পরমাত্মার প্রকাশ নহে—ইহা পরমাত্মার আবরণ।" তাহা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, "আবরণ কাহার নিকটে? যাহার অন্তঃকরণ মোহ-কুজ্ঝটিকার ঘন আবরণে আবৃত, তাহার নিকটে সবই আবরণ। পক্ষান্তরে, যাঁহার অন্তঃকরণ কুজ্ঝটিকামুক্ত, নির্ম্মল, স্থির এবং প্রশান্ত, তাঁহার নিকটে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকাশ পরমাত্মারই প্রকাশ। এইজন্য বলিতেছি যে, অন্তঃকরণ হইতে সমস্ত পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার এবং ভাবনা-চিন্তা দূরে সরাইয়া-দিয়া অন্তঃকরণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রশান্ত কর, এবং এই অভাবপূর্ণ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড আপনার অভাবের পূরণকামনায় স্বভাবতই যে মাতৃমুখের প্রতি উন্মুখ হয়—সেই মাতৃমুখের দিকে—বিশ্বপ্রকাশের দিকে—সুবিমল মনোদর্পণ বাগাইয়া ধর, তাহা হইলেই সেই এক প্রকাশেই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশেই—পরমাত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনেরই যুগপৎ প্রকাশ হইবে।

এই যে কথাগুলি বলিলাম, ইহার ভিতরে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা চাপাচুপি দেওয়া রহিয়াছে; সেগুলি ভাঙিয়া বলা আবশ্যক। বারান্তরে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড়োদারাজ গায়কবাড়।*

রাগিণী ভূপালি—তাল তেওরা।†

বঙ্গজননী-মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে!
জয় বড়োদারাজ হে!
শঙ্খ, বাজহ বাজ হে
জয় নৃপোত্তম পুরুষসত্তম
জয় বড়োদারাজ হে!

ভাষিছে শুন বঙ্গবাণী
রাজদর্শন পুণ্য মানি—
এসহে নৃপ, এস হে,
ধন্য কর এ দেশ হে!

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয়কীর্ত্তিসৌরভ,
এস তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল,
নাশ ভারতলাজ হে!
রাজধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে
লোকহৃদয়ে রাজ' হে!

শঙ্খ, বাজহ, বাজ হে—
জয় নৃপোত্তম, পুরুষসত্তম
জয় বড়োদারাজ হে!

---

* বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশনে বড়োদারাজ গায়কবাড়ের অভ্যর্থনার উপলক্ষ্যে রচিত।
† সর্ব্বত্র দীর্ঘহ্রস্ব রক্ষা করিয়া পড়িতে হইবে।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৫১

চন্দ্রমোহনের কাছে রমেশের খবর পাইয়া অক্ষয়ের মনে অনেকগুলা চিন্তার উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কি? রমেশ গাজিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছিল—এতদিন নিজেকে যথেষ্ট গোপনেই রাখিয়াছিল—ইতিমধ্যে এমন কি ঘটিল, যাহাতে সে সেখানকার প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িয়া-দিয়া আবার সাহসপূর্ব্বক কলুটোলার গলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অন্নদাবাবুরা যে কাশীতে আছেন, কোন্‌দিন রমেশ কোথা হইতে সে খবর পাইবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হাজির হইবে।" অক্ষয় স্থির করিল, ইতিমধ্যে গাজিপুরে গিয়া সে সমস্ত সংবাদ জানিবে এবং তাহার পর একবার কাশীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসিবে।

একদিন অগ্রহায়ণের অপরাহ্নে অক্ষয় তাহার ব্যাগ হাতে করিয়া গাজিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে বাজারে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু বলিয়া একটি বাঙালি উকিলের বাসা কোন্‌দিকে?"—অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাজারে রমেশবাবুনামক কোনো ব্যক্তির উকিল বলিয়া কোনো খ্যাতি নাই। তখন সে আদালতে গেল। আদালত তখন ভাঙিয়াছে। শাম্‌লা-পরা একটি বাঙালি উকিল গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল—"মশায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরী বলিয়া একটি নূতন বাঙালি উকিল গাজিপুরে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসা কোথায় জানেন?"

অক্ষয় ইঁহার কাছ হইতে খবর পাইল যে, 'রমেশ ত এতদিন খুড়ামশায়ের বাড়ীতেই ছিল, এখন সে সেখানে আছে, কি কোথাও গেছে, তাহা বলা যায় না। তাহার স্ত্রীকে পাওয়া যাইতেছে না, সম্ভবত তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।'

অক্ষয় খুড়ার বাড়ীতে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, "এইবার রমেশের চালটা বুঝা যাইতেছে। স্ত্রী মারা গিয়াছে, এখন সে অসঙ্কোচে হেমনলিনীর কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার স্ত্রী কোনোকালেই ছিল না। হেমনলিনীর

অবস্থা যেরূপ, তাহাতে রমেশের কথা অবিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে!" —যাহারা ধর্ম্মনীতি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়ায়, গোপনে তাহারা যে কি ভয়ানক লোক, অক্ষয় তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল।

খুড়ার কাছে গিয়া তাঁহাকে রমেশের ও কমলার কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "আপনি যখন রমেশবাবুর বিশেষ বন্ধু, তখন আমার মা কমলাকে নিশ্চয় আপনি আত্মীয়ের মতই জানেন; কিন্তু আমি এ কথা বলিতেছি, কয়েকদিনমাত্র তাঁহাকে দেখিয়া আমি আমার নিজের কন্যার সহিত তাঁহার প্রভেদ ভুলিয়া গেছি। দুদিনের জন্য মায়া বাড়াইয়া মা-লক্ষ্মী যে আমাকে এমন বজ্রাঘাত করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ কি আমি জানিতাম!"

অক্ষয় মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "এমন ঘটনাটা যে কি করিয়া ঘটিল, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই রমেশ কমলার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নাই।"

খুড়া। আপনি রাগ করিবেন না,—আপনাদের রমেশটিকে আমি আজ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিলাম না। এদিকে বাহিরে ত দিব্য লোকটি, কিন্তু মনের মধ্যে কি ভাবেন, —কি করেন, বুঝিবার জো নাই। নহিলে কমলার মত অমন স্ত্রীকে কি মনে করিয়া যে অনাদর করিতেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কমলা এমন সতী-লক্ষ্মী, আমার মেয়ের সঙ্গে তার আপন বোনের মত ভাব হইয়াছিল—তবু কখনো একদিনের জন্যও নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও কহে নাই। আমার মেয়ে মাঝে মাঝে বুঝিতে পারিত যে, সে মনের মধ্যে খুবই কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু শেষদিন পর্য্যন্ত একটি কথা বলাইতে পারে নাই। এমন স্ত্রী যে কি অসহ্য কষ্ট পাইলে এমন কাজ করিতে পারে, তাহা ত আপনি বুঝিতেই পারেন, সে কথা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। আবার আমার এম্নি কপাল, আমি তখন এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছিলাম, নহিলে কি মা কখনো আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন!

পরদিন প্রাতে খুড়াকে লইয়া অক্ষয় রমেশের বাংলা ও গঙ্গার তীর ঘুরিয়া আসিল। ঘরে ফিরিয়া-আসিয়া কহিল, "দেখুন মশায়, কমলা যে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আপনি যতটা নিঃসংশয় হইয়াছেন, আমি ততটা হইতে পারি নাই।"

খুড়া। আপনি কিরূপ মনে করেন?

অক্ষয়। আমার মনে হয়, তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন—তাঁহাকে ভালরূপ খোঁজ করা উচিত।

খুড়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কথাটা নিতান্তই অসম্ভব নহে।"

অক্ষয়। নিকটেই কাশীতীর্থ। সেখানে আমাদের একটি পরম বন্ধু আছেন—এমনো হইতে পারে, কমলা তাঁহাদের কাছে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

খুড়া আশান্বিত হইয়া কহিলেন, "কই,

তাঁহাদের কথা ত রমেশবাবু আমাদের কখনো বলেন নাই। যদি জানিতাম, তবে কি খোঁজ করিতে বাকি রাখিতাম?"

অক্ষয়। তবে একবার চলুন না, আমরা দুইজনেই কাশী যাই—পশ্চিম-অঞ্চল আপনার সমস্তই জানা শোনা আছে, আপনি ভাল করিয়া খোঁজ করিতে পারিবেন।

খুড়া এ প্রস্তাবে উৎসাহের সহিত সম্মত হইলেন। অক্ষয় জানিত, তাহার কথা হেমনলিনী সহজে বিশ্বাস করিবে না, এইজন্য প্রামাণ্য-সাক্ষীর স্বরূপে খুড়াকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে গেল।

৫২

সহরের বাহিরে ক্যান্টন্‌মেণ্টের অধিকারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় অন্নদাবাবুরা একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন।

অন্নদাবাবুরা কাশীতে পৌঁছিয়াই খবর পাইলেন, নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমঙ্করীর সামান্য জ্বরকাশী ক্রমে ন্যুমোনিয়াতে দাঁড়াইয়াছে। জ্বরের উপরেও এই শীতে তিনি নিয়মিত প্রাতঃস্নান বন্ধ করেন নাই বলিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

হেমনলিনী তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইল। তখন তাঁহার জ্বর অত্যন্ত বেশি, বুকে বেদনা, এবং মাঝে মাঝে বুদ্ধির ভুল হইতেছে। হেমকে দেখিয়া কহিলেন, "কে ও, বৌমা বুঝি, নলিনের খাওয়া হইয়াছে? যাও যাও, তাড়া কর!"

কয়েকদিন অশ্রান্তযত্নে হেম তাঁহার সেবা করার পর ক্ষেমঙ্করীর সঙ্কটের অবস্থা কাটিয়া গেল। কিন্তু তখনো তাঁহার অতিশয় দুর্ব্বল অবস্থা। শুচিতা লইয়া অত্যন্ত বিচার করাতে পথ্যজলপ্রভৃতিসম্বন্ধে হেমনলিনীর সাহায্য তাঁহার কোনো কাজে লাগিল না। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বপাক আহার করিতেন, এখন নলিনাক্ষ স্বয়ং তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল এবং আহারসম্বন্ধে মাতার সমস্ত সেবা নলিনাক্ষকে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহাতে ক্ষেমঙ্করী সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি ত গেলেই হ'ত, কেবল তোদের কষ্ট দিবার জন্যই আবার বিশ্বেশ্বর আমাকে বাঁচাইলেন।"

ক্ষেমঙ্করী নিজের সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চারিদিকে পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যবিন্যাসের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল। হেমনলিনী সে কথা নলিনাক্ষের কাছ হইতে শুনিয়াছিল। এইজন্য সে বিশেষ যত্নে চারিদিক্ পরিপাটি করিয়া এবং ঘরদুয়ার সাজাইয়া রাখিত এবং নিজেও যত্ন করিয়া সাজিয়া ক্ষেমঙ্করীর কাছে আসিত। অন্নদা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে যে বাগান ভাড়া করিয়াছিলেন, সেখান হইতে প্রত্যহ ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতেন, হেমনলিনী ক্ষেমঙ্করীর রোগশয্যার কাছে সেই ফুলগুলি নানারকম করিয়া সাজাইয়া রাখিত।

নলিনাক্ষ মাতার সেবার জন্য দাসী রাখিতে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু তাহাদের হস্ত হইতে সেবাগ্রহণ করিতে কোনোমতেই তাঁহার অভিরুচি হইত না। অবশ্য, জলতোলা প্রভৃতির জন্য চাকর রাখিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার একান্ত নিজের কাজগুলিতে বেতনভুক্ কোনো চাকরের হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারি-

তেন না। যে হরির মা ছেলেবেলায় তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সে মারা গিয়া অবধি অতিবড় রোগের সময়েও কোনো দাসীকে তিনি পাখা করিতে বা গায়ে হাত বুলাইতে দেন নাই।

সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড় ভালবাসিতেন। দশাশ্বমেধঘাটে প্রাতঃস্নান সারিয়া পথে প্রত্যেক শিবলিঙ্গে ফুল ও গঙ্গাজল দিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় একএকদিন কোথা হইতে হয় ত একটি সুন্দর খোট্টার ছেলেকে অথবা কোনো ফুট্‌ফুটে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। পাড়ার দুটিএকটি সুন্দর ছেলেকে তিনি খেলনা দিয়া, পয়সা দিয়া, খাবার দিয়া বশ করিয়াছিলেন, তাহারা যখন তখন তাঁহার বাড়ীর যেখানে-সেখানে উপদ্রব করিয়া খেলিয়া বেড়াইত, ইহাতে তিনি বড় আনন্দ পাইতেন। তাঁহার আর একটি বাতিক ছিল; ছোটোখাটো কোনো একটি সুন্দর জিনিষ দেখিলেই তিনি না কিনিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ সমস্ত তাঁহার নিজের কোনো কাজেই লাগিত না;—কিন্তু কোন্ জিনিষটি কে পাইলে খুসি হইবে, তাহা মনে করিয়া উপহার পাঠাইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। অনেকসময় তাঁহার দূর আত্মীয়পরিচিতেরাও এইরূপ একটা-কোনো জিনিষ ডাকযোগে পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। তাঁহার একটি বড় আবলুষ-কাঠের কালো সিন্ধুকের মধ্যে এইরূপ অনাবশ্যক সুন্দর সৌখীন জিনিষপত্র, রেশমের কাপড়চোপড় অনেক সঞ্চিত ছিল। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, নলিনের বৌ যখন আসিবে, তখন এগুলি সমস্ত তাহারই হইবে। নলিনের একটি পরমা সুন্দরী বালিকাবধূ তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে তাঁহার ঘর উজ্জ্বল করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—তাহাকে তিনি সাজাইতেছেন-পরাইতেছেন, এই সুখচিন্তায় তাঁহার অনেক দিনের অনেক অবসর কাটিয়াছে।

তিনি নিজে তপস্বিনীর মত ছিলেন,—স্নানাহ্নিকপূজায় প্রায় দিন কাটিয়া গেলে একবেলা ফলদুধমিষ্ট খাইয়া থাকিতেন, কিন্তু নিয়মসংযমে নলিনাক্ষের এতটা নিষ্ঠা তাঁহার ঠিক মনের মধ্যে ভাল লাগিত না। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের আবার অত আচারবিচারের বাড়াবাড়ি কেন?" পুরুষমানুষদিগকে তিনি বৃহৎবালকদের মত মনে করিতেন;—খাওয়াদাওয়া-চালচলনে উহাদের পরিমাণবোধ বা কর্ত্তব্যবোধ না থাকিলে সেটা যেন তিনি সস্নেহ প্রশ্রয়বুদ্ধির সহিত সঙ্গত মনে করিতেন—ক্ষমার সহিত বলিতেন, "পুরুষমানুষ কঠোরতা করিতে পারিবে কেন!" অবশ্য, ধর্ম্ম সকলকেই রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু আচার পুরুষমানুষের জন্য নহে, ইহাই তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন। নলিনাক্ষ যদি অন্যান্য সাধারণ-পুরুষের মত কিঞ্চিৎপরিমাণে অবিবেচক ও স্বেচ্ছাচারী হইত, সতর্কতার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ এবং অসময়ে তাঁহাকে স্পর্শকরাটুকু বাঁচাইয়া চলিত, তাহা হইলে তিনি খুসিই হইতেন।

ব্যামো হইতে যখন সারিয়া উঠিলেন, ক্ষেমঙ্করী দেখিলেন, হেমনলিনী নলিনাক্ষের

উপদেশ অনুসারে নানাপ্রকার নিয়মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন কি, বৃদ্ধ অন্নদাবাবুও নলিনাক্ষের সকল কথা প্রবীণ গুরুবাক্যের মত বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অবধান করিয়া শুনিতেছেন।

ইহাতে ক্ষেমঙ্করীর অত্যন্ত কৌতুকবোধ হইল। তিনি একদিন হেমনলিনীকে ডাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "মা, তোমরা দেখিতেছি, নলিনকে আরো ক্ষ্যাপাইয়া তুলিবে। ওর ও সমস্ত পাগ্‌লামির কথা তোমরা শোনো কেন? তোমরা সাজগোজ করিয়া হাসিয়া-খেলিয়া আমোদ-আহ্লাদে বেড়াইবে,—তোমাদের কি এখন সাধন করিবার বয়স? যদি বল, তুমি কেন বরাবর এই সব লইয়া আছ? তার একটু কথা আছে। আমার বাপ-মা বড় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে আমরা ভাইবোনেরা এই সকল শিক্ষার মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। এ যদি আমরা ছাড়ি ত আমাদের দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় থাকে না। কিন্তু তোমরা ত সেরকম নও তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা ত সমস্তই আমি জানি। তোমরা এ যা-কিছু করিতেছ, এ কেবল জোর করিয়া করিতেছ—তাহাতে লাভ কি মা! যে যাহা পাইয়াছে, সে তাহাই ভাল করিয়া রক্ষা করিয়া চলুক্, আমি ত এই বলি। না না, ও সব কিছু নয়—ও সমস্ত ছাড়। তোমাদের আবার নিরামিষ খাওয়া কি, যোগতপই বা কিসের! আর নলিনই বা এত-বড় গুরু হইয়া উঠিল কবে? ও এ সকলের কি জানে? ও ত সেদিন পর্য্যন্ত যা-খুসি-তাই করিয়া বেড়াইয়াছে, শাস্ত্রের কথা শুনিলে একেবারে মারমূর্ত্তি ধরিত। আমাকেই খুসি করিবার জন্য এই সমস্ত আরম্ভ করিল, শেষকালে দেখিতেছি, কোন্‌দিন পুরা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইবে। আমি ওকে বারবার করিয়া বলি, 'ছেলেবেলা হইতে তোর যা বিশ্বাস ছিল, তুই তাই লইয়াই থাক্, সে ত মন্দ কিছু নয় আমি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না।' শুনিয়া নলিন হাসে—ঐ ওর একটি স্বভাব সকল কথাই চুপ করিয়া শুনিয়া যায়—গাল দিলেও উত্তর করে না।"

অপরাহ্ণে পাঁচটার পর হেমনলিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে এই সমস্ত আলোচনা চলিত। হেমের খোঁপা-বাঁধা ক্ষেমঙ্করীর পছন্দ হইত না। তিনি বলিতেন, "তুমি বুঝি মনে কর মা, আমি নিতান্তই সেকেলে, এখনকার কালের ফেশান্ কিছুই জানি না। কিন্তু আমি যতরকম চুলবাঁধা জানি, এত তোমরাও জান না বাছা। একটি বেশ ভাল মেম্ পাইয়াছিলাম, সে আমাকে সেলাই শেখাইতে আসিত, সেই সঙ্গে কতরকম চুলবাঁধাও শিখিয়াছিলাম। সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত। কি করিব মা, সংস্কার, উহার ভালমন্দ জানি না—না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁইছুঁই করি, কিছু মনে করিয়ো না মা। ওটা মনের ঘৃণা নয়—ও কেবল একটা অভ্যাস। নলিনদের বাড়ীতে যখন অন্তরূপ মত হইল, হিন্দুয়ানি ঘুচিয়া গেল, তখন ত আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, কোনো কথাই বলি নাই—আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি যে, যাহা ভাল বোঝ কর—আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, এত-

কাল যাহা করিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়িতে পারিব না।"—বলিতে বলিতে ক্ষেমঙ্করী চোখের একফোঁটা জল তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

এম্‌নি করিয়া, হেমনলিনীর খোঁপা খুলিয়া-ফেলিয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ লইয়া প্রত্যহ নূতন-নূতন-রকম বিনানি করিতে ক্ষেমঙ্করীর ভারি ভাল লাগিত। এমনো হইয়াছে, তিনি তাঁহার সেই আব্‌লুষকাঠের সিন্ধুক হইতে নিজের পছন্দসই-রঙের কাপড় বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছেন। মনের মত করিয়া সাজাইতে তাঁহার বড় আনন্দ। প্রায়ই প্রতিদিন হেমনলিনী তাহার সেলাই আনিয়া ক্ষেমঙ্করীর কাছে দেখাইয়া-লইয়া যাইত—ক্ষেমঙ্করী তাহাকে নূতন নূতন রকমের সেলাইসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ সমস্তই তাঁহার সন্ধ্যার সময়কার কাজ ছিল। বাংলা মাসিকপত্র এবং গল্পের বই পড়িতেও উৎসাহ অল্প ছিল না। হেমনলিনীর কাছে যাহা-কিছু বই এবং কাগজ ছিল, সমস্তই সে ক্ষেমঙ্করীর কাছে আনিয়া দিয়াছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধ ও বই সম্বন্ধে ক্ষেমঙ্করীর আলোচনা শুনিয়া হেম আশ্চর্য্য হইয়া যাইত —ইংরাজি না শিখিয়া যে এমন বুদ্ধিবিচারের সহিত চিন্তা করা যায়, হেমের তাহা ধারণাই ছিল না। নলিনাক্ষের মাতার কথাবার্ত্তা এবং সংস্কার-আচরণ সমস্তটা লইয়া হেমনলিনীর তাঁহাকে বড়ই আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। সে যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই নয়, সমস্তই অপ্রত্যাশিত।

৫৩

ক্ষেমঙ্করী পুনর্ব্বার জ্বরে পড়িলেন। এবারকার জ্বর অল্পের উপর দিয়া কাটিয়া গেল। সকালবেলায় নলিনাক্ষ প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইবার সময় বলিল, "মা, তোমাকে কিছুকাল রোগীর নিয়মে থাকিতে হইবে। দুর্ব্বল শরীরের উপর কঠোরতা সহ্য হয় না।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "আমি রোগীর নিয়মে থাকিব, আর তুমিই যোগীর নিয়মে থাকিবে! নলিন, তোমার ও সমস্ত আর বেশিদিন চলিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে এবার বিবাহ করিতেই হইবে।"

নলিনাক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "দেখ বাছা, আমার এ শরীর আর গড়িবে না—এখন তোমাকে আমি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে মনের সুখে মরিতে পারিব। আগে মনে করিতাম, একটি ছোট ফুট্‌ফুটে বৌ আমার ঘরে আসিবে, আমি তাহাকে নিজের হাতে শিখাইয়া-পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিব, তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া মনের সুখে থাকিব। কিন্তু এবার ব্যামোর সময় ভগবান্ আমাকে চৈতন্য দিয়াছেন। নিজের আয়ুর উপরে এতটা বিশ্বাস রাখা চলে না, আমি কবে আছি কবে নাই, তার ঠিকানা কি। একটি ছোটো মেয়েকে তোমার ঘাড়ের উপর ফেলিয়া গেলে সে আরো বেশি মুস্কিল হইবে। তার চেয়ে তোমাদের নিজেদের মতে বড়-বয়সের মেয়েই বিবাহ কর। জ্বরের সময় এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার রাত্রে ঘুম হইত না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, এই

আমার শেষ কাজ বাকি আছে এইটি সম্পন্ন করিবার অপেক্ষাতেই আমাকে বাঁচিতে হইবে, নহিলে আমি শান্তি পাইব না।"

নলিনাক্ষ। আমাদের সঙ্গে মিশ খাইবে, এমন পাত্রী পাইব কোথায়?

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আচ্ছা, সে আমি ঠিক করিয়া তোমাকে বলিব এখন—সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

আজ পর্য্যন্ত ক্ষেমঙ্করী অন্নদাবাবুর সম্মুখে বাহির হন নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বেড়াইতে বেড়াইতে অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ক্ষেমঙ্করী অন্নদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন—"আপনার মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—তাহার 'পরে আমার বড়ই স্নেহ পড়িয়াছে। আমার নলিনকে ত আপনারা জানেন, সে ছেলের কোনো দোষ কেহ দিতে পারিবে না—ডাক্তারিতেও তাহার বেশ নাম আছে। আপনার মেয়ের জন্য এমনতর সম্বন্ধ কি শীঘ্র খুঁজিয়া পাইবেন?"

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি! এমনতর কথা আশা করিতেও আমার সাহস হয় নাই। নলিনাক্ষের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিবাহ হয়, তবে তার অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে! কিন্তু তিনি কি—"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"নলিন আপত্তি করিবে না। সে এখনকার ছেলেদের মত নয়, সে আমার কথা মানে। আর, এর মধ্যে পীড়াপীড়ির কথাই বা কি আছে! আপনার মেয়েটিকে পছন্দ না করিবে কে? কিন্তু এই কাজটি আমি অতি শীঘ্রই সারিতে চাই। আমার শরীরের গতিক আমি ভাল বুঝিতেছি না।"

সে রাত্রে অন্নদাবাবু উৎফুল্ল হইয়া বাড়ীতে গেলেন। সেই রাত্রেই তিনি হেমনলিনীকে ডাকিয়া কহিলেন—"মা, আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, আমার শরীরও ইদানীং ভাল চলিতেছে না। তোমার একটা স্থিতি না করিয়া যাইতে পারিলে আমার মনে সুখ নাই। হেম, আমার কাছে লজ্জা করিলে চলিবে না; তোমার মা নাই, এখন তোমার সমস্ত ভার আমারই উপরে।"

হেমনলিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, তোমার জন্য এমন একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে যে, মনের আনন্দ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না। আমার কেবলি ভয় হইতেছে, পাছে কোনো বিঘ্ন ঘটে। আজ নলিনাক্ষের মা নিজে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।"

হেমনলিনী মুখ লাল করিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—"বাবা, তুমি কি বল! না না, এ কখনো হইতেই পারে না।"

নলিনাক্ষকে যে কখনো বিবাহ করা যাইতে পারে, এ সম্ভাবনার সন্দেহমাত্র হেমনলিনীর মাথায় আসে নাই—হঠাৎ পিতার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে লজ্জায়-সঙ্কোচে অস্থির করিয়া তুলিল।

অন্নদাবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কেন হইতে পারে না?"

হেমনলিনী কহিল, "নলিনাক্ষবাবু! এও

কি কখনো হয়!”--এরূপ উত্তরকে ঠিক যুক্তি বলা চলে না—কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা ইহা অনেকগুণে প্রবল।

হেম আর থাকিতে পারিল না—সে বারন্দায় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি এরূপ বাধার কথা কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার ধারণা ছিল, নলিনাক্ষের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে হেম মনে মনে খুসিই হইবে। হতবুদ্ধি বৃদ্ধ বিষণ্ণ-মুখে কেরোসিনের আলোর দিকে চাহিয়া স্ত্রীপ্রকৃতির অচিন্তনীয় রহস্য ও হেমনলিনীর জননীর অভাব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেম অনেকক্ষণ বারান্দার অন্ধকারে বসিয়া রহিল। তাহার পরে ঘরের দিকে চাহিয়া তাহার পিতার নিতান্ত হতাশমুখের ভাব চোখে পড়িতেই তাহার মনে বাজিল। তাড়াতাড়ি তাহার পিতার চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে কহিল—‘বাবা চল, অনেকক্ষণ খাবার দিয়াছে, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল।”

অন্নদাবাবু যন্ত্রচালিতবৎ উঠিয়া খাবারের জায়গায় গেলেন -কিন্তু ভাল করিয়া খাইতেই পারিলেন না। হেমনলিনীসম্বন্ধে সমস্ত দুর্য্যোগ কাটিয়া গেল মনে করিয়া তিনি বড়ই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হেমনলিনীর দিক্ হইতেই যে এত-বড় ব্যাঘাত আসিল, ইহাতে তিনি অত্যন্ত দমিয়া গেছেন। আবার তিনি ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে ভাবিলেন, “হেম তবে এখনো রমেশকে ভুলিতে পারে নাই।”

অন্যদিন আহারের পরেই অন্নদাবাবু শুইতে যাইতেন, আজ বারান্দায় ক্যাম্বিসের কেদারার উপরে বসিয়া বাড়ীর বাগানের সম্মুখবর্ত্তী ক্যান্টন্‌মেণ্টের নির্জ্জন রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হেম-নলিনী আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, “বাবা, এখানে বড় ঠাণ্ডা, শুইতে চল।”

অন্নদা কহিলেন, “তুমি শুইতে যাও, আমি একটু পরেই যাইতেছি।”

হেমনলিনী চুপ করিয়া তাঁহার পাশে দাড়াইয়া রহিল। আবার খানিক বাদেই কহিল, “বাবা, তোমার ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না হয় বসিবার ঘরেই চল।”

তখন অন্নদাবাবু চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কিছু না বলিয়া শুইতে গেলেন।

পাছে তাহার কর্ত্তব্যের ক্ষতি হয় বলিয়া হেমনলিনী রমেশের কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া নিজেকে পীড়িত হইতে দেয় না। এজন্য এপর্য্যন্ত সে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে যখন টান পড়ে, তখন ক্ষতস্থানের সমস্ত বেদনা জাগিয়া উঠে। হেমনলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনটা যে কিভাবে চলিবে, তাহা এপর্য্যন্ত সে পরিষ্কার কিছুই ভাবিয়া পাইতে-ছিল না—এই কারণেই একটা সুদৃঢ় কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া অবশেষে নলিনাক্ষকে গুরু মানিয়া তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখনি বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয়সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে, তখনি সে বুঝিতে পারে, সে বন্ধন কি কঠিন! তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে

আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে।

৫৪

এদিকে ক্ষেমঙ্করী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি তোমার পাত্রী ঠিক করিয়াছি।"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ?"

ক্ষেমঙ্করী। তা নয় ত কি? আমি কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব? তা শোন, আমি হেমনলিনীকেই পছন্দ করিয়াছি—অমন মেয়ে আর পাইব না। রংটা তেমন ফর্সা নয় বটে, কিন্তু—

নলিনাক্ষ। দোহাই মা, আমি রং-ফর্সার কথা ভাবিতেছি না। কিন্তু হেমনলিনীর সঙ্গে কেমন করিয়া হইবে? সে কি কখনো হয়?

ক্ষেমঙ্করী। ও আবার কি কথা! না হইবার ত কোনো কারণ দেখি না!

নলিনাক্ষের পক্ষে ইহার জবাব দেওয়া বড় মুস্কিল। কিন্তু হেমনলিনী—এতদিন যাহাকে কাছে লইয়া অসঙ্কোচে গুরুর মত উপদেশ দিয়া আসিয়াছে—হঠাৎ তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে নলিনাক্ষকে যেন লজ্জা আঘাত করিল।

নলিনাক্ষকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "এবারে আমি তোমার কোনো আপত্তি শুনিব না। আমার জন্য তুমি যে এই বয়সে সমস্ত ছাড়িয়া-দিয়া কাশি-বাসী হইয়া তপস্যা করিতে থাকিবে, সে আমি আর কিছুতেই সহ্য করিব না। এইবারে যে দিন শুভদিন আসিবে, সেদিন ফাঁক যাইবে না, এ আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

নলিনাক্ষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল —"তবে একটা কথা তোমাকে বলি মা। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়ো না। যে ঘটনার কথা বলিতেছি, সে আজ নয়দশমাস হইয়া গেল, এখন তাহা লইয়া উতলা হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার যেরকম স্বভাব মা, একটা অমঙ্গল কাটিয়া গেলেও তাহার ভয় তোমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। এইজন্যই কতদিন তোমাকে বলিব-বলিব করিয়াও বলিতে পারি নাই। আমার গ্রহশান্তির জন্য যত-খুসি স্বস্ত্যয়ন করাইতে চাও করাইয়ো, কিন্তু অনাবশ্যক মনকে পীড়িত করিয়ো না।"

ক্ষেমঙ্করী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "কি জানি বাছা, কি বলিবে, কিন্তু তোমার ভূমিকা শুনিয়া আমার মন আরো অস্থির হয়। যত-দিন পৃথিবীতে আছি, নিজেকে অত করিয়া ঢাকিয়া রাখা চলে না। আমি ত দূরে থাকিতে চাই, কিন্তু মন্দকে ত খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না; সে আপনিই ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। তা ভাল হোক্ মন্দ হোক্, বল, তোমার কথাটা শুনি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "এই মাঘমাসে আমি রংপুরে আমার সমস্ত জিনিষপত্র বিক্রি করিয়া, আমার বাগানবাড়ীটা ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। সাঁড়ায় আসিয়া আমার কি বাতিক গেল, মনে করিলাম, রেলে না চড়িয়া নৌকা করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিব। সাঁড়ায়

একখানা বড় দিশী নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। দুদিনের পথ আসিয়া একটা চরের কাছে নৌকা বাঁধিয়া স্নান করিতেছি. এমন-সময় হঠাৎ দেখি, আমাদের ভূপেন এক বন্দুক হাতে করিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই ত সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, 'শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড় শিকারটাই মিলিয়াছে।' সে ঐ দিকেই কোথায় ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটি করিতেছিল—তাঁবুতে মফস্বলভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অনেকদিন পরে দেখা, আমাকে ত কোনোমতেই ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ধোবাপুকুর বলিয়া একটা জায়গায় একদিন তাহার তাঁবু পড়িল। বৈকালে আমরা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি—নিতান্তই গণ্ডগ্রাম—একটি বৃহৎ ক্ষেতের ধারে একটা প্রাচীর দেওয়া চালা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরের কর্ত্তা উঠানে আমাদের বসিবার জন্য দুটি মোড়া আনিয়া দিলেন। তখন দাওয়ার উপরে ইস্কুল চলিতেছে। প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ঘরের একটা খুঁটির গায়ে দুই পা তুলিয়া দিয়াছে। নীচে মাটিতে বসিয়া স্লেটহাতে ছেলেরা মহা কোলাহল করিতে করিতে বিদ্যালাভ করিতেছে। বাড়ীর কর্ত্তাটির নাম তারিণী চাটুয্যে। ভূপেনের কাছে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমার পরিচয় লইলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভূপেন বলিল, 'ওহে, তোমার কপাল ভাল— তোমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।' আমি বলিলাম, 'সে কিরকম?' ভূপেন কহিল, 'ঐ তারিণী চাটুয্যে লোকটি মহাজনী করে, এত-বড় কৃপণ জগতে নাই। ঐ যে ইস্কুলটি বাড়ীতে স্থান দিয়াছে, সেজন্য নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিলেই নিজের লোকহিতৈষিতা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করে। কিন্তু ইস্কুলের পণ্ডিতটাকে কেবলমাত্র বাড়ীতে খাইতে দিয়া রাত দশটা পর্য্যন্ত সুদের হিসাব কসাইয়া লয়, মাইনেটা গবর্মেণ্টের সাহায্য এবং ইস্কুলের বেতন হইতে উঠিয়া যায়। উহার একটি বোনের স্বামিবিয়োগ হইলে পর সে বেচারা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইহারই কাছে আসে। সে তখন গর্ভিণী ছিল। এখানে আসিয়া একটি কন্যা প্রসব করিয়া নিতান্ত অচিকিৎসাতেই সে মারা যায়। আর একটি বিধবা বোন ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করিয়া ঝি রাখিবার খরচ বাঁচাইত, সে এই মেয়েটিকে মায়ের মত মানুষ করে। মেয়েটি কিছু বড় হইতেই তাহারো মৃত্যু হইল। সেই অবধি মামা ও মামীর দাসত্ব করিয়া অহরহ ভর্ৎসনা সহিয়া মেয়েটি বাড়িয়া উঠিতেছে। বিবাহের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাথার পাত্র জুটিবে কোথায়? বিশেষত উহার মাবাপকে এখানকার কেহ জানিত না, পিতৃহীন অবস্থায় উহার জন্ম, ইহা লইয়া পাড়ার ঘোঁটকর্ত্তারা যথেষ্ট সংশয়প্রকাশ করিয়া থাকেন। তারিণী চাটুয্যের অগাধ টাকা আছে সকলেই জানে, লোকের ইচ্ছা, এই মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যাসম্বন্ধে খোঁটা দিয়া উহাকে বেশ একটু দোহন করিয়া লয়। ও ত আজ চারবছর ধরিয়া এই মেয়েটির বয়স দশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। অতএব, হিসাবমত তার বয়স এখন অন্তত

চৌদ্দ হইবে। কিন্তু যাই বল, মেয়েটি নামেও কমলা,—সকল বিষয়েই একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন সুন্দর মেয়ে আমি ত দেখি নাই। এ গ্রামে বিদেশের কোনো ব্রাহ্মণযুবক উপস্থিত হইলেই তারিণী ত হাকে বিবাহের জন্য হাতে-পায়ে ধরে। যদি-বা কেহ রাজি হয়, গ্রামের লোকে ভাংচি দিয়া তাড়ায়। অতএব এবারে নিশ্চয় তোমার পালা।' জান ত মা, আমার মনের অবস্থাটা তখন একরকম 'মরিয়া' গোছের ছিল—আমি কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, 'এ মেয়েটিকে আমিই বিবাহ করিব।' ইহার পূর্ব্বেই আমি স্থির করিয়াছিলাম, একটি হিন্দুঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া আমি তোমাকে চমৎকৃত করিয়া দিব - আমি জানিতাম, বড়-বয়সের ব্রাহ্মমেয়ে আমাদের এ ঘরে আনিলে তাহাতে সকল পক্ষই অসুখী হইবে। ভূপেন ত একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে বলিল, 'কি বল!' আমি বলিলাম, 'বলাবলি নয়, আমি একেবারেই মন স্থির করিয়াছি।'—ভূপেন কহিল, 'পাকা!' আমি কহিলাম, 'পাকা!' সেই সন্ধ্যাবেলাতেই স্বয়ং তারিণী চাটুযো আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হাতে পৈতা জড়াইয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মেয়েটি স্বচক্ষে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় ত অন্য কথা—কিন্তু শত্রুপক্ষের কথা শুনিবেন না।' আমি বলিলাম, 'দেখিবার দরকার নাই, দিন স্থির করুন।' তারিণী কহিলেন, 'পশু দিন ভাল আছে, পশুই হইয়া যাক্!' তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়া বিবাহে যথাসাধ্য খরচ বাঁচাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। বিবাহ ত হইয়া গেল।"

ক্ষেমঙ্করী চম্‌কিয়া-উঠিয়া কহিলেন—"বিবাহ হইয়া গেল—বল কি নলিন!"

নলিনাক্ষ। হাঁ, হইয়া গেল। বধূ লইয়া নৌকাতেও উঠিলাম। যেদিন বৈকালে উঠিলাম, সেইদিনই ঘণ্টা-দুয়েক বাদে সূর্য্যাস্তের একদণ্ড পরে হঠাৎ সেই অকালে ফাল্গুনমাসে কোথা হইতে অত্যন্ত গরম একটা ঘূর্ণিবাতাস আসিয়া এক মুহূর্ত্তে আমাদের নৌকা উল্টাইয়া কি করিয়া দিল, কিছু যেন বোঝা গেল না।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন, "মধুসূদন!" তাঁহার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নলিনাক্ষ। ক্ষণকাল পরে যখন বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি নদীতে একজায়গায় সাঁতার দিতেছি, কিন্তু নিকটে কোনো নৌকা বা আরোহীর কোনো চিহ্ন নাই। পুলিসে খবর দিয়া খোঁজ অনেক করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না।

ক্ষেমঙ্করী পাংশুবর্ণ মুখ করিয়া কহিলেন, "যাক্, যা হইয়া গেছে তা গেছে, ও কথা আমার কাছে আর কখনো বলিস্ নে—মনে করিতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

নলিনাক্ষ। এ কথা আমি কোনোদিনই তোমার কাছে বলিতাম না, কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া তুমি নিতান্তই জেদ করিতেছ বলিয়াই বলিতে হইল।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া তুই ইহজীবনে কখনো বিবাহই করিবি না?"

নলিনাক্ষ কহিল, "সেজন্য নয় মা, যদি সে মেয়ে বাঁচিয়া থাকে!"

ক্ষেমঙ্করী। পাগল হইয়াছিস্? বাঁচিয়া থাকিলে তোকে খবর দিত না?

নলিনাক্ষ। আমার খবর সে কি জানে। আমার চেয়ে অপরিচিত তাহার কাছে কে আছে! বোধ হয় সে আমার মুখও দেখে নাই। কাশীতে আসিয়া তারিণী চাটুযোকে আমার ঠিকানা জানাইয়াছি—তিনিও কমলার কোনো খোঁজ পান নাই বলিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন।

ক্ষেমঙ্করী। তবে আবার কি!

নলিনাক্ষ। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি, পুরা একটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে তাহার মৃত্যু স্থির করিব।

ক্ষেমঙ্করী। তোমার সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। আবার একবৎসর অপেক্ষা করা কিসের জন্য?

নলিনাক্ষ। মা, একবৎসরের আর দেরিই বা কিসের! এখন অগ্রাণ; পৌষে বিবাহ হইতে পারিবে না—তাহার পরে মাঘটা কাটাইয়া ফাল্গুন।

ক্ষেমঙ্করী। আচ্ছা বেশ। কিন্তু পাত্রী ঠিক রহিল। হেমনলিনীর বাপকে আমি কথা দিয়াছি।

নলিনাক্ষ কহিল—"মা, মানুষ ত কেবল কথাটুকুমাত্রই দিতে পারে, সে কথার সফলতা দেওয়া যাঁহার হাতে, তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

ক্ষেমঙ্করী। যাই হোক্ বাছা, তোমার এই ব্যাপারটা শুনিয়া এখনো আমার গা কাঁপিতেছে।

নলিনাক্ষ। সে ত আমি জানি মা, তোমার এই মন সুস্থির হইতে অনেকদিন লাগিবে। তোমার মনটা একবার একটু নাড়া পাইলেই তাহার আন্দোলন কিছুতেই আর থামিতে চায় না। সেইজন্যই ত মা, তোমাকে এরকম সব খবর দিতেই চাই না।

ক্ষেমঙ্করী। ভালই কর বাছা—আজকাল আমার কি হইয়াছে জানি না,—একটা মন্দ-কিছু শুনিলেই তার ভয় কিছুতেই ঘোচে না। আমার একটা ডাকের চিঠি খুলিতে ভয় করে,—পাছে তাহাতে কোনো কুসংবাদ থাকে। আমিও ত তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি, আমাকে কোনো খবর দিবার কোনো দরকার নাই;—আমি ত মনে করি, এ সংসারে আমি মরিয়াই গেছি, এখানকার আঘাত আমার উপরে আর কেন!

ক্রমশঃ।

রামায়ণের রচনাকাল।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি।

"যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।
তমশ্চাজ্ঞানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

গন্ধারদেশের শালাতুরা-গ্রামে পাণিনির জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী। তিনি "অষ্টাধ্যায়ী"নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিক অন্য কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিয়ন্‌-থ্সাঙ্গ ভারতভ্রমণে নিযুক্ত হইবার সময় পর্য্যন্তও শালাতুরায় পাণিনির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।* এখন তাঁহার চিরস্মরণীয় নাম ও ভুবনবিখ্যাত ব্যাকরণ ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। পাণিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও, পুনঃপুন পাণিনির আবির্ভাবকালনির্ণয়ের চেষ্টা আরব্ধ হইয়া, নানা মতভেদের সূত্রপাত করিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে পাণিনি কোন্ পুরাকালের ঋষি, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়াই, অনুমানমূলক আবির্ভাবকালনির্ণয়ের আড়ম্বর অধিক হইয়া উঠিয়াছে! পাণিনির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে পারিলে, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের সুবিধা হইতে পারে; অন্যথা সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাণিনি-সূত্রে পুরাতন সাহিত্যের নানা প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; পরবর্ত্তী সংস্কৃত-সাহিত্যের সকল যুগেই পাণিনীয় প্রভাব অল্লাধিকমাত্রায় দেদীপ্যমান। সুতরাং সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া, সকলেই পাণিনির আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলর, ওয়েবর প্রভৃতি স্বনামখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গ পাণিনির যে আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন, পাণিনি তাহা অপেক্ষাও পুরা-কালের ঋষি। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর সে কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

পাণিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও,

---

* Beal's Buddhistic Records of the Western World.

† That Sanskrita philology should not yet possess the means of ascertaining the date of Panini's life, is, no doubt, a serious impediment to any research concerning the chronology of ancient Hindu works. For Panini's grammar is the centre of a vast and important branch of the ancient literature. No work has struck deeper roots than his in the soil of the scientific development of India. It is the standard of accuracy of speech,—the grammatical basis of the Vaidik commentaries. It is appealed to by every scientific writer whenever he meets with a linguistic

তিনি কোন্ সময়ের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা মোটামুটি নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এই ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, পাণিনিকে শাক্যসিংহের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সে কোন্ পুরাকালের কথা, তাহা কে বলিতে পারে? অনুমানমূলে তাহার সীমানির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

পাণিনির সময় পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্য ও ব্যাকরণ সংস্কৃতভাষাকে অলঙ্কৃত করিত, তাহা অবলম্বন করিয়াই পাণিনিসূত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। উত্তরকালে অন্যান্য পুরাতন ব্যাকরণ বিলুপ্ত হইয়া পাণিনি-ব্যাকরণের প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গুণ না থাকিলে, এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইত না। কোন্ গুণে পাণিনিসূত্র দেশকাল জয় করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে? কোন্ গুণে পুনঃপুন পরীক্ষিত ও সমালোচিত হইয়াও, পাণিনিসূত্র আত্মগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাষার শব্দানুশাসনপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করাই প্রধান গুণ। ইহারই নাম প্রকৃত ব্যাকরণ —এইভাবেই শব্দের 'ব্যাকার' বা ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই গুণে পাণিনি-সূত্র নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার হইয়া, ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পুরাকাল হইতেই পাণিনিসূত্রের বিবিধ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ করে। তন্মধ্যে কোন্ গ্রন্থ প্রথম, তাহা নির্ণয় করিবার প্রমাণ না পাইয়া অনেকে কাত্যায়নের 'মহাবার্ত্তিক'নামক সমালোচনাকেই প্রথম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। কাত্যায়নের 'মহাবার্ত্তিক' পাণিনিসূত্রের বৃত্তি বা ব্যাখ্যাপুস্তক নহে। ঐ গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও, বার্ত্তিকসূত্র-গুলি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—যে সকল সূত্রে 'বার্ত্তিক'সংযোগের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, কাত্যায়ন কেবল তাহারই সমালোচনা করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি আবার সেই সকল 'বার্ত্তিকের' সমালোচনা উপলক্ষে 'ভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং 'মহাভাষ্যে' আদ্যন্ত সমগ্র পাণিনিসূত্রের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। এই কথা স্মরণ না করিয়া অধ্যাপক-ওয়েবর প্রমুখ

difficulty. Besides the inspired seers of the works which are the root of Hindu belief, Panini is the only one, among those authors of scientific works who may be looked upon as real personages, who is a *Rishi* in the proper sense of the word,—an author supposed to have had the foundation of his work revealed to him by a divinity. Yet, however we may regret the necessity of leaving this important personage in the chaos which envelopes the historical existence of all ancient Hindu celebrities, it is better to acknowledge this necessity than attach faith to a date devoid of real substance and resting on no trustworthy testimony.—Goldstucker's PANINI, p 87—89.

কতিপয় পাশ্চাত্যপণ্ডিত 'বার্ত্তিক' ও 'ভাষ্য'-হীন পাণিনিসূত্রকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেও ইতস্তত করেন নাই! তাঁহারা আবার কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির কোন কোন উক্তিকে পাণিনির উক্তি বলিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনজন তিন সময়ের বৈয়াকরণ; তিনজন ভাষার তিন অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনজনের লেখায় তিনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া, 'ত্রিমুনি-ব্যাকরণের' আলোচনা করিলে, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সে পথ যখনই আবিষ্কৃত হউক, অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকরকেই তাহার নেতা বলিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তাঁহারই পাণিনিসেবা সার্থক হইয়াছে। মোক্ষমূলর পদে পদে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন; অধ্যাপক ওয়েবর মহাভাষ্য অধ্যয়ন না করিয়াই, পাণিনির আবির্ভাবকালনির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।* দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মতামত লইয়াই আমরা মতান্ধ হইয়া উঠিতেছি।

কাত্যায়নের 'মহাবার্ত্তিকে' ব্যাড়ীনামক একজন পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'সংগ্রহ', তাহা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ ব্যাকরণ। পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ীর 'সংগ্রহ' রচিত হইয়াছিল। ব্যাড়ী কে, পতঞ্জলি তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যাড়ীকে 'দাক্ষায়ণ' বলায়, পাণিনির সহিত ব্যাড়ীর সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; ব্যাড়ী যে পাণিনির পরবর্ত্তী, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ব্যাড়ীর নাম সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রে অপরিচিত নহে। 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে' ব্যাড়ীর নাম পুনঃপুন উল্লিখিত আছে। পতঞ্জলিও ব্যাড়ীর নাম অনেকবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি। ২। ৩। ৬৬।

এই সূত্রের বিচারে, পতঞ্জলি উদাহরণ-প্রয়োগে 'সংগ্রহ'নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাহার রচয়িতাকে 'দাক্ষায়ণ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা:—

"শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ।"

"শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিরিতি।"

দাক্ষীর অধস্তন তৃতীয়পুরুষ দাক্ষায়ণ-নামে কথিত হইতে পারেন;—পাণিনি-সূত্রানুসারে তাহাই দাক্ষায়ণশব্দের ব্যুৎপত্তি। তৃতীয় হইতে অধস্তন অন্যান্য ব্যক্তিগণও দাক্ষায়ণনামে পরিচিত হইতে পারেন; প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষের পক্ষে এই নাম ব্যবহৃত হইতে পারে না। সুতরাং সংগ্রহকার দাক্ষায়ণ পাণিনির বংশে তাঁহার পৌত্র বা তাঁহার অধস্তন পুরুষ। দাক্ষায়ণ বংশা-

* অধ্যাপক মোক্ষমূলর অনেকস্থলে পাণিনিসূত্র উদ্ধৃত করিতে গিয়া সংখ্যাপাতেও ভুল করিয়াছেন; অনেকস্থলে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, সূত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বিকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক ওয়েবর স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—তিনি আদ্যন্ত মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন নাই। এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া, অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর তাঁহার 'পাণিনি'প্রবন্ধে উভয়কেই তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন। কোন গ্রন্থের আদ্যন্ত অধ্যয়ন না করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতা হইলেও, আধুনিক সাহিত্যে সেরূপ ধৃষ্টতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা পল্লবগ্রাহী আধুনিকশিক্ষার প্রধান দোষ। তজ্জন্য ব্যক্তিবিশেষকে তিরস্কার করা অসঙ্গত।

মুযায়ী নাম ; ব্যক্তিগত নাম ব্যাঢ়ী। সুতরাং পাণিনির পর ব্যাঢী এবং ব্যাঢ়ীর পর কাত্যায়ন ; এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায়। পাণিনির কত পরে ব্যাঢী এবং ব্যাঢ়ীর কত পরে কাত্যায়ন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকায়, অনুমানমূলে কোনরূপ কাল-নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত। এই প্রমাণে কাত্যায়ন পাণিনির পরকালবর্ত্তী বৈয়াকরণ বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা গেল,—ইহাই পরম লাভ। পাণিনির কতকাল পরে কাত্যায়ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য প্রমাণের আলোচনা করা আবশ্যক। বার্ত্তিকসূত্রে সেরূপ প্রমাণের অভাব নাই।

পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্ব্বে অনেক অভিনব সাহিত্য সমুদ্ভূত হইয়াছিল, ভাষার অবস্থাও নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য কাত্যায়ন পাণিনি-সূত্রের নানাস্থানে বার্ত্তিক সংযোগ করিয়া, পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব ভাষার শব্দানুশাসনের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত লইয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত অধিকাংশস্থলে বার্ত্তিকসংযোগের প্রয়োজন প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে।

অরণ্যান্মনুষ্যে। ৪।২।১২৯.

এই সূত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, নানা তথ্য প্রকাশিত হইবে। অরণ্যশব্দ হইতে আরণ্য ও আরণ্যক—এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 'বুঞ্'প্রত্যয়ে 'আরণ্যক'-শব্দের উৎপত্তি। একটি বিশেষ-অর্থ জ্ঞাপনার্থ অরণ্যশব্দে 'বুঞ্'প্রত্যয় হইত বলিয়া পাণিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে অর্থ কি, তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য সূত্রে 'মনুষ্য'শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে,—অরণ্যবাসী 'মনুষ্য' বুঝাইতে হইলে, 'আরণ্য মনুষ্য' বলিলে চলিবে না, 'আরণ্যক মনুষ্য' বলিতে হইবে; অর্থাৎ 'আরণ্যক' বলিলে, মনুষ্য বুঝাইবে:—আর কিছু বুঝাইবে না। পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে 'আরণ্যক' বলিতে মনুষ্য ভিন্ন আর কিছু বুঝাইত কি না, তাহার প্রমাণাভাব। কাত্যায়নের সময়ে 'আরণ্যক' বলিতে মনুষ্য ভিন্ন আরও নানা অর্থ প্রতিভাত হইত। তাঁহার সময়ে আরণ্য পথ, আরণ্য অধ্যায়, আরণ্য ন্যায়, আরণ্য বিহার ও আরণ্য হস্তী বলিবার নিয়ম ছিল না। ঐ সকল স্থলেও 'আরণ্যক'-শব্দ ব্যবহার করিতে হইত। 'গোময়'-অর্থে আরণ্য ও আরণ্যক শব্দ তুল্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অর্থে আরণ্যশব্দই প্রযুক্ত হইত। এই পার্থক্য-সূচনার্থ কাত্যায়ন বার্ত্তিকসূত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা:—

"পথ্যধ্যায়ন্যায়বিহারমনুষ্যহস্তিষ্বিতি বক্তব্যম্।" ১।

"বা গোময়েষু।" ২।

'আরণ্যক'শব্দ পাণিনির সময়ে এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইবার নিয়ম থাকিলে, তিনি কেবল মনুষ্য-অর্থেই 'আরণ্যক'শব্দের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিতেন না। পাণিনির ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-বিচারনিপুণ বিশেষজ্ঞ বৈয়াকরণের পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা বা অনবধানতা স্বীকার করা অসঙ্গত। অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

তিনি বলেন,—ভারতপ্রসিদ্ধ উপনিষদের নাম 'আরণ্যক'। আরণ্যক বলিতে প্রথমে সেই অর্থই প্রতিভাত হয়। 'বাইবেল' বলিলে 'পুস্তক' বুঝাইতে পারে; কিন্তু তাহার মুখ্যার্থ,—'ধর্ম্মপুস্তক'। একজন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীকে 'বাইবেল'শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রথমেই মুখ্যার্থের উল্লেখ করিবেন; সে অর্থ বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সেইরূপ হিন্দুর পক্ষেও 'আরণ্যক'শব্দের মুখ্যার্থ বিস্মৃত হইয়া, কেবল মনুষ্যার্থে আরণ্যকশব্দের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিয়া ব্যাকরণরচনা করা অসম্ভব। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের এই তর্ক অকাট্য। কিন্তু তিনি ইহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"পাণিনির সময়ে উপনিষৎ রচিত হয় নাই।" তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উপনিষৎ চিরকাল 'আরণ্যক'নামে পরিচিত থাকিলে, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু উপনিষৎ কি চিরকাল 'আরণ্যক'নামে পরিচিত ছিল? না থাকিলে, কি সূত্রে তাহা আরণ্যকনামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে?

উপনিষদের অন্য নাম 'বেদান্ত'—অর্থাৎ বেদের অন্ত্য ভাগ; তাহা 'ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত। একদা ব্রাহ্মণমাত্রেই 'ব্রাহ্মণের' আদ্যন্ত অধ্যয়নের অধিকারী ছিলেন। 'কঠোপনিষদে' দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসভায় তাহা পাঠ করিবার ব্যবস্থা ছিল। উত্তরকালে ব্রাহ্মণমাত্রের পক্ষে 'ব্রাহ্মণের' শেষাংশ অর্থাৎ উপনিষৎ পাঠ বা শ্রবণের অধিকার ছিল না। যাঁহারা বানপ্রস্থব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিতেন, তাঁহারা ভিন্ন গৃহী ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনিষদের অধ্যয়ন দূরে থাকুক, শ্রবণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্য 'ব্রাহ্মণের' কোন্ ভাগ ব্রাহ্মণমাত্রের পাঠ্য, কোন্ ভাগ কেবল ব্রতিগণের পাঠ্য, তাহা নির্ণয় করিয়া পৃথক্ নামকরণ করা আবশ্যক হইয়াছিল। তদনুসারে উপনিষদ্ভাগের নাম 'আরণ্যক' হইয়াছে।* পাণিনির সময়ে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিয়া, তৎকালে 'আরণ্যক'শব্দে 'উপনিষৎ' বুঝাইত না। এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহার অধিক স্বীকার করিবার উপযোগী প্রমাণের অভাব। সুতরাং অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের শেষাংশ সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না।†

আর্য্যসমাজে বেদ 'অপৌরুষেয়' বলিয়া চিরপরিচিত। যাঁহারা কোনরূপ 'অপৌরুষেয়' শাস্ত্রে আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত,

* "অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে ॥
অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেব বাক্যং প্রচক্ষতে ॥
এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি ॥"
—তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্যে সায়ণাচার্য্যঃ।

† Is it possible to assume that Panini could have known this sense of the word *Aranyaka*, when he is altogether silent on it; and if he did not know it, that the works so called could have already existed in his time?—Goldstucker's PANINI, p. 130.

তাঁহারা বেদ বিশ্বাসী ভারতবর্ষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অবজ্ঞাপ্রকাশে ত্রুটি করেন না। ঐতিহাসিকের পক্ষে এরূপ অবজ্ঞাপ্রকাশ তথ্যানুসন্ধানের বাধাপ্রদান করে। পুরাকালের ঋষি ও ঋষিকল্প গৃহস্থগণ কি ভাবে ও কি অর্থে বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বেদশব্দের পুরাতন অর্থ 'জ্ঞান'। জ্ঞান মনুষ্যকৃত, না অপৌরুষেয়? নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণজ্ঞানের জন্য জগদ্বিখ্যাত, তিনি কি তাহার স্রষ্টা, না দ্রষ্টা? কোনও জ্ঞানের পক্ষেই মানবকে স্রষ্টা বলা যায় না; মানব দ্রষ্টা, মানব প্রোক্তা;—তাহার অধিক নহে। জ্ঞান অনাদিকাল হইতে দ্রষ্টা ও প্রোক্তার প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান আছে;—কত জ্ঞান দৃষ্ট ও প্রোক্ত হইয়াছে; তথাপি কত জ্ঞান এখনও মানবসমাজে অপরিজ্ঞাত। যিনি যে জ্ঞান দর্শন করেন, তিনি তাহার 'দ্রষ্টা' বা ঋষি; যিনি তাহা প্রচার করেন, তিনি তাহার 'প্রোক্তা'। পাণিনি এইভাবেই সূত্ররচনা করিয়া, মন্ত্রভাগকে 'দৃষ্ট' এবং ব্রাহ্মণ ও কল্পাদিকে 'প্রোক্ত' বলিয়া গিয়াছেন। পাণিনির মতে বেদাঙ্গমাত্রেই 'প্রোক্ত'। যাহা 'দৃষ্ট' বা 'প্রোক্ত' নহে, মনুষ্যকৃত—পদ্যগদ্যময় ইতিহাস-উপাখ্যানাদি তাহারই নাম 'কৃত'। এইরূপে পাণিনি প্রথমত কৃত ও অকৃত নামক দুই শ্রেণীর সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া, অকৃত সাহিত্যকে আবার দৃষ্ট ও প্রোক্ত নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। কৃতাকৃত সমস্ত সাহিত্যই মনুষ্যের নামে পরিচিত; পার্থক্য এই যে,—কৃতগ্রন্থ কর্ত্তার নামে, অকৃতগ্রন্থ দ্রষ্টা ও প্রোক্তার নামে পরিচিত। অকৃতগ্রন্থেরও শব্দাবলী মনুষ্যকৃত; তাহা অপৌরুষেয় নহে; শব্দপ্রতিপাদ্য জ্ঞানই 'অপৌরুষেয়'। ইহাকে কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞাপ্রকাশ করিবার উপায় নাই।

যাহা 'দৃষ্ট', তাহা ক্রমে ক্রমে 'দৃষ্ট' হইয়াছিল। তদ্রূপ যাহা 'প্রোক্ত'সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাও ক্রমে ক্রমেই প্রচারিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহা পুরাতন ও আধুনিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইবার যোগ্য। পাণিনিসূত্রে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তেন প্রোক্তম্ ।৪।৩।১০১।

'প্রোক্তং'শব্দের অর্থ কাশিকা বৃত্তিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৭সংখ্যক সূত্রে মনুষ্যকৃত গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সহিত পার্থক্যরক্ষার্থ, এই সূত্রদ্বারা 'প্রোক্ত'সাহিত্যের অধিকার আরব্ধ হইয়াছে। এই অধিকারভুক্ত তিনটি সূত্র একত্র বিচার করা আবশ্যক।

তেন প্রোক্তম্ ।৪।৩।১০১।

কাশ্যপকৌশিকাভ্যাং ঋষিভ্যাং ণিনিঃ ।৪।৩।১০৩।

পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু ।৪।৩।১০৫।

নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া, এই তিনটি সূত্র ইউরোপীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর বিচারে নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর সে সকল কাল্পনিক ব্যাখ্যার ভ্রমপ্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই তিনটি সূত্রের সরল ব্যাখ্যা কি, তাহার আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

পাণিনি প্রথমে 'মনুষ্যকৃত' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া, পরে 'মনুষ্যপ্রচারিত' গ্রন্থের উল্লেখ করিবার জন্য নূতন অধিকার-সূত্রের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন, "তেন প্রোক্তম্।" অতঃপর 'প্রোক্ত'গ্রন্থের কথা বলিব। তাহার সাধারণ নিয়ম এই যে, 'প্রোক্ত'গ্রন্থ প্রোক্তার নামানুসারে কথিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য 'প্রোক্তার' নামে প্রত্যয় সংযোগ করা আবশ্যক। কাশ্যপ ও কৌশিক এই দুই ঋষির নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাদের 'প্রোক্ত'গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাশ্যপ বলিতে ঋষি কাশ্যপ ও গোত্রকাশ্যপ বুঝায়। ঋষিকাশ্যপ পুরাতন; গোত্রকাশ্যপ আধুনিক ব্যক্তি। সেই পার্থক্যরক্ষার্থই সূত্রে 'ঋষি'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রের পুরাতন প্রচারকগণের নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পরিচিত হইয়া থাকে। যাঁহারা 'পুরাণ-প্রোক্তা' বলিয়া পরিগণিত হইবার অযোগ্য,—যাঁহারা আধুনিক—তাঁহাদের নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় হয় না।

এই সরল ব্যাখ্যায় বুঝিতে পারা যায়,—পাণিনির মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি পুরাণ-প্রোক্তা বলিয়া পরিগণিত হইবার অযোগ্য। কারণ তাঁহার ব্রাহ্মণাদির নাম —"যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি।" যাজ্ঞবল্ক্যের নামে 'অন্'-প্রত্যয় হইয়া 'যাজ্ঞবল্কানি'শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; 'ণিনি'-প্রত্যয় হয় নাই। পাণিনি-সূত্রের যে ইহাই সরলার্থ, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে 'যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত' শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ' আধুনিক হইয়া পড়ে। কাত্যায়ন তাহার মর্য্যাদা-রক্ষার্থ বার্ত্তিক সংযোগ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—পাণিনির বলা উচিত ছিল যে, যাজ্ঞবল্ক্যাদির পক্ষে তাঁহার সূত্র খাটিবে না; তাঁহারাও তুল্যকালবর্ত্তী পুরাণ-প্রোক্তা; কিন্তু তাঁহাদের নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় হয় নাই। কাত্যায়ন এখানে স্পষ্টাক্ষরেই পাণিনির দোষপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।*

উত্তরকালে ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, এই বার্ত্তিকের দুইপ্রকার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এক দল হিন্দু, অপর দল বৌদ্ধ। বৌদ্ধ কাশিকাবৃত্তিকার কাত্যায়নের বার্ত্তিক স্বীকার না করিয়া, স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন,—"যাজ্ঞবল্ক্যাদি আধুনিক ব্যক্তি।"† উত্তরকালে সিদ্ধান্তকৌমুদীর হিন্দু গ্রন্থকারও কাশিকার মতই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, কাত্যায়নের মত পরবর্ত্তী বৈয়াকরণসমাজে সর্ব্বত্র সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে পাণিনির পরকালবর্ত্তী ও কাত্যায়নের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিতে হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি কাত্যায়নের এত পূর্ব্বকালবর্ত্তী যে, কাত্যায়ন তাঁহাদিগকে পাণিনিরও পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—পাণিনির বহুকাল পরে কাত্যায়ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান ছিল বলি-

* "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ।"
৪।৩।১০৫। বার্ত্তিকসূত্রম্।

† যাজ্ঞবল্ক্যাদয়োঽচিরকালা ইত্যাখ্যানেষু বার্ত্তা।

য়াই, পাণিনির সময়ের ভাষার সহিত কাত্যায়নের সময়ের ভাষার নানা পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছিল।* এই পার্থক্য রামায়ণেও দেদীপ্যমান।

কাত্যায়ন কেবল বার্ত্তিকসূত্র রচনা করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহার নাম বৈদিক-সাহিত্যেও সুপরিচিত। কৃতাকৃত উভয়-শ্রেণীর সাহিত্যেই কাত্যায়নের নাম চির-সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং আর্য্য-সাহিত্যে 'মুনি'নামেই সুপরিচিত। যে সকল বৈদিকসাহিত্যের সহিত কাত্যায়নের নামের সংস্রব থাকা জানিতে পারা যায়, তন্মধ্যে (১) অনুক্রমণী, (২) প্রাতিশাখ্য, (৩) কল্পসূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সকল লৌকিকসাহিত্যের সহিত কাত্যায়নের নামের সংস্রব থাকা জানিতে পারা যায়, তন্মধ্যে (১) ভ্রাজাশ্লোক ও (২) মহা-বার্ত্তিক সংস্কৃতসাহিত্যে সুপরিচিত। কাত্যায়ন প্রোক্তা এবং কর্ত্তা,—প্রচারক এবং গ্রন্থকার। তাঁহার টীকাকার ষড়্‌গুরুশিষ্য প্রসঙ্গক্রমে কাত্যায়নের সাহিত্যসেবার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ষড়্‌গুরুশিষ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক টীকাকার হইলেও, তাঁহার উক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। তিনি বলেন,—পুরাকালে শৌনকনামক ঋষি নানা সূত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্য আশ্বলায়নও সূত্রগ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধ। শৌনক ও আশ্বলায়নের সূত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াই, কাত্যায়ন গ্রন্থসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে কাত্যায়ন এইরূপে বৈদিকসাহিত্যে সুপরিচিত, তিনিই পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিককার;—

"মহাবার্ত্তিকনৌকারঃ পাণিনীয়মহার্ণবে।"

পতঞ্জলি তাহারই সমালোচনাচ্ছলে 'মহাভাষ্য' রচনা করিয়া গিয়াছেন। ষড়্‌গুরুশিষ্যের এই সংক্ষিপ্ত উক্তি কাত্যায়নের কালনির্ণয়ের জন্য অধ্যাপক মোক্ষমূলরকর্ত্তৃক প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই যে, ষড়্‌গুরুশিষ্য কোনস্থলে কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ না করিলেও, অধ্যাপক মোক্ষমূলর আশ্বলায়ন ও কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।† এরূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিবার কারণ কি? মোক্ষমূলর "কথাসরিৎসাগরের" আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া, পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পাণিনিসূত্রে শৌনকের নাম যে ভাবে উল্লিখিত, তাহাতে শৌনক ও পাণিনি তুল্যকাল-বর্ত্তী বলিয়া তর্ক করা যাইতে পারে। সুতরাং

* This explanation, I hold, can only be derived from the circumstance that Panini and Katyayana belonged to different periods of Hindu antiquity.—Goldstucker's PANINI, p. 122.

† Several of the works mentioned before were ascribed to Saunaka and his two pupils, Katyayana and Asvalayana.—Max Muller's History of Ancient Sanskrita Literature.—p. 215.

কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য না বলিলে, পাণিনির সহিত কাত্যায়নের তুল্যকাল-বর্ত্তিত্ব রক্ষা করা যায় না। বলা বাহুল্য, এরূপ বিচারপদ্ধতি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রবল অন্তরায়। কাত্যায়ন যে শৌনকের শিষ্য, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; প্রমাণ কেবল মোক্ষমূলরের অনুমান; —তাহাও ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। অথচ তাহার উপর নির্ভর করিয়াই "সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস" সঙ্কলিত হইয়াছে! সে ইতিহাস লিপিচাতুর্য্যে বিশ্ববিখ্যাত হইলেও, বিশেষজ্ঞগণের নিকট নিরতিশয় কৌতূহলের আকর। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টূকর সে কথা ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ এরূপ দুর্লভ ও দুরূহ যে, তাঁহার কথা অল্পলোকেই অবগত; তজ্জন্যই মোক্ষমূলরের "সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া সমাদরলাভ করিতেছে!

বৈদিকসাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় বেদাঙ্গের প্রয়োজন থাকায়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ নামক ছয়টি বেদাঙ্গ প্রচলিত হইয়াছিল। ষড়ঙ্গ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নাম; ছয়খানি গ্রন্থের নাম নহে। এক এক বিষয়ে বহুলোকের বহুগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে বেদবাক্যের উচ্চারণ, বেদমন্ত্রের প্রয়োগ, বৈদিকশব্দের শাসন, পদ-পদার্থের নিরূপণ ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হইত। সেকালে বৈদিকসাহিত্যের আলোচনায় লিপ্ত হইয়া সমগ্র বেদবাক্যের রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঋষিগণ সময়ে সময়ে 'অনুক্রমণী'নামক সূচীপুস্তক সঙ্কলিত করিতেন। শৌনক ঋগ্বেদের নানাপ্রকার অনুক্রমণী সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাত্যায়নকৃত অনুক্রমণীই এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত; —তাহার নাম "সর্ব্বানুক্রমণী"। ষড়্‌গুরু-শিষ্য তাহারই "বেদার্থদীপিকা"নামক টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন। শৌনকের সময়ে ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্ত নামক বিবিধ বিভাগে বিভক্ত থাকায়, তাঁহার অনুক্রমণীতে তাহারই উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৌনকের পরে এবং কাত্যায়নের পূর্ব্বে অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গানুসারে ঋগ্বেদ বিভক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য কাত্যায়নের "সর্ব্বানুক্রমণীতে" আমরা অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গানুসারে ঋগ্বেদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। শৌনকের বহুপরকালবর্ত্তী না হইলে, কাত্যায়নের "সর্ব্বানুক্রমণীতে" শৌনকের "অনুক্রমণীর" ন্যায় মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্তের নামই প্রাপ্ত হওয়া যাইত। মোক্ষমূলরের মতানুসারে কাত্যায়ন শৌনকের শিষ্য ও সমসাময়িক হইলে, তাহাই দেখিতে পাইতাম। সর্ব্বানুক্রমণীর ন্যায় "প্রাতিশাখ্য"-নামক এক গ্রন্থও কাত্যায়নের লেখনী-প্রসূত। তাহা "বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য" নামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাতিশাখ্য ও মহাবার্ত্তিকে কাত্যায়নের অসাধারণ ব্যাকরণজ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ওয়েবর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ 'প্রাতিশাখ্য'গুলিকে পাণিনির পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পাণিনির পরে ব্যাড়ী, ব্যাড়ীর পরে প্রাতিশাখ্য। কাত্যায়ন

শুক্লযজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে শুক্লযজুর্ব্বেদের শিক্ষা ও প্রয়োগ এইরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাণিনির সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না। এই সকল বৈদিকগ্রন্থ ভিন্ন কাত্যায়ন 'ভ্রাজা'নামক শ্লোকগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' তাহার উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ীর 'সংগ্রহ'নামক গ্রন্থে শ্লোকনামক রচনাপ্রণালীর প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্লোক বলিতে সেকালে কেবল অনুষ্টুভ্‌ছন্দকেই বুঝাইত। বৈদিকসাহিত্যে কদাচিৎ অনুষ্টুপের ব্যবহার থাকিলেও, আদ্যন্ত অনুষ্টুপ্ ব্যবহৃত হয় নাই। ঋগ্বেদের দশসহস্রাধিক মন্ত্রের মধ্যে ৮৫৫ মন্ত্র অনুষ্টুপ্। পাণিনির সময়ে আদ্যন্ত অনুষ্টুভ্‌ছন্দে রচিত কোন গ্রন্থ প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন পাণিনিসূত্রের উদাহরণে 'শ্লোক'শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, পাণিনির সময়ে শ্লোকগ্রন্থ প্রচলিত থাকা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল উদাহরণ পাণিনির লেখনীপ্রসূত নহে। পাণিনির পরে এবং কাত্যায়নের পূর্ব্বে সংস্কৃতসাহিত্যের এই সকল বিবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি ও কাত্যায়নের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান না থাকিলে, এই সকল পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল-নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে, সমালোচ্য গ্রন্থের উপর পাণিনি বা কাত্যায়নের প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন হয় না। রামায়ণের ন্যায় পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করিতে হইলে, এই পথেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য পতঞ্জলিরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

কাত্যায়নের কতকাল পরে পতঞ্জলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পতঞ্জলির মাতার নাম গোণিকা; তাঁহার বাসস্থান গোনর্দ্দ। তিনি কিছুকাল কশ্মীরে বাস করিয়াছিলেন, এবং অভিমন্যুনামক কশ্মীরাধিপতির শাসনসময়ে তদ্দেশে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণ অনুসারে পতঞ্জলিকে দ্বিসহস্রবৎসর পূর্ব্বের বৈয়াকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার প্রমাণপরম্পরার বিস্তৃত আলোচনা করা অনাবশ্যক।

পুরাতন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে পাণিনিযুগ, কাত্যায়নযুগ ও পতঞ্জলিযুগ নামক তিনটি সাহিত্যযুগ কল্পনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনিযুগে 'রামায়ণ' পরিচিত না থাকিলেও, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিযুগে 'রামায়ণ' পরিচিত ছিল। পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্ব্বে কোনও সময়ে রামায়ণ রচিত হইয়া থাকিবে। রামায়ণের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলেই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনিযুগে শুক্লযজুর্ব্বেদ, বাজসনেয়িসংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নকল্পসূত্র

বা শ্লোকনিবদ্ধ ভাষাসাহিত্য বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কাত্যায়নযুগ হইতে এই শ্রেণীর সাহিত্যের বিবিধ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে, তাহার রচনাকালনির্ণয়ের প্রকৃত পথের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তৎপূর্ব্বে রামায়ণের ভাষাবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মুক্তিবিষয়ে রামানুজস্বামীর উপদেশ।

ছেলে স্কুলে যায়, ক্লাসেও বেশ পড়া হয়, মাষ্টারও ভাল, অথচ ছেলে কিছু শিখিতে পারে না, ক্লাস্‌প্রমোশন্‌ও পায় না। ছেলের ঝোঁক খুটিনাটীর দিকে, পড়ার দিকে নহে। সে সুযোগ পাইলেই পেন্‌সিল্‌ দিয়া ছবি আঁকে, কেতাবের গায়ে ফুল কাটে, দেয়ালের গায়ে ঘরবাড়ী আঁকে। তাহার পড়াশুনা ভাল লাগে না, ভাল লাগে—ঐরূপ ঐরূপ কারুকার্য্য! সেই অশিক্ষিত অবস্থায় সে যাহা আঁকে, তাহা নিতান্ত মন্দও হয় না। এরূপ দেখিলে কে না বলে—তুমিও বল, আমিও বলি—ছেলেটিকে আর্টস্কুলে দাও। হয় ত তাহাতেই কিছু হইবে, নচেৎ লেখাপড়ায় কিছু হইবে না। আমরা যেমন আমাদের ছেলের ঝোঁক ও পারকতা দেখিয়া শিক্ষাধিকারে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করি, করি বা না করি, অন্তত মুখেও বলি, ছেলেটিকে অমুক বিষয়ে দিলে ভাল হইত, এইরূপ আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরাও ঝোঁক ও পারকতা অনুসারে শাস্ত্রাধিকার নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। ঝোঁক ও পারকতা, এই দুই বিষয়ের শাস্ত্রীয় নাম অর্থিত্ব ও সামর্থ্যবত্ত্ব। অর্থিত্ব অর্থাৎ উৎকটতর ইচ্ছা। সামর্থ্যবত্ত্ব অর্থাৎ ঈপ্সিত বিষয় নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা থাকা। এই সামর্থ্য লৌকিক-বৈদিকভেদে নানাপ্রকার, এবং তৎসংক্রান্ত নানা বিচার থাকিলেও সে সকল এ প্রবন্ধের বর্ণনীয় নহে। এখানে স্থূলত এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, ঈপ্সিত বিষয় আয়ত্ত করিবার শক্তি থাকাই উল্লিখিত সামর্থ্যবত্ত্বকথার অর্থ। ইচ্ছা আছে সামর্থ্য নাই, অথবা সামর্থ্য আছে ইচ্ছা নাই, সেরূপ লোক অনধিকারী। অর্থী ও সমর্থ, এরূপ ব্যক্তিই অধিকারী, তদ্ভিন্ন ব্যক্তি অনধিকারী। যে অধিকারী, সে-ই অধিকর্ত্তব্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে এবং যে যে-বিষয়ে অনধিকারী, সে শতচেষ্টা করিলেও সে-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আমরা এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহারা জন্মাবধি গান করিয়া বেড়ায়, অথচ তালবোধ-সুরবোধ-বর্জ্জিত। অনেক সুপণ্ডিত লোক দেখিয়াছি, পরন্তু তাঁহারা গণিতবিষয়ে মূর্খ। ব্যাকরণ-সাহিত্য-অলঙ্কারাদি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন,—কেবল ন্যায়শাস্ত্রের নামে

ভীত, এরূপ লোকও অনেক আছেন। আবার ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, অথচ ব্যাকরণ বুঝেন না, এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে। অতএব, মনুষ্য যে সামর্থ্যযোগ ব্যতীত কেবল অর্থিতার দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পারে না। না পাবার পক্ষে ঐ সকল পুষ্কল নিদর্শন। আমাদের শাস্ত্রে যে সদ্বয়-অদ্বয়-বাদের কথা আছে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি প্রভৃতির পন্থা উপদিষ্ট আছে, সে সমস্তই অধিকারিবিশেষের জন্য, সাধারণের জন্য নহে। পাত্র বা অধিকারী অনুসারে সুপথ কুপথ হয়, আবার কুপথ সুপথ হয়। তাই শাস্ত্রকারদিগের আদেশ -যে যে-পথের অধিকারী, সে সেই পথে গমনাগমন করুক। স্বামী মধুসূদনসরস্বতী স্বকৃত ভক্তিরসায়নগ্রন্থে জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই পথের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"অদ্রুতচিত্তস্য নির্বেদপূর্ব্বকং তত্ত্বজ্ঞানম্। দ্রুতচিত্তস্য তু ভগবৎকথাশ্রবণাদিভাগবতধর্ম্মশ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা ভক্তিরিত্যধিকারভেদেন দ্বয়মপ্যুপাত্তম্।'

অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত তীব্র,—অত্যন্ত নীরস, কিছুতেই দ্রুত হয় না,—গলে না, তাহারাই ঐহিক সম্পদে নির্বিঘ্ন হওয়ার পর তত্ত্বজ্ঞানের পথ বা অদ্বয়বাদের পথ গ্রহণ করুক; কিন্তু যাহাদের চিত্ত সেরূপ শক্তিশালী নহে,—সেরূপ তীব্র নহে, যাহাদের চিত্ত দ্রুতিপ্রবণ,—সহজে গলিয়া যায়, তাহারা ঐহিকসম্পদে নির্ব্বিঘ্ন হওয়ার পর সদ্বয়বাদের উপদিষ্ট ভক্তির পথ গ্রহণ করুক। অদ্বয়বাদের তত্ত্বজ্ঞান ও সদ্বয়বাদের ভক্তিনামক জ্ঞান, উভয়ই অধিকারিভেদে গ্রহণীয়।

কথায় কথা উঠে,—"ঐহিকসম্পদে নির্বিঘ্ন" এই কথায় অপর এক কথা উঠিতেছে। কথাটা এই—

অন্য জীবের প্রকৃতিতে কি আছে,—কি নাই, অন্য জীবের প্রকৃতি কি চায়,—কি চায় না, তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু মনুষ্য-জীবের প্রকৃতিতে বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ অত্যন্ত বলবৎ। মনুষ্যের প্রকৃতিতে ভবিষ্যতের আশা অত্যধিক প্রবল বলিয়াই মনুষ্যজগতের এত পরিবর্ত্তন ও এত উন্নতি। ভবিষ্যতের সীমা দৈবাৎ কাহার প্রকৃতিতে মরণাকারে অভিব্যক্ত হয়;—যাবৎ না মরণ হয়, তাবৎ তাহারা সুখদুঃখপ্রাপ্তি-পরিহারের চেষ্টা করে, তদূর্দ্ধে নহে। কেন না, তাহারা বুঝে, মরণেই শেষ, মরণেই বিরাম। অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কতক-লোকের প্রকৃতি ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া পরলোক ও স্বর্গনরকাদি কল্পনা করে এবং তদবশিষ্ট লোক স্বর্গনরকাদির অতীত মুক্তি-নামক দুঃখান্ত পদের অস্তিত্ব মান্য করে। যাহাদের ভবিষ্যৎ মরণ, তাহাদের জন্য শাস্ত্র—নীতি। যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বর্গনরকাদি, তাহাদের জন্য তৎপ্রাপ্তিপরিহারের উপায়ী-ভূত কর্ম্মকাণ্ড এবং যাহাদের ভবিষ্যদাশা মুক্তি, তাহাদের জন্য কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ, এই চার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে যে-পথের অধিকারী, সে সেই পথ অবলম্বন করুক, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের ঘোষণা বা ডিণ্ডিম। শঙ্কর জ্ঞানপথের পথিকদিগের জন্য অদ্বয়-বাদের দর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন এবং রামানুজ-স্বামী ভক্তিপথের অধিকারীদিগের জন্য

ভক্তিবাদের দর্শন প্রচারিত করিয়াছেন। প্রমাণপ্রয়োগ প্রদর্শন করি বা না করি, কথাটা বলিয়া রাখি, শঙ্কর অদ্বয়বাদের প্রথমোপদেষ্টা নহেন এবং রামানুজস্বামীও ভক্তিবাদের আদিগুরু নহেন। রামানুজের পূর্ব্বেও অনেক মুনি-ঋষি ও আচার্য্য ভক্তির পন্থা বর্ণন করিয়াছিলেন, রামানুজ তাঁহাদের সেই বর্ণিত পথের সুগমতাবিধানমাত্র করিয়াছেন।

রামানুজ ভক্ত ও ভক্তিপথের উপদেষ্টা। ভক্তিপথের উপদেষ্টা হইলেও সকলকে ভক্তি-পথে যাইতে বলেন না। যাহারা প্রকৃত অধিকারী, যাহাদের চিত্ত দ্রুত হয়,—ভক্তিরসে বিগলিত হয়, তাহাদিগকেই বলেন, তোমাদের মুক্তির পথ এই। তিনি শঙ্করের ব্রহ্মাদ্বৈত শুনিয়া,—মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়, এই উপদেশ শুনিয়া, কিছুমাত্র কোলাহল করেন না,. কান্নাহাটিও করেন না, লাঠি বাহিরও করেন না, খড়্গাধারণও করেন না, উপহাসের হাসিও হাসেন না, বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অদ্বয়বাদের উপেক্ষাও করেন না, এবং জীব ব্রহ্ম হইবে ভাবিয়া সাবেক তারা-শঙ্করী ভাষায় "হা হতোহস্মি, হা দগ্ধোহস্মি," বলিয়া রোদনও করেন না। তিনি উপযুক্ত অধিকারীদিগকে ডাকিয়া অতি ধীরভাবে বিনয়নম্রবচনে বলেন, "তোমরা আপনাকে ব্রহ্ম ভাবিতে পারিবে না, ভাবিলেও ব্রহ্ম হইতে পারিবে না, তোমরা ভাব—আমরা ব্রহ্মসমুদ্ভূত ব্রহ্মাংশ, এবং চিত্তকে তাঁহার ভক্তিরসে গলাইয়া সেই স্বাংশিএকরূপ ছাঁচে ঢালিয়া দাও, দিয়া তৎস্বরূপ হইয়া তদীয় অসীম আনন্দে আপনার সসীম আনন্দ লুপ্ত করিয়া দাও। তাহাই তোমাদের মুক্তি, তাহাই তোমাদের ব্রহ্ম হওয়া এবং তাহাই তোমাদের সর্ব্বোচ্চ দুঃখান্তস্থান—পরম পদ।"

মোক্ষধামে যাইবার প্রথম সোপান নির্বেদ, এ বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ে একমত। শঙ্করও বলেন,—স্বীকার করেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।"

রামানুজও শ্লোকের অপরার্দ্ধে গিয়া বলেন—

"মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

উভয়েরই অভিপ্রায়—মানুষ কামনা ছাড়িয়া কর্ম্ম করিতে থাকুক, ক্রমে তাহার কামনাত্যাগ অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে, কামনাত্যাগ অভ্যস্ত হইলে নির্বেদ বা ঐহিকবাঞ্ছাপরিহার আপনা হইতেই সম্পন্ন হইবে। কামনাত্যাগ না হইলে চিত্ত পরিমার্জ্জিত হয় না,—ক্রোধদ্বেষাদিদোষশূন্য হয় না, সুতরাং নির্ব্বেদও হয় না। নির্ব্বেদ না হইলেও, কি জ্ঞান কি ভক্তি, দুএর কোনটিই দেখা দেয় না।

কর্ম্ম যেমন নির্ব্বেদপ্রাপ্তির উপায়, তেমনি স্বর্গনরকপ্রাপ্তিপরিহারেরও উপায়। কামনাত্যাগযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা নির্ব্বেদলাভ ও কামনাযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা উভয় আচার্য্যেরই অনুমত। জীব বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গনামক দুঃখাসম্ভিন্ন সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে, আবার কর্ম্মবিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া নরকনামক যাতনাবিশেষ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থানে কর্ম্মবাদী আচার্য্যগণ বলেন, শঙ্কর ও রামানুজ ইঁহারাও বলেন, কামনাপূর্ব্বক বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুণ্য জন্মে, পরে তাহারই সামর্থ্যে স্বর্গলাভ হয়। আর

স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির বশে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকল বিধিবহির্ভূত বলিয়া পুণ্যের জনক হয় না, অধিকন্তু পাপেরই জনক হয়। অতএব, মানুষ যদি বিধির অধীন হইয়া চলিতে না পারে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পাপী—জন্মাবধি পাপী। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বশে চলিতে শেখা অনেক বয়সে ঘটে, কাহার বা না-ও ঘটে। কাজেই মনুষ্য সাধারণত জন্মপাপী। এই সকল আর্যমত যেন অনেকটা খৃষ্টানিমতের মত। খৃষ্টানেরা বলে, মনুষ্য জন্মাবধি পাপী। প্রকারান্তরে ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন, মনুষ্য জন্মাবধি পাপী।

"বিহিতস্যানমুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
প্রসজ্যংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥"

খৃষ্টানেরা বলে, মানুষ পাপের ফলভোগ করিতে বাধ্য। ঋষিরাও বলেন—

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ "

খৃষ্টানেরা বলে, মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিচারক গড্ * পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য। ঋষিরাও বলেন—

"ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা।"

খৃষ্টান বলে, যে তাঁহার শরণাগত, সে পাপ-মুক্ত হইবে। ঋষিরাও বলেন—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

ইত্যাদি।

এই তুলনা শুনিয়া হয় ত আজকাল-কার ঔপমিতিক ভাবাতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া উঠিবেন, "কি আশ্চর্য্য! কি করিয়া ঋষিরা খৃষ্টানি স্যাল্‌ভেশন্ (salvation) শিখিলেন ?" যাহাই হউক, মনুষ্য স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে বাধ্য বটে ; পরন্তু মুক্তিতে নহে। মুক্তিতে অর্থাৎ জীবন্মুক্তির অবস্থায়—দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রারব্ধকর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়া থাকে, মুক্তপুরুষ তাহা সাক্ষীর ন্যায় কেবল দেখিয়া থাকেন, ভোগ করেন না। আর সঞ্চিতকর্ম্ম যাহা থাকে, তাহার ফলভোগ হওয়া দূরে থাকুক, মূলে ফলই হয় না। ফল ত হয়-ই না, তাহার অঙ্কুর পর্য্যন্তও হয় না। দগ্ধবীজের অঙ্কুরজননসামর্থ্য নষ্ট হওয়ার ন্যায় তদীয় সঞ্চিতকর্ম্মসকল জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়। আজকাল অনেকে আপনা-আপনি বেদান্ত দেখিয়াছেন, তাই তাঁহারা বলেন ও অকুতোভয়ে লেখেন—"মুক্তির পর অর্থাৎ জীবন্মুক্তির পর সুখদুঃখ কেন থাকিবে না ? থাকিবে বৈ কি ? বেদান্ত বলেন, প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে।" আমরা জানি ও লিখিয়া থাকি —সঞ্চিতকর্ম্মের ফল ভুগিতে হয় না, তাহা তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, ভৃষ্ট বীজের ন্যায় জননশক্তিরহিত হইয়া যায়। কাজেই তাহা ফলপ্রসবও করে না, ভুগিতেও হয় না। আজকাল ঐরূপ বেদান্তব্যাখ্যা অনেক। আরও দুচারটা ব্যাখ্যার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। "তাহা আমার অবিদ্যা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব।"

আমরা জানি, বেদান্তপরিভাষিত অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে ; পরন্তু ভাব।

* কেহ কেহ গড বলায় ঠিক তর্জ্জমা হয় না ভাবিয়া বলেন, খোদা।

অর্থাৎ তাহাও একপ্রকারের জ্ঞান এবং উহা—

"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

২। "যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয়পদার্থে পরিণত করে, তদ্দ্বারা ব্যক্ত-জগতের নির্ম্মাণ করে, অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূলসূক্ষ্মভূতসমষ্টি বিষয়ের আবির্ভাব হয়—তাহার নাম সৃষ্টি।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে অথবা সৃষ্টিকালে ভিতর-বাহির ছিল, আত্মার জ্ঞানরাশি আত্মা হইতে চতুর্দ্দিকে চলিয়া যায়, গিয়া জ্ঞেয়-পদার্থে বিবর্ত্তিত হইয়া জ্ঞেয়পদার্থে পরিণত করে, আত্মা আত্মার জ্ঞানরাশি নিক্ষেপ করে, এরূপ ব্যাখ্যা আমরা বেদান্তীদিগের নিকট কখনও শুনি নাই। বেদান্তীরা জ্ঞান-শব্দটিকে দুই অর্থে ব্যবহার করেন। এক মনোবৃত্তি অর্থে, অপর চৈতন্য অর্থে। আত্মা যে জ্ঞানকে স্থূলসূক্ষ্মভূতসমষ্টিসৃষ্টির জন্য ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করেন, সে জ্ঞান কোন্ জ্ঞান? আমরা জানি, দুইটির একটিকেও আত্মা ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করেন না।

৩। "মোটা কথায় এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্ জ্ঞানের উদয়? জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়।"

মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়, এ কথা বেদান্তীর কথা নহে। জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এ কথাও বেদান্তীর কথা নহে। ঐ কথা বলিলে লোকে হয় ত বুঝিবে, তবে বুঝি আমাকে লইয়া স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। যদি সে আমাকেই লইল, তবে তাহার সে স্বাধীন অস্তিতা কিরূপ স্বাধীন অস্তিতা? বেদান্তীরা জ্ঞানোদয়কে মুক্তি বলেন না; বলেন, জ্ঞানোদয় মুক্তির কারণ। মুক্তির পূর্ব্বে তাহার উদয় হইয়া থাকে।

৪। বেদান্তব্যাখ্যাতা শঙ্কর শারীরক-ভাষ্যের প্রারম্ভে বিশ্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন সত্য, এক ভাগ বিষয় ও এক ভাগ বিষয়ী, এ কথাও বলেন সত্য; পরন্তু বেদান্তীরা তদর্থে "বিষয়-আমি ও বিষয়ি-আমি," এরূপ ভাব বুঝেন না এবং "আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তাও আমি, কর্ম্মও আমি", এরূপ নিদর্শনও দেখান না। ইঁহারা কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধকে বড়ই অগ্রাহ্য ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। বেদান্তীদিগের শাস্ত্রে "বিষয়-আমার অর্থাৎ জ্ঞানগম্য-আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্মা, আর বিষয়ি-আমার বা জ্ঞাতা-আমার পারিভাষিক নাম পরমাত্মা," এরূপ করিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মা বুঝান নাই। ইঁহারা জানেন বা বুঝেন, পরমাত্মা জ্ঞাতাও নহেন, বিষয়ীও নহেন। শারীরকভাষ্যের যে অংশে বিষয়বিষয়ীর কথা আছে, সে অংশ এই—

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্-বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎ-প্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্।"

ইত্যাদি।

ইহারই কিয়দ্দূরে পূর্ব্বপক্ষ—

"কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়তদ্ধর্ম্মা-

ণাম্? সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি, যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্ম.নাঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি?"

এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আছে—

"ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ।"

এই অংশের স্থূল সংস্কৃত ব্যাখ্যা—

"অয়ম্ আত্মা একান্তেন নিয়মেন অবিষয়ো ন ভবতি। অত্র হেতুমাহ, অস্মদিতি। অস্মৎপ্রত্যয়ঃ অহমিত্যধ্যাসঃ, তত্র ভাসমানত্বাদিত্যর্থঃ। অথবা অস্মদর্থশ্চিদাত্মা প্রতিবিম্বিতত্বেন যত্র প্রতীয়তে সঃ অস্মৎপ্রত্যয়ঃ অহঙ্কারস্তত্র ভাসমানত্বাদিত্যর্থঃ।"

পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য— আত্মা অবিষয়, সেজন্য অধ্যাস অসম্ভব। উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য — ঐকান্তিক অবিষয় নহে, বুদ্ধিতত্ত্বে তদীয় প্রতিবিম্ব পড়ে, সেভাবে তদীয় প্রতিবিম্ব অহংবৃত্তির বিষয়। অপরোক্ষত্বাৎ কথার অর্থ —স্বপ্রকাশত্বাৎ। অতএব, "বিষয়ী অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে—অর্থাৎ আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়," এ কথা ভাষ্যকারীয় কথা নহে। একজন উকিল বলিয়াছিলেন, দলিলের ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য যিনি অধিক কথা লিখিবেন, তাঁহার দলিলে তত অধিক ছিদ্র হইবে। প্রবন্ধলেখকেরাও যদি এক কথা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বারবার বহুবার না লেখেন, বৃথা প্রবন্ধশরীর বিস্তৃত না করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইতে পারে।

বহুবিস্তৃত করিলে প্রাসঙ্গিক কথাও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায়, সেজন্য এই স্থানেই প্রসঙ্গোত্থাপিত কথায় বিরত হইলাম। এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রামানুজস্বামীর উপদেশ—মোক্ষার্থী মনুষ্য আপনার অধিকার বুঝিয়া অর্থাৎ অধিত্ব-সামর্থ্যবত্ত্ব বুঝিয়া হয় ভক্তির পথে যাউক, না হয় জ্ঞানের পথ অবলম্বন করুক। যাহার চিত্ত দ্রব হয়—রসে বিগলিত হয়, সে ভক্তিপথে যাউক। যাহার চিত্ত গলে না,—কিছুতেই গলে না, সে জ্ঞানের পথে যাউক। বিপর্য্যয় করিলে অনধিকারচর্চ্চা হইবে, অনধিকারচর্চ্চায় ফল হয় না। যাহারা অধিকারের অনুগামী হইয়া চলে,—কার্য্য করে, তাহারাই প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়,—কৃতকার্য্য হয়, অন্যে অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে।

শঙ্কর বলেন, মোক্ষের একমাত্র পন্থা জ্ঞান, রামানুজ বলেন, তাহা ভক্তিসমুচ্চিত হওয়া আবশ্যক। যাহাই হউক, জ্ঞান অথবা ভক্তি, দুইটির একটিও সহজলভ্য নহে। শঙ্করের তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ও রামানুজের পরা ভক্তি কিরূপ প্রভেদযুক্ত, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শঙ্কর ব্রহ্মাকারা অখণ্ড-চিত্তবৃত্তিকে তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান বলেন, রামানুজও ধ্যেয়ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তিকে পরা ভক্তি বলেন। সুতরাং তাহাও জ্ঞানবিশেষ। রামানুজ ব্রহ্মশব্দের অর্থে সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণযোগী পরমেশ্বরের গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই পুরাণাদিবর্ণিত নাম বাসুদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি। অতএব, শঙ্করের তত্ত্বজ্ঞান ও রামানুজের পরা ভক্তি, দুইটির একটিও সহজলভ্য নহে। দুইটিই দুঃসম্পাদ্য ও ধ্যানসাধ্য। এই ধ্যানসাধ্যতাবিষয়ে জ্ঞানবাদী শঙ্কর ও ভক্তিবাদী রামানুজ উভয়েই একমত এবং উভয়েই—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।"

এই স্মৃতিবাক্য মান্য করেন।

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মোহবদপরোক্ষাদৃতে।" যেমন প্রণিধানজ সাক্ষাৎকার ব্যতীত উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা দিগ্‌ভ্রান্তি যায় না,—নিবৃত্ত হয় না, তেমনি ভাবনাময়ধ্যানজাত কিংবা প্রণিধানময়ধ্যানপ্রভব জ্ঞানবিশেষ ব্যতীত কেবল উপদেশে মুক্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। ধ্যান দুইপ্রকার—এক ভাবনাময়, অপর প্রণিধানময়। সদ্বয়বাদী ও অদ্বয়বাদী উভয়েই উক্ত দ্বিবিধ ধ্যানের এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করেন

"ভাবনাময়ং নাম নষ্টবনিতাদিবদসন্নিহিতবিষয়ং পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্। প্রণিধানময়ন্তু বস্তুতত্ত্ববিষয়ম্।"

বেদান্তীরা এই দ্বিবিধ ধ্যান বর্ণনা করিয়া বলেন—

"দ্বিবিধমপি ধ্যানং শুদ্ধং বস্তু প্রতিপিৎসোরাবশ্যকম্।"

যাঁহারা বিশুদ্ধ বস্তু জানিবার জন্য - ব্রহ্ম জানিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত দ্বিবিধ ধ্যান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রামানুজস্বামী এইস্থলে বলেন, প্রণিধানময় ধ্যান অপেক্ষা ভাবনাময় ধ্যান ভাল। সকলের পক্ষে না হউক, অন্তত ভক্তিমান্ অধিকারীর পক্ষে ভাল। বেদান্তীরা বলেন—

"ভাবনাময়ধ্যানেন বশীকৃতং চিত্তং ক্রমশো মূর্ত্যাকারতঃ প্রচ্যাব্য অব্যক্তমাত্রাবলম্বনো ভূত্বা বিরাড়াদৌ কারণে ব্রহ্মণি চিত্তং প্রণিদধ্যাৎ। ততশ্চাস্বস্থ্যধ্যস্তস্য বিরাড়াদিত্রয়স্য রজ্জুসর্পস্যেব চিত্তস্থিরীকরণেন অধিষ্ঠানভূতশুদ্ধবস্তুদর্শনেন প্রবিলাপনকরণম্। তচ্চ দর্শনং দগ্ধেন্ধনানলবৎ স্বয়মুপশান্তং সৎ সুষুপ্তিসরূপা কাচিদানন্দাবস্থা আবির্ভবতি সা মুক্তিঃ।"

প্রচলিত বঙ্গভাষায় কথাগুলির ব্যাখ্যা বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়। সেজন্য ব্যাখ্যা না বলিয়া, মাত্র স্থূল তাৎপর্য্যটুকু বলিতেছি। প্রথমত চিত্তকে ভাবনাময় ধ্যান দ্বারা বশীভূত করিতে হয়। চিত্ত বশীভূত হইলে অল্পে অল্পে ও ধীরে ধীরে সে মূর্ত্ত্যবলম্বন ত্যাগ করিয়া অব্যক্তাবলম্বী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিশ্বকারণ বিরাট্, হিরণ্য ও ঈশ্বর তত্ত্বে প্রণিধানতৎপর হইতে হয়। প্রণিধান-ধ্যান স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে এক-প্রকার সাক্ষাৎকারকারী জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে। তাহাতেই, যেমন রজ্জুসাক্ষাৎকার হইলে তন্নিমেষে রজ্জ্বধিষ্ঠানের সর্পাবভাস লুকাইয়া যায়, তেমনি, আত্মাধিষ্ঠানস্থ বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, এই তিন অবভাসও লুকাইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে ব্যষ্টিনিয়মের বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, এ সকল অবভাসও (মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানপ্রভব কল্পনাসমূহ) বাধিত হইয়া যায়। তখন অবশিষ্ট থাকে প্রণিধান বা ধ্যানপ্রবাহ, তাহাও কাষ্ঠভস্মকারী বহ্নির ন্যায় আপনা-আপনি উপশমপ্রাপ্ত হয়। এই উপশমের পর একপ্রকার সুষুপ্তিতুল্য অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা তারতম্যবর্জ্জিত, পূর্ব্বাপরবিভাগশূন্য ও আদ্যন্ত-মধ্যরহিত আনন্দাবস্থা এবং এই অবস্থাই বেদান্তীদিগের অভিমতা মুক্তি। এই স্থানে রামানুজ বলেন, আদর, নৈরন্তর্য্য, ও সংকার সহকারে ও অবিচ্ছেদে দীর্ঘকালব্যাপী ভাবনাময় ধ্যান করিতে করিতে অল্পে অল্পে জীব তন্ময় হইয়া যায়,—কীটবিশেষের পতঙ্গ হওয়ার অনুরূপে ধ্যেয়সারূপ্য অর্থাৎ ভগবৎ-সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সেই ভগবৎসারূপ্য-প্রাপ্তিই তাহার মুক্তি,—জীবন্মুক্তি, অন্য কোনরূপ মুক্তি নাই। সারূপ্যপ্রাপ্তি হইলে জীব দেহপাতের পর সম্পূর্ণ-

ষড়্‌গুণ ভগবানের জগৎকর্ত্তৃত্ব গুণ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় গুণ প্রাপ্ত হয় ও ভগবদ্‌-যাথাত্ম্য ও নিত্যনিরতিশয় নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। মুক্তপুরুষকে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিতে হয় না কেন? না, জন্মপরিগ্রহের কারণ বা বীজ কর্ম্মাশয় বা সঞ্চিতকর্ম্ম তাঁহার থাকে না, জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ হইয়া যায়। তাই তাঁহার জন্ম-হয় না। একাত্মবাদীর মুক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে গেলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি না হয় কেন? আমি, তুমি, তিনি, আমরা সকলেই সাধনা বা জ্ঞানপ্রাপ্তির চেষ্টা করি কেন? হিমালয়-গুহায় সন্ন্যাসী জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন, তিনি যখন মুক্ত হইবেন, আমিও তখন মুক্ত না হইব কেন? এইরূপ অনেকানেক আপত্তি খণ্ডন করিয়া সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে হয়, না করিলে অপূর্ণতাদোষ থাকে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

ত্রিবঙ্কুর।

৩

ত্রিবঙ্কুরে এই-যে প্রথম রাত্রি আমি অতি-বাহিত করিতেছি, এই রাত্রির শেষভাগে আমার ছাদের উপর একটা ভীষণ কোলাহল উপস্থিত। হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, তাহার পর লড়ালড়ি। আমার নিবাসগৃহ চারি-দিকে খোলা, এই মনে করিয়া আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অস্পষ্ট উদ্বেগের ভাব ছিল। এখন যেন আমি আধো-ঘুমন্ত অব-স্থায় দেখিতে পাইলাম, কতকগুলা বড়-বড় বিড়াল লম্ফঝম্প দিয়া কর্কশস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রির নিস্তব্ধতাহেতু ও গৃহের মধ্যে কাঠের কাজ অধিক থাকায়, বেশি শব্দ হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। আসলে উহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বনবিড়ালের পদশব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্তদিন উহারা উদ্যানস্থ বৃক্ষের উপরে নিদ্রা যায়; রাত্রিকালে শিকারে বাহির হইয়া আত্মবিনোদন করে এবং ধৃষ্টতাসহকারে মনুষ্যরাজ্য আক্রমণ করে।

অতি প্রত্যুষে, ত্রিবন্দ্রমে আমার মনে একটা বিষাদের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। উষার প্রথম আরম্ভেই, ভীষণ একটা শোকসূচক কোলাহল উত্থিত হইল। শব্দটা যেন একটু দূর হইতে আসিতেছে,—ব্রাহ্মণ্যের সেই পূতভূমি হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। হাজার-হাজার লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; উহা যেন সমস্ত মানবমণ্ডলীর আর্ত্তনাদ; সমস্ত মানব-মণ্ডলী যেন জাগ্রত হইয়াই আবার সেই চির-ন্তন পৃথিবীর দুঃখকষ্ট অনুভব করিতেছে—মৃত্যুচিন্তার ভারে নিষ্পেষিত হইতেছে। তাহার পরেই, বিহঙ্গেরা নব-ভানুকে অভি-বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু বসন্তকালে

উহারা আমাদের ফলবাগানে যেরূপ মৃদু-মধুধরণে সুমধুর প্রভাতী গাহিয়া থাকে, ইহাদের সঙ্গীত সেরূপ নহে।

এখানে, 'নকুলে' টিয়াপাখীর স্থূল কণ্ঠস্বরে—বিশেষত কাকের শোকবিষাদময় চীৎকারে ছোট-ছোট পাখীর কলধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রথমে, সঙ্কেতস্বরূপ পৃথক্‌ভাবে দুইএকটা কা-কা-শব্দ সুরু হয়, তাহার পর শতকণ্ঠে—সহস্রকণ্ঠে কা-কা-শব্দের ভীষণ সমবেত-সঙ্গীত বাহির করিয়া, কাকেরা পূতিগন্ধি শবদেহের জয়ঘোষণা করে। ......কাক, কাক, সর্ব্বত্রই কাক, ভারতভূমি কাকে আচ্ছন্ন; বরাবর দেখিতেছি,—ত্রিবঙ্কুরে, এই মনোমুগ্ধকর শান্তিময় রাজ্যে, —উষার আরম্ভ হইতেই উহাদের চীৎকারে তালতরুমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং যাহারা উহার সুন্দর পত্রপুঞ্জের নীচে বাস করে ও জাগ্রত হয়, তাহাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া যায়। কাকেরা যেন এই কথা বলে:—"সমস্ত মাংস কখন্ পচিয়া উঠিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা এখানে আছি, আমাদের খাদ্য নিশ্চিত মিলিবে, আমরা সমস্তই আহার করিব।"......

তাহার পর, তাহারা চারিদিকে উড়িয়া যায়, আর তাহাদের সাড়াশব্দ থাকে না। আবার মনুষ্যের দূর-কোলাহল শ্রুত হয়;—অতীব প্রবল, অতীব গভীর; বেশ বুঝিতে পারা যায়, অসংখ্য ব্রাহ্মণ কোন বৃহৎ মন্দিরে সমবেত হইয়া স্বকীয় দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। তাহার পরেই, 'ত্রিবন্দ্রম'-নগর যে তালকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত, তাহার চারিদিক্ হইতে ঢাক-ঢোল, করতাল-শঙ্খের মিশ্রিত কল্লোল এখানে আসিয়া পৌঁছে। অরণ্যের মধ্যে যে সকল ছোট-ছোট দেবালয় ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে,—সেই সকল মন্দিরে ইহাই দিবসের প্রথম পূজা।

অবশেষে সূর্য্যের উদয় হইল। সম্পূর্ণ-অবারিত এই সকল গৃহে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিল। অত্রত্য গৃহ ও নৈশপদার্থের মধ্যে স্তম্ভ ও পাতলা 'চিক্' ভিন্ন আর কোন অন্তরাল নাই। এই আলোকে, এই সুন্দর চমৎকার আলোকে, এই সুমধুর সময়ে, উষার সমস্ত বিষণ্ণতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। আমি উদ্যানে নামিলাম।

তালবনের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকা জায়গায় এই উদ্যানটি অবস্থিত। ইহার মধ্যে কত শাদ্বলভূমি, কত গোলাপি-রঙের ফুলের বৃক্ষ, কত পর্ণতরু (Fern); উত্তপ্ত আর্দ্রস্থানেই এই পর্ণতরুগুলি জন্মায়। এরূপ অপূর্ব্ব পত্রপুঞ্জ ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। এইজাতীয় সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষই এখানে আছে। কোন কোন পাতায় ফুলের মত রং; কোনটা ঘোর লাল, কোনটা বেগ্‌নি, কোনটা ফিঁকে রক্তবর্ণ; কোনটায় সরীসৃপজাতীয় জীবদিগের পৃষ্ঠের ন্যায় ডোরাকাটা; আবার কোনটার গায়ে, প্রজাপতির পাখায় যেরূপ থাকে, সেইরূপ চোখ আঁকা।

প্রাতে ৭টায়—যে সময়ে তরুবীথিমণ্ডপতলে নিশার শৈত্য একেবারে চলিয়া যায় নাই—সেই সময়েই এখানকার লোকদিগের দেখাশুনা করিবার, লোক-লৌকিকতা করিবার সময়।—অস্মদ্দেশীয় রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি সংবাদ পাইলাম, কাল এই

সময়ে, রাজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য, আমাকে ব্রাহ্মণগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি,—এত তালবৃক্ষ, এত ছায়া সত্ত্বেও, উর্দ্ধগগনাবলম্বী সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে জীবনপ্রবাহ যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই ঘুমন্ত ভাব, সর্ব্বত্রই নিস্পন্দতা; সেই চিরন্তন বায়সেরাও নিস্তব্ধ,—পত্রপুঞ্জের নীচে ভূতলে উপবিষ্ট।

আমার বারণ্ডা হইতে যে রাস্তাটি দেখিতে পাইতেছি, উহা হরিতের নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উহা লোকশূন্য থাকিবে। এখনও দুইচারিজন পথিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে; উহারা নিজ নিজ কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; ভারতবাসী অথবা ভারতবাসিনী; পরিধানে একইরকম লালধুতি; উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ তাম্রাভ গাত্র - নগ্নপদে নিঃশব্দে চলিতেছে। লোকদিগের লালচে-রঙের কাপড়; এবং উহারা লালমাটির উপর দিয়া চলিতেছে; এদিকে তালপুঞ্জের অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ;—এই বৈপরীত্য-সংযোগে লালরঙের আরো যেন খোল্‌তাই হইয়াছে। কখন-কখন, কোন নিঃশব্দ গুরু-পদক্ষেপে পথভূমি কাঁপিয়া উঠিতেছে। উহা হস্তীর পদক্ষেপ। মহারাজার হস্তিগণ, কোনো মেঠো কাজ সমাধা করিয়া, চিন্তামগ্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, উহারা হস্তিশালায় গিয়া এইবার নিদ্রা যাইবে। ইহার পর, আর কিছুই শুনা যায় না। কেবল যে সকল জীব স্বকীয় স্বাভাবিক গতির উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে সর্ব্বদাই চঞ্চল, সেই তরুনিবাসী চটুল কাঠবিড়ালীরা চারিদিক্‌কার নিস্তব্ধতার সাহস পাইয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সায়াহ্নে, যখন মনুষ্যের চেষ্টা-উদ্যম আবার আরম্ভ হইল, তখন আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহারাজার গাড়িতে আমি আরোহণ করিলাম। অশ্বদিগের দ্রুতগতিতে আমার মনে যেন একটা শৈত্যবিভ্রম উপস্থিত হইল।

এখন, ত্রিবন্দ্রমনগরের আর-এক নূতন বিভাগ আমার চতুষ্পার্শ্বে প্রসারিত। এখন আর বৃক্ষের আধিপত্য নাই,—শাদ্বলভূমি উহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে,—কতকগুলি বালুকাকীর্ণ সুন্দর বীথি প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিক-ধরণের রাজধানীতে যে সকল দ্রষ্টব্য বস্তু থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই উদ্যানসমূহের অভ্যন্তরে বিকীর্ণ রহিয়াছে:—মন্ত্রণাভবন, আতুরাশ্রম, কর্জ্জ-কুঠী, বিদ্যালয়। এ সব জিনিস তত বেসুরো-বেখাপ্পা বলিয়া মনে হইত না,—যদি একটু ভারতীয়-ধরণে গঠিত হইত; কিন্তু, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই একই প্রকারের রুচিদোষ দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া, এখানে প্রটেস্‌টাণ্ট, ল্যাটিন ও সিরিয়া সম্প্রদায়ের বিবিধ খৃষ্টান গির্জ্জাদিও আছে। এই সিরিয়া-সম্প্রদায়ের গির্জ্জাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং উহাদের সম্মুখ-ভাগের আকৃতিটি নিতান্ত সাদাসিদা-ধরণের। কিন্তু সে যাহাই হোক, এ সমস্ত দেখিতে আমি ত্রিবঙ্কুরে আসি নাই। এখন আমি বুঝিতেছি, ব্রাহ্মণভারতের—রহস্যগভীর ভারতের সংস্পর্শে আসা কতটা কঠিন,—যদিও সেই জীবন্ত ভারত, সেই অপরিবর্ত্তনীয় ভারত

আমার খুব নিকটেই রহিয়াছে বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি এবং উহার মহারহস্য আমার চিত্তকে সততই বিক্ষুব্ধ করিতেছে।

নগরের এই নব অঞ্চলটির বাহিরে, যে সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে সমস্ত নীচজাতীয় হিন্দুরা বাস করে, তাহার উপর তাল-তরুর হরিৎ খিলান প্রসারিত। বাঁশের ছোট-ছোট বাড়ী, পাথর ও খড়-পাতার ছোট-ছোট পুরাতন দেবালয়, সেই চিরন্তন নারিকেলপুঞ্জের মধ্যে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন; এই স্থানটি ছায়ার রাজ্য এবং ইহার বীথিগুলি তমসাচ্ছন্ন উদ্ভিজ্জের ঢাকা-বারণ্ডা-পথ বলিয়া মনে হয়।

কেবল একটিমাত্র রীতিমত রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া, নক্ষত্র-পরিদৃশ্যমান একটা মুক্তস্থানে আসিয়া পড়িলাম এবং এই রাস্তা দিয়াই ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র গণ্ডির দ্বারদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই রাস্তাটি বণিক্-বীথি; নিস্তব্ধপ্রায় এই যে নগর, ইহার যাহা-কিছু চলাচল, যাহা-কিছু কোলাহল, সমস্তই এইখানে কেন্দ্রীভূত। সায়াহ্নের এই সময়ে, এই রাস্তাটি লোকাকীর্ণ; এইখানে ঘোড়াদিগকে একটু আস্তে-আস্তে চালাইতে হইল। লোকদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন সব দেবমূর্ত্তি, এমনি সুন্দর মুখশ্রী, এমনি শোভন-গম্ভীর দাঁড়াইবার ভঙ্গি এবং সুগভীর অতলস্পর্শ চোখের দৃষ্টি।

এই লোকদিগের বাহু ও গাত্র যেন তাম্র ধাতুতে কোঁদা—চূড়ান্ত গঠন-উৎকর্ষে ও সুচারু ভঙ্গিমায় পুরাতন গ্রীসের উৎকীর্ণ-চিত্রমূর্ত্তির সদৃশ।

সূক্ষ্মরুচি ও মহাগৌরবান্বিত উন্নতপদবি ব্রাহ্মণেরা সাজসজ্জা তুচ্ছ করিয়া, নিকৃষ্ট-বর্ণের লোকদিগের অপেক্ষা—এমন কি, পারিয়াদিগের অপেক্ষাও স্বল্প পরিচ্ছদে যাতায়াত করিতেছে। শাদা কাপড়ের ধুতি কোমরে জড়ানো এবং তাহাই নগ্নবক্ষের উপর, চাপ্‌রাসের মত বক্রভাবে গিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে; সেই নগ্নবক্ষে ছোট একটা শণ সূতার দড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই বর্ণভেদের বাহ্যচিহ্ন; জন্মাবামাত্রই পুরোহিত উহা গলায় বাঁধিয়া দেয়; উহা কস্মিন্‌কালেও আর ত্যাগ করিবার জো নাই; এই পবিত্র যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণের জীবন-মরণের সাথী। উহাদের ললাটদেশে, গভীর কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয়ের মাঝখানে স্বকীয় ইষ্টদেবতার সাঙ্কেতিক নাম অঙ্কিত থাকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ এই চিহ্নটি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের পরে উহাদিগকে নূতন করিয়া সযত্নে ললাটে আঙ্কত করিতে হয়। একটা লাল ফোঁটা ও তিনটা শাদা রেখা—ইহাই শৈবদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন; বৈষ্ণবদিগের একপ্রকার শাদা ও লাল রঙের ত্রিশূলরেখা, যাহা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি আমাদিগের পক্ষে নিতান্তই প্রহেলিকা।

স্ত্রীলোক খুব অল্প কিংবা নাই বলিলেই হয়—যদিও প্রথমদৃষ্টিতে, গ্রন্থিবদ্ধ বা স্কন্ধের উপরে বিলম্বিত সুচিক্কণ দীর্ঘ কেশগুচ্ছ দেখিয়া পুরুষদিগকে স্ত্রীলোক বলিয়া সর্ব্বত্রই ভ্রম হয়। যে সকল স্ত্রীলোক দেখা যায়, তাও আবার অতি নীচবর্ণের—তাহাদের

মুখশ্রী রাস্ত'র মজুবরমণীদিগের ন্যায় নিতান্ত ইতরধরণের। অবশ্য ব্রাহ্মণদিগের পত্নী ও কন্যাগণ এই পবিত্র গণ্ডির মধ্যে বাস করে। সন্ধ্যার সময় উহারা দলে দলে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই সমস্ত বাড়ী,—যাহা গতরাত্রে, নীলাভ-প্রশান্ত-কিরণ তলে, নিদ্রামগ্ন ও মুদ্রিতনেত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল এক্ষণে উহা জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। এখন উহাতে বাজার বসিয়াছে; ফল, শস্য দানা, রঙিন ফুলের ছাবা-দেওয়া মিহি কাপড়; সোনার মত ঝক্‌ঝকে পিত্তলের সামগ্রী:—এই পিত্তলের সামগ্রীর মধ্যে, বহুডালবিশিষ্ট পাতলা-গঠনের প্রদীপ -খুব উচ্চ পায়ার উপর বসানো—(যেরূপ 'পম্পে'তে দেখিতে পাওয়া যায়); বিবিধপ্রকার পূজার বাসন ও পাত্র, এবং হস্তীর উপর আরূঢ় দেবদেবীর মূর্ত্তি।

তাহার পর, আমার প্রদর্শকমহাশয় আমাকে কতকগুলি কুমারের কর্ম্মস্থান দেখাইলেন। এই সকল কারখানা বর্ত্তমান মহারাজার স্থাপিত। এখানে সুন্দর প্রাচীন-ধরণে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত হয়।—আর কতকগুলি কারখানা দেখিলাম, যেখানে রাজপুতানা ও কাশ্মীরপ্রচলিত রঙের অনুকরণে পশমের গালিচাদি তৈয়ারি হয়। অবশেষে কতকগুলি শিল্পশালা দেখিলাম, যেখানে ধৈর্য্যশালী ক্ষোদকেরা নিকটস্থ অরণ্যহস্তীদিগের দন্ত কুঁদিয়া দেবদেবীর ছোট-ছোট সুন্দর মূর্ত্তি অথবা চামরের ও ছাতার ডাণ্ডি নির্ম্মাণ করিতেছে।

কিন্তু এ সব দেখিবার জন্য আমি ত্রিবঙ্কুরে আসি নাই। রাজপ্রাসাদগণ্ডির বাহিরে ও নিষিদ্ধপ্রবেশ বৃহৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে যে সকল ব্যাপার হইয়া থাকে—যাহা নিতান্তই ভারতীয়—যাহা ভারতের একেবারে নিজস্ব জিনিস—কেবল তাহাই দেখিবার জন্য আমার মন আকৃষ্ট হয়।...

ত্রিবঙ্কুরে একটি পশু-উদ্যান আছে; আমাদের য়ুরোপীয় রাজধানীসমূহের পশু-উদ্যান-গুলির ন্যায় এটিও সযত্নরক্ষিত;—ইহাতে হরিণদিগের বিচরণভূমি আছে, কুম্ভীরের চৌবাচ্চা আছে:—এইরূপ স্থান অতি বিরল . শ্বাসরোধী নিবিড় তালপুঞ্জের ছায়া হইতে বাহির হইয়া এই স্থানটিতে আসিয়া অরণ্য ও জঙ্গলের দূরদৃশ্য একটু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কতকগুলি শাদ্বলভূমি আছে, যাহার চারিধারে দুর্লভ গাছের চারা ও বড় বড় বিদেশী ফুলের গাছ লাগানো হইয়াছে। এই অংশটি এমনি ভাবে নির্ম্মিত যে, এখানে বেশ নিরাপদে বিচরণ করা যায়; কেন না, এখানকার তৃণাদি উদ্ভিজ্জ সযত্নে ছাঁটা, এবং যে সকল ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্রজন্তু এখান হইতে বড় ছয়সাতক্রোশ দূরে জঙ্গলের মধ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করে—এখানে তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ। সূর্য্য এখন আর জগৎকে দগ্ধ করিতেছে না—রাত্রিও আসিয়া পড়ে নাই, এই অল্পস্থায়ী মনোহর সময়টিতে একদল ঐকতানবাদক, উদ্যানের দ্বারহীন চারিদিক্-খোলা একটি ক্ষুদ্র বিনোদমন্দিরে বাজাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। উহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়; উহারা য়ুরোপীয় সুর অতি বিশুদ্ধভাবে বাজায়। বালুকাবিকীর্ণ উদ্যানের সুঁড়িপথগুলিতে অধিষ্ঠিত—দুর্লভ

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে—কতকগুলি পাত্‌লা-পাত্‌লা নগ্নগাত্র ব্যক্তি অবস্থিত; শ্বেতজাতীয় দুই-চারিটি খোকা-খুকি—(শ্বেতজাতির মধ্যে দুইচারিজনমাত্র এখানে আছে) রং খুব ফ্যাকাসে—ভারতীয় ধাত্রীর ক্রোড়ে অবস্থিত। তা ছাড়া, দেশীয় শিশুও কতকগুলি ছিল—রাজাদের ছেলে; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন তাহারা আর নিজেদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে না, পরন্তু উদ্ভট-অদ্ভুত পাশ্চাত্যপুতুলের ছদ্মবেশ ধারণ করে; তাম্রবর্ণসত্বেও এই নরপুত্তলিকাগুলি অতি সুন্দর, আর চোখগুলিও খুব বড়-বড় ও কালো মখমলের মত। এই পশু-উদ্যানটি একটু উচ্চভূমির উপর অধিষ্ঠিত হওয়ায়, দূরস্থ ভারতসমুদ্র অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ সমুদ্রে জাহাজ নাই; অন্যদেশে সমুদ্র বাহ্যজগতের সহিত গতিবিধির পথ বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু এ অঞ্চলের সমুদ্রটি একেবারেই অব্যবহার্য্য ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী;—যোগনিবদ্ধ করা দূরে থাকুক, বাহ্যজগতের সহিত উহা যেন আরও বেশি পৃথক্ করিয়া দেয়। কেন না, এই উপকূলের কোথাও একটি বন্দর নাই; এমন কি, একখানি নৌকাও নাই, ধীবরও নাই, কেবল চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বীচিমালা। ত্রিবঙ্কমের এই 'সৌখীন' দিবাবসানসময়ে যখন কেবলমাত্র দুইচারিটি বেচারি খোকা-খুকির জন্য ঐকতানবাদ্য বাদিত হয়, তখন ঐ দুরস্থ সমুদ্রের উপচ্ছায়া প্রবাসীর মনে কষ্ট ও বিষাদের ভাব আরো যেন বাড়াইয়া তুলে।

এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন—বড় শীঘ্র অস্ত গেলেন: ক্ষণেকের জন্য অস্ত মহিমা; দেখিলে মনে হয়, যেন রক্তবর্ণ ভূমির উপর গোলাপি রংমশালের আলো, এবং তৃণপুঞ্জের উপর—দিগন্তব্যাপী দুর্ভেদ্য বনভূমির উপর—সবুজ রংমশালের আলো পতিত হইয়াছে। তাহার পর অতি শীঘ্র (সহসা বলিলেও হয়) রাত্রির আবির্ভাব হইল। এখানে দীর্ঘ-বিলম্বিত গোধূলি নাই ঠিক্ একই অপরিবর্ত্তনীয় সময়ে রাত্রি আসিয়া পড়ে—আমাদের দেশের ন্যায় এই সময়টি ঋতুর উপর কোন প্রভাব প্রকটিত করে না। উদ্যানে রাত্রিটা যেন আরো বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে—কেন না, ইহার ঝোপ্‌ঝাড়ের সুঁড়িপথে, তালপুঞ্জের নীচে—চতুর্দ্দিকের সকল স্থানেই ইহারই মধ্যে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সময়ে ব্রহ্মার মন্দির হইতে একটা কোলাহল উত্থিত হইল; আর সমস্ত অন্যান্য ইতস্ততোবিকীর্ণ মন্দির হইতে, প্রাতঃকালের ন্যায়, আবার শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নারিকেল-তৈলসিক্ত শতসহস্র প্রদীপ বনভূমিতলে প্রজ্বলিত হইল এবং এই লাল আগুনের আলোকচ্ছটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথসমূহে প্রসারিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবাহযাত্রী।

[ছবি]

দেখ্‌লাম একটা যাচ্ছে বিয়ে
সমারোহে রাস্তা দিয়ে।-
রাস্তার দুধার চলেছে দুই 'এসেটেলিন্ ল্যাম্পের' সারি ;
প্রথমত ঢোল ও কাঁশী,
তাহার পরে দক্ষ বাঁশী,
তাহার পরে গোরার বাদ্য, তাহার পরে সানাইদারি ;—
বাঁশী, সানাই, ঢক, ঢোল,
কচ্ছে মিলে হট্টগোল ;
সবই আছে, নাইক কেবল মৃদঙ্গ ও হরিবোল !

একটি যুবা—সুগৌর, হ্রস্ব,
চড়ে' একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে, যাচ্ছেন সগৌরবে ;—
অতি সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি :
পরনে তাঁর রেশ্‌মি কুর্ত্তি,
রেশ্‌মি ধুতি, জরির টুপি ; - বয়স বছর পঁচিশ হবে ;—
সুবিস্তৃতপরিসর,
যেন বিন্ধ্য মহীধর,
কিম্বা ইন্দ্র ঐরাবতে ;- তিনি হচ্ছেন বিয়ের বর।

পিছনে তাঁর, ইতস্তত,
ধূমকেতুর লেজের মত,—
আস্‌ছে নানাবিধ শকট অনবিস্তর অন্ধকারে ;
তাতে বরযাত্রিবর্গ—
(তাঁরা মাত্র উপসর্গ)
এ কার্য্যে প্রকারান্তরে সমুৎসাহ দিতে তাঁরে।

(দিয়ে দণ্ডবিধির মাপ
বিয়ে যদি হ'ত পাপ, -
তাঁদেরও এ বিয়ের জন্য পেতে হ'ত মনস্তাপ।)

—এখন এটা বড়ই ইতর
বরের আসল মনের ভিতর
কিরকমটা হচ্ছিল, তা খুঁচিয়ে দেখা বারেবারে ;
সে সময়, সে স্থানে, জানি,
সে ব্যাপারে, একটুখানি
তাঁহার মনে মনে গর্ব,—সে ত স্বতই হতেই পারে ;
'ওয়েলিংটন্' 'ওয়াটার্লু'জয়
করেছিলেন যে সময়,
তখন জয়ীর মনের ভাবটা হওয়াও তাঁর আশ্চর্য্য নয়।

সুসজ্জিত দিব্যসাজে ;
নানাবিধ বাদ্য বাজে ;
তা'তে 'এসেটেলিন্' আলো ; তা'তে চতুরশ্ব গাড়ি ;
[যদিও সে বাহকস্কন্ধে
অবস্থিত 'ল্যাম্পের' গন্ধে
বাল্যে ভুক্ত মাতৃদুগ্ধও উঠে আসে জঠর ছাড়ি' ;
যদিও সেরকম সাজ
পর্ত্তে আমার হ'ত লাজ,-
বিংশ শতাব্দীতে একটু বেশী পৌরাণিকী ধাঁজ ;

যদিও সে গাড়িখানা
কোথাও কর্জ্জ করে' আনা ;
বরযাত্রী—দূরে থাকুক দেখা বরে সসম্মানে—
বরের সজ্জা, ধরণ দেখে,
হাস্‌ছে মুখে রুমাল ঢেকে ;
তাকাচ্ছিলও পথিকবৃন্দ বরের চেয়ে ঘোরার পানে ;
যদিও সে বাদ্য—হোক
কেবলমাত্র গোলোযোগ ;—
বাদক এবং শ্রোতার পক্ষে দস্তুরমত কর্ম্মভোগ ;]

তথাপি সে বরের পক্ষে,
(অন্তত তাঁর নিজের চক্ষে)
সে রাত্রিটি ভবিষ্যতে স্মরণীয় পৃথক্ করে' ;
দেখ্‌ছিলেন সে সমারোহে
একটু হর্ষে, একটু মোহে,
একটু বিচলিত বক্ষে, একটু যেন নেশার ঘোরে ;
শুন্‌ছিলেন সে বাদ্যরব
মধ্যে যেন আত্মস্তব—
(ভাবী বধূর মলের শব্দ শোনাও নয় ক অসম্ভব !)

দেখ্‌ছিলেন "এ কোথা থেকে,
দু গণ্ডে অলক্ত মেখে,
পেশোয়াজে মর্ত্তে নেমে এসে'ছে অপ্সরাবর্গ ?"
ভাব্‌ছিলেন "সে—ভাবী বধূ
(বাহিরে-অন্তরে মধু)
মর্ত্ত্যে যদি-স্বর্গ থাকে—সেই স্বর্গ,—সেই স্বর্গ।
পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথ —
প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ
ব্যাপি', একটা পুষ্পকীর্ণ আলোকিত ভবিষ্যৎ।"

ভাব্‌ছিলেনও করে' দম্ভ—
"হোল অন্ত যে আরম্ভ,
গীতিঝঙ্কারিত, দীপ্ত, প্লুত পূর্ণমহোৎসবে ,
হোল সে আরম্ভ যদি,
সে আরম্ভ নিরবধি.—
কালের মত ব্যাপ্তির মত কভু না সমাপ্ত হবে ;
[যদি বা সমাপ্ত হয়
দর্শকবৃন্দ-সমুদয়,
পড়ে' গেলে যবনিকা, 'আঙ্কোর' কর্ব্বে অতিশয়"]

ভাব্‌ছিলেন না তিনি "আছে
এই আরম্ভটির পাছে
অনেক বিরাগ, অনেক বিবাদ, অনেক বিশ্রী গণ্ডগোলে ,

অনেক বাক্যহানাহানি ;
গর্জ্জনবর্ষণ অনেকখানি ;
অনেক অভিব্যক্ত ইচ্ছা—'বাঁচি আমার মরণ হোলে'।
পরে অভিজ্ঞতালাভ—
আরম্ভটি অমিতাভ ;
তৃতীয়াঙ্ক-কাছাকাছি কিন্তু একটু অসদ্ভাব।"

ভাব্‌ছিলেন না "পরিশেষে,
পঞ্চমাঙ্কে পড়্‌লে এসে,
পিছন থেকে লৌহহস্ত একটির এসে ধর্‌বে টুঁটি ;
নিঠুর কঠিন কঠোর ভাবে,
টুঁটি ধরে' নিয়ে যাবে ;
চিরকালের জন্য সেদিন ভিন্ন হবে হৃদয়দুটি ;
এ রহস্য হবে ভেদ ;
ঘুচে যাবে সকল খেদ ;
প্রেমের পরিপূর্ণ মাত্রায় পড়্‌বে পূর্ণ পরিচ্ছেদ !"

—ভালবাসে শ্রোতা, পাঠক,
বটে, 'মিলনান্ত নাটক' ;
কিন্তু আমরা অসমাপ্ত গল্প শুধু শুনাই তথা ;
পূর্ণজীবন যদি লিখি,
দেখাই সেটির সমাপ্তি কি,
সব নাটকই 'বিয়োগান্ত'— কহি যদি সত্য কথা ;
সব নাটকের শেষে হায়
একই দৃশ্য ;—সমুদায়
সেই একই চিতানলে ধূধূ করে' পুড়ে যায়।

এই যে রাত্রি আঁধার স্তব্ধ ;
উঠ্‌ছে যে ঐ ঢাকের শব্দ
নিস্তব্ধতার বিজনদুর্গ লুঠে নিতে বারেবারে ;
অন্ধকারকে ছিন্ন করে',
ব্যঙ্গ করে', ভিন্ন করে',
জল্‌ছে যে এই আলোকশ্রেণী সমুন্নত অহঙ্কারে ;—

পরে স্তব্ধ হবে রব,
আলোক নিভে যাবে সব,
—নিজের দণ্ডব্যাপী স্পর্দ্ধা তখন কর্ব্বে অনুভব।

অন্ধকারের বিরাট্ রাজ্য ;—
তাহে জ্যোতি হচ্ছে বাহ্য,
হচ্ছে লুপ্ত,—সাগরবক্ষে দ্বীপের মত, ইতস্তত ;
মহাব্যাপ্তি গভীর স্তব্ধ ;—
তা'তে কোটি মহাশব্দ
উঠে নামে, পরিব্যাপ্ত সাগরবক্ষে ঢেউয়ের মত ;
মরণসিন্ধু বিশ্বময়
ছেয়ে আছে সমুদয় ;
জীবন তাহে বিম্বসম উদয় এবং বিলীন হয়।

—হে কাম্য বিবাহযাত্রি !
এই যে আলোকিত রাত্রি,
এই যে যাত্রাসমারোহ, দেখ্‌ছ অন্ত্য সগৌরবে ;
ভাব্‌ছ কি হে—একদিন আবার
(বটে সময় হ'লে যাবার)
একদিন আবার অন্যরকম সমারোহে যেতে হবে ?
(তবে কিনা সেটা ঠিক
নয় ক শ্বশুরবাড়ীর দিক্ -
আলোক কিম্বা বাদ্যও তা'তে থাক্‌বে নাক সমধিক।)

সেদিন- বিনা গণ্ডগোলে,
(হন্দমুদ্দ হরিবোলে)
মন্দগতি বাহকস্কন্ধে সোজাপথে চলে' যাবে !
(এমন সমারোহ—আহা !
তুমিই দেখ্‌বে নাক' তা ;
কিন্তু পথের অন্যসকল পথিকমাত্রই দেখ্‌তে পাবে ;
দেখ্‌বে তারা—যাচ্ছে বেশ,
নাইক কষ্টদুঃখলেশ ;
কিন্তু যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের কষ্টের পরিশেষ।)

আপন ব্যক্তি সময় দেখে,
তোমার আপন বাড়ী থেকে
কর্ব্বে সেদিন বহিষ্কৃত, নিয়ে যাবে দড়ির খাটে :
তোমার আপন দেহ, 'বাসি'
হবামাত্রই, অবিশ্বাসী ;
পুড়িয়ে তারে, নেহাইৎ একা রেখে আস্‌বে শ্মশানঘাটে।
(বেশী কিম্বা অল্প হোক)
দুদিন তারা কর্ব্বে শোক ;
পরে আবার অন্যজনে করে' নেবে আপন লোক।

—হে কাম্য শকটারূঢ় !
বল্‌ব না আজ সে নিগূঢ়
সেই নিত্য সত্য রূঢ়।—তোমার সুখের রাত্রি হেন !—
তোমার সুখে সমুৎসাহে
কেবা বাধা দিতে চাহে ?
তোমার পূর্ণ শরচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত কর্ব্ব কেন ?
যাও বিয়ে কর্ত্তে যাও ;
—সে সব কথা ভেব না-ও
অদ্য তোমার সুখের রাত্রি—যত পার ভেসে নাও।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দিল্লির শিল্পপ্রদর্শনী।

দিল্লিদরবারের বিরাট্ ব্যাপারের মধ্যে যাহা-কিছু খাঁটি, যাহা-কিছু দ্রষ্টব্য, যাহা-কিছু শিক্ষার জিনিষ, সমস্তই তাহার শিল্পপ্রদর্শনীতে ছিল, ভারতবাসিমাত্রকেই এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইউরোপ-আমেরিকা, জাপান-অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দূরদেশ হইতে,—ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ এই শিল্পপ্রদর্শনী দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, 'ভারতের শিল্প' আজও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার তুলনা অন্যত্র সম্ভবে না। প্রাচীনতার জন্য ভারত গরিমা করে বটে—কিন্তু এ গরিমার যথেষ্ট কারণ আছে। এ গরিমা গায়ের জোরে, মুখের তোড়ে, কলের বলে, রাক্ষসপ্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সেদিনের

সভ্যতার প্রচণ্ড উত্তাপের ঝলমলানি প্রতাপে হয় নাই। ভারতে প্রাচীনসভ্যতার যে একটা সাহিত্য ছিল, আর্য্যদিগের যে প্রদীপ্ত প্রতিভা—যে আরাম ও শান্তশীতল ধীরতা ছিল, তাহারই মাহাত্ম্যে এক সুনিপুণ শিল্প সেই পুণ্যভূমির নানা স্থানে নানা জাতির মধ্যে আবহমানকাল নিহিত হইয়া ছিল; -হিন্দু-সাম্রাজ্যপতনের পর মুসলমান তাহাকে মাল্য-দান করিতে কৃপণতা করে নাই,—শিক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই,—ব্যবহার করিতে ত্রুটি করে নাই।

বিদেশী রাজাদের আমলেও ভারত-শিল্প ভূপতিবর্গের আপাদমস্তক ভূষিত করিত,—অন্দরমহলে মহিষীগণের দেহ কান্তি বাড়াইতে ব্যস্ত থাকিত,—বিলাসিতার একমাত্র সহায় হইত;—তখন অঙ্গশোভা-বৃদ্ধির অনন্য উপায় ছিল ভারতশিল্প। মুসলমান বাদশাহগণ শিল্পের আদর করিতে যাইয়া ভারতবর্ষকে যেন আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। ভারতললনা রাজ-অন্তঃপুরে মহিষী হইলেন—ভারতশিল্প তাঁহাদের মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাজাইয়া দিল। কাঠখোট্টার মত মোগল-পাঠানের স্বদেশের সাজগোজগুলি নিজের লজ্জায় নিজেই লুপ্ত হইল,—আপন মহিমায় ভারতশিল্প তাহার স্থান দখল করিয়া লইল। ভারতশিল্পই দেখাইল, জয়লাভের পর মুসলমান যেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া ভারতের হীরামাণিক্যখচিত চরণখানি ধরিয়া মানভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতের দুর্দ্দিনের মধ্যে ঐ ভাবটিই বুঝি ঘনান্ধকারে বিজলিলীলা দেখাইয়াছিল। হায় সে দিন!

তাহার পর ভাগ্যলক্ষ্মী যখন মোগল-বাদশাহকে ত্যাগ করিয়া ইংরেজের অঙ্ক-শায়িনী হইলেন, তখন ভারতশিল্পকলা অভিভাবকহীনা হিন্দুবিধবার ন্যায় পিতৃকুলে আশ্রয় লইয়া নিরাভরণার দীনমূর্ত্তি প্রকাশ করিল। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও গুণগ্রাহী ভাগ্যবন্তদের গৃহে ভারতশিল্পগুলি আশ্রয় পাইল বটে, কিন্তু শিল্পের আর বিস্তারলাভ হইল না। সখের জন্য,—প্রাচীনতার যশোমাহাত্ম্যের পরিচায়ক বোধে,—চিরপ্রসিদ্ধ দ্রব্যগুলি নানাদেশে নানা ঘরে মাত্র রক্ষিত হইল। তাহাদের চিহ্নমাত্র যাহা-কিছু এবার এই দিল্লিপ্রদর্শনীতে Loan collection বিভাগে দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি তাহার বিবরণ Indian Art at Delhi 1903 নামক গবর্মেণ্টকর্ত্তৃক প্রকাশিত Sir George Watt সম্পাদিত গ্রন্থে সচিত্র বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ। ইহারই উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ইংরেজ ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতের ভাণ্ডার লুটপাট হইয়া গিয়াছিল। নাদিরশাহ ময়ূরসিংহাসন লুণ্ঠন করিলেন,—ভারতসিংহাসন শূন্য হইল,—সঙ্গে সঙ্গে ভারতশিল্পও হস্তান্তরিত হইয়া পড়িল। ইংরেজ শনৈঃশনৈ ভারতে রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন তাঁহাদের সঙ্গে নানা দেশের নরপতিবর্গের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইতে লাগিল মহারাট্টা, শিখ, মুসলমান, রাজ-পুতগণ ইংরেজপ্রতাপের সম্মুখে পরাজিত বা সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইল। সে সময়ে ভারত-ইতিহাস কেবলই ইংরেজের জয়কাহিনীতে

পূর্ণ। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী সমৃদ্ধ শান্তিসুখের অভ্যন্তরে পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন। এই কালের মধ্যে কত রাজ্যে কত গোলযোগ, যুদ্ধবিগ্রহ, আত্মকলহ, রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি ঘটনার ঝঞ্ঝাবাতে ছোট-বড় কত-শত প্রলয় হইয়া গেল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। কত ঘরের কত মণিমাণিক্যাদি শিল্পসামগ্রী কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। কে তাহার অনুসন্ধান লইয়াছে? ব্রিটিশদ্বীপেই বা কত প্রেরিত হইয়াছে! সামান্য সৈনিকেরা পর্য্যন্ত কত লুণ্ঠন-সামগ্রী স্বদেশে লইয়া-গিয়া অল্পবিস্তর মূল্যে ধনবানদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা করা কঠিন। একমাত্র টিপুসুলতানের লুণ্ঠিত হৃতাবশেষ কোষাগার হইতে, তোষাখানা হইতে তিনকোটি টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। জয়ের পর ইংরেজরাজপুরুষেরা এই সকল দ্রব্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। টিপুর দরিয়া-দৌলত-বাগের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রমোদভবন দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া যান। কাঠের উপর এরূপ সুন্দর খোদকারী কাজ ইউরোপে সম্ভব নহে। অথচ টিপুসুলতানের দুই-পুরুষমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শিল্পদ্রব্যাদি এখনও অতি প্রাচীন রাজবংশে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পী আর নাই। উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে, পৃষ্ঠপোষকের অভাবে, অর্থসামর্থ্যের অভাবে এক ব্যবসা হইতে ব্যবসান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে শিল্পিকুল লুপ্ত হইয়া গেছে। এমন কি, কোন কোন শিল্প একেবারেই নাই। নাম কত করিব?

এই ইংরেজরাজ্যে ভারতীয় শিল্প রাজানুগ্রহ পায় নাই;—কোম্পানীর আমলে কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিল্পদ্রব্য তাহাদের ব্যবসায়ের উপযুক্ত ছিল না;—ডাল, গম, পাট প্রভৃতি যতটা লাভজনক, শিল্পদ্রব্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। ইংরেজ সওদাগর-রাজা সওদাগরি করিতে লাগলেন, সস্তাদরে বিলাতিদ্রব্য ভারতে পৌঁছিতে লাগিল, শিল্প টিকে কিসে? শিল্পিগণও পাট বুনিতে আরম্ভ করিল,—ধানচাস করিতে লাগিল—বেনারসী, ঢাকাই, আমাদাবাদী, দিল্লিওয়ালা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি শিল্পিকুল জাতি নষ্ট করিয়া চাষাভুষা হইল। ভাগ্যে দুইএকজন দেশীয় রাজা ও ধনশালী সখ করিয়া কোন কোন জিনিষের খরিদদার ছিলেন, তাই প্রাণে প্রাণে দুএকটি ঘর বাঁচিয়া গেছে—কিন্তু তাহাদের অবস্থাও পূর্ব্বের মত রহিল না। ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গে সস্তাদরের জিনিষের দরকার হইল। বিলাতি সূতা, রং ও গিল্‌টি আসিয়া ভারতশিল্পকুলে যে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিল, তাহাতে তাহার এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সিগারেট্‌বাক্স, দেশেলায়ের বাক্স, দস্তানা রুমালের বাক্স, বিবিদের গাউনের মগ্‌জিতে দেশীয়শিল্পের কত রকমের অপব্যবহার, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। হিন্দুদেবদেবী চুরুটের ভস্মধারীতে, জুতা লাগাইবার ফলকের মুঠিতে, চাদানের টিপায়ের পায়ায় পরিণত হইয়াছেন,—ভারতীয় শিল্প ইংরেজিঘরে শোভা পাইতেছে।

ভারতে ইংরেজরাজ্য যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল, দেশীয়দ্রব্য তখন ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পকলার আদরের স্থান এখন ইউরোপ, তাই ইউরোপ ভারতশিল্পের আদর করিতে অগ্রসর হইয়াছে—রাজানুগ্রহও এখন কতকপরিমাণে এদিকে ফিরিয়াছে। কতকপরিমাণে বলিতেছি এইজন্য যে, হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের মত ইংরেজরাজ এই সব শিল্পদ্রব্যের জন্য অজস্র টাকাখরচ করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিশেষ-কিছু সার্থকতা ইহাতে দেখিতে পান না, তাই এভাবে অর্থ ব্যয়কে অর্থের অপব্যবহার বলিয়া ধরিয়া লন এবং patronise নামক ইংরেজীশব্দে যতটা বুঝায়, কেবল সেইটুকুই করিতে প্রস্তুত হন। অন্তত লর্ড কার্জ্জন এ অনুগ্রহটুকু করিয়াছেন। এই অনুগ্রহবিতরণে তিনি যেরূপ মুক্তকণ্ঠ হইয়াছিলেন, সেরূপ মুক্তহস্ত হইতে পারিলে প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি অধিকাংশ ভারত সম্রাটের তোষাখানার জন্য খরিদ হইত। তবুও লর্ড কার্জ্জন ভারতশিল্পের উন্নতি ও পুনরাবির্ভাবের জন্য যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিই। ভারতের স্থায়ী রাজপ্রতিনিধি হইবার আশা যদি তাঁহার থাকে, ভারতশিল্পদেবতা তাঁহার সে আশা পূর্ণ করুন।

লর্ড কার্জ্জনের ভারতে পদার্পণের পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর ইংরেজদিগের একটা সখ জন্মে। ক্রমে তাঁহাদের ঐ সব দ্রব্যের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত হয় —তাঁহারা উহার খরিদদার হইতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে এই সকল সামগ্রীর পণ্যবীথিকা খুলিতে আরম্ভ করিল—দিল্লির চাঁদনীচৌকে, লাহোরবাজারে, বারাণসী, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতিতে এই সকল দ্রব্য বৈদেশিক ভবঘুরেদের নিকট বহুগুণ মূল্যে বিক্রী হইতে লাগিল। India Curio না দেখাইলে কোন ভ্রমণকারীর ভ্রমণ দেশের দশজনের কাছে কল্কে পায় না। এই কলিকাতানগরীতে এখন রাস্তায় রাস্তায় দেশীয় দ্রব্যের দোকান খোলা হইয়াছে, বেশ বিক্রীও হইতেছে। কিন্তু ক্ষোভ ও আশ্চর্য্যের বিষয়, দেশীয় লোকের মতিগতি বিলাতি জিনিষের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এ সকল কথা লইয়া সম্প্রতি আলোচনা বড় অল্প হয় নাই—তাহার ফলে দেখা যায়, আমাদের মধ্যেও এখন অর্থশালিগণ দেশীয় দ্রব্যের আদর করিতেছেন। ইহা সুখের কথা, আশার কথাও বটে।

লর্ড কার্জ্জন ও তাঁহার পত্নী ভারতশিল্পদ্রব্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। স্বয়ং ভারতেশ্বরীর রাজবেশ ভারতবর্ষের কারুকার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছিল—লাটপত্নী দিল্লির দরবারঘটিত নানা উৎসবে সুন্দর ভারতজাত বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট—দেশের লোকের নিকট ভারতবর্ষের দ্রব্যগুলির মাহাত্ম্যপ্রচারের জন্য তিনি গত ১৯০২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর দিল্লিতে ভারতশিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার সময় দেশীয় ভদ্রমণ্ডলীকে, বিশেষত ভারতের রাজন্যবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আমরা আশা করি, পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সেগুলি স্মরণ রাখিবেন এবং কায়মনে

পালন করিবেন। Tottenham Court নিবাসী গৃহসজ্জানির্ম্মাতাদের কারুকর্ম্মের তুলনায় তিনি এ দেশের দ্রব্যগুলির সমধিক সম্মান দিয়াছিলেন ঐ সব দ্রব্যের যাহাতে বহুলবিস্তার হয়, সেজন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। ইহাতে Tottenham Court হইতে তাঁহাকে গালি পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছিল। Tottenham Court চটিলেন—ভারতের বড় বড় রাজারাজড়া তাঁহাদের খরিদদার, পাছে লাটসাহেবের যুক্তিতে খরিদদার ছুটিয়া যায়। কিন্তু লাট কার্জ্জনের ঐরূপ ভাষাপ্রয়োগের কারণ যথেষ্ট ছিল। তিনি অনেকানেক দেশীয় রাজ্যে ঘুরিয়াছেন,—আশা করিয়াছিলেন, প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজভবনে প্রাচীন ভারতশিল্পের সমাদর ও শোভা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তৃপ্তিলাভ দূরের কথা, তাঁহার বিরক্তি ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, তৃতীয়শ্রেণীর বিলাতি গৃহসজ্জায় রাজাবাস সজ্জিত,—অতি কদর্য্য বিলাতি টুম্‌টাম্ দ্রব্যাদিতে কলঙ্কিত, নকলের নাকাল গ্রাসের জিনিষে শ্রীভ্রষ্ট এবং নিতান্ত শ্রীহীন বিলাতি গালিচায় গৃহপ্রাঙ্গণ মণ্ডিত। সোনা ফেলিয়া রাংতার আদর—মণিমাণিক্যের স্থানে কুৎসিত নকল সাজ। সর্ব্বোপরি অতীব আদরের দেশীয় বস্ত্রাদির—কিংখাব, শাল, ঢাকাই বস্ত্রের—পরিবর্ত্তে ভারতের নমুনার সঙ্গে অসংলগ্ন জর্ম্মাণিনির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে ইংরেজদর্জ্জির নির্ম্মিত রাজবেশ;—রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিলাতি নমুনায় গঠিত। আবার কোন রাজ-অন্তঃপুরে বিলাতি সাটিন-মখমল রাজরাণীদের পরিধেয় পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। এই সব দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন—ভারতশিল্পের জন্য অন্তরে অন্তরে ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে তাঁহার আত্মনিবেদন বিদেশীয় শিল্পীদের নিকট কঠোর ঠেকিলেও, ভারতবাসীদের নিকট মর্ম্মব্যথার সেই কথাগুলি বড় মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তাহার পর যখন প্রদর্শনীগৃহের দ্বারমোচন হইল, দর্শকবৃন্দ যথার্থই বুঝিতে পারিলেন, কার্জ্জনের কথা সত্য, সাধু এবং সদভিপ্রায়পূর্ণ। এই প্রদর্শনীতে না ছিল কি? শিল্পজগতে উত্তমশ্রেণীর মধ্যে যাহা সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে, নানাদেশের নানাজাতীয় সেইরূপ জিনিষ এই শিল্পাগারের প্রত্যেক শ্রেণীতে ছিল। ভারতের শিল্পকে এভাবে একত্র সমাবেশ ও সাধারণের দৃষ্টিপথে আনয়ন করার ব্যবস্থা এই সর্ব্বপ্রথম। কাজেই দিল্লির দরবার উপলক্ষ্যে এই মহৎ কার্য্যটি যথার্থই ভারতের একটি মঙ্গলব্যাপার হইয়াছিল এবং দরবারের মহিমাও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রদর্শনীমণ্ডপটিও আবার একটি এদেশীয় মন্দিরের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। গৃহের অভ্যন্তরভাগ ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজচিহ্ন বংশচিহ্ন-বিশিষ্ট পতাকাদিতে সজ্জিত এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ নানা দেশীয়দ্রব্যাদিতে অতিরিক্তমাত্রায় পূর্ণ ছিল। যেদিকে দেখ, কেবলই বিচিত্র সামগ্রীর বাহার। কাঠের, ধাতুর, পশমের, সূতার, দাঁতের, হাড়ের, পশুশৃঙ্গের, কাগজের শতসহস্রাধিক দ্রব্যজাতে গৃহটি পূর্ণ হইয়াছিল। যিনি তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু সার্থক হইয়াছে। কি দেশীয়, কি বিদেশীয়,

সকলকেই এই সব সামগ্রী দেখিয়া একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—ভারতবর্ষে যে এরূপ বিচিত্র, সুরম্য-সুন্দর, দুর্লভ শিল্প সম্ভবে, ইহা পূর্ব্বে তাঁহাদের ধারণা ছিল না। দেশীয় রাজন্যবর্গ স্বদেশজাত দ্রব্যের মূল্য জানিতে যাইয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। এত সস্তায় এরূপ সুন্দর সামগ্রী পাওয়া যায়, ইহা তাঁহাদের মনেও হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি, একজন রাজা আর মূল্য জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা পাইয়া কেবলমাত্র জিনিষ পসন্দ করিয়া লইতেছিলেন—আর মূল্য জানাইতে গেলে দুহাতে নিষেধ করিয়া বলিতেছিলেন, আর যেন মূল্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া না হয়। রাজার কথা শুনিয়া একজন ইংরেজমহিলা সঙ্গিনীর প্রতি ইঙ্গিত করিতে করিতে বলিলেন —'Now the native chiefs seem to be getting wise!" সঙ্গিনী উত্তর করিলেন—"They ought to be'—আর হস্তস্থিত লক্ষ্ণৌয়ের চিকণের-রুমালখানার প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে ভারতনৃপতিবৃন্দ একে অন্যের দেশের শিল্পকলার মাহাত্ম্য বুঝিতেছেন, পছন্দসই জিনিষ কিনিতেছেন, ফরমাইস দিতেছেন, কারিকরের খোঁজ নিতেছেন, এ দৃশ্য কি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সত্যসত্যই শিল্পপ্রদর্শনীতে তাহা দেখা গিয়াছিল।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

সার সত্যের আলোচনা।

ভিতরে-ভিতরে মনুষ্যমাত্রেই সত্যের অন্বেষা। কিন্তু লোকসমাজে বয়স্থমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে মুখে এইরূপ ভাণ করেন যে, "সত্যে আমার কাজ নাই—সত্যের বদলে একমুটা অন্ন পাইলে বর্ত্তিয়া যাই; কেন না, সত্যে পেট ভরে না—অন্নে পেট ভরে।" লোকের এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। যদি জল তুলিতে হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে কলস তৈয়ারি করা চাই। সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সত্যের ধারণক্ষম পাত্র তৈয়ারি করা চাই। অন্নাভাবে যাহার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, সে ব্যক্তি সত্যগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। প্রাণের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ রহিয়াছে। এক-তালায় প্রাণ, দোতালায় মন, তেতালায় জ্ঞান। মনুষ্যের প্রাণের উপরে মন, মনের উপরে জ্ঞান উপর্য্যুপরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তবে মনুষ্য সত্যের উপযুক্ত বাসস্থান হয়। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যশরীরে উদরের উপরে হৃদয়, হৃদয়ের উপরে মস্তক উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সত্য আপনার বাসস্থান আপনিই তৈয়ারি করিতেছেন—সে বাসস্থান মনুষ্য। পশুপক্ষীরা অন্ন পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়; মনুষ্য রাজ-

ভোগেও পরিতৃপ্ত হয় না—মনুষ্য চায় সত্য। মনুষ্যের চক্ষু ফুটিয়াছে। মনুষ্য জানিতে পারিয়াছে যে, রাজভোগও যেমন, দেবভোগও তেমনি - সবই ক্ষণস্থায়ী। কাজেই, চিরস্থায়ী পদার্থের অন্বেষণ মনুষ্যের একটা দৈনিক কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রাণ, মন এবং জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য যেমনটি হওয়া চাই, তাহা কার্য্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। পৃথিবীতে সত্যের বাসস্থান সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিগঠিত হইয়া দাঁড়ায় নাই। এক কথায়—মানুষ এখনো মানুষ হইয়া ওঠে নাই। প্রকৃতি-মাতা মানুষকে মানুষ করিতেছেন নির্নিদ্র-নয়নে। তথাপি মানুষের মানুষ হইতে এখনো একটু বিলম্ব আছে। মানুষ এখনো ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুল্লুক ছাড়াইয়া মানুষের মুল্লুকে পৌঁছে নাই। পৌঁছে নাই বটে, কিন্তু অচিরে পৌঁছিবে, তাহার জোগাড় হইতেছে পৃথিবীময় সর্ব্বত্র; কেন না, প্রকৃতি-মাতার স্নেহচক্ষু মনুষ্যের উপরে ক্রমাগতই লাগিয়া রহিয়াছে।

ভিতরে-ভিতরে কিন্তু মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধিই মানুষ। ক্রোড়স্থ শিশুও জ্ঞানের জন্য আঁকুপাঁকু করে। স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই মনুষ্য জ্ঞানামৃত পান করিতে থাকে। নবাগত মনুষ্যের চাহনিই স্বতন্ত্র। শিশুর চাহনির কিছুতেই পেট ভরে না। ক্রোড়স্থ শিশু মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া সকল বিষয়েরই সমাচার জানিতে চায়। শিশুর ভিতরে-ভিতরে জ্ঞান অল্পে-অল্পে উদ্বোধিত হইয়া সত্যের প্রতি হাত বাড়াইতে থাকে—যদিও সত্য আকাশের চাঁদ।

প্রকৃতিমাতার চক্ষে লোকশিরস্থ মহাজ্ঞানী এবং মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মধ্যে অল্পই প্রভেদ। শিশুর জ্ঞানোপার্জ্জনপ্রণালী কিরূপ? মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর যেমন প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, মাতার মুখচক্ষু হইতে স্নেহভরা সত্য পান করিয়া শিশুর তেমনি জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়। শিশুর নিকটে মাতার মুখচক্ষুই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; সে জানে—মাতার মুখচক্ষুতে সব সত্য এক-ঠাঁই ভরা রহিয়াছে। ইহাই জ্ঞানোপার্জ্জনের আদিম প্রণালী। আদিম ঋষিরা প্রকৃতি-মাতার মুখচক্ষু হইতে সত্য পান করিতেন - তাহাতেই তাঁহাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইত; তাঁহাদিগকে পুঁথিপাঁজির দ্বারস্থ হইতে হইত না। স্তন্যদুগ্ধ যেমন সাক্ষাৎ প্রাণ, তেমনি আদিম ঋষিরা প্রকৃতিমাতার মুখচক্ষু হইতে যে-রকমের সত্যামৃত পান করিতেন, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান। এই যে সাক্ষাৎ-জ্ঞান বা সাক্ষাৎ-উপলব্ধি—ইহা পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান খাঁটি জ্ঞান। এক্ষণে সাক্ষাৎ-উপলব্ধি যে পদার্থটা কি, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

সাক্ষাৎ-উপলব্ধি।

ধ্বনির স্রোত আমাদের এক কান দিয়া প্রবেশ করিয়া আরেক কান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; আলোকের স্রোত আমাদের চক্ষুর মধ্য দিয়া বহিয়া চলিতেছে। তড়িদ্বেগে বহিয়া চলিতেছে বলিলে কিছুই বলা হয় না—সত্য এই যে, তড়িৎ অপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক বেগে বহিয়া চলিতেছে। সাক্ষাৎ-উপলব্ধি ইহার কোন্খানটায়? তোমার সম্মুখ দিয়া নদী যখন দ্রুতবেগে বহিয়া চলি-

তেছে, তখন তুমি তাহার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছ—"এই নদী"। যাহাকে বলিতেছ "এই নদী", সে নদী কোথায় ? যেই বলিতেছ "এই", অমি তাহা নেই। তুমি যাহাকে বলিতেছ "এই নদী", সে তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া নেই-নদী হইয়া সরিয়া পালাইয়াছে। নদীর স্রোতও যেমন, ধ্বনির প্রবাহও তেমনি, আলোকের রশ্মিও তেমনি—সবই দুই নৌকায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ;—এক নৌকা হ'চ্চে বর্ত্তমান-মুহূর্ত্ত, আর-এক নৌকা হ'চ্চে অতীত-মুহূর্ত্ত। তাহার মধ্যে বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তই জীবন্ত মুহূর্ত্ত, অতীত-মুহূর্ত্ত মৃত মুহূর্ত্ত। যাহা বর্ত্তিয়া থাকিতেছে, তাহারই নাম বর্ত্তমান। বর্ত্তমান কাল বর্ত্তিয়া থাকিবার কাল—বাঁচিয়া থাকিবার কাল। বর্ত্তমান কাল সজীব কাল—তাই বর্ত্তমান কাল আমাদের জীবনের উপরে—প্রাণের উপরে—কার্য্য করে। পক্ষান্তরে, মৃতব্যক্তিকে যেমন চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না—কেবল মনে স্মরণ হয় মাত্র, অতীত কাল সেইরূপ আমাদের মনের স্মরণেতেই যাওয়া-আসা করে, তা বই, বর্ত্তমানের ন্যায় তাহা আমাদের প্রাণের হস্তে ধরা দ্যায় না। বর্ত্তমান কালের দর্শন হ'চ্চে প্রাণের ব্যাপার, অতীত কালের স্মরণ হ'চ্চে মনের ব্যাপার ; এই দুই ব্যাপারের উপরে ভর দিয়া বুদ্ধি-ব্যাপার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। বুদ্ধি-ব্যাপার কি ? না, "এটা এই" এইরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া। আমরা প্রথমে বলি "এটা," তাহার পরমুহূর্ত্তে সেই এটা'র পরিবর্ত্তে যখন তাহার যমক-সহোদর আর-একটা আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সেই দ্বিতীয়-এটাকে আমরা বলি "এই" ; আর, তাহা যখন বলি—দ্বিতীয় এটাকে অর্থাৎ আর-একটাকে যখন আমরা বলি "এই",—তখন প্রথম-"এটা" আমাদের স্মরণে টাট্‌কা রহিয়াছে যেন সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ; সেই প্রথম-এটা যাহা আমাদের স্মরণে জাগিতেছে এবং তাহার জুড়ি এই দ্বিতীয়-এটা যাহাকে আমরা এক্ষণে বলিতেছি "এই"—এই দুই এটাকে এক বন্ধনে বাঁধিয়া আমরা বলি "এটা এই"। ইহারি নাম বুদ্ধির নিশ্চয়ক্রিয়া। (১) প্রাণ বর্ত্তমানকে ধরে, (২) মন অতীত'কে ধরে, এবং বুদ্ধি বর্ত্তমান এবং অতীত উভয়কে একীভূত করিয়া ত্রৈকালিক ধ্রুববস্তুকে উপলব্ধি করে। ইহারই নাম বাস্তবিক-সত্তা'র উপলব্ধি। বাস্তবিক-সত্তা'র উপলব্ধিতে প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনই একযোগে কার্য্য করে। প্রাণ করে—দর্শন, মন করে—স্মরণ, এবং বুদ্ধি করে—তত্ত্ব-অবধারণ। এই যে তিনটি ব্যাপার—দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ, তিনই সমান আশ্চর্য্য। যদি মনে কর যে, দর্শন তো অষ্টপ্রহরই করিতেছি—স্মরণও তাই ; তত্ত্বনিরূপণটাই কেবল সব সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না—অতএব তত্ত্ব-নিরূপণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য, তবে সেটা তোমার বড়ই ভুল ; বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি বলিতেছি যে, গতকল্য আমি কাশীতে ছিলাম। গতকল্য সত্যসত্যই যে আমি কাশীতে ছিলাম, তাহার প্রমাণ কি ? তোমার নিকটে তাহার প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে তাহার প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক। কেন না, আমার স্মরণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, গত-

কল্য আমি কাশীতে ছিলাম। যদি বলো যে, তোমার এই যে স্মরণ—এ তো তোমার বর্ত্তমান কালের মনোবৃত্তি; বর্ত্তমান কালের মনোবৃত্তিকে অতীত ঘটনা'র সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ কোন্ যুক্তিতে? "ঐখানটিতে ঐ দেয়ালটা রহিয়াছে" এটা যেমন তুমি তোমার চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছ; গতকল্য "তুমি কাশীতে ছিলে" এটাও কি তুমি সেইরূপে তোমার মনশ্চক্ষে দেখিতেছ? তাহা তুমি বলিতে পার না—কেন না, যাহাকে তুমি বলিতেছ "ঐখানটি", তাহা তোমার চক্ষের সম্মুখে বাস্তবিকই উপস্থিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে, যাহাকে তুমি বলিতেছ "গতকল্য", তাহা কোনোকালেই তোমার চক্ষের সম্মুখে জীবিতমান ভাবে—অর্থাৎ সত্যসত্যই—উপস্থিত হইতে পারে না। তবে যে বলিতেছ যে, তোমার মনশ্চক্ষে তাহা উপস্থিত—সে কেবল কল্পনাতে। কিন্তু কল্পনাকে বিশ্বাস কি? আমি যদি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিতাম যে, "গতকল্য আমি কাশীতে ছিলাম", তবে কি তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম? স্পষ্ট আমার স্মরণ হইতেছে যে, আমি গতকল্য কাশীতে ছিলাম, তাই তাহা আমার নিকটে ধ্রুবসত্য। স্মরণ এবং কল্পনা দুইই আমার আপনার, অথচ স্মরণের কথার যাথার্থ্যে আমার বিশ্বাস দাঁড়াইতেছে ভরপুর—কল্পনার কথার যাথার্থ্যের মূল্য আমার নিকটে কিছুই নহে। এক যাত্রায় এই যে পৃথক্ ফল—ইহা কি কম আশ্চর্য্য! স্মরণ এই তো এক আশ্চর্য্য-ব্যাপার—দর্শন আবার আর-একতরো আশ্চর্য্য-ব্যাপার। এ বলে আমায় ত্থাখ্—ও বলে আমায় ত্থাখ্। এমন কি, দর্শন এবং স্মরণের মধ্যে যে প্রভেদ কোন্‌খানটায়, তাহার ঠিকানা পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী:—

মনে কর, একটা অঙ্গুলিপরিমাণ আগ্নেয়-নলিকা (যেমন হাউইবাজি'র চোঙা)

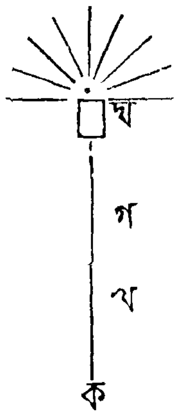

ক-স্থান হইতে ছুটিয়া ঘ-স্থানে পৌঁছিল। তাহা ঘ-স্থানে পৌঁছিবামাত্র দর্শকের চক্ষে একটি আগ্নেয়বিন্দু ঘ প্রকাশ পাওয়াই উচিত; কিন্তু প্রকাশ পাইতেছে—শুধু-কেবল সেই আগ্নেয়বিন্দুটি না, পরন্তু ক হইতে ঘ পর্য্যন্ত সমস্ত ক-খ-গ-ঘ-পথ জুড়িয়া একটা সুদীর্ঘ আগ্নেয়রেখা। হইতেছে একটি আশ্চর্য্য-ব্যাপার—দৃশ্যমান ঘ-বিন্দুর সঙ্গে স্মৃতিপথের ক, খ, গ, বিন্দুগুলা সংস্কারের আটায় জোড়া লাগিয়া-গিয়া ক-খ-গ ঘ পথের আগাগোড়া সমস্তটা দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানের দর্শন, অতীতের স্মরণ এবং ভবিষ্যতের কল্পনা, এই তিন জ্ঞাত্ কাঁধ-ধরাধরি করিয়া একসঙ্গে দৌড়িয়া চলিতেছে। দৃষ্টির চাপায় পড়িয়া স্মৃতিও দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে

—কল্পনাও দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। এস্থলে (১) সম্মুখ-বর্ত্তমান আগ্নেয়বিন্দু দৃষ্টির বিষয়, (২) অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তের আগ্নেয়-বিন্দু স্মৃতির বিষয়, এবং (৩) অব্যবহিত ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তের আগ্নেয়বিন্দু কল্পনায় গড়িয়া-তোলা—এই তিন আগ্নেয়বিন্দু, আর সেই সঙ্গে দর্শন, স্মরণ এবং কল্পনা, এই তিন মনোবৃত্তি, একেবারেই এক। দর্শনের গায়ে, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, স্মরণ এবং কল্পনা মাথা রহিয়াছে—বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তের গায়ে অতীত-মুহূর্ত্ত এবং ভবিষ্যৎ-মুহূর্ত্ত মাথা রহিয়াছে। বর্ত্তমানকে যেমন অতীত এবং ভবিষ্যতের সংস্রব হইতে ছাড়ানো কঠিন, দর্শনকে তেমনি স্মরণ এবং কল্পনার সংস্রব হইতে ছাড়ানো কঠিন।

উপরে যাহা দেখানো হইল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি সাক্ষাৎ-উপলব্ধি, তাহা দর্শন, স্মরণ এবং কল্পনা, তিনের মিলিতাঙ্গ। তাহা শুধুই কেবল দর্শনের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল স্মরণের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল কল্পনার ব্যাপার নহে,—তাহা দর্শন-এবং-স্মরণ সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার। অথবা, যাহা একই কথা – প্রাণ এবং-মন সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার। প্রাণের সহিত দর্শনের এবং মনের সহিত স্মরণের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা যদি-চ পূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি—তথাপি তাহা আরেকবার বলি :—

(১) বর্ত্তমানের বিষয়ই দর্শনের বিষয়।

(২) যাহা বর্ত্তিয়া থাকে বা বাঁচিয়া থাকে, তাহাই বর্ত্তমান। যাহা জীবিতমান, তাহাই বর্ত্তমান; প্রাণই বর্ত্তমান। দর্শনের ব্যাপার প্রাণেরই ব্যাপার।

(৩) যাহা অতীত, তাহা মৃত। অতীতেরই স্মরণ হয়—মৃতেরই স্মরণ হয়। দর্শন হয় চক্ষে বা চাক্ষুষ প্রাণে, স্মরণ হয় মনে। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, দর্শন এবং স্মরণ দুয়ের যোগে—প্রাণ এবং মন দুয়ের যোগে—বুদ্ধিতে লক্ষ্যবস্তুর সাক্ষাৎ-উপলব্ধি সঙ্ঘটিত হয়। সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আমি যখন বলি যে, "এটা বটবৃক্ষ," তখন আমার বুদ্ধি করে কি? না, পূর্ব্বদৃষ্ট বটবৃক্ষ যাহা আমার স্মরণে জাগিতেছে, তাহার সহিত দৃশ্যমান বটবৃক্ষকে একীভূত করিয়া বটবৃক্ষরূপী বস্তুতে অবগাহন করে। আমার সম্মুখ দিয়া যখন নদীর প্রবাহ বহিয়া চলিতেছে, তখন যে জলরাশি সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, তাহা চক্ষুর মধ্য দিয়া আমার প্রাণের উপরে কার্য্য করিতেছে, এবং যে জলরাশি চলিয়া যাইতেছে, তাহা স্মৃতির মধ্য দিয়া আমার মনের উপরে কার্য্য করিতেছে। বুদ্ধি করিতেছে কি? না, যাহা উপস্থিত হইতেছে এবং যাহা চলিয়া যাইতেছে, দুইকে একদৃষ্টিতে দেখিয়া নদীরূপী বস্তুতে অবগাহন করিতেছে। বুদ্ধি যে-নদীকে উপলব্ধি করিতেছে, তাহা শুদ্ধ-কেবল বর্ত্তমানের দৃশ্য নদী নহে - অতীত-কালের স্মৃত নদীও নহে, পরন্তু দৃশ্য এবং স্মৃত এই দুই নদীকে লইয়া যে এক নদী, সেই-নদীরূপী বস্তু। দর্শনের ব্যাপার এবং স্মরণের ব্যাপার কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি; কিন্তু বুদ্ধি যেরূপে বস্তুসকলের বাস্তবিক-সত্তা উপলব্ধি করে, তাহার ন্যায় আশ্চর্য্য জগতে আর কিছুই নাই। বিশেষ আশ্চর্য্য যে কোন্‌খানটায়, তাহা বলিতেছি, প্রণিধান করুন :—

ঐ বটগাছটিকে দেখিয়া আমি বলিতেছি "এটা বটগাছ"। এ যাহা আমি বলিতেছি, এ কথাটি সত্য। কেন না, বটগাছের ভাব যাহা আমার মনে বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত লক্ষ্যবস্তুটির সম্পূর্ণ মিল বসিয়াছে। মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এই যে মিল, ইহারি নাম সত্য। আর, মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এইরূপ মিল ঘটাইবার যিনি কর্ত্রী, তাঁহারই নাম বুদ্ধি। পুনশ্চ, অন্তঃকরণে ঐরূপ মিলের যে উপলব্ধি (সত্যের যে উপলব্ধি), তাহারই নাম জ্ঞান। "এটা বটবৃক্ষ" এই জ্ঞানটি জন্মিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বদৃষ্ট অনেকানেক বটবৃক্ষের একটা সাধারণ আদর্শ বা নক্সা জ্ঞাতার মনে বর্ত্তমান থাকা চাই, সেই সাধারণ আদর্শটি দৃশ্যমান বটবৃক্ষের সহিত স্মৃত বটবৃক্ষের মিল ঘটাইয়া দ্যায়। পূর্ব্বে আমি বটবৃক্ষ দেখিয়াছি, তাই আমি এক্ষণে বলিতে পারিতেছি যে, "এটা বটবৃক্ষ"। পূর্ব্বে যদি আমি বটবৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে আমি "বটবৃক্ষ" না বলিয়া শুদ্ধকেবল বলি যে, "এটা বৃক্ষ"। পূর্ব্বে যদি আমি বৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে বৃক্ষ না বলিয়া বলি যে, "এটা একটা বস্তু"। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বে যদি আমি বস্তুও না দেখিয়া থাকি, তবে আমি সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষটাকে কি বলিব? নবপ্রসূত বালকের মনে যখন সবেমাত্র প্রথমজ্ঞানের উদ্বোধন হইয়াছে, তখন সেই প্রথমজ্ঞানের অবলম্বন শুধুই কি কেবল সম্মুখের দৃশ্যবিষয়, না, তা ছাড়া আরোকিছু? এটা দেখা চাই যে, সেই জ্ঞানটিই শিশুটির প্রথম জ্ঞান, তাহার পূর্ব্বে তাহার কোনো জ্ঞানই ছিল না; এরূপ স্থলে এ কথা খাটে না যে, পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুসকলের একটা সাধারণ নক্সা শিশুর মনে বর্ত্তমান আছে, আর, সেই নক্সার সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুর ঐক্য-উপলব্ধি-হওয়া-গতিকে জ্ঞানের উদ্বোধন হইল। কাজেই বলিতে হয় যে, সেই "প্রথম-জ্ঞানের পূর্ব্বসূত্র একপ্রকার অব্যক্ত সংস্কার, তা বই, তাহা কোনোপ্রকার আঁকিয়া-জুঁকিয়া প্রস্তুত-করা নক্সা নহে। সর্ব্বাদিম প্রথমজ্ঞানে দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ, এই তিন মনোবৃত্তির মধ্যে ব্যবধান থাকিতে পারে না একচুলও। আদিম-উদ্ভিদ-সম্বন্ধে (protoplasm সম্বন্ধে) যেমন আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা বীজ, বৃক্ষ এবং ক্ষেত্র, তিনই একাধারে, আদিমজ্ঞান-সম্বন্ধেও তেমনি আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ, তিনই একাধারে। অর্থাৎ আদিমজ্ঞানে দর্শনই স্মরণ, স্মরণই দর্শন এবং তাহাই তত্ত্বনিরূপণ। আদিম জ্ঞানের সম্মুখে বিষয়ের উপস্থিতি এবং পশ্চাতে সংস্কারের গোড়াবন্ধন, দুইই শুদ্ধকেবল ঐশী শক্তি দ্বারা সম্ভাবিত হয়; তা বই, দুয়ের কোনোটিতেই জ্ঞাতার নিজের কোনো হস্ত নাই। ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা শুধুই কি কেবল আদিম-জ্ঞানে, নব্যতম পরিপক্ব জ্ঞানে কি ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে কম? এই কথাটি বারান্তরে আলোচনার জন্য স্থগিত রাখিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতির প্রতি।

কোন্ দূরদেশ হ'তে আঁধার জগতে
তুমি এসেছ
হ'য়ে শশী সুন্দর মম অন্তর
আলো করেছ।

সেই আলোকসুধায় হরিয়া আঁধার
ঘর সৃজিল
তব প্রীতির সুজলে সেই গৃহতলে
শোভা তুলিল।

কর লহর বহিয়া নাচিয়া নাচিয়া
হৃদে প্রয়াণ
তব বদনকমলে আমি কুতূহলে
লইনু ঘ্রাণ।

পরে তুলি মৃদুস্বর অতি মনোহর
কহিলে কথা
রহি সে কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া
ভুলিয়া ব্যথা।

ক্রমে আরো কাছে আসি সুমধুর হাসি
হাত ধরিলে
তব চন্দনরসে পূরিত পরশে
মোরে মোহিলে।

আমি এতকাল ধরে' জগত-ভিতরে
জড় আছিনু
তুমি জ্ঞানময়ী হ'য়ে আসিলে হৃদয়ে
তাই বাঁচিনু।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গদর্শন।

সংস্কৃতসাহিত্যে সামাজিক চিত্র।

আমি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সুপরিচিত মৃচ্ছকটিকনামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাটক অবলম্বন করিয়া কথা উপস্থিত করিব। মৃচ্ছকটিক শূদ্রকনৃপতিবিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই শূদ্রকনৃপতি কোথায় বিরাজিত ছিলেন এবং তিনি বাস্তবিক নিজে মৃচ্ছকটিককার কি না, তাহা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডের উল্লেখ অনুসারে শূদ্রকের কালকে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিতে হয়। এখন দেখা যাউক, মৃচ্ছকটিকের অন্তর্ভূত বিষয়সকলের আলোচনা দ্বারা ইহার রচনাকালসম্বন্ধে কতদূর নির্ণীত হইতে পারে।

দেখা যাক্, মৃচ্ছকটিকে কি আছে। প্রথমত ইহাতে দুইটি রাজধানীর উল্লেখ দেখিতেছি—প্রথম উজ্জয়িনী, দ্বিতীয় পাটলিপুত্র। ইহার মধ্যে উজ্জয়িনী নবোদীয়মান এবং পাটলিপুত্র প্রাচীন ও পতনোন্মুখ; উজ্জয়িনীতে শৈবধর্ম্মের নবাভ্যুদয়, পাটলিপুত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। ইহার প্রমাণ দ্বিতীয় অঙ্কে দ্যূতকরদিগের সহিত সংবাহকের বিবাদের উল্লেখ যেখানে আছে, সেখানে পাওয়া যায়। সংবাহক বসন্তসেনাকে বলিতেছে:—

"আর্য্যে শুনুন, পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি, আমি গৃহস্থের সন্তান, সংবাহকের কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি। পর্য্যটকদিগের মুখে শুনিয়া অপূর্ব্বদেশদর্শনকুতূহলবশত এখানে আসিয়াছি। উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করিয়া এক ভদ্রলোকের সেবা করিয়াছি," ইত্যাদি।

এ ব্যক্তি সংবাহকের অর্থাৎ পা-টেপা খানসামার কাজ করে। বিভব ও বিলাস পূর্ণ মহানগরেই এরূপ ভৃত্যের প্রয়োজন হয়। পাটলিপুত্র ত এক মহানগর, তবে কেন সে পাটলিপুত্র ছাড়িয়া উজ্জয়িনীতে আসিল? বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতির আলোচনার দ্বারা জানা যায় যে, পুষ্যমিত্রনামক এক রাজা চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের ১৩৭ বৎসর পরে পাটলিপুত্রকে আক্রমণ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশের উচ্ছেদসাধন এবং মগধে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। ইতিবৃত্তের গণনা অনুসারে খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ সালে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রনগরে মৌর্য্যবংশ স্থাপন করেন। সুতরাং মৌর্য্য-

বংশের বিদ্রোহ খ্রীষ্টীয় ১৭৮ সালে ঘটিয়া থাকিবে। ইহা মৃচ্ছকটিকরচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকিবে। মৌর্য্যবংশের বিনাশের এবং পাটলিপুত্রে বিপ্লবঘটনার পর ইহা স্বাভাবিক যে, সংবাহকের ন্যায় ব্যক্তিগণ কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া পতনোন্মুখ পাটলিপুত্রকে ত্যাগ করিয়া নবোদীয়মান উজ্জয়িনী-নগরীতে আসিবে।

তখন পাটলিপুত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, ইহা অনুমান করিবার কারণ এই—যেই সংবাহক দ্যূতকরদিগের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অপমানিত হইল, অমনি তাহার মনে নির্ব্বেদের উদয় হইল, এবং তাহার ফলস্বরূপ সে বৌদ্ধশ্রমণ হইয়া গেল। নির্ব্বেদের অবস্থাতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন তখন দৈনিক ঘটনা না হইলে কবি এত শীঘ্র ও এত সহজে একজন পাটলিপুত্রাগত ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিয়া দিতে পারিতেন না।

উজ্জয়িনীতে নবরাজ্যের অভ্যুদয় ও শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার অনুমান করিবার কারণ এই—কবি বর্ণন করিতেছেন যে, তখনও উজ্জয়িনীতে মধ্যে মধ্যে প্রজাদের বিদ্রোহ ঘটিতেছে। তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ আর্য্যক; এই ব্যক্তি গোপকুলোদ্ভব। এ ব্যক্তি গোপনে বিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, এরূপ সংবাদ পাইয়া উজ্জয়িনীপতি ইহাকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু সে স্বীয় বন্ধুগণের সাহায্যে আপনার বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া উজ্জয়িনীপতিকে বিনাশপূর্ব্বক উক্ত নগরে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে।

ইহা হইতে এপ্রকার অনুমান করা কিছুই অযৌক্তিক নয় যে, কবি যে সময়ে মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছিলেন, তখনও উজ্জয়িনী-নগরে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে আদিম অধিবাসিগণ অভ্যুত্থিত হইয়া বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিতেছিল।

আর এরূপ অনুমান ইতিবৃত্তের ঘটনার অনুরূপও বটে। এতদুপলক্ষে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের একটি বিষয় আলোচ্য বোধ হইতেছে। ভারতে আর্য্যজাতির সমাগমসম্বন্ধে লোকের সাধারণত এই ধারণা আছে যে, আর্য্যগণ প্রাচীনতম কালে মধ্য-আশিয়ার কোন এক শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতেন। তৎপরে সেখানে জ্ঞাতি-বিবাদবশত পৃথক্ হইয়া দুই ধারাতে তাঁহারা দক্ষিণগামী হন। পরে ইঁহাদের এক ধারা হিন্দুকুশের দ্বার দিয়া পঞ্চনদে প্রবেশ-পূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। অপর ধারা ইরাণে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। পঞ্চনদ ও ব্রহ্মর্ষিদেশবাসী আর্য্যগণের বংশধরগণ ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান ভারতীয় হিন্দুজাতি। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভারতে আর্য্যসমাগম প্রাচীনতম কালের একমাত্র বিজয়প্রবাহে ঘটে নাই; পর-বর্ত্তী ও অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও ইরান্ প্রভৃতি দেশ হইতে নব নব বিজয়-প্রবাহ ভারতক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে। এমন কি, মহাভারতাদি গ্রন্থে যে সূর্য্যবংশীয় ও

চন্দ্রবংশীয় রাজগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইঁহারা এই সকল পরবর্ত্তী বিজয়প্রবাহের অঙ্গীভূত হইয়া প্রতীচ্যদেশ হইতে এই প্রাচ্যভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রতীচ্যদেশ হইতে শক, জাঠ, হূন প্রভৃতি আরও অনেক জাতি আসিয়া ভারতক্ষেত্রকে অধিকার করিয়াছে; এবং কালে হিন্দুরূপে পরিণত হইয়াছে।

কোন্ জাতি কোন্ কালে আসিয়াছিলেন ও কোথায় কতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা এখন একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলে হয়। মোটের উপরে এই বলা যায় যে, সূর্য্য ও অগ্নির উপাসক কোন কোন সামরিক জাতিকে খ্রীষ্টীয় অব্দের বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই সিন্ধুনদের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ মাসিডোনিয়াধিপতি সিকন্দর শাহ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সিন্ধুর উভয় কূলে যদুবংশীয় রাজগণকে এবং পঞ্চনদে পুরুবংশীয় রাজগণকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরিয়ান্‌নামক একজন গ্রীক্ ইতিবৃত্তলেখক দেখা দেন। ইনি বাণিজ্যকার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন বর্ত্তমান ব্রোচ্‌নামক নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আরিয়ান্ সিন্ধুর পশ্চিম উপকূলে মীনগরনামক এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ অনুমান করেন যে, উহা বর্ত্তমান সেওয়ান্‌নামক নগরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল এবং তাহার প্রকৃত নাম ছিল স্বামিনগর। মুসলমানগণ প্রাচীন নাম লুপ্ত করিয়া তাহার সেওয়ান নাম রাখিয়াছে। টড্ আরও অনুমান করেন যে, ঐ রাজনগর সাইথিয়ান্ ও পার্থিয়ান্ রাজগণের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সিন্ধুর উপকূলবাসী রাজগণ দুই ধারাতে ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এক ধারা পঞ্চনদকে প্লাবিত করিয়া কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হয়। অপর ধারা সিন্ধুদেশের দক্ষিণভাগ হইতে সৌরাষ্ট্রদেশে ব্যাপ্ত হয়। এই সৌরাষ্ট্রবাসী শকবংশীয় রাজগণ উত্তরকালে মিবার ও মালব প্রভৃতি দেশেও স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করেন। ইঁহারা আবার উত্তরকালে হূনদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

সৌরাষ্ট্রদেশ হইতে শিবারাধক রাজগণ মিবার ও মালবে রাজ্যবিস্তার করেন। শাসনলিপি প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ১২৬ অব্দে এক সৌরাষ্ট্রসমাগত রাজা মালব অধিকারপূর্ব্বক উজ্জয়িনীকে স্বীয় রাজধানী করেন। মিবারের প্রাচীন কাহিনী অনুশীলনের দ্বারা এবং ইতিবৃত্তের আলোচনা দ্বারাও জানা গিয়াছে যে, সূর্য্যোপাসক ও শিবোপাসক শকবংশীয় রাজগণ যখন মালব প্রভৃতি আক্রমণ করেন, তখন ঐ সকল প্রদেশ ভীলজাতীয় আদিম নিবাসীদিগের হস্তে ছিল। তাহাদেরই সহিত নবাগত জেতাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব মৃচ্ছকটিকে উজ্জয়িনীপতির গোপালদারকের সহিত যে বিবাদের বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা এই আদিম অধিবাসীদিগের বংশধরদিগের অভ্যুত্থান মনে করা যাইতে পারে; অথবা তৎপূর্ব্বপ্রসৃত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের ফল মনে করা যাইতে পারে।

শেষোক্ত অনুমান করিবার আর একটু যুক্তি এই, এই মৃচ্ছকটিকেরই একস্থানে দুইজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া একজন অপরকে বলিতেছে—"জানি, জানি, তুই ত চামারের ছেলে, রাজপ্রসাদে সেনাপতি হইয়াছিস্।"—ক্ষত্রিয়ের কার্য্য চামারে করিতেছে, ইহাও বোধ হয় বৌদ্ধ-প্রভাবের ফল। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, এই বৌদ্ধপ্রভাব খ্রীষ্টীয় অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই মালব প্রভৃতি দেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীপতি শকবংশীয় রাজগণ এই বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে দমন করিয়া শিবোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিন্ধুর উপকূল হইতে এক প্রবল জাতি আসিয়া সৌরাষ্ট্রদেশকে অধিকার এবং তাহার রাজধানী বল্লভীপুরকে দগ্ধ ও ধ্বংস করে। ধ্বংস করিলে তাহার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে বহুসহস্র লোক উত্তরাভিমুখে গিয়া এক স্বতন্ত্র নগর স্থাপন করিয়া বাস করে। ইহারা জৈনমতাবলম্বী বলিয়া এবং জেতারা সূর্য্য ও শিবের উপাসক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সকল প্রদেশে বৌদ্ধ, জৈন ও শিবোপাসকদিগের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে। এই বিবাদের ফলস্বরূপ আর্য্যাবর্ত্তে কান্যকুব্জ, ইন্দ্রপ্রস্থ ও উজ্জয়িনী এই তিনটি স্থান পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্মের প্রধানকেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠে। মৃচ্ছকটিকে এই বৌদ্ধপ্রভাবের হ্রাস ও উদীয়মান শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয় উভয়েরই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

উজ্জয়িনীতে শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয় অনুমানের আর এক কারণ এই যে, কবি বারবার 'নানক'নামক একপ্রকার মুদ্রার উল্লেখ করিতেছেন। প্রথম অঙ্কে শকার বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :—

"এষা নানকমোষি-কাম-কশিকা।"

অর্থ—নানককে যে হরণ করে অর্থাৎ চোর, তার কামকে যে চরিতার্থ করে, অর্থাৎ গণিকা।

এতদ্ভিন্ন এই নাটকের অপরাপর স্থানেও 'নানক'নামক মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। পুরাতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টের জন্মের এক শতাব্দী পূর্ব্বে ও এক বা দুই শতাব্দী পরে সিন্ধুনদের তীরে যে রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা 'নানক' নামে শিবনামাঙ্কিত একপ্রকার মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। এই 'নানক'মুদ্রা সেই মুদ্রা। এরূপ অনুমান করা যায়, শকবংশীয় রাজগণই মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে স্বীয় অধিকারবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ব্যবহৃত নানকমুদ্রা ঐ সকল স্থানে প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। এই নানকমুদ্রা এক সময়ে অনেক প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার প্রমাণ, মৃচ্ছকটিককার 'দরিদ্র'শব্দের পরিবর্ত্তে 'নির্নানক'শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। উজ্জয়িনীর প্রতিষ্ঠাতা শকবংশীয় রাজগণ যেখানেই গিয়াছিলেন, শৈবধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিকে আমরা সেই লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিতেছি।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিতেছি, সংবাহক দ্যূতকরদিগের দ্বারা অনুসৃত হইয়া তাহাদের

ভয়ে এক পরিত্যক্ত দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেবীর স্থান অধিকার করিয়া রহিল; এবং সভিক, দ্যূতকর প্রভৃতি সেই মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল। ইহাতেই প্রমাণ, খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধনরপতিগণের প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থানেই হিন্দুধর্ম্ম এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, অনেক দেবদেবীর মন্দির পূজারীর অভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কেবল তাহাও নহে, ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণোচিত যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। নাটকের প্রধান পুরুষ চারুদত্ত একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠিচত্বরে বাস করেন; তিনি শ্রেষ্ঠীদিগের অর্থাৎ কুশীদব্যবসায়ী ধনীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, নিজের দানধ্যানের জন্যই দরিদ্র হইয়াছেন। চারুদত্ত প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা করিতেছেন বটে, এবং তাঁহার পত্নী ধূতা উপবাস ও ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদানাদি করিতেছেন বটে, কিন্তু আসল ব্রাহ্মণের কাজ তখন বিলুপ্ত হইয়াছে। চারুদত্ত একটি গণিকার প্রণয়ে আসক্ত হওয়াকে অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য মনে করিতেছেন না।

অধিক কি, তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, শর্ব্বিলক একজন ব্রাহ্মণের সন্তান, সে দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও গণিকাসক্ত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সে চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কাটিবার সময় আপনার যজ্ঞোপবীতটিকে পরিমাণসূত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে; আর বলিতেছে:—

"যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য। কুতঃ—

এতেন মাপযতি ভিত্তিষু কর্ম্মমার্গং
এতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রয়োগান্।
উদ্‌ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে
দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ॥"

অর্থ—"যা হোক, পৈতাটা ব্রাহ্মণের, বিশেষত আমার মত ব্রাহ্মণের, অনেক কাজে লাগে। কেন না, এতদ্দ্বারা সিঁধ কাটিবার সময় ভিত্তি মাপা যায়, অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া লওয়া যায়, দ্বারে অর্গল দিয়া রাখিলে খোলা যায়, এবং সর্ব্বশেষে সাপ-খোপে কামড়াইলে তাগা বাঁধা যায়।"

পূর্ব্বোক্ত উক্তির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এরূপ মনে লাগে যে, সে সময়কার আচারভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণ্যচ্যুত ব্রাহ্মণগণকে উপহাস করিবার উদ্দেশেই কবি শর্ব্বিলকের ন্যায় এক পুরুষকে স্বীয় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। এই অনুমানের আর এক প্রমাণ এই, কবি এই সময়েই শর্ব্বিলকের মুখে আর একটি উক্তি দিয়াছেন। শর্ব্বিলক বলিতেছেন:—

"অহং হি চতুর্ব্বেদবিদোঽপ্রতিগ্রাহকস্য পুত্রঃ শর্ব্বিলকো নাম ব্রাহ্মণো গণিকামদনিকার্থমকার্য্যমনুতিষ্ঠামি।"

অর্থ—"আমি শর্ব্বিলক, জাতিতে ব্রাহ্মণ, চতুর্ব্বেদবেত্তা অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের পুত্র, আমি মদনিকা গণিকার নিমিত্ত অপকার্য্য করিতেছি।"

কবি যেন বলিতে চাহিতেছেন—"কালে কালে এই হ'ল যে, যার বাপ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, তার ছেলে বেশ্যাসক্ত চোর।" ইহাতেই জানা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সে সময়ে কতদূর ম্লান ও শিথিল হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের আরও কিছু কিছু পরিচয় এই নাটকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধনীতির দুইটি প্রধান অঙ্গ—অহিংসা ও দান। দরিদ্রদিগকে দান বৌদ্ধ আচার্য্য গণ সকল গুণের উপরে শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অশোকের ন্যায় বৌদ্ধ উপাসকগণও দানধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ। এমন কি, চৈন পরিব্রাজক হিউএন্‌সঙ্গ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন থানেশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের রাজসভাতে উপস্থিত হন, তখন তিনি প্রয়াগের "সন্তোষক্ষেত্রে" অদ্ভুত মেলা ও অদ্ভুত দানের ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। ঐ দান অভেদে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় শ্রেণীর সাধকদিগকে করা হইয়াছিল। ঐ দানের ব্যাপার দেখিয়াই বোধ হয় হিউএন্‌সঙ্গ শিলাদিত্যকে বৌদ্ধ উপাসক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা বোধ হয় এই,—সে সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় শ্রেণীর রাজগণই অভেদে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান করিতেন। তখন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম অবিবাদে পাশাপাশি বাস করিতেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যেও বৌদ্ধনীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে-কোন কাব্যপুরাণাদি রচিত হইয়াছে, তাহাতে অহিংসা ও দানধর্ম্মের মহিমা উদ্বোষিত হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদান, দাতাকর্ণের পুত্রশিরশ্ছেদন, বলির পাতালগমন, নাগানন্দে জীমূতবাহনের পক্ষিমুখে আত্মসমর্পণ, এই দানমহিমাঘোষণা মাত্র। এই মৃচ্ছকটিকনাটকের গ্রন্থকার যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন, তথাপি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান পুরুষ চারুদত্তের সর্ব্বপ্রধান প্রশংসার বিষয় এই, তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফকীর হইয়াছেন। নতুবা গণিকাসঙ্গ করিতে, মিথ্যা বলিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে তাঁহার বাধিতেছে না। বসন্তসেনার ন্যস্তসম্পত্তি চোরের দ্বারা অপহৃত হইলে, তিনি নিজ পত্নীর রত্নমালা বিদূষকের হস্তে প্রেরণ করিয়া এই কথা বলিতে বলিতেছেন যে, "সে ন্যস্তসম্পত্তি আমি নিজের মনে করিয়া দ্যূতে হারিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে এই রত্নাবলী প্রেরণ করিতেছি।" বিচারস্থলে তিনি হতাশ ও নিজ প্রাণের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া অবশেষে বলিতেছেন—"আমি বসন্তসেনাকে মারিয়াছি," যাহা সত্য নহে। কিন্তু ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসার বিষয় এই, ইনি আপনার সমুদয় বিভব অর্থিগণের উদরসাৎ করিয়াছেন। এমন কি, স্বীয় পুত্রকে একটি মাটীর শকটের অধিক দিবার সাধ্য নাই।

আমাদের ত পড়িতে পড়িতে চারুদত্তের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ বিরাগ উৎপন্ন হয়। দারিদ্র্যের জন্য কাতরোক্তি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এবং বলিতে ইচ্ছা করে—"বাবা, শেষে যদি কাঁদ্‌বে, তবে দান কর্‌তে গেলে কেন?" কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহাকে আদর্শচরিত্র বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। নিশ্চয় এই দানশক্তি তাঁহার চক্ষে মানবচরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

তৎপরে দানশক্তির ন্যায় অহিংসাধর্ম্মের প্রতিও দৃষ্টি দেখা যায়। কবি শকারের মুখ দিয়া বসন্তসেনাকে যখন গালাগালি দিতেছেন, তখন অপরাপর অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনের মধ্যে "মৎস্যাশিকা" বা মৎস্যভোজিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতে প্রমাণ, সেই প্রাচীন সময়েও মৎস্য-মাংস-আহার নিকৃষ্টশ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ ও ঘৃণিত কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। ইহাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবজাত বলিতে হইবে।

এ সময়ে আর একটি অনুষ্ঠান দেখিতেছি, যাহা দেখিলে বর্ত্তমান জৈনধর্ম্মকে স্মরণ হয়। তাহা পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে আহার দেওয়াকে ধর্ম্মজ্ঞান করা। এই ভাব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সেই প্রাচীনকালেও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ধার্ম্মিকপ্রবর চারুদত্ত নিতান্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সন্ধ্যাবন্দনান্তে ভূতদিগকে বলি অর্পণ করিতে ভুলিতেছেন না। বিদূষককে বলি অর্পণ করিতে বাধ্য করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যাইতেছে, জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের চক্ষে ইহা নিত্য আচরণীয় মহা ধর্ম্মানুষ্ঠান। গুজরাটের অন্তর্গত আমদাবাদ প্রভৃতি জৈনপ্রধান স্থানে, এমন কি, কলিকাতার বড়বাজারের মাড়ওয়ারীপটীর ন্যায় স্থানে পদার্পণ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ রাজপথে পক্ষিদের জন্য নানাজাতীয় শস্যবীজ, অথবা, পিপীলিকাদের জন্য চিনি-প্রভৃতি অর্পণ করিতেছেন। এই ধর্ম্মবুদ্ধি এতদূর গিয়াছে যে, এরূপও শুনিয়াছি, পয়সা দিয়া মানুষ ভাড়া করিয়া তাহাকে সমস্তরাত্রি খাটের সহিত বাঁধিয়া-রাখিয়া ছারপোকাদিগকে খাওয়ানকেও তাঁহাদের অনেকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এই অহিংসা ও ভূতবলির ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অহিংসা হিন্দুভাব নহে; কারণ যাগযজ্ঞ ও পশুবলি এদেশের প্রাচীন ভাব। তান্ত্রিক বামাচারকে এই অতিরিক্ত অহিংসাপরতার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তৎপরে এই নাটকের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতির যে নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমত তখন দাসদাসীদিগকে ক্রয়বিক্রয় করা নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে ছিল। মদনিকা বসন্তসেনার দাসী; শর্বিলক তাহার প্রতি অনুরক্ত; তাহাকে একেবারে চায়,—বসন্তসেনা তাহাকে যে-মূল্যে কিনিয়াছিলেন, তাহা না পাইলে দিবেন না, এই আশঙ্কা করিয়া শর্বিলক চুরি করিতে গেল; এবং চারুদত্তের গৃহ হইতে বসন্তসেনার ন্যস্ত অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়া আনিল। দ্বিতীয়ত সংবাহক সভিক, দ্যূতকর প্রভৃতির নিকট দ্যূতে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, যখন তাহাদের হস্তে ধরা পড়িল এবং বাজির টাকা দিতে অসমর্থ হইল, তখন আপনাকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দিবার চেষ্টা করিল; এবং প্রকাশ্য রাজপথে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়রা কে চাকর চান, আমাকে ক্রয় করুন, আমি সংবাহনবিদ্যাতে পারদর্শী", ইত্যাদি।—এই ক্রীতদাসপ্রথা ও বাঁদীক্রয়-প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে

চলিয়া আসিয়াছে। ইংরাজরাজ্যে ইহা অপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়া নিবারিত হইয়াছে।

তৎপরে আর একটা এই দেখিতেছি—বারাঙ্গনাদিগের মহাসম্ভ্রম। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হুতোম প্যাঁচা যখন তাঁহার সরস ভাষাতে কলিকাতাসহরের নক্‌সা অঙ্কিত করেন, তখন বলিয়াছিলেন—

"আজব সহর কলকেতা।
* * * *
রাঁড়ী-সুঁড়ীর খাসা বাড়ী ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।"

এ সম্বন্ধে এই খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর সমকালের মহানগরীসকলের কিছু প্রভেদ দেখিতেছি না। ভদ্রতম চারুদত্তের ভবনে একটি প্রদীপ জ্বলে কি না, সন্দেহ! কিন্তু গণিকা বসন্তসেনার ভবনে সাত প্রকোষ্ঠ, এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একটি রাজভবনের ন্যায়; বসন্তসেনার মদমত্ত হস্তী রাজপথে সকলের ত্রাস উৎপন্ন করিতেছে; বসন্তসেনার দাসদাসী, পরিচারক-পরিচারিকার অন্ত নাই; কি ঐশ্বর্য্য! কি বিভব!

এই বারাঙ্গনাবৃত্তির বিষয়ে আবার এই দেখিতেছি যে, ইহা ভদ্রজনসম্মত একটি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। ভদ্রলোকে ইহাদের গৃহে যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। ইহারাও অবাধে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসিতেছে। এ বিষয়ে ইহারা গ্রীক্ হেটেরিদিগের ন্যায় ছিল, যাহাদের ভবনে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস্‌ও যাইতে লজ্জাবোধ করিতেন না।

বসন্তসেনার অভিসারক্রিয়া কি নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা! ইহাতেই প্রমাণ, এ-জাতীয় গণিকাগণ তখন কিরূপ অবারিতগতি ছিল। কিন্তু এ কথা বলিবার সময় মনে হইতেছে, এখনও ত ভারতবর্ষে এরূপ একশ্রেণীর বারাঙ্গনা রহিয়াছে। পঞ্জাবে ও দাক্ষিণাত্যে এখনও দুই শ্রেণীর বারাঙ্গনা দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীকে বলা যাউক "রাহী", আর এক শ্রেণীকে বলা যাউক "গেহী"। "রাহী" তাহারা, যাহারা পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে ও উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করে। গেহীরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত বাস করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নৃত্যগীতে পরিপক্ক। বিবাহাদি উৎসবে ইহারাই গৃহস্থের গৃহে নৃত্যাদি করিতে আসে। দাক্ষিণাত্যে এই শ্রেণীর বারাঙ্গনাগণ সচরাচর দেবমন্দিরের দেবদাসী বলিয়া পরিচিত। ইহারা নামত মন্দিরের দেবগণের সহিত বিবাহিত হয়, কিন্তু ফলত বিলাসী পুরুষগণের জন্যই থাকে। ইহাদের সহিত মেশা বা ইহাদিগকে বাড়ীতে আনা তত্তৎপ্রদেশের সামাজিকদিগের পক্ষে লজ্জাজনক কার্য্য নহে। ইহারা dancing girl নামে পরিচিত। এজন্য সে সকল প্রদেশের বহুসংখ্যক পুরুষের নীতি অতি কলুষিত। সে নীতি সংশোধিত হইতে যে কতদিন লাগিবে, তাহা বলা যায় না। এই দেবদাসী বা dancing girl শ্রেণী বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ রায়ের চরিত্রবর্ণনস্থলে গোদাবরীপ্রদেশে এই দেবদাসীদলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকে এই "গেহী"শ্রেণীগণ্য বারাঙ্গনা বলা যাইতে পারে। বসন্ত-

সেনার মাতা ও ভ্রাতার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। মাতা ও ভ্রাতা তাহার আয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। এখনও পঞ্জাবে ও অপরাপর স্থানে গিয়া দেখুন, এই ব্যাপার চলিতেছে। কেবল তাহাও নহে, বিদূষক বসন্তসেনার মাতাকে দেখিয়া বলিতেছে—"স্ত্রীলোকটা সুরাপান করিয়া করিয়া স্থূলোদরা হইয়াছে।" ইহাতে প্রমাণ, তখনও এই শ্রেণীর স্ত্রালোক ও ইহাদের সংসর্গী পুরুষগণ পানাসক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

তৎপরে সে সময়কার বিচারপ্রণালী। ইহা যেন কতকটা এখনকার বিচারপ্রণালীর অনুরূপ, তবে উকীল নাই। অধিকরণিক-শব্দবাচ্য একজন রাজনিযুক্ত বিচারক অধিকরণে আসিয়া বিচারাসনে বসিলেন, সঙ্গে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। কায়স্থ সাক্ষীর জবানবন্দী লেখেন; শ্রেষ্ঠীর কি কাজ, তাহা নাটকে প্রকাশ পাইতেছে না; হয় তিনি জুরির কাজ করেন,—বিচারকের বিচারকার্য্যের সহায়, না হয় জরিমানার টাকা প্রভৃতি যাহা-কিছু জমা হয়, তাহা লইয়া রাজকোষে জমা দিবার ভারগ্রহণ করেন। অনুমানে বোধ হয়, শ্রেষ্ঠীদিগের প্রতি দ্বিতীয়-প্রকার কার্য্যের ভার থাকিত। কারণ প্রাচীন হিন্দুবিচারপ্রণালীতে প্রাড়্‌বিবাকগণই অনেকপরিমাণে জুরীর কার্য্য করিতেন। মৃচ্ছকটিকের বিচারে কিন্তু প্রাড়্‌বিবাক দেখা যাইতেছে না।

এই নাটকে তদানীন্তন লৌকিক প্রচলিত ধর্ম্মের যে ছবি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও কতকটা বর্ত্তমানপ্রচলিত লৌকিকধর্ম্মের অনুরূপ। দেখিতেছি, সেই প্রাচীনকালেও লৌকিকধর্ম্ম প্রধানত স্ত্রীলোকদিগের ব্রত-উপবাসাদিতে দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিয়া বসিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া কথা শুনাইয়া যান; এবং ব্রত-উপবাসাদি করিলে অন্তত একটি ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়।

ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতকে সেই প্রাচীনকালেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে খুব পরিচিত দেখা যাইতেছে। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ পদে পদে রামায়ণ-মহাভারতের বর্ণিত আখ্যায়িকাসকলের উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু অপর কোন পুরাণোল্লিখিত আখ্যায়িকাদির উল্লেখ দেখা যায় না; ইহাও মৃচ্ছকটিকের খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইবার অপর প্রমাণ; কারণ অধিকাংশ পুরাণ তৎপরে রচিত হইয়াছে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বাচ্ছা-চর।

[অনুবাদ]

তাহার নাম ষ্টেনের পো, খালি ষ্টেনের পো।

সে পারী-নগরের একটি সহুরে ছেলে, কাহিল, ফ্যাকাসে। তাহার বয়স দশও হইতে পারে, পনের বলিলেও চলে, এ-রকম ছোঁড়াদের বয়স ঠিক করা মুস্কিল। তার মা মারা গিয়াছিল। বাপ আগে সিপাহী ছিল, এখন সহরের একটা পাড়ার চকের হেফাজতের কাজে নিযুক্ত।

শিশুর দল, চাকরাণী, নিড়বিড়ে বুড়ী, ছেলে কোলে পথচলতি স্ত্রীলোক, যে কেহ গাড়িঘোড়ার ভিড় হইতে চার-দিক্-রাস্তায়-ঘেরা সেই চকের বাগানের মধ্যে আশ্রয় লইত, সকলেই বাবা ষ্টেন্‌কে চিনিত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

তাহারা জানিত যে, সেই ঝাঁটার মত গোঁফ-জোড়া, যা দেখিয়া পাড়ার বদমাইস ও রাস্তার কুকুরগুলো ভয়ে অস্থির হইত, তার মধ্যে বড় নরম, মিঠে, প্রায়-মায়ের-মত-স্নেহমাখা একটি হাসি লুকান ছিল। সেই হাসিটুকু দেখিতে হইলে ভদ্রলোককে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেই হইত—"তোমার ছেলেটি কেমন?"

বাবা ষ্টেন্ ছেলেকে কি ভালটাই বাসিত! ছোকরা যখন শেষবেলায় ইস্কুল থেকে ফিরিয়া তাহাকে ডাকিত, তখন সে খুসী কত! তার পর বাপে-বেটায় মিলিয়া চকের চারদিকের রাস্তায় চক্র দিত, বেঞ্চিতে যারা বসিয়া আছে তাহাদিগকে অভিবাদন করিত, তাদের কুশলপ্রশ্নের উত্তর দিত।

দুঃখের মধ্যে পারী-অবরোধের সঙ্গে সঙ্গে সবই উলট্‌পালট্ হইয়া গেল। এই চকের ভিতর একরাশ কেরোসিন্‌তেল আনিয়া জমা করা হইল, তাই পাহারা দিতে দিতে বেচারা বাবা ষ্টেন্‌কে সমস্তদিন সেই লোকশূন্য জঙ্গলপড়া বাগানে একলাটি কাটাইতে হইত। তামাকটুকু পর্য্যন্ত খাইবার জো ছিল না; সেই কত রাত্রে বাড়ী ফেরার আগে ছেলেরও দেখা পাইত না। সুতরাং প্রুশিয়ান্‌দের নাম করিলে তার গোঁফ-ফোলানটা একটা দেখ্‌বার জিনিষ ছিল।

ষ্টেনের পোর কিন্তু এ নূতন বন্দোবস্তে আপত্তির বিশেষ কারণ ছিল না। অবরোধ! ছোঁড়াদের পক্ষে এমন মজার জিনিষ কি আর আছে? ইস্কুল নাই, পড়া নাই, রোজই ছুটি, রাস্তায় যেন সমস্তক্ষণ মেলা লাগিয়া রহিয়াছে।

বালক সারাদিন বাইরে-বাইরে টোটো করিয়া রাত্রে বাড়ী ফিরিত। পল্টনের দলগুলো যে সময়ে পাড়ার ব্যারাক্ হইতে গড়ে যাইত, সে একটা-না-একটার সঙ্গ ধরিত, যেটার বাজনা ভাল, সেইটাই পছন্দ করিয়া লইত। এ সম্বন্ধে ষ্টেনের পোর বেশ জানা-শোনা ছিল। সে ফস্ করিয়া

বলিয়া দিতে পারিত যে, ৯৬ নং পল্টনের ব্যাণ্ড তেমন কাজের নয়, কিন্তু ৫৫রটার বড় জবর। আবার কখনো বা সে দাঁড়াইয়া ফৌজের কাওয়াজ দেখিত।

এর উপর দোকানের দরজায় লোকের সার ছিল। শীতকালের এই অন্ধকার ভোর হইতে মাংসওয়ালা-রুটিওয়ালার দোকানের সাম্‌নে সারবন্দী লোক জমিয়া থাকিত, সেই বরফ-গলা জলে পা দিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে সেখানে সকলের পরস্পরের সহিতআলাপ হইত, গল্প চলিত, রাজনীতির তর্কবিতর্ক বাধিত। ষ্টেনের পো চুপ্‌ড়ী-হাতে সেই সারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত, ষ্টেন্-মহাশয়ের ছেলে বলিয়া সকলে ওরও মতামত জিজ্ঞাসা করিত।

কিন্তু সব চেয়ে ভারি আমোদ ছিল জুয়াখেলা। ষ্টেনের পোকে সৈন্যদলের সঙ্গে বা দোকানের সাম্‌নে না দেখা গেলে, বড় চকের ভিতরে, যেখানে যুদ্ধ সুরু হওয়া অবধি একটি মস্ত জুয়ার আড্ডা বসিয়া গিয়াছিল, সেখানে তাকে নির্ঘাত পাওয়া যাইত। সে যে নিজে খেলিত না, তা আর বলিতে হইবে কেন, সে ত ঢের পয়সার কাজ। কিন্তু খেলওয়াড়দের দিকে কি প্যাট্‌প্যাট্ করিয়া চাহিয়া থাকিত!

এক চোটে পাঁচমুদ্রার কম বাজি ফেলিতই না, এমন একটি নীল-জামা-পরা ঢ্যাঙা ছোকরা তাহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। সে একটু জোরে চলিলেই তার পকেট সর্ব্বদা ঝম্‌ঝম্ করিত।

একদিন তাহার একটি মুদ্রা ষ্টেনের পোর পায়ের কাছে গড়াইয়া আসিলে, কুড়াইয়া লইবার সময়ে ঢ্যাঙা ছোকরাটি চাপা আওয়াজে তাহাকে বলিল—"টাকা দেখে' যে ট্যারা হয়ে গেলি, অ্যাঁ? আচ্ছা, চাস্ ত এ সব কোথা পাওয়া যায়, তোকে বলে' দিতে পারি।"

খেলা শেষ হইলে সে তাকে চকের এক কোণে লইয়া গিয়া প্রুশিয়ান্‌দিগকে ফরাসী খবরের কাগজ বেচিতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। ইহাতে সে প্রত্যেক খেপে ত্রিশমুদ্রা করিয়া পাইত।

ষ্টেনের পো প্রথমটা মহা রেগেমেগে অস্বীকার করিল; এমন কি, তিনদিন সে খেলার ধারেই গেল না। তিনটি বড় সাঙ্ঘাতিক দিন! ঘুমাইতেও পারে না, খাইতেও পারে না। রাত্রে সে কেবলি দেখিতে থাকে, খাটের গোড়ায় একরাশ খেলার ঘুঁটি,আর চারদিকে রূপার মুদ্রা চেপ্টা হইয়া পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে। লোভের মাত্রা কিছু বেশী হইয়া পড়িল।

চতুর্থ দিনে সে আবার বড় চকে হাজির, ফের সেই ঢ্যাঙা ছোকরার পাল্লায় পড়িল, এবার ভজিয়াও গেল।

একদিন সকালে বরফের মধ্য দিয়া দু'জনে বাহির হইল, কাঁধের উপর একটি করিয়া চটের থলে, কাপড়ের মধ্যে খবরের কাগজ লুকান। তাহারা যখন সহরের ফটকে উপস্থিত, তখন সবে আলো হইয়াছে। ঢ্যাঙা ছোকরাটি ষ্টেনের পোর হাত ধরিয়া সাস্ত্রীর নিকট এগিয়ে গেল—লাল-নেকো সিপাহী, মুখে ভালমানুষী ভাব—এবং ভিক্‌কের নাকে-কাঁদুনি সুরে তাহাকে বলিল—"আমাদের ছেড়ে দাও গো, দয়াল সেপাই-

বাবা। আমাদের বাপ মারা গেছে, মা ব্যারামে প'ড়', আমার ছোট ভাইকে নিয়ে আমি মাঠে আলু কুড়ুতে যাব।"

বলিয়া সে কান্না জুড়িয়া দিল। ষ্টেনের পো লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। সান্ত্রা একবার উহাদিগকে দেখিয়া লইল, একনজর চারদিক্ চাহিল, কেউ কোথাও নাই, তার পরে চট্ করিয়া পথ ছাড়িয়া-দিয়া কহিল--"ফূর্ত্তি কর্!"

যাঁহাতক্ বলা, আর তাহারাও সদর-রাস্তায় বাহির। তখন ঢ্যাঙা ছোঁড়াটার হাসি দেখে কে!

ষ্টেনের পো স্বপ্নের মত ঝাপ্‌সাভাবে দু'ধারের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কারখানা-গুলোকে সব ব্যারাক্ করিয়া ফেলা হইয়াছে, লম্বা-লম্বা ধোঁয়াশূন্য চোংগুলো কোয়াশা ফুঁড়িয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে। এখানে-ওখানে পাহারা; কোথাও ঝাপ্পা-ঝোপ্পা-আঁটা সেনা-নায়ক দূরবীণ দিয়া দূরে কি দেখিতেছে; মাঝে মাঝে গলা-বরফে-ভেজা তাঁবু, সাম্‌নে রাত্রে-জ্বালা আগুনের ছাই পড়িয়া।

ঢ্যাঙা ছোঁড়ার পথঘাট সব চেনা ছিল, সে সান্ত্রী-বসান স্থানগুলি বাঁচাইয়া মাঠে মাঠে চলিতে লাগিল; শেষে কিন্তু একদল গোলন্দাজের সাম্‌নে পড়িয়া গেল, তাহাদিগকে আর এড়াইতে পারিল না। তাহারা বরাবর রেলের রাস্তার জলার ধারে সার-বাঁধা ছোট ছোট চালার মধ্যে চৌকি দিতেছিল।

এবার ঢ্যাঙা ছোকরা তার গৎটি বৃথা আওড়াইল, তারা কিছুতেই ছাড়িবে না। কান্নাকাটি শুনিয়া কোঁচকান-মুখ, চুলে-পাক-ধরা কতকটা বাবা ষ্টেনের ধরণের এক বুড়ো জমাদার পাহারা-ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া বলিল—"কিরে বেটারা! অমন করে' কি কাঁদ্‌তে আছে? আলু কুড়'তে যাবি এখন, আগে ঘরে এসে একটু গরম হয়ে নে, ছোট ছোঁড়াটা যে প্রায় জমে' গেছে।"

হায় রে! ষ্টেনের পো যে কাঁপিতেছিল, সে ত শীতে নয়, ভয়ে ও লজ্জায়! পাহারা-ঘরে ঢুকিয়া তাহারা দেখে, গরীবিয়ানা-রকমের অল্প একটুখানি আগুনের চার-দিকে জনকতক সিপাহী জড়সড় হইয়া সঙীনের উপর বরফ-জমা বিস্কুটগুলি বিঁধিয়া তাতাইয়া লইতেছে।

ছেলেদের জন্য জায়গা করিয়া তাহারা আর-একটু ঘেঁষাঘেঁষি বসিল। তাহা-দিগকে একটু কাফি খাইতে দিল। তাহারা সেটা খাইতেছে, এমন সময়ে এক নায়ক দরজার গোড়ায় আসিল, জমাদারকে ডাকিল, ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল, আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। জমাদার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া-আসিয়া উৎফুল্লমুখে কহিল —"ওহে বাপসকল, আজ রাতে একটা কাণ্ডমাণ্ড কিছু হবে! প্রুশিয়ান্‌দের সঙ্কেত মেরে নেওয়া গেছে, এবার বোধ হয় সয়তানদের বুর্জে-গড়টা আবার আমাদের হাতে পড়্‌বে।"

তখন হাসি ও জয়ধ্বনির চোটে ঘর ভাঙিয়া পড়িবার জোগাড়! সকলে নাচিয়া-গাহিয়া সঙীন আস্ফালন করিতে লাগিল। এই মাতামাতির সুযোগে ছোকরারা সট্‌কাইয়া পড়িল।

রেলের রাস্তা পার হইলে সাম্‌নে ফাঁকা-

মাঠ ছাড়া আর কিছু রহিল না। দূরে একটি টানা দেওয়াল, ঘনঘন ঘুলঘুলি কাটা। এই দেওয়ালের দিকে ইহারা আলু কুড়াইবার ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে নুইতে নুইতে চলিল। ষ্টেনের পো বারে-বারে বলিতে লাগিল—"চল ফিরে যাই, আর গিয়ে কাজ নেই।"

কিন্তু অপরটি শুধু ভ্রু কোঁচকায়, আর চলিতে থাকে। হঠাৎ বন্দুকের ঘোড়াতোলার কটাস্ শব্দ শোনা গেল। ঢ্যাঙা ছোঁড়া মাটীতে লুটাইয়া-পড়িয়া বলিল—"শুয়ে পড়্।"

দুই জনেই জমির উপর লম্বা হইলে সে শিশ্ দিল। বরফের উপর দিয়া পাল্টা শিশ্ আসিল। তাহারা গুড়ি মারিয়া আগিয়ে চলিল। দেওয়ালের ঠিক সাম্‌নে মাটীর সঙ্গে সমান হইয়া এক ময়লা টুপি ও তাহার নীচে কটা গোঁফ-জোড়া দেখা দিল। ঢ্যাঙা ছোকরা সেই প্রুশিয়ান্‌টার পাশে নালার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গীটির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—"এটি আমার ভাই।"

ষ্টেনের পো এমন ছোট্টটি ছিল যে, প্রুশিয়ান্‌টা তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির। তাহাকে আড়্‌কোলা করিয়া তবে দেওয়ালের কাটা জায়গাটা পার করা গেল।

দেওয়ালের ও-পাশে মস্ত মস্ত মাটীর ঢিবি, কাটা গাছের গুঁড়ি, বরফের মধ্যে কালো কালো গর্ত্ত, প্রত্যেক গর্ত্তের ভিতর সেইরকম ময়লা টুপি, তার নীচে সেইরকম কটা গোঁফ, ছেলেদিগকে যাইতে দেখিয়া সবগুলোতে মুচ্‌কি-হাসি।

এক কোণে বাগান-ওয়ালার বাড়ী, তাহা গাছের গুঁড়ি দিয়া আগাগোড়া মোড়া হইয়াছে। নীচের ঘরে সিপাহী পোরা, তাহারা তাস খেলিতে ব্যস্ত। গম্‌গমে আগুনটার উপর হাঁড়ি চড়ান, দিব্য রান্নার গন্ধে ভুর্‌ভুর্ করিতেছে। সেই ফরাসী গোলন্দাজদের আড্ডা হইতে কত তফাৎ!

উপরের তলায় সেনানায়করা। তাহারা মদ খাইতেছে, গানবাজনা করিতেছে। ফরাসী ছোকরা দু'টা ঢুকিতে খুব আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। তাহারা উপরে গিয়া খবরের কাগজগুলি বাহির করিয়া দিল। তাহাদের নিকট আরো কথা আদায় করিবার আশায় মদ দেওয়া হইল।

নায়কদের খুব ঘাড়-তোলা নাক-সিঁটকন ভাব, কিন্তু ঢ্যাঙা ছোঁড়াটার নানারকম সহুরে রসিকতা ও গলিচ্ বোলচালের চোটে তাহারা নরমে আসিল। প্রথমটা হাসিল, ক্রমে সেই সব চোখা-চোখা বুলি তার সঙ্গে সঙ্গে আওড়াইতে লাগিল, এক কথায় পারী-নগরের এই কাদায় শুয়ারের মত আনন্দে লুটাপুটি করিতে থাকিল।

ষ্টেনের পোর ইচ্ছা হইল, সেও দুটো বিদ্যা জাহির করিয়া প্রমাণ করে যে, সে নেহাৎ অজ্ঞ নয়, কিন্তু কি-একটা যেন তাহাকে দমাইয়া রাখিল। তার ঠিক সাম্‌নে, দল হইতে একটু তফাতে, একটি প্রবীণ গম্ভীর প্রুশিয়ান্ বসিয়া পড়িতেছিল, অর্থাৎ প্রথমটা পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আসলে তাহার চোখ একবারও ষ্টেনের পোর মুখ থেকে নামে নাই। তাহার চাহনীতে তিরস্কার-মেশান স্নেহ ছিল—যেন বাড়ীতে তাহার

এই বয়সের ছেলে আছে, যাহার সম্বন্ধে ভাবিতেছে "ছেলেকে এমন কাজে দেওয়ার চেয়ে মরণ ভাল!"

সেই মুহূর্ত্ত থেকে ষ্টেনের পোর মনে হইল, যেন তার বুকের মধ্যে কাহার হাত ঢুকিয়া দম চাপিয়া বন্ধ করিতেছে। এই যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য সে মদ খাইতে লাগিয়া গেল। ক্রমে চারদিক্‌টা পাক দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে সে অস্পষ্টভাবে হাসির গর্‌রা শুনিল, দেখিল যে, তাহার সঙ্গীটি নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া ফরাসী-সৈন্যদের রকমসকম নকল করিতেছে।

পরে ঢ্যাঙা ছোকরাটি গলা নামাইল, নায়কগুলো তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের মুখ গম্ভীর। হতভাগাটা বুঝি গোলন্দাজদের রাত্রের আক্রমণসম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। তখন ষ্টেনের পোর নেশা ছুটিয়া গেল, সে রাগিয়া টং হইয়া লাফাইয়া উঠিল—"ও হবে না, ও সব চল্‌বে না!"

অপরটি খালি একটু হাসিয়া বলিয়া চলিল। তাহার শেষ হইতে না হইতেই নায়করা সব খাড়া হইয়া উঠিল। একজন দরজার দিকে দেখাইয়া ছেলেদিগকে বলিল—"বেরো!"

তাহার পর তাহারা নিজেদের মধ্যে জর্ম্মণে কি বিড়্‌বিড়্ করিতে লাগিল।

ঢ্যাঙা ছোকরাটা পকেট বাজাইতে বাজাইতে রাজার মত বুক ফুলাইয়া বাহির হইল। ষ্টেনের পো মাথা লট্‌কাইয়া তাহার পিছনে-পিছনে চলিল; যে প্রুশিয়ান্‌টির চাহনি তাহাকে এত উতলা করিয়াছিল, তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময়ে সে দুঃখের স্বরে এই কয়টি কথা শুনিল—"এ কাজ বড় ভাল নয়, মোটেই ভাল নয়।"

তাহার চোখে জল আসিল।

একবার মাঠে পড়িলে পর বালকরা দৌড় মারিয়া শীঘ্রই ফরাসী সীমানায় উপস্থিত হইল। প্রুশিয়ান্‌রা আলু দিয়া তাহাদের থলেগুলো পূরিয়া দিয়াছিল, তাই নিয়া গোলন্দাজদের সার পর্য্যন্ত তারা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিল।

সেখানে রাত্রের আক্রমণের আয়োজন চলিতেছিল। ফৌজ চুপিচাপি আসিয়া দেওয়ালের আড়ালে জমায়েৎ হইতেছে। সেই বুড়া জমাদার বন্দোবস্ত করিতে মহাব্যস্ত, মুখে কি প্রফুল্লভাব! ছেলেরা যাইতেছে দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া একটু স্নেহহাসি হাসিল।

উঃ! সে হাসি ষ্টেনের পোকে কি বেঁধাই বিঁধিল! একবার তাহার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া বলে—"ওগো, তোমরা ওখানে যেয়ো না গো, আমরা তোমাদের সর্ব্বনাশ করে' এসেছি!"

কিন্তু অপরটি উহাকে বলিয়া রাখিয়াছিল—"খবরদার, মুখ খুলিস্ নে, তা হ'লে আমাদের গুলি কর্‌বে!"

সেই ভয়ে সে চাপিয়া গেল।

সহরের দেওয়ালের বাইরে তাহারা এক পোড়ো বাড়ীতে ঢুকিয়া টাকা ভাগ করিয়া লইল। সত্য কথা বলিতেই হইবে যে, ভাগ কড়ায়-গণ্ডায় মিলাইয়া লওয়া হইল, এবং ষ্টেনের পো যখন তার কাপড়ের মধ্যে টাকার ঝম্‌ঝমানি শুনিল, তা' দিয়া কত খেলা

যাইতে পারিবে কল্পনা করিল, তখন তার দুষ্কর্ম্মটা আর তত ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইল না।

কিন্তু বেচারা ছেলেমানুষ। সে যখন একলা পড়িল, তখন? ফটক পার করিয়া-দিয়া যখন ঢ্যাঙা ছোঁড়াটা চলিয়া গেল, তখন তাহার পকেটের ভার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তার বুকের মধ্যের সেই হাতটা আরও কসিয়া ধরিল। এ পাবী-সহব আর সে পারী নয়। রাস্তার লোকজন যেন সকলেই তাহার বিশ্বা টের পাইয়াছে, সকলেই তাহার পানে কট্‌মট্‌ কবিয়া তাকাইতেছে। গাড়ির চাকার ঘড়্‌ঘড়ানীতে, খালধারে যে যুদ্ধঢাক বাজিতেছে তাহার বোলে, সবটাতেই ক্রমাগত বলিতেছে "ঘুষখোর!"

শেষে কোনরকমে বাড়ী পৌঁছিলে, বাপ তখনো আসেন নাই দেখিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তার নিজের বালিশের নীচে সেই টাকার বোঝাটা নামাইয়া-রাখিয়া তবু কতক হাল্‌কা বোধ করিল।

সে রাতে বাবা ষ্টেন্‌ যেমন খোস-মেজাজে বাড়ী ফিরিল, আগে এমন তার কখনো দেখা যায় নাই। মফস্বল হইতে যুদ্ধসংবাদ পৌঁছিয়াছে, লড়াইয়ের অবস্থা যেন একটু ভালর দিকে। খাইতে খাইতে বুড়া সিপাহী তাহার দেওয়ালে-টাঙান বন্দুকের দিকে তাকাইয়া, তাহার সেই শাদা খোলা হাসি হাসিয়া ছেলেকে বলিল—"বড় হ'লে তুই প্রুশিয়ান্‌দের খুব ঠুক্‌তিস্‌, কেমন?"

আটটা-আন্দাজ সময়ে তোপের আওয়াজ শোনা গেল।

"ঐ শোন্‌! সদররাস্তার দিক্‌ থেকে আওয়াজ আস্‌ছে—বুর্জে গড়ে খুব লেগে গেছে!"—ভদ্রলোক যুদ্ধের সমস্ত অন্ধিসন্ধি জানিত।

ষ্টেনের পো ফ্যাকাসে মারিয়া গেল; শ্রান্তিবোধ হইতেছে ছুতা করিয়া সে শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম আসিল না। কামানের ধড়্‌ধড়ানি চলিতে থাকিল। তাহার মনে খালি সেই গোলন্দাজদের ছবি আসে; তারা প্রুশিয়ান্‌দিগকে রাত্রে আচম্‌কা ধরিতে গিয়া নিজে ফাঁদে পড়িয়া যাইতেছে। সেই বুড়া জমাদারের হাসি মনে পড়িল, অন্য অনেকের সঙ্গে সে এতক্ষণ বরফের উপর পড়িয়া।

এই সব রক্তের মূল্য তাহার বালিশের নীচে লুকান—আর কারো নয়, বৃদ্ধ যোদ্ধা ষ্টেন্‌মহাশয়ের ছেলের বালিশের—

—চোখের জলে তার চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল।

পাশের ঘরে শুনিল, বাবা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইতেছেন। নীচের চকে ভেঁপু বাজিতেছে, ফৌজ সব বাহিরে যাইবে বলিয়া তৈয়ারী হইতেছে। তবে ত সত্য-সত্যই রীতিমত লড়াই বাধিয়াছে। ব্যাকুল বালক সশব্দে ফোঁপাইয়া উঠিল।

—"তোর কি হয়েছে রে?"—বাবা ষ্টেন্‌ ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ছেলে আর থাকিতে পারিল না, এক লাফে খাট হইতে নামিয়া-পড়িয়া বাপের পা জড়াইয়া ধরিল। সেই ধাকায় মুদ্রাগুলি ঘরময় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

—"এ সব কি? তুই কি চুরী করে-ছিস্ নাকি?"—বুড়া কাঁপিতে কাঁপিতে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

তখন দম পর্য্যন্ত না লইয়া ষ্টেনের পো একটানে প্রুশিয়ানদের সীমানায় যাওয়ার ও সেখানকার কাণ্ডকারখানার বৃত্তান্ত বলিয়া গেল।

বলিতে বলিতে যেন তার বুকের চাপ একটু কমিয়া গেল, নিজের দোষস্বীকার করা হইলে একটু খোলসা বোধ করিল। বাবা ষ্টেন্ শোকবিহ্বল মুখে সব শুনিয়া গেল, শেষ হইলে হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

—"বাবা, বাবা!" ছেলে কি বলিতে গেল, কিন্তু বুড়া কোন উত্তর না করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া-দিয়া মুদ্রাগুলি কুড়াইয়া লইল।

"এই ত সব?"—সে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল।

ষ্টেনের পো ইঙ্গিতে জানাইল যে, আর নাই। বৃদ্ধ দেওয়াল হইতে বন্দুক ও টোটার বাক্‌স নামাইয়া লইল এবং মুদ্রাকয়টা পকেটে পুরিয়া বলিল "আচ্ছা বেশ, আমি তাদের এগুলো ফিরিয়ে দিই গে যাই।"

আর একটি কথাও না বলিয়া, একবার ফিরিয়াও না তাকাইয়া সে নামিয়া বাহির হইল, এবং পল্টনের দলের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া গেল!

তাহাকে আর দেখা যায় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদিম ধর্ম্মভাব ও যোগের অঙ্কুর।

১

আদিম বা অনুন্নত মনুষ্যসমাজে প্রেতপূজা খুব প্রচলিত। দলপতির আত্মার পূজা, দুষ্ট শত্রুর আত্মার তৃপ্তিবিধান, পূজার ইতিহাসে প্রথম কথা। প্রেতাত্মার বৃক্ষ এবং জীবশরীরে সংক্রমণবিষয়ে সকল অসভ্য-জাতির মধ্যেই দৃঢ়বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ব্বর যখন নিভৃত গুহা বা কুটীরে নিদ্রিত থাকিয়া রাত্রে স্বপ্ন দেখিত যে, সে পরিচিত অরণ্যে ও পাহাড়ে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেছে এবং হিংস্রজন্তু তাহাকে তাড়া করিলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিত যে, সে আপনার শয্যায় নিভৃতে শুইয়া আছে, তখন তাহার মনে বিস্ময় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ছায়া, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি হইতে যখন আপনার মধ্যে আর একটা আমির জ্ঞান ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই লুকায়িত আমিটাই যে রাত্রে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়, তাহাতে তাহার সন্দেহ থাকিত না। এই বিশ্বাস জন্মিবার পর যখন

কোন লোকের মূর্চ্ছা, আবার অনেক যত্নের পর মূর্চ্ছিতের চেতনাপ্রাপ্ত হইতে দেখিত, তখন অতি সহজেই তাহাদের প্রতীতি হইত যে, লুকান মানুষটা কোথাও ছল করিয়া পালাইয়া গিয়াছিল এবং অনেক সাধ্যসাধনায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুকেও যখন প্রথম মূর্চ্ছা বলিয়া ভাবিয়াছিল, তখন নানা চেষ্টায় তাহাকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আহার্য্যসামগ্রী পর্য্যন্ত উপহার দিয়াছিল। শ্রাদ্ধের পিণ্ডজলের ইহাতেই উৎপত্তি।*

যখন কেহ কোন শত্রু তাড়াইবার জন্য মৃত দলপতির আত্মার উদ্বোধন করিত এবং পাহাড়ে-বনে প্রেতাত্মার পরিহাস-উত্তর মনে করিয়া প্রতিধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিত, তখন পূজাটা সহজ ছিল। তাহার পর যখন স্বপ্নে মৃতজনের দর্শনলাভ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিল যে, কোন কোন শুভ-মুহূর্ত্তেই অচেতন অবস্থায় প্রেতাত্মার দর্শন পাওয়া যায়, তখন ধীরে ধীরে কৃত্রিম স্বপ্ন ও মন্ত্রতন্ত্রের অনেক সৃষ্টি হইয়াছিল। Tylor এর Primitive Culture প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ তত্ত্ব অনেকেই শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যদি এদেশের অনার্য্যপ্লুত স্থান পরিদর্শন করা যায়, তাহা হইলে ইতিহাসটা সহজেই যথার্থ বলিয়া ধারণা হইতে পারিবে। আমাদের সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা অসভ্যজাতির সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে যে, তাহাদের সমাজেও এগুলি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। একালের ভূতবাদী এবং থিয়সফিষ্টেরাও স্বপ্নতত্ত্বের যে বাড়াবাড়ি করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাসের মূলেও যে ঐ একই কথা, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

প্রথমে যখন কেহ কৃত্রিম স্বপ্নের জোরে স্বীয় শরীরে মৃত আত্মার আবির্ভাব করাইয়া লইয়াছিল, তখন যে একটা চালাকি করিয়াছিল, তাহা নয়। ভ্রান্তবিশ্বাসের ফলে অসত্য সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। সহজে যে ব্যক্তি কৃত্রিম স্বপ্নের দ্বারা পরাভূত হইতে পারিত, সে বেশ প্রতিপত্তিও লাভ করিত। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিজীবিগণ তখন চালাকি করিয়া সম্মান লাভ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। মৃত দলপতির আশীর্ব্বাদে বললাভ করা যাইতে পারে, ইহা সাধারণত সকলেই বিশ্বাস করিত; বিশ্বাস করিত বলিয়াই তাঁহাকে ডাকিত। উহা হইতেই অমানুষিক ও অস্বাভাবিক শক্তিলাভের বিশ্বাসও জন্মিয়া যায়। উপবাস করিয়া, একাসনে বসিয়া-বসিয়া হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরাইয়া, একদৃষ্টে একদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া মাথা ঘুরাইয়া এবং আরো নানাপ্রকার উপায়ে কৃত্রিম স্বপ্নের সৃষ্টি করিতে হইত। এ কষ্ট সকলে সহ্য করিতে পারিত না কাজেই সাধকের দল গোড়াগুড়িই অল্প ছিল। অল্পসংখ্যক লোক যদি একবার একটা কিছু হাতে লয় এবং তাহা হইতে যদি সম্মানাদি লাভ করিতে পারে, তবে

* মানবতত্ত্ববিজ্ঞানের (Anthropologyর) অতি পরিচিত মূল সূত্রগুলির উল্লেখ করিতে হইল; বিজ্ঞ পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। যোগের উৎপত্তির ইতিহাসের জন্য কথাগুলির প্রয়োজন আছে বলিয়াই একবার উহাদের আবৃত্তি করিয়া লইতেছি।

তাহা সযত্নে নিজস্ব করিয়া তোলে। শুধু শারীরিক পরিশ্রমে হয় না, আরো কিছু চাই প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়া একটা গুরুর দল জন্মগ্রহণ করে। জিনিষটার শিক্ষাদীক্ষার ভার তখন ঐ দলের এক-চেটিয়া হয়; এবং অনুষ্ঠেয় বিষয়টি যে ভারি উপকারী, তাহা প্রচারিত হইতে থাকে। সাধারণ লোকের কাছে শক্তিলাভাদির কথা পরীক্ষিত জিনিষ না হইলেও, উহারা সর্ব্বান্তঃ-করণে উহাতে বিশ্বাসস্থাপন করে। প্রকারা-ন্তরে সকল অসভ্য সমাজের মধ্যেই এই শ্রেণীর দেবদর্শনবাদে বিশ্বাস আছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা মানব-তত্ত্বশাস্ত্রের কয়েকটি স্থূল মীমাংসা। এই-প্রকার দেবদর্শনবাদই যে এদেশের চির-পূজিত মহামান্য যোগের মূলে, তাহা সহজে অনুমিত হইতেও পারে। তথাপি প্রাচীন সমাজের অবস্থার ইতিহাস হইতে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

২

ঋগ্বেদে প্রাচীন আর্য্যদের সামাজিক অবস্থা এবং ধর্ম্মভাবের যে মনোজ্ঞ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বত্রই আনন্দের সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। দেবতার চিত্রে ভূত-প্রেতবিভীষিকার ধূম্রবর্ণ নাই; মানবের আশা আকাঙ্ক্ষায় জন্মান্তরবাদের বিষাদ-কালিমার দাগ নাই। জীবন আনন্দময়, দেবতারাও মঙ্গলময়। প্রথম ঋক্‌সৃষ্টির কতকাল পূর্ব্বে যে প্রেতাত্মপূজার যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রেতাত্মার পূজা যে এক সময়ে ছিল, তাহা পিতৃদিগের পূজা হইতেই সূচিত হয়; এবং ঐ পূজা যে ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশে দেবতাপূজার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল, তাহাও দেবলোকের ঊর্দ্ধে পিতৃলোকের অব-স্থান হইতে বুঝিতে পারা যায়। একমাত্র বেদত্রয় হইতে যদি আর্য্যধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিকাশ বুঝিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে কি-রূপে যে ভূতপেত্নীর (গণ ও মাতৃকার) পূজা এবং জন্মান্তরবাদ উপস্থিত হইল, তাহার মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠে। অতি প্রাচীন বেদে জন্মান্তরবাদের নামগন্ধ নাই, অথচ সহসা যখন প্রাচীন উপনিষদে উহা সত্য বলিয়া গৃহীত দেখিতে পাই, তখন কোন শাস্ত্রেই উহা লইয়া বাদবিবাদ পর্য্যন্ত নাই। নূতন করিয়া যদি কোন পণ্ডিতের মাথায় জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে উহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্কবিতর্ক উঠিত। যে কোন দর্শনশাস্ত্র দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ, সর্ব্বত্রই উহা স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বেদ-ত্রয়ে প্রেতাত্মার অন্য জীবশরীরে সংক্রমণের আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, অথচ বৌধা-য়নের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, পিতৃগণ পক্ষিরূপে গৃহের নিকটে উড়িয়া আসেন বলিয়া উঁহাদের জন্য বলি বিতরণ করা কর্ত্তব্য। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে গণ বা ভূতপ্রেতের পূজকেরা হেয় বলিয়া গণ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা প্রাচীন দেববর্গ অপেক্ষা অধিক পূজ্য হইয়া উঠিয়া-ছিল।

সমাজের মধ্যে যাহার সতেজ জীবন্তবীজ না থাকে, তাহা নির্ব্বিবাদে অঙ্কুরিত হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে পারে না। অন্যদিকে আবার প্রাচীন বৈদিকসমাজে

ঐ বীজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় না। এই সমস্যাটি মীমাংসা করিবার জন্য পণ্ডিতেরা নানা কথা বলিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উহার মধ্যে যে মতটি অধিকতর সম্ভাবনীয় মনে হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বৈদিকযুগ হইতেই বহুশ্রেণীর অনার্য্যেরা আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল। অনার্য্যেরা যেমন আর্য্যধর্ম্ম দ্বারা আপনাদের সংস্কারসাধন করিয়াছিল, আর্য্যেরাও সেইরূপ নিতান্ত অলক্ষ্যে অনার্য্যদের অনেক জিনিষ আত্মশরীরস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতে যে আর্য্য-অনার্য্য-মিশ্রণ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

৩

অতি প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে ভারতবর্ষের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়েরও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের অনেক ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ রিস্ ডেবিড্স্ প্রণীত Buddhist India গ্রন্থে ঐ সকল বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন সময় হইতেই অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রদেশে এবং অবন্তী প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রদেশে আর্য্যেরা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অঙ্গ, মগধ, অবন্তী প্রভৃতি নাম উক্তপ্রদেশবাসী জাতিসমূহের নাম ছিল; এবং জাতির নাম হইতেই দেশের নামকরণ হইয়াছিল। ঐ প্রাচীন সময়ের রাজবংশের নামের তালিকায় শাক্য-বংশব্যতিরিক্ত বৃজি, বৃজিজাতিভুক্ত লিচ্ছবি, ভগগ, কালাম প্রভৃতি অনার্য্য নাম পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন বৈদিকসাহিত্যে ইঁহাদের কাহারও নাম পাওয়া যায় না, এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মসূত্রে অঙ্গ, মগধ, অবন্তী প্রভৃতি দেশ অতি অপবিত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। বৌধায়নের অনুশাসনে ঐ সকল দেশে গমন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অথচ সূত্রকর্ত্তার পূর্ব্ব হইতেই ঐ দেশসমূহে আর্য্য ভাষা, আর্য্য ধর্ম্ম এবং আর্য্য রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত।

কথা এই যে, প্রাচীন আর্য্যেরা যে কেবল একটি পরিপুষ্ট দল লইয়া গঙ্গা এবং যমুনার প্রবাহপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নহে। যাঁহারা ঐ পথে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের সংখ্যা খুব অধিক ছিল, এবং তাঁহাদের সমাজে বহুকাল পর্য্যন্ত অনার্য্যেরা স্থানলাভ করিতে পারে নাই। ঋক্ হইতে সাম-যজু ইঁহাদেরই হস্তে বিকশিত এবং সুবৃহৎ ব্রাহ্মণনামক সাহিত্য ইঁহাদেরই সৃষ্টি। আর্য্যদের আর একটি দল কচ্ছ-উপসাগরের দিক্ দিয়া অবন্তীপ্রদেশে, এবং অন্য একটি দল হিমাচলের পাদপ্রদেশ দিয়া শাক্যরাজ্যের মধ্যে এবং তথা হইতে মগধ ও অঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটির ১৯০১ সালের পত্রিকায় এবং গত জানুয়ারীমাসের এশিয়াটিক্ কোয়াটারলি রিভিউ কাগজে ডাক্তার গ্রিয়ার্সন্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এ বিষয়ের অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যাইবে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের অনুমান যে,

ব্রিজি, শাক্য প্রভৃতি জাতি মঙ্গোলীয় এবং মল্ল, কোলীয় প্রভৃতি জাতি দ্রাবিড়ী। রাজপ্রভাব মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি স্থানেই বেশি বিকশিত হইয়াছিল। রাজবর্গই ক্ষত্রিয়নাম পাইয়াছিলেন; এবং ক্ষত্রিয়কুলে মগধরাজগণই চিরকাল শ্রেষ্ঠ। বর্ণবিভাগে ক্ষত্রিয়ের পীতবর্ণ কথাটায়, উল্লিখিত মঙ্গোলীয় উৎপত্তির মত সমর্থিত হইতে পারে। মঙ্গোলীয় হউন বা ভারতের আদিম অধিবাসীই হউন, উঁহারা যখন অতি প্রাচীন সময় হইতেই আর্য্যধর্ম্ম এবং আর্য্যভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন আর্য্যপ্রভাব এবং আর্য্যমিশ্রণ অস্বীকার করিয়া উঠিতে পারা যায় না। দেশগুলি আর্য্যসভ্যতায় সংস্কৃত, ক্ষমতাশালী এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ; তথাপি যখন ধর্ম্মসূত্রকারেরা উহাদিগকে অপবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং সহসা আবার অল্প সময়ের মধ্যেই যখন নিষ্কলঙ্ক আর্য্যেরা উহাদের সহিত মিশিয়া গেলেন, তখন আর্য্য এবং অনার্য্য মিশ্রণের মতদ্বারাই অবস্থাটির একটা সুবোধ্য ব্যাখ্যা হইতে পারে। আর্য্যগন্ধ না থাকিলে ব্রাহ্মণ্যগৌরবে গৌরবান্বিতেরা ঐ জাতির সহিত মিশিতেন না। পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রবাদটির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, হয় ত বহুদিন পর্য্যন্ত উহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদিও চলিয়াছিল।

মহামান্য বেদত্রয়ে মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্ব-অঞ্চলের দেশের নাম নাই। যে অথর্ব্ববেদ আর্য্যের নিকট বহুকাল পর্য্যন্ত অপবিত্র ছিল, এখনও যাহা ব্রাহ্মণদের নিকট সম্পূর্ণ সম্মানিত নহে, উহার সৃষ্টি যে বৈদিকযুগে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। ঐ অথর্ব্ববেদে কিন্তু মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের কথা আছে। এইজন্য ঐ হতাদর অথর্ব্ববেদ পূর্ব্বপ্রদেশের কথঞ্চিৎ আচারভ্রষ্ট সঙ্কর আর্য্যমন্ত্রগ্রন্থ বলিয়া অনুমান হয়। এই মীমাংসা গ্রহণ করিলে উল্লিখিত সকল অবস্থার সহিত বেশ মিল হয়।

৪

ঠিক যে সময়ের বৈদিকসাহিত্যে ভূতপ্রেতপূজার নামগন্ধ পাওয়া যায় না, সেই সময়ের অথর্ব্ববেদে উহাদের বিস্তৃত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যাদুমন্ত্র এবং ভূতপ্রেতের কথাই অথর্ব্ববেদে বিস্তর। পণ্ডিতেরা এই বেদ পাঠ করিয়া স্বীকার করেন যে, যে আনন্দপূর্ণ এবং উন্নত ধর্ম্ম সামসময়িক ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অথর্ব্ববেদের শিক্ষা তাহা হইতে বহুদূরে। বিভিন্নসংস্কারের জাতির হাতে সৃষ্ট না হইলে কদাচ এরূপ হইতে পারিত না। শ্রীযুক্ত মেক্‌ডোনেল্ অথর্ব্ববেদের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—Taken as a whole, it is a heterogeneous collection of spells. Its salient teaching is sorcery, for it is mainly directed against hostile agencies, such as diseases, noxious animals, demons, wirzards, foes, oppressors of Brahmans ইত্যাদি।

প্রাচীন ও আদিম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি মগধাদি পূর্ব্বপ্রদেশের সাহিত্য। ঐ সাহিত্যে ভূতপ্রেতাদির কথা এবং জন্মান্তরের কথা অতি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজের নিম্নস্তর হইতে যে সকল ভাব ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে উচ্চ সমাজস্তরে সংক্রামিত হয়, তাহা সাধারণের বিশ্বাসের সামগ্রী বলিয়া কোন পণ্ডিতকে একটা মতস্থাপনের জন্য দার্শনিক তর্কজাল বিস্তার করিতে হয় না। সম্ভবত এইজন্যই জন্মান্তরবাদ সর্ব্বত্র স্বীকৃত দেখিতে পাই।

প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি যে মগধ, বিদেহ * প্রভৃতি দেশে ক্ষত্রিয়দের প্রভাবে আবির্ভূত, তাহা এখন প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃত বলিয়া কোন প্রমাণ দিতে অগ্রসর হইলাম না। ঐ উপনিষদে যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে এবং ব্রাহ্মণের বৃথা জ্ঞানাভিমানের দৃষ্টান্ত দিয়া অনেক কথা লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ আসিয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা মূলত আর্য্য না হইলেও, ইঁহারা যে সাহসী এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। আর্য্য সংমিশ্রণে যে পূর্ব্বাঞ্চলের ঐ সকল জাতির প্রতিভা অধিক বিকশিত হইয়াছিল, তাহা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ব এবং বুদ্ধদেবের অসামান্য কীর্ত্তি হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদ্‌গুলি পূর্ব্বাঞ্চলে উৎপন্ন, এবং সর্ব্বপ্রথম ঐ সাহিত্যেই জন্মান্তরবাদ পাওয়া যায়। ব্রহ্মতত্বাদি উহাতে সযত্নে আলোচিত; কিন্তু জন্মান্তরবাদ কেবল সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত।

প্রেতপূজার যুগ ধর্ম্মভাববিকাশের প্রথম স্তরে। বেদ হইতে উপনিষদাদি পর্য্যন্ত আলোচিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যসমাজ নিত্য উন্নতিশীল, ধীরে ধীরে উন্নততর তত্বে তাঁহাদের সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতেছিল। কাজেই প্রেতপূজার যুগ একবার অতিবাহিত করিবার পর, উন্নতিশীল আর্য্যসমাজে আবার উহা বিকশিত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আজ পর্য্যন্তও যখন সকল অনার্য্যজাতির মধ্যেই মানবাত্মার বৃক্ষ এবং জীবশরীরে প্রবিষ্ট হইবার বিশ্বাস প্রচলিত দেখিতে পাই, তখন সমাজের নিম্নস্তর হইতেই ঐ বিশ্বাস সংক্রামিত হইয়াছিল বলিয়া দৃঢ় অনুমান হয়। পূর্ব্বাঞ্চলেই যখন উহার মূলটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে, তখন এই মীমাংসাটি সুধীগণের বিচারাধীন করা যাইতে পারে। এই বিশ্বাসটির আলোচনা করিতে গিয়া সুপণ্ডিত গার্ব লিখিয়াছেন—It is natural enough to suspect foreign influence in this sudden revolution of thought.

অনার্য্যের বিশ্বাসের সহিত জন্মান্তরবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও আর্য্যদের এই জন্মান্তরবাদ ও "সংসারচক্র"বাদে একটু বিশেষত্ব আছে। ঠিক সংসারচক্রবাদ বা *metempsychosis* অনার্য্যের বিশ্বাসের সামগ্রী নহে। দোষগুণের হিসাবে কোন প্রেতাত্মা বা এ জীবশরীরে এবং কোনটা বা অন্য জীবশরীরে প্রবিষ্ট হয়; অনার্য্যের এই বিশ্বাসটি যে কর্ম্মফলে আত্মার জীবজীবান্তরশরীরে পরিভ্রমণ করিবার বিশ্বাসের মূলে, তাহা যেন সুস্পষ্ট। কিন্তু শরীর হইতে শরীরান্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া

* বিদেহে বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব্বে হইতেই বজ্জি বা বৃজিজাতির বিদেহশাখার রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

বেড়ানটা একটা নূতন কথা। কেহই নিরবচ্ছিন্ন দোষে দোষী নহে; দুঃখীও সুখী হইবে, মন্দও ভাল হইবে, এই ভাব হইতেই পরিক্রমণবাদের উৎপত্তি। যাঁহারা মঙ্গলময় দেবতায় বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের হাতে অনার্য্যের বিশ্বাসটার ঐপ্রকার সংস্করণ বা পরিবর্দ্ধন হওয়াই স্বাভাবিক।

জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থে যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত এবং দেশব্যাপী প্রচলিত বিশ্বাস যাহার অনুকূলে, সে জিনিষটা বৈদিক নহে বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডে বা ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যজুর্ব্বেদে বিধিবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণখণ্ডে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। উহারই নাম বেদের কর্ম্মকাণ্ড। পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পূর্ণরূপে ঐ কর্ম্মকাণ্ড হইতে উৎপন্ন। মৃত্যুর পর মানবাত্মা পিতৃলোকে গমন করেন; পুত্রহীন বলিয়া যাঁহারা পিতৃলোকে গমন করিতে পারেন না, তাঁহারাও অদৃশ্য-লোকে মহাকষ্টে সময়ক্ষেপ করেন; পাপিগণ যমলোকে যাইয়া বহুকষ্ট প্রাপ্ত হয়; ইত্যাদি কথার সহিত জন্মান্তরবাদের বিরোধ হয়। এইজন্যই পৌরাণিক (মূলত বৈদিক) শ্রাদ্ধের মন্ত্র ও অনুষ্ঠান কোনপ্রকারে জন্মান্তরবাদের সহিত মিলাইতে পারা যায় না। যদি মনুষ্যের আত্মা জীবশরীর হইতে জীবশরীরে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অলজ্ঘ্য কর্ম্মফলে ব্রহ্মে লীন হইবে বা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়া-ফেলিয়া মুক্ত হইবে, তাহা হইলে পিতৃলোক এবং পিতৃতর্পণ অর্থশূন্য হয়। মৃত্যুর পর যদি কোন আত্মা অন্য জীবদেহে চলিয়া গিয়াছে, এবং সেখানে মায়াময় দেহ ধারণ করিয়া আহারপানাদি করিতেছে, তাহা হইলে পিতৃলোককে তৃপ্ত করিবার জন্য ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন থাকে না। পিতৃগণ পিণ্ড এবং উদকের আশায় বসিয়া আছেন বলিয়াই উহা প্রদত্ত হয়। রাজা দিলীপ বলিতেছেন যে, তিনি মরিয়া গেলে পূর্ব্বপুরুষেরা আর পিণ্ড পাইবেন না বলিয়া, তাঁহারা দুঃখে ভাল করিয়া পিণ্ড খাইতেছেন না এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তর্পণের জলটুকু "কবোষ্ণ"রূপে পান করিতেছেন। জন্মান্তরবাদ যে বৈদিক নহে, কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও তাহার একটি প্রমাণ।

অন্যদিকে আবার দেখুন, যে ভূতের কৃপায়, অথবা ভূত নামাইয়া, অথবা ভূতের মত অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়া কোন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বেদত্রয়ে এবং বেদত্রয়ের সাহিত্যে কুত্রাপি নাই। যাদুমন্ত্র এবং মন্ত্রবল অথর্ব্ববেদের বিশেষত্ব। মন্ত্রবলে কাহাকেও ভস্ম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, একটা অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিদ্যা অথর্ব্ববেদ হইতে উৎপন্ন। অথর্ব্ববেদের উপাধ্যায়েরাই উহাতে পারদর্শী ছিলেন; এবং উঁহারাই গণপূজক এবং গ্রামযাজক পুরোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে উঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ। Hopkins প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এতদূর পর্য্যন্তও বলিতে চাহেন যে, অথর্ব্ববেদের 'উপাধ্যায়'কথার অপভ্রংশই ওঝা। অথর্ব্ববেদ যে পূর্ব্বাঞ্চলে পরিবর্দ্ধিত বলিয়া অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহা বলিয়াছি। আর্য্যদের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত উহার ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয় না বলিয়া,

ঐ হতাদর বেদের অনেক কথা যে সমাজান্তর হইতে সমাগত, এইরূপ মীমাংসাই উপযুক্ত বোধ হয়। এখনও যখন এ দেশের সমগ্র অনার্য্যজাতির মধ্যে এবং নিম্নস্তরের হিন্দুদের মধ্যে স্কন্ধে ভূত চাপাইয়া অলৌকিক জ্ঞানলাভের অনুষ্ঠান রহিয়াছে, তখন ঐ শ্রেণীর বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ যে নিম্নস্তর হইতে উন্নতিশীল আর্য্যসমাজে সংক্রমিত, তাহাতে সন্দেহ করিব কেন?

জন্মান্তরবাদ, ভূত নামাইবার শক্তি এবং যাদুমন্ত্রাদির বলের উপর যে যোগতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা যোগপ্রক্রিয়ার বিশেষ বর্ণনা হইতে লক্ষিত হইতে পারিবে। সময়ান্তরে সে কথা লইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

উৎসবের দিন।

সকালবেলার অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে উপবনে পাখীদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখীরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান্, গতিবান্, চেতনাবান্ পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সঙ্গীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্ত্তিমান্ উৎসব। সেইজন্ত হেমন্তের সূর্য্যাকিরণে অগ্রহায়ণের পক্কশস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে—সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে,—বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না-যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে;—সেদিন ত আমরা জড়ের মত, উদ্ভিদের মত, সাধারণ জন্তুর মত—সেদিন ত আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্ব্বজয়ী

মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্ম্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না -সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সঙ্গীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—আজ, আলোক জ্বলিয়াছে, সঙ্গীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে—আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে—আজ আমরা কেহ একাকী নহি আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক—আজ অতীত সহস্রবৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—আজ অনাগত সহস্রবৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কি আশ্চর্য্যশক্তি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্দ্ধে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্ম্মী কর্ম্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে? জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সেই শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়াদিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়! প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি, মানুষের উদ্যম, মানুষের উদ্যোগ রহিয়াছে—আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে—কোমল ত্বক্ এবং দুর্ব্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজনসাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট

হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে একি জোয়ার আসিয়াছে —সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া, সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া অহর্নিশি অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে, কোন্ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে! যাহাকে জানিবার জন্যে সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কি প্রয়োজন! যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়? যাহার কর্ম্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন কি, প্রাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই? আশ্চর্য্য! ইহাই আশ্চর্য্য! আনন্দ! ইহাই আনন্দ! যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম, সর্ব্বোচ্চতম শক্তি সর্ব্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দসঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান্ মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত-সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ. আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী। এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে! মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সঙ্কীর্ণতা, কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয় —যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর-মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান, সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন!—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়

পান না। এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ্ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের উর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া একি কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্ব্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বের উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।—

অন্তরতর এই যে আত্মা, ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়। সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূরনিকটের অন্তরতর, তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে, এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে একমুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি—স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি—পিপীলিকাকেও, মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনোশ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে আপনাকে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীমপ্রাচুর্য্যবশতই আপনাকে নির্ব্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জ্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।

এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং ॥
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং ।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥
তিঠ্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে —ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার—এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না—এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মত সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্য্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্ম্মবিস্তার-কার্য্যে, মঙ্গলসাধনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি সুতীব্র, তাহা আমরা সকলেই জানি সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজ-শক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য্য—ইহা সহসা চক্রবর্ত্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্ত্তে হীনপ্রভ করিয়া-দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাজার বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিস্মৃত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গল-শক্তির মহান্ আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌর-বের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা

স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি—আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি—ফাল্গুনের পুষ্পপর্য্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি—মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি—কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট্ বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত, সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসঙ্ঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান্ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্য্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিই—সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্মমঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মত দীনহীন জগতে আর কে থাকিত! সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন, বস্ত্র, আবাস, ভাষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে একমুহূর্ত্তে ধন্য হইয়াছে! তাহার জন্ম উপলক্ষ্যে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া-দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব! অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে, ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানবসমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে—এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে—তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ

করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা একএকদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এককালে যাহা বিনয়বসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্য্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্ম্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারো স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া, নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড় হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর, খাদ্য প্রচুরতর, আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে—কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা, আমাদের দীনতা, আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে, এই গৃহসজ্জায়, এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্তমঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান কর!—বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান কর। আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যাহিক জড়ত্ব, প্রাত্যাহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্বোধিত কর, প্রতিদিনের নির্বীর্য্য নিশ্চেষ্টতা হইতে,—আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার কর। যে কঠোরতায়, যে উদ্যমে, যে আত্মবিসর্জ্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর! আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব, যে প্রেমের গৌরব, যে মঙ্গলের গৌরব, যে কঠিনবীর্য্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে সকল অভয়বাণী-অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খনির্ঘোষের মত আজ না শুনিতে পাই—শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌বিন্যাস—তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও—যেখানে ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন—যেখানে তোমার সর্ব্বত্যাগী সেবক কর্ত্তব্যের কঠিনপথে রিক্তহস্তে ধাবমান হইয়াছেন—

যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য! কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য্য, সেইখানেই তুমি! দূর কর—দূর কর এই সমস্ত আবরণ-আচ্ছাদন, এই সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদিচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও! সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জ্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভু!

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক্ আজি কঠিন আদেশে!
কর মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার! ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে!

ত্রিবঙ্কুর।

৪

প্রাতঃকাল, সাতটা; রাজাদিগের সহিত দস্তুরমত দেখাসাক্ষাৎ করিবার ও তাঁহাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবার ইহাই নির্দ্দিষ্ট সময়। যে সময়ে, চিরনিদাঘ ত্রিবঙ্কুরের দীপ্যমান প্রখর সূর্য্যরশ্মি দিগন্ত হইতে সুদীর্ঘ সরলরেখায় প্রসারিত হইয়া, পত্রাবরণ ভেদ করিয়া তালকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং নারিকেল ও সুপারি তরুর শিখরদেশ স্বর্ণাভ গোলাপি-রঙে রঞ্জিত করিল,—সেই সময়ে, আমি মহারাজের অতিথিস্বরূপে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গাড়িতে উঠিলাম। প্রথমে, তালজাতীয় তরুমণ্ডপের নীচে দিয়া আমাদের গাড়ি চলিতে লাগিল; একটু পরেই, একটা প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে পৌঁছিবার প্রথম রাত্রেই, যে তোরণটি পার হইয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম,—ইহা সেই তোরণ। ইহার ভিতর দিয়া একটা চতুষ্কোণ প্রাচীরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। ইহা যেন একটি নগরের মধ্যে নগর। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরা প্রবেশ করিতে পায় না।

এইবার আমার গাড়ি তোরণের মধ্য দিয়া একেবারে সিধা চলিয়া গেল। সেইখানে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক তোরণ রক্ষা করিতেছিল। প্রবেশ করিবামাত্র

পুণ্যস্থানের বিবিধ নিদর্শন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমরা একটা বিস্তীর্ণ সরোবরের ধার দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই সরোবরজলে আ-কটি-মজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতেছে; প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পূজার মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; উহাদের লম্বিত কেশগুচ্ছ বাহিয়া জলবিন্দু ঝরিতেছে; উহাদের আর্দ্র গাত্র সূর্য্যকিরণে, অভিনব পিত্তলসামগ্রীর ন্যায় ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে;—মনে হইতেছে, যেন উহারা কতকগুলি জলদেবতা। উহারা স্বকীয় ধ্যানে এমনি নিমগ্ন,—আমাদের গাড়ি উহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে, সৈনিকগণ আমাদের সম্মানার্থ তূরীনাদ করিতেছে, জয়ঢাক পিটাইতেছে, তথাপি সেদিকে উহাদের দৃক্‌পাত নাই।

ইতরসাধারণের অপ্রবেশ্য এই ঘেরটির মধ্যে রাজপরিবারবর্গের নিবাসগৃহ, পাঠশালাসমূহ, আর সেই সর্ব্বপ্রধান মন্দিরটি অধিষ্ঠিত—যাহা আর চারিটি বিরাট্‌ অট্টালিকার উপর—সেই দেবমন্দিরের গগনভেদি-চূড়াচতুষ্টয়ের উপর আধিপত্য করিতেছে। এই প্রাসাদের সম্মুখভাগের আকৃতি ও প্রাসাদপ্রাচীরের বহির্ভাগটি যেন একটু বিষাদময়। প্রাসাদদ্বারের উপর দুইটি যুগল কাল্পনিক মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত; এই মূর্ত্তি-দুটি ভারতীয়-ধরণের। আরো কিছু দূরে, পূর্ব্বদিকের শেষপ্রান্তে, কতকগুলি 'ড্রাগন'মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত—উহা স্পষ্ট চীনদেশীয় বলিয়া মনে হয়।

সমস্তই অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত; এবং বহুবর্ষাবধি ধূলিরাশি সঞ্চিত হইয়া উহাদিগকে 'পোড়া-পোড়া'-ও আরক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। কেন না, পথগুলির ন্যায়, এদেশে ধূলিও লাল।

মহারাজের প্রাসাদদ্বারের সম্মুখে, অশ্বারোহী রক্ষিগণ আবার আমার সম্মানার্থ স্কন্ধ হইতে অস্ত্রাদি নামাইয়া লইল। সৈনিকগুলিকে দেখিতে খুব জাঁকালো, বেশ কায়দা দোরস্ত, লাল পাগ্‌ড়ি-পরা; এবং উহারা আধুনিক নিয়মানুসারে, 'পুনঃ-পুন আওয়াজকারী' নবপ্রচলিত বন্দুকের যথাযথ প্রয়োগ ও চালনা করিতে পারে।

মহারাজা স্বয়ং অভ্যর্থনার জন্য দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার সম্মুখে য়ুরোপীয় বৃহৎ-কোর্ত্তা-ধারী কোন রাজমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু না—মহারাজা সুরুচির পরিচয় দিয়া খাঁটি ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন।—শাদা রেশমের পাগ্‌ড়ি, মখ্‌মলের পরিচ্ছদ—বোদামগুলি স্বচ্ছ হীরকের।

যে দরবারশালায় প্রথমে আমার অভ্যর্থনা হইল, উহার কুট্টিমতল চীন-বাসনের দ্রব্যে মণ্ডিত; চাঁদোয়া হইতে কতকগুলি বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে; মধ্যস্থলে খোদাই-কাজ-করা একটা রৌপ্যসিংহাসন; উহার চারিধারে কালো-রঙের আস্‌বাব্‌;—পুরু আব্‌নুস্‌-কাঠে খোদাই-কাজ-করা ভারতীয়-ধাঁচার কালো আরাম-কেদারা; এ কেবল আশিয়াখণ্ডের লোকেরাই জানে, কি করিয়া এরূপ মূল্যবান্‌ কঠিন কাষ্ঠে খোদাই-কাজ করা যাইতে পারে।

ফরাসী-সরকারের একটি সম্মানভূষণ মহারাজকে প্রদান করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল;—এই সহজ কাজটি

সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত য়ুরোপের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। এই য়ুরোপদর্শন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কেননা, বর্ণাশ্রমপ্রথার দুর্লঙ্ঘ্য শাসনে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তাঁহার কোথাও যাইবার জো নাই। প্রধানত সাহিত্যের বিষয় লইয়াই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল; কেন না, মহারাজা মার্জ্জিতরুচি ও সুশিক্ষিত। পরে, তিনি হস্তিদন্তের বিচিত্র আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য-সামগ্রী দেখাইবার নিমিত্ত, আমাকে একটি উচ্চ শিল্পাগারে লইয়া গেলেন। এই শিল্প-সামগ্রীগুলি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইবার বিদায়কাল উপস্থিত হইল; আমি মহারাজের নিকট বিদায় লইলাম।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জের হরিৎ আঁধারের মধ্য দিয়া আমার গাড়ি চলিতে লাগিল। এই অমায়িক রাজার সহিত, আর একটু গভীরভাবে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিয়া গেল। কেন না, আমাদের মনের গঠন ও তাঁহার মনের গঠন ভিন্ন হইবারই কথা।

যে কয়েকদিন আমি এখানে থাকিব, তাহার মধ্যে অবশ্যই আবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাৎ-কারেই আমি বুঝিয়াছি, এখানকার বৃহৎ মন্দিরটির ন্যায়, তাঁহার মনের অন্তরতম প্রদেশটিও আমার নিকট দুর্ভেদ্যরহস্যরূপেই থাকিয়া যাইবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে, কি জাতি, কি কুল, কি ধর্ম্ম,—সকল বিষয়েই মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। তা ছাড়া, আমাদের ভাষা এক নহে। বাধ্য হইয়া একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে রাখিতে হয়; —ইহাই ত একটা বিষম বাধা; দোভাষীর দ্বারা যতই কেন সাহায্য হউক না, তবু যেন আমাদের মধ্যে একটা পদ্দার ব্যবধান থাকিয়া যায়; এইজন্য আমাদের কথাবার্ত্তা বেশিদূর অগ্রসর হইতে পায় না, —একস্থানে সহসা থামিয়া যায়।

দুইতিনদিনের মধ্যে, আমি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। মহারাণী পৃথক্ প্রাসাদে থাকেন। ইনি মহারাজের পত্নী নহেন,—ইনি তাঁহার মাতুলানী। ত্রিবঙ্কুরের প্রধান গোষ্ঠীবর্গ যে জাতির অন্তর্গত, সে জাতিটি বহু প্রাচীন; উহা এক্ষণে ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে, কেবল পত্নীর দিক্ দিয়াই লোকের নাম, উপাধি ও সম্পত্তি উত্তরবংশে সংক্রামিত হয়। তা ছাড়া, পত্নীর স্বেচ্ছামত স্বামি-পরিত্যাগের অধিকার আছে।

রাজপরিবারের মধ্যে, অভিজাতা প্রধানা মহিলার জ্যেষ্ঠকন্যা—'মহারাণী' এবং জ্যেষ্ঠ-পুত্র—'মহারাজা' হইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহারাণী কিংবা তাঁহার ভগিনীগণ—ইঁহাদের সেরূপ কোন বংশসূত্র না থাকায়, বর্ত্তমান রাজবংশ শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার কথা।

এই রাজত্বে, মহারাজার সন্তানদিগের কোন উত্তরাধিকারস্বত্ব নাই; শুধু অধি-কার নাই, তাহা নহে—"রাজকুমার" কিংবা "রাজকুমারী" এই উপাধিলাভেও তাহারা বঞ্চিত।

এই 'নায়ের'জাতীয় মহিলাদিগের মুখশ্রী অতীব সুন্দর। অপরদেশীয় কুমারী-

দিগের ন্যায় উহারা কেশের কিয়দংশ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখে, এবং অবশিষ্ট অংশ এক প্রকার গোলাকৃতি "চাপাটির" আকারে রচনা করিয়া তাহাই মস্তকের চূড়াদেশে ধারণ করে; তাহার কতকটা সম্মুখভাগে ও কতকটা পার্শ্বদেশে কপালের দিকে ঝুলিয়া পড়ে;—দেখিলে মনে হয়,—কোঁচ্‌কানো-কিনারা একপ্রকার টুপি যেন বেশ একটু ঢং করিয়া মাথায় পরিয়াছে। কিন্তু উহাদের কেশরচনায় যেরূপ বিলাস-লীলা প্রকাশ পায়, উহাদের দেহের সমস্ত সাজসজ্জায় তেম্‌নি আবার তাপসসুলভ একটা কঠোর গাম্ভীর্য্য দেদীপ্যমান।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার সত্যের আলোচনা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, নবপ্রসূত বালকের মনে জ্ঞান যখন সবে-মাত্র নূতন উন্মেষিত হয়, তখনকার সেই আদিমজ্ঞান কেবলমাত্র ঐশী শক্তিরই ব্যাপার, তা বই তাহাতে জ্ঞাতার নিজের কর্ত্তৃত্ব বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। জ্ঞান কি? না, "এটা এই" এইরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া; কিন্তু যাহাকে বলা হইতেছে "এটা", তাহার ন্যায় আর দশ-পাঁচটা যদি পূর্ব্বে কোনোসময়ে জ্ঞাতার জ্ঞানগোচর হইয়া না থাকে, তাহা হইলে "এটা" যে কি বস্তু, তাহা জ্ঞানে প্রতিভাত হইতে পারে না, কাজেই "এটা এই" এরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। নব-প্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানে যখন প্রথম আলোক উদ্ভাসিত হইল, তখন পূর্ব্বে কোনোসময়ে সেরূপ কোনো আলোক তাহার জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় নাই; তাহা যখন হয় নাই, তখন সেই নূতন আলোকের উদ্ভাসনকালে অভিনব জ্ঞাতা কেমন করিয়া বলিবে যে, "এটা আলোক" বা "এটা এই"। জ্ঞানের রূপই হ'চ্চে "এটা এই", তা বই শুদ্ধ কেবল "এটা" জ্ঞানশব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কাগজের যেমন দুই পিট—এ-পিট এবং ও পিট, জ্ঞানেরও তেমনি দুই পিট এটা এবং এই, অর্থাৎ বিশেষ্য এবং বিশেষণ। একপিঠিয়া কাগজও যেমন—একপিঠিয়া জ্ঞানও তেমনি, দুইই বন্ধ্যাপুত্র অর্থাৎ একান্ত-পক্ষেই অসম্ভব। কাজেই বলিতে হয় যে, নবপ্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানের "এটা"র ভিতরে অবশ্যই কোনো-না-কোনো-প্রকার "এটা এই" লুকানো রহিয়াছে। সে "এটা এই" যে ব্যাপারটা কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা আবশ্যক;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আদিম জ্ঞানা-লোক ফুটিয়া বাহির হইল। বিশেষ একটা ব্যাপার ফুটিয়া বাহির হইল। যখন বলি-তেছি "বিশেষ একটা ব্যাপার", তখন

তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, আদিম জ্ঞানালোক কোনো-না-কোনো-প্রকার বিশেষণদ্বারা বিশেষিত। কিন্তু একটা বিষয় আর-একটা বিষয় হইতেই বিশেষিত হইতে পারে; তা বই, একাকী একটা বিষয় বিশেষিত হইতে পারে না। আদিম জ্ঞানালোক তো এক, তাহার প্রতিযোগী আর-এক কে? আদিমজ্ঞান তো এ-পিট, তাহার প্রতিযোগী ও-পিট কে? ও পিট হ'চ্চে অজ্ঞান-অন্ধকার। আদিম জ্ঞানালোক অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে বিশেষিত। আদিম জ্ঞান অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত—অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুত্থিত। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত ছিল—এক্ষণে তাহাই ব্যক্ত হইল। এ নহে যে, পূর্ব্বে তাহা নাস্তি ছিল, এক্ষণে তাহা অস্তি হইল। শাল এবং তাল দুইই যেমন বৃক্ষ, ব্যক্ত-বস্তু এবং অব্যক্ত-বস্তু দুইই তেমনি বস্তু। তালগাছ দেখিয়া যখন আমরা বলি যে, "এটা বৃক্ষ", তখন সে কথার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বদৃষ্ট শালগাছও যেমন বৃক্ষ, দৃশ্যমান তালগাছটিও তেমনি বৃক্ষ। তবেই হইতেছে যে, দৃশ্যমান তালগাছকে বৃক্ষ বলিলে পূর্ব্বদৃষ্ট শালগাছকেও প্রকারান্তরে বৃক্ষ বলা হয়। তেমনি ব্যক্ত-বস্তুকে বস্তু বলিলে, পূর্ব্বে যখন তাহা অব্যক্ত ছিল, সেই অব্যক্ত-বস্তুকেও প্রকারান্তরে বস্তু বলা হয়। শালগাছও বৃক্ষ, তালগাছও বৃক্ষ। শাল এবং তাল দুয়ের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বৃক্ষপ্রত্যয়, আর, সেই উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি শাল এবং তাল দুয়েরই বিশেষণ। তেমনি "ব্যক্ত এই" এবং "অব্যক্ত এই" এ-দুয়ের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়, আর সেই বস্তুপ্রত্যয়ই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুয়েরই বিশেষণ। তালগাছের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবামাত্রই যেমন শাল-তালের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তেমনি আদিম প্রকাশের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবামাত্রই ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শাল-তালের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বৃক্ষপ্রত্যয়; ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়। আদিম জ্ঞানালোক পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে ব্যক্ত হইল; সুতরাং ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে একটা ঐক্যভূমি রহিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ নাই কখন্? না, অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হইল, তখন্। আদিমজ্ঞানে "ব্যক্ত ইতি" এই বিশেষ্যের সহিত ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ বস্তুপ্রত্যয় আপনা হইতেই আসিয়া জোটে। আর সেই বস্তুপ্রত্যয়ই আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ। বস্তু-প্রত্যয়ের রূপ কি, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই:—

প্রকাশ নূতন, কিন্তু বস্তু নূতন নহে—বস্তু পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান;—এইটি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়ের রূপ। আদিমজ্ঞানে যখন "এটা" বলিয়া প্রথম বিশেষ্য বা প্রথম লক্ষ্য-বস্তু উপস্থিত হয়, তখন "এটা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান" এই বিশেষণটিও সেই সঙ্গে উপস্থিত হয়, তবে কিনা—অতীব অপরিস্ফুট নিগূঢ়ভাবে।

বিগত প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে বলা

হইয়াছিল যে, নবপ্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানে জ্ঞাতার নিজের কোনো কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কেমন করিয়া? জ্ঞাতা নিজে এবং সেই সঙ্গে তাহার জ্ঞান যখন অব্যক্ত ছিল, তখন জ্ঞানকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত করিয়া তোলা কেমন করিয়া তাহার নিজের ইচ্ছায় বা নিজের শক্তিতে বা নিজের কর্ত্তৃত্বে সম্ভবসাধ্য হইবে? তা ছাড়া, আর-একটি কথা আছে, তাহা এই :—

বৃক্ষের বিশেষণ এক নহে—বৃক্ষের বিশেষণ অনেক; বৃক্ষ স্থাবর, সজীব, বৃক্ষ উদ্ভিদ্, বৃক্ষ নশ্বর—এইরূপ নানা বিশেষণ। নানা বিশেষণের যোগে এক বৃক্ষকে আমরা নানাভাবে দেখিতে পারি। বৃক্ষকে চাই আমরা স্থাবর বলিয়া অবধারণ করি, চাই সজীব বলিয়া অবধারণ করি, চাই উদ্ভিদ্ বলিয়া অবধারণ করি—সে আমাদের ইচ্ছা; সুতরাং তাহার উপরে আমাদের কর্ত্তৃত্ব চলে। পক্ষান্তরে, আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ একটিমাত্র—কি? না, অস্তিপ্রত্যয় বা বস্তুপ্রত্যয়। কাজেই আদিমজ্ঞানের লক্ষ্য বস্তুতে অভিনব জ্ঞাতা সেই অবিকল্পিত একই-ধাঁচা'র বিশেষণটি আরোপ করিতে অগত্যা বাধ্য। সুতরাং শেষোক্তস্থলে জ্ঞাতা এরূপ বলিতে পারে না যে, "উপস্থিত বিষয়টাকে—চাই আমি বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—চাই আমি আর-কিছু বলিয়া অবধারণ করি—সে আমার ইচ্ছা"। লক্ষ্য বিষয়টাকে বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেই হইবে। কেন না—লক্ষ্য বিষয়কে তুমি যে, বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেছ, করিতেছ তাহা ঐশী শক্তির বলে—তোমার নিজের ইচ্ছার বলে নহে।

আদিমজ্ঞান যখন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হইতে প্রকাশে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে অলক্ষিতভাবে বিকাশের মঞ্চে আরূঢ় হয়, তখন তাহার ভিতর হইতে নিজের কর্ত্তৃত্ববোধ ফুটিয়া বাহির হয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞাতার সেই যে নিজের কর্ত্তৃত্ব, তাহা ঐশী শক্তিরই প্রতিধ্বনি। বৃক্ষের পুষ্প যদি বলে যে, "আমি বৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আমার মধু আমারই মধু—তাহা বৃক্ষের নির্যাস নহে; আমার পাপ্‌ড়ি আমারই পাপ্‌ড়ি—তাহা বৃক্ষের পল্লব নহে; আমার গর্ভজাত ফল আমারই ফল- তাহা বৃক্ষের ফল নহে"; তবে পুষ্পটাকে বৃক্ষ হইতে উন্মূলিত করিয়া দুইদিন পরে তাহাকে যদি বলি যে, "তোমার পাপ্‌ড়ি কোথায়—তোমার মধু কোথায়—তোমা হইতে ফলোৎপত্তিরই বা সম্ভাবনা কি?" তবে পুষ্প বলিবে যে, "মড়া'র উপর খাঁড়ার ঘা দিও না"। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, পুষ্পের যে মধু তাহা বৃক্ষের নির্যাসেরই মূর্ত্তিভেদ, পুষ্পের যে পাপ্‌ড়ি তাহা বৃক্ষের পল্লবেরই মূর্ত্তিভেদ, পুষ্পের যে গর্ভপুষ্ট বীজ তাহা বৃক্ষবীজেরই মূর্ত্তিভেদ। তেমনি, মনুষ্যের জ্ঞানবিকাশের মধ্যে তাহার নিজের কর্ত্তৃত্বশক্তি যাহা-কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐশী শক্তিরই মূর্ত্তিভেদ। বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে যেমন করিয়া মনুষ্য ভূতরাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য এবং জীবরাজ্য মাড়াইয়া সর্ব্বসমভিব্যাহারে মানবরাজ্যে উপনীত হইয়াছে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি মনুষ্যের আত্মা প্রাণরাজ্য এবং মনোরাজ্য মাড়াইয়া প্রাণমন-সমভিব্যাহারে জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইয়াছে। দুই ঘটনাই

একই ঐশী শক্তির প্রভাবে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে—তাহার উপরে কোনো জীবেরই কোনো কর্ত্তৃত্ব চলে না। মনুষ্যের জ্ঞানের প্রকাশ এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্ব-শক্তির প্রকাশ এবং বিকাশ হয়, ইহা সকলেরই দেখা কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা চাই যে, পরমেশ্বরের মহতী শক্তি যাহা সর্ব্বজগতে কার্য্য করিতেছে, সেই ঐশী শক্তিই মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বশক্তির সারসর্ব্বস্ব। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, একদিকে আকাশ, প্রকাশ এবং বিকাশ, ও আর-একদিকে কারণ, করণ এবং উপকরণ, এই দুই ত্রিকের অন্ধিসন্ধি বিধিমতে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অতঃপর তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌকাডুবি।

৫৫

কমলা যখন গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিল, শীতের সূর্য্য তখন রশ্মিচ্ছটাহীন ম্লান পশ্চিমাকাশের প্রান্তে নামিয়াছেন। কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অস্তগামী সূর্য্যকে কি মনে করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং জোড়করপুটে গঙ্গায় জলগণ্ডূষ অঞ্জলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুরুজনদের উদ্দেশ করিয়া সেইখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিতেই আর একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনোদিন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে সে চাহে নাই—এম্‌নি তাহার দুর্ভাগ্য, যখন একদিন রাত্রে সে তাঁহার পাশে বসিয়াছিল, তখন তাঁহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে নাই—বাসরঘরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে দুই-চারিটা কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও সে যেন ঘোম্‌টার মধ্য দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া তেমন সুস্পষ্ট করিয়া শুনিতে পায় নাই। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার জন্য আজ এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই মনে আসিল না।

অনেক রাত্রে তাহার বিবাহের লগ্ন ছিল; নিতান্ত শ্রান্তশরীরে সে যে কখন্ কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও মনে নাই—সকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের প্রতিবেশীর বাড়ীর একটি বধূ তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছে—বিছানায় আর কেহই নাই। জীবনের এই শেষমুহূর্ত্তে জীবনেশ্বরকে একটিবার স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। তাঁহাকে ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া যে কেবল এই ক'টি কথা বলিবে, "নাথ, এবারকার এ-জন্মের মত তবে আমি

আসি”, তাহাও হইল না ;—সেদিকে একেবারে অন্ধকার—কোনো মূর্ত্তি নাই, কোনো বাক্য নাই, কোনো চিহ্ন নাই। যে লাল চেলীটির সঙ্গে তাঁহার চাদরের গ্রন্থি বাধা হইয়াছিল তারিণীচরণের প্রদত্ত সেই নিতান্ত অল্পদামের চেলীর মূল্য ত কমলা জানিত না—সে চেলীখানিও সে যত্ন করিয়া রাখে নাই!

জগতের মধ্যে তাহার সেই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচিত আত্মীয়তমের উদ্দেশে কমলা দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, “তুমি কোথায় আছ, আমি কিছুই জানি না, তোমার কাছে আমার শরীরমন—আমার জন্মজন্মান্তর উৎসর্গ করিতেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর!”—কমলা চোখ যখন খুলিল, সূর্য্যমণ্ডলের শেষ অগ্নিরেখা তখন দিগন্তের অন্তরালে ডুবিয়া গেছে। কমলা মনে মনে কহিল, “এই ত শেষ আলোক নির্ব্বাণ হইল, আমার স্বামীর মূর্ত্তি ইহজীবনে দেখিতে পাইলাম না!” রমেশ হেমনলিনীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, সেখানি কমলার আঁচলের প্রান্তে বাঁধা ছিল—সেই চিঠি খুলিয়া বালুতটে বসিয়া তাহার একটি অংশ গোধূলির আলোকে পড়িতে লাগিল। সেই অংশে তাহার স্বামীর পরিচয় ছিল,—বেশি কথা নয়, কেবল তাঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, আর তিনি যে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন ও এখন সেখানে তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায় না—এইটুকুমাত্র। চিঠির বাকি অংশ সে অনেক সন্ধান করিয়াও পায় নাই। “নলিনাক্ষ” এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল,—এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম ধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া দিল মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল, “এ ত শূন্যতা নয়, এ ত অন্ধকার নয়—আমি দেখিতেছি, সে যে আছে, সে আমারই আছে।” তখন কমলা প্রাণপণবলে বলিয়া উঠিল, “আমি যদি সতী হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনোই বাধা দিতে পারিবেন না। আমি যখন আছি, তখন তিনি কখনই যান নাই, তাঁহারই সেবা করিবার জন্য ভগবান্ আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।”

এই বলিয়া সে তাহার রুমালে বাঁধা চাবির গোছা সেইখানেই ফেলিল এবং হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, রমেশের দেওয়া একটা ব্রোচ্ তাহার কাপড়ে বেঁধানো আছে। সেটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পরে পশ্চিমে মুখ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল—কোথায় যাইবে, কি করিবে, তাহা তাহার মনে স্পষ্ট ছিল না—কেবল সে জানিয়াছিল, তাহাকে চলিতেই হইবে, এখানে তাহার একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার স্থান নাই।

শীতের দিনান্তের আলোকটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। অন্ধকারের মধ্যে শাদা বালুতট অস্পষ্টভাবে ধূ ধূ করিতে লাগিল, হঠাৎ এক জায়গায় কে যেন বিচিত্র রচনাবলীর মাঝখান হইতে সৃষ্টির খানিকটা চিত্রলেখা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকাররাত্রি তাহার সমস্ত নির্নিমেষ তারা লইয়া এই জনশূন্য নদীতীরের উপর অতি ধীরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

কমলা সম্মুখে গৃহহীন অনন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে জানিল, তাহাকে চলিতেই হইবে কোথাও পৌঁছিবে কি না, তাহা ভাবিবার সামর্থ্যও তাহার নাই।

বরাবর নদীর ধার দিয়া সে চলিবে, এই সে স্থির করিয়াছে—তাহা হইলে কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না এবং যদি বিপদ্ তাহাকে আক্রমণ করে, তবে মুহূর্ত্তের মধ্যেই মা গঙ্গা তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

আকাশে কুহেলিকার লেশমাত্র ছিল না। অনাবিল অন্ধকার নিদ্রাহীন জননীর সতর্কতার মত কমলাকে আবৃত করিয়া রাখিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিকে বাধা দিল না।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যবের ক্ষেতের প্রান্ত হইতে শৃগাল ডাকিয়া গেল। কমলা বহুদূর চলিতে চলিতে বালুর চর শেষ হইয়া মাটির ডাঙা আরম্ভ হইল। নদীর ধারেই একটা গ্রাম দেখা গেল। কমলা কম্পিত-বক্ষে গ্রামের কাছে আসিয়া দেখিল, গ্রামটি সুষুপ্ত। ভয়ে ভয়ে গ্রামটি পার হইয়া চলিতে চলিতে তাহার শরীরে আর শক্তি রহিল না। অবশেষে একজায়গায় এমন একটা ভাঙা-তটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে সম্মুখে আর কোনো পথ পাইল না। নিতান্ত অশক্ত হইয়া একটা বটগাছের তলায় শুইয়া পড়িল, শুইবামাত্রই কখন্ নিদ্রা আসিল, জানিতেও পারিল না।

প্রত্যুষেই চোখ মেলিয়া দেখিল, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোকে অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"তুমি কে গা? শীতের রাত্রে এই গাছের তলায় কে শুইয়া?"

কমলা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, তাহার অদূরে ঘাটে দুখানা বজ্‌রা বাঁধা রহিয়াছে—এই প্রৌঢ়াটি লোক উঠিবার পূর্ব্বেই স্নান সারিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

প্রৌঢ়া কহিলেন—"হাঁ গা, তোমাকে যে বাঙালির মত দেখিতেছি।"

কমলা কহিল—"আমি বাঙালি।"

প্রৌঢ়া। এখানে পড়িয়া আছ যে?

কমলা। আমি কাশীতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি। রাত অনেক হইল, ঘুম আসিল, এইখানেই শুইয়া পড়িলাম।

প্রৌঢ়া। ওমা সে কি কথা! হাঁটিয়া কাশী যাইতেছ? আচ্ছা চল, ঐ বজ্‌রায় চল, আমি স্নান সারিয়া আসিতেছি।

স্নানের পর এই স্ত্রীলোকটির সহিত কমলার পরিচয় হইল।

গাজিপুরে যে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া বিবাহ হইতেছিল, তাঁহারা ইঁহাদের আত্মীয়। এই প্রৌঢ়াটির নাম নবীনকালী এবং ইঁহার স্বামীর নাম মুকুন্দ-লাল দত্ত—কিছুকাল কাশীতেই বাস করিতে-ছেন। ইঁহারা আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, অথচ পাছে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিতে বা খাইতে হয়, এইজন্য বোটে করিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহ-বাড়ীর কর্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করাতে নবীন-কালী বলিয়াছিলেন, "জানই ত ভাই, কর্ত্তার

শরীর ভাল নয়। আর ছেলেবেলা হইতে উঁহাদের অভ্যাসই একরকম। বাড়ীতে গোরু রাখিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া সেই মাখনমারা ঘিয়ে উঁহার লুচি তৈরি হয়,—আবার সে গোরুকে যা'-তা' খাওয়াইলে চলিবে না”—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীনকালী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?”

কমলা কহিল, “আমার নাম অমলা।”

নবীনকালী। তোমার হাতে লোহা দেখিতেছি, স্বামী আছে বুঝি।

কমলা কহিল, “বিবাহের পরদিন হইতেই স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেছেন।”

নবীনকালী। ওমা, সে কি কথা! তোমার বয়স ত বড় বেশি বোধ হয় না।

তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “পনেরোর বেশি হইবে না।”

কমলা কহিল, “বয়স ঠিক জানি না, বোধ করি, পনেরোই হইবে।”

নবীনকালী। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে?

কমলা কহিল—“হাঁ।”

নবীনকালী কহিলেন, “তোমাদের বাড়ী কোথায়?”

কমলা। কখনো শ্বশুরবাড়ী যাই নাই, আমার বাপের বাড়ী বিশুখালি।

কমলার পিত্রালয় বিশুখালিতেই ছিল, তাহা সে জানিত।

নবীনকালী। তোমার বাপ-মা—

কমলা। আমার বাপ মা কেহই নাই!

নবীনকালী। হরি বল! তবে তুমি কি করিবে?

কমলা। কাশীতে যদি কোনো ভদ্র-গৃহস্থ আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া দু'বেলা দুটি খাইতে দেন, তবে আমি কাজ করিব। আমি বাঁধিতে পারি।

নবীনকালী বিনা-বেতনে পাচিকা ব্রাহ্মণী লাভ করিয়া মনে মনে ভারি খুসি হইলেন। কহিলেন, “আমাদের ত দরকার নাই বামুন-চাকর সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের আবার যে-সে বামুন হইবার জো নাই—কর্ত্তার খাবারের একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হইলে আর কি রক্ষা আছে। বামুনকে মাইনে দিতে হয় চোদ্দটাকা, তার উপরে ভাত-কাপড় আছে। তা হোক্‌, ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ, তা চল, আমাদের ওখানেই চল। কত লোক খাচ্চে-দাচ্চে, কত ফেলা-ছড়া যায়, আর, একজন বাড়িলে কেহ জানিতেও পারিবে না। আমাদের কাজও তেমন বেশি নয়। এখানে কেবল কর্ত্তা আর আমি আছি। মেয়েগুলির সব বিবাহ দিয়াছি; তা তাহারা বেশ বড়ঘরেই পড়িয়াছে। আমার একটিমাত্র ছেলে, সে হাকিম, এখন সেরাজগঞ্জে আছে, লাট-সাহেবের ওখান হইতে দুমাস-অন্তর তাহার নামে চিঠি আসে, আমি কর্ত্তাকে বলি, আমাদের নোটোর ত অভাব কিছুই নাই, কেন তাহার এই গেরো! এত-বড় হাকিমি সকলের ভাগ্যে জোটে না, তা জানি, কিন্তু বাছাকে তবু ত সেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হয়! কেন! দরকার কি! কর্ত্তা বলেন, ‘ওগো সেজন্য নয়, সেজন্য নয়! তুমি মেয়েমানুষ, বোঝ না! আমি কি রোজগারের জন্য নোটোকে চাকুরিতে দিয়াছি! আমার অভাব কিসের!

তবে কি না, হাতে একটা কাজ থাকা চাই, নহিলে অল্প বয়স, কি জানি কখন্ কি মতি হয়!'"

পালে বাতাসের জোর ছিল, কাশী পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিল না। সহরের ঠিক বাহিরেই অল্প-একটু বাগানওয়ালা একটি দোতলা বাড়ীতে সকলে গিয়া উঠিলেন।

সেখানে চোদ্দটাকা-বেতনের বামুনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না—একটা উড়ে-বামুন ছিল, অনতিকাল পরেই নবীনকালী তাহার উপরে একদিন হঠাৎ অত্যন্ত আগুন হইয়া উঠিয়া বিনা বেতনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দটাকা-বেতনের অতি দুর্লভ দ্বিতীয় একটি পাচক জুটিবার অবকাশে কমলাকেই সমস্ত রাঁধাবাড়ার ভার লইতে হইল।

নবীনকালী কমলাকে বারবার সতর্ক করিয়া কহিলেন, "দেখ বাছা, কাশী সহর ভাল জায়গা নয়। তোমার অল্প বয়স। বাড়ীর বাহিরে কখনো বাহির হইয়ো না। গঙ্গাস্নান-বিশ্বেশ্বরদর্শনে আমি যখন যাইব, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব।"

কমলা পাছে দৈবাৎ হাতছাড়া হইয়া যায়, নবীনকালী এজন্য তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিলেন। বাঙালী মেয়েদের সঙ্গেও তাহাকে বড়-একটা আলাপের অবসর দিতেন না। দিনের বেলা ত কাজের অভাব ছিল না, সন্ধ্যার পরে একবার কিছুক্ষণ নবীনকালী তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য, যে গহনাপত্র, যে সোনারূপার বাসন, যে মখমল্-কিংখাবের গৃহসজ্জা চোরের ভয়ে কাশীতে আনিতে পারেন নাই, তাহারই আলোচনা করিতেন। "কাঁসার থালায় খাওয়া ত কর্ত্তার কোনোকালে অভ্যাস নাই, তাই প্রথম-প্রথম এ লইয়া তিনি অনেক বকাবকি করিতেন। তিনি বলিতেন, 'না হয় দুচারখানা চুরি যায়, সেও ভাল, আবার গড়াইতে কতক্ষণ!' কিন্তু টাকা আছে বলিয়াই যে লোকসান করিতে হইবে, সে আমি কোনোমতে সহ্য করিতে পারি না। তার চেয়ে বরঞ্চ কিছুকাল কষ্ট করিয়া থাকাও ভাল! এই দেখ না, দেশে আমাদের মস্ত বাড়ী, সেখানে লোকলস্কর যতই থাক্ আসে-যায় না, তাই বলিয়া এখানে কি সাতগণ্ডা চাকর আনা চলে? কর্ত্তা বলেন, 'কাছাকাছি না হয় আরো একটা বাড়ী ভাড়া করা যাইবে।' আমি বলিলাম, 'না, সে আমি পারিব না কোথায় এখানে একটু আরাম করিব, না, কতকগুলো লোকজন-বাড়ীঘর লইয়া দিনরাত্রি ভাবনার অন্ত থাকিবে না।'" ইত্যাদি।

৫৬

নবীনকালীর আশ্রয়ে কমলার প্রাণটা যেন অল্পজল এঁধো-পুকুরের মাছের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? সেদিনকার রাত্রে গৃহহীন বাহিরের পৃথিবীকে সে জানিয়াছে; সেখানে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিতে আর তাহার সাহস হয় না। কিন্তু তাহার জীবনটা কি শেষকালে এই খাঁচাটার মধ্যে আসিয়াই চিরদিনের মত আট্‌কা পড়িয়া গেল? এইজন্য কি তাহার বাঁচিবার কোনো প্রয়োজন ছিল? প্রতিদিন রাত্রে যে প্রার্থনা করিয়া সে বিছানায় শোয়, প্রতিদিন প্রাতে যে

আশা করিয়া সে জাগিয়া উঠে, এখানে এমন করিয়া বদ্ধ হইয়া থাকিলে কি তাহা সিদ্ধ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে? কমলার এখন অল্পবয়স, এখনো কতদিন তাহাকে বাঁচিতে হইবে কে জানে,—কিন্তু তাহার অবশিষ্ট জীবনের প্রত্যেক দিনই যদি এম্‌নি করিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিতে থাকে, তবে আর কেন? কিন্তু মরিতেও কিছুতে প্রবৃত্তি হয় না—এতদিন সে যে এত দুঃখে বাঁচিয়া আসিয়াছে, তাহার সার্থক পরিণাম হইতে যদি সে বঞ্চিত হয়!

নবীনকালী যে কমলাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে রস ছিল না। দুই একদিন অসুখ বিসুখের সময় তিনি কমলাকে যত্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যত্ন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা বড় কঠিন। বরঞ্চ সে কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিত ভাল, কিন্তু যে সময়টা নবীনকালীর সঙ্গীত্বে তাহাকে যাপন করিতে হইত, সেইটেই তার পক্ষে সব চেয়ে দুঃসময়।

কর্ত্তা মুকুন্দলালবাবু প্রত্যহ সকালে শিথিল একখানি তেলধুতি পরিয়া রৌদ্রে রাস্তার ধারে এক মোড়া লইয়া বসিতেন এবং প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক ধরিয়া একজন হিন্দুস্থানী চাকর তেল মাখাইতে মাখাইতে তাঁহার স্থূল-কৃষ্ণ দেহকে নানাপ্রকারে সশব্দে দলন, মর্দ্দন, তাড়ন করিত;—সম্মুখে আর একটা মোড়ার উপর তাঁহার গড়গড়া থাকিত, তাহারই নলটা মুখে লাগাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ধূম আকর্ষণ করিতেন—এই বিরাট্ দৃশ্যটি একদিন রাস্তার লোকে দেখিতে পাইল না। সেদিন সকালবেলা নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, ও বামুনঠাকরুণ, আজ কর্ত্তার শরীর বড় ভাল নাই, আজ ভাত হইবে না, আজ রুটি। কিন্তু তাই বলিয়া একরাশ ঘি লইয়ো না! জানি ত তোমার রান্নার শ্রী, উহাতে এত ঘি কেমন করিয়া খরচ হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। এর চেয়ে সেই যে উড়ে বামুনটা ছিল ভাল—সে ঘি লইত বটে, কিন্তু রান্নায় ঘিয়ের স্বাদ একটু-আধটু পাওয়া যাইত।"

কমলা এ সমস্ত কথার কোনো জবাবই করিত না, যেন শুনিতে পায় নাই, এম্‌নিভাবে নিঃশব্দে সে কাজ করিয়া যাইত।

আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া কমলা চুপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল, সমস্ত পৃথিবী বিরস এবং জীবনটা দুঃসহ বোধ হইতেছিল, এমন-সময় গৃহিণীর ঘর হইতে একটা কথা তাহার কানে আসিয়া কমলাকে একেবারে চকিত করিয়া তুলিল। নবীনকালী তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "ওরে তুল্‌সি, যা ত, সহর হইতে নলিনাক্ষ-ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া আন্। বল্, কর্ত্তার শরীর বড় খারাপ।"

নলিনাক্ষ ডাক্তার! কমলার চোখের উপরে সমস্ত আকাশের আলো আহতবীণার স্বর্ণতন্ত্রীর মত কাঁপিতে লাগিল। সে তরকারি-কোটা ফেলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তুলসী নীচে নামিয়া আসিতেই কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছিস্ তুল্‌সি?" সে কহিল, "নলিনাক্ষ-ডাক্তারকে ডাকিতে যাইতেছি।"

কমলা কহিল—"সে আবার কোন্ ডাক্তার?"

তুলসী কহিল—"তিনি এখানকার একটি বড় ডাক্তার বটে।"

কমলা। তিনি থাকেন কোথায়?

তুলসী কহিল—"সহরেই থাকেন, এখান হইতে আধক্রোশটাক হইবে।"

আহারের সামগ্রী অল্পস্বল্প যাহা-কিছু বাঁচাইতে পারিত, কমলা তাহাই বাড়ীর চাকরবাকরদের ভাগ করিয়া দিত। এজন্য সে ভর্ৎসনা অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এ অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। বিশেষত গৃহিণীর কড়া আইন অনুসারে এ বাড়ীর লোকজনদের খাবার কষ্ট অত্যন্ত বেশি। তা ছাড়া কর্ত্তা-গৃহিণীর খাইতে বেলা হইত—ভৃত্যেরা তাহার পরে খাইতে পাইত। তাহারা যখন আসিয়া কমলাকে জানাইত, "বামুন-ঠাকরুণ, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে," তখন সে তাহাদিগকে কিছু-কিছু খাইতে না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারিত না। এম্নি করিয়া বাড়ীর চাকরবাকর দুইদিনেই কমলার একান্ত বশ মানিয়াছে।

উপর হইতে রব আসিল, "রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কিসের পরামর্শ চলিতেছে রে তুলসি! আমার বুঝি চোখ নাই মনে করিস্! সহরে যাইবার পথে একবার বুঝি রান্নাঘর না মাড়াইয়া গেলে চলে না। এম্নি করিয়াই জিনিষপত্রগুলো সরাইতে হয় বটে! বলি বামুনঠাকরুণ, রাস্তায় পড়িয়াছিলে, দয়া করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিলাম, এম্নি করিয়াই তাহার শোধ তুলিতে হয় বুঝি!"

সকলেই তাহার জিনিষপত্র চুরি করিতেছে, এই সন্দেহ নবীনকালীকে কিছুতেই ত্যাগ করে না। যখন প্রমাণের লেশমাত্রও না থাকে, তখনো তিনি আন্দাজে ভর্ৎসনা করিয়া লন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, অন্ধকারে ঢেলা মারিলেও অধিকাংশ ঢেলা ঠিক জায়গায় গিয়া পড়ে, আর তিনি যে সর্ব্বদা সতর্ক আছেন ও তাঁহাকে ফাঁকি দিবার জো নাই, ভৃত্যেরা ইহা বুঝিতে পারে।

আজ নবীনকালীর তীব্রবাক্য কমলার মনেও বাজিল না। সে আজ কেবল কলের মত কাজ করিতেছে, তাহার মনটা যে কোন্‌খানে উধাও হইয়া গেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

নীচে রান্নাঘরের দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন-সময় তুলসী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে একা আসিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"তুলসি, কই ডাক্তারবাবু আসিলেন না?"

তুলসী কহিল—"না, তিনি আসিলেন না।"

কমলা। কেন?

তুলসী। তাঁহার মার অসুখ করিয়াছে।

কমলা। মার অসুখ? ঘরে আর কি কেহ নাই?

তুলসী। না, তিনি ত বিবাহ করেন নাই।

কমলা। বিবাহ করেন নাই, তুই কেমন করিয়া জানিলি?

তুলসী। চাকরদের মুখে ত শুনি, তাঁহার স্ত্রী নাই।

কমলা। হয় ত তাঁহার স্ত্রী মারা গেছে।

তুলসী। তা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চাকর ব্রজ বলে, তিনি যখন রংপুরে

ডাক্তারি করিতেন, তখনো তাঁহার স্ত্রী ছিল না।

উপর হইতে ডাক পড়িল—"তুল্‌সি!"—কমলা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং তুলসী উপরে চলিয়া গেল।

নলিনাক্ষ- রংপুরে ডাক্তারি করিতেন—কমলার মনে আর ত কোনো সন্দেহ নাই। তুলসী নামিয়া আসিলে পুনর্ব্বার কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ্‌ তুল্‌সি, ডাক্তারবাবুর নামে আমার একটি আত্মীয় আছেন—বল্‌ দেখি, উনি ব্রাহ্মণ ত বটেন?

তুলসী। হাঁ, ব্রাহ্মণ, চাটুয্যে।

গৃহিণীর দৃষ্টিপাতের ভয়ে তুলসী বামুন-ঠাকরুণের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে সাহস করিল না—সে চলিয়া গেল।

কমলা নবীনকালীর নিকট গিয়া কহিল—"কাজকর্ম্ম সমস্ত সারিয়া আজ আমি একবার দশাশ্বমেধঘাটে স্নান করিয়া আসিব।"

নবীনকালী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। কর্ত্তার আজ অসুখ,—আজ কখন্‌ কি দরকার হয়, তাহা বলা যায় না—আজ তুমি গেলে চলিবে কেন?

কমলা কহিল—"আমার একটি আপনার লোক কাশীতে আছেন খবর পাইয়াছি, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইব।"

নবীনকালী। এ সব ভাল কথা নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, আমি এ সব বুঝি। খবর তোমাকে কে আনিয়া দিল? তুলসী বুঝি? ও ছোঁড়াটাকে আর রাখা নয়। শোন বলি বামুনঠাকরুণ, আমার কাছে যতদিন আছ, ঘাটে একলা স্নান করিতে যাওয়া, আত্মীয়ের সন্ধানে সহরে বাহির হওয়া, ও সমস্ত চলিবে না, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।

দরোয়ানের উপর হুকুম হইয়া গেল, তুলসীকে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন এ-বাড়া-মুখো হইতে না পারে।

গৃহিণীর শাসনে অন্যান্য চাকরেরা কমলার সংস্রব যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিল।

নলিনাক্ষসম্বন্ধে যতদিন কমলা নিশ্চিত ছিল না, ততদিন তাহার ধৈর্য্য ছিল; এখন তাহার পক্ষে ধৈর্য্যরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই নগরেই তাহার স্বামী রহিয়াছেন, অথচ সে একমুহূর্ত্তও যে অন্যের ঘরে আশ্রয় লইয়া থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। কাজকর্ম্মে তাহার পদে পদে ত্রুটি হইতে লাগিল।

নবীনকালী কহিলেন—"বলি বামুন-ঠাকরুণ, তোমার গতিক ত ভাল দেখি না। তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে? তুমি নিজে ত খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়াছ, আমাদিগকেও কি উপোস করাইয়া মারিবে? আজকাল তোমার রান্না যে আর মুখে দেবার জো নাই!"

কমলা কহিল—"আমি এখানে আর কাজ করিতে পারিতেছি না—আমার কোনোমতে মন টিকিতেছে না। আমাকে বিদায় দিন্‌!"

নবীনকালী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বটেই ত! কলিকালে কাহারো ভাল করিতে নাই! তোমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যে আমার এতকালের অমন

ভাল বামুনটাকে ছাড়াইয়া দিলাম, একবার খবরও লইলাম না—তুমি সত্যি বামুনের মেয়ে কি না। আজ উনি বলেন কিনা, আমাকে বিদায় দিন্! যদি পালাইবার চেষ্টা কর ত পুলিসে খবর দিব না! আমার ছেলে হাকিম—তার হুকুমে কত লোক ফাঁসি গেছে আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না। শুনেইছ ত—গদা কর্ত্তার মুখের উপরে জবাব দিতে গিয়াছিল, সে বেটা এম্‌নি জব্দ হইয়াছে, আজো সে জেল্ খাটিতেছে! আমাদের তুমি যেমন-তেমন পাও নাই!"

কথাটা মিথ্যা নহে—গদাচাকরকে ঘড়িচুরির অপবাদ দিয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে বটে।

কমলা কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহার চিরজীবনের সার্থকতা যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়, তখন সেই হাতে বাঁধনপড়ার মত এমন নিষ্ঠুর আর কি হইতে পারে! ব্যাকুল পাখী তাহার পিঞ্জরের শলাকাকে যেমন করিয়া আঘাত করিতে থাকে, কমলার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার শরীরকে যেন তেম্‌নি করিয়া আঘাত করিতে লাগিল। কমলা আপনার কাজের মধ্যে, ঘরের মধ্যে কিছুতেই আর ত বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার রাত্রের কাজ শেষ হইয়া গেলে পর সে শীতে একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িত। প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া যে পথ সহরের দিকে চলিয়া গেছে, সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার যে তরুণ হৃদয়খানি সেবার জন্ত ব্যাকুল, ভক্তি-নিবেদনের জন্ত ব্যগ্র, আত্মোৎসর্গের জন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে -সেই হৃদয়কে কমলা এই রজনীর নির্জ্জন পথ বাহিয়া নগরের মধ্যে কোন্ এক অপরিচিত গৃহের উদ্দেশে প্রেরণ করিত—তাহার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার শয়নকক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু এইটুকু সুখ, এইটুকু স্বাধীনতাও কমলার বেশিদিন রহিল না। রাত্রির সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গেলে একদিন কি কারণে নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেহারা আসিয়া খবর দিল, "বামুনঠাকরুণকে দেখিতে পাইলাম না!"

নবীনকালী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে কিরে, তবে পালাইল নাকি?"

নবীনকালী নিজে সেই রাত্রে আলো ধরিয়া ঘরে ঘরে খোঁজ করিয়া আসিলেন, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দবাবু অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে গুড়্‌গুড়ি টানিতেছিলেন—তাঁহাকে গিয়া কহিলেন—"ওগো শুন্‌চ, বামুনঠাকরুণ বোধ করি পালাইল।"

ইহাতেও মুকুন্দবাবুর শান্তিভঙ্গ করিল না—তিনি কেবল আলস্যজড়িতকণ্ঠে কহিলেন—"তখনি ত বারণ করিয়াছিলাম—জানাশোনা লোক নয়। কিছু সরাইয়াছে নাকি?"

গৃহিণী কহিলেন—"সেদিন তাহাকে যে শীতের কাপড়খানা পরিতে দিয়াছিলাম, সেটা ত ঘরে নাই, এ ছাড়া আর কি গিয়াছে, এখনো দেখি নাই!"

কর্ত্তা অবিচলিত গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"পুলিসে খবর দেওয়া যাক্!"

একজন চাকর লণ্ঠন লইয়া পথে বাহির হইল। ইতিমধ্যে কমলা তাহার ঘরে ফিরিয়া-আসিয়া দেখিল, নবীনকালী সে ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। কোনো জিনিষ চুরি গেছে কি না, তাহাই তিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-সময় কমলাকে হঠাৎ দেখিয়া নবীনকালী বলিয়া উঠিলেন "বলি, কি কাণ্ডটাই করিলে? কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?"

কমলা কহিল, "কাজ শেষ করিয়া আমি একটুখানি বাগানে বেড়াইতেছিলাম।"

নবীনকালীর মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া গেলেন। বাড়ীর সমস্ত চাকরবাকর দরজার কাছে আসিয়া জড় হইল।

কমলা কোনোদিন নবীনকালীর কোনো ভর্ৎসনায় তাঁহার সম্মুখে অশ্রুবর্ষণ করে নাই। আজও সে কাঠের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নবীনকালীর বাক্যবর্ষণ একটুখানি ক্ষান্ত হইবামাত্র কমলা কহিল,"আমার প্রতি আপনারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন—আমাকে বিদায় করিয়া দিন্।"

নবীনকালী। বিদায় ত করিবই। তোমার মত অকৃতজ্ঞকে চিরদিন ভাতকাপড় দিয়া পুষিব, এমন কথা মনেও করিয়ো না! কিন্তু কেমন লোকের হাতে পড়িয়াছ, সেটা আগে ভাল করিয়া জানাইয়া তবে বিদায় দিব।

ইহার পর হইতে কমলা বাহিরে যাইতে আর সাহস করিত না। সে ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনে মনে এই কথা বলিল—"যে লোক এত দুঃখ সহ্য করিতেছে, ভগবান্ নিশ্চয় তাহার একটা গতি করিয়া দিবেন।"

৫৭

মুকুন্দবাবু তাঁহার দুইটি চাকর সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ীতে প্রবেশের দরজায় ভিতর হইতে হুড়কা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

দ্বারের কাছে রব উঠিল—"মুকুন্দবাবু ঘরে আছেন কি?"

নবীনকালী চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ঐ গো, নলিনাক্ষ-ডাক্তার আসিয়াছেন। বুধিয়া! বুধিয়া!"

বুধিয়ানামধারিণীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন নবীনকালী কহিলেন—"বামুনঠাকরুণ, যাও ত, শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও গে। ডাক্তারবাবুকে বল, কর্ত্তা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, এখনি আসিবেন—একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।"

কমলা লণ্ঠন লইয়া নীচে নামিয়া গেল;—তাহার পা কাঁপিতেছে, তাহার বুকের ভিতর গুরগুর্ করিতেছে, তাহার করতল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। তাহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে এই বিষম ব্যাকুলতায় সে চোখে ভাল করিয়া দেখিতে না পায়।

কমলা ভিতর হইতে হুড়কা খুলিয়া-দিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইল।

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—"কর্ত্তা ঘরে আছেন কি?"

কমলা কোনোমতে কহিল—"না, আপনি আসুন।"

নলিনাক্ষ বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে বুধিয়া আসিয়া কহিল - "কর্ত্তাবাবু বেড়াইতে গেছেন, এখনি আসিবেন, আপনি একটু বসুন্।"

কমলার নিশ্বাস প্রবল হইয়া তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল। যেখান হইতে নলিনাক্ষকে স্পষ্ট দেখা যাইবে, অন্ধকার-বারান্দার এমন একটা জায়গা সে আশ্রয় করিল,—কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে সেইখানে বসিয়া পড়িতে হইল। তাহার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্যের সঙ্গে শীতের হাওয়া যোগ দিয়া তাহাকে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল।

নলিনাক্ষ কেরোসিন্-আলোর পাশে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষে বারবার জল আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া-ফেলিয়া সে তাহার একাগ্রদৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তরদেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ঐ যে উন্নতললাট স্তব্ধ মুখখানির উপরে দীপালোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ঐ মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারিদিকের আকাশের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল;—বিশ্বজগতের মধ্যে আর কিছুই রহিল না, কেবল ঐ আলোকিত মুখখানি রহিল—যাহার সম্মুখে রহিল, সেও ঐ মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কমলা সচেতন কি অচেতন ছিল, তাহা বলা যায় না—এমন-সময় হঠাৎ সে চকিত হইয়া দেখিল, নলিনাক্ষ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মুকুন্দবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে।

এখনি পাছে উঁহারা বারান্দায় বাহির হইয়া আসেন এবং কমলা ধরা পড়ে, এই ভয়ে কমলা বারান্দা ছাড়িয়া নীচে তাহার রান্না-ঘরে গিয়া বসিল। রান্নাঘরটি প্রাঙ্গণের এক ধারে—এবং এই প্রাঙ্গণটি বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথ।

কমলা সর্ব্বাঙ্গমনে পুলকিত হইয়া বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার মত হত-ভাগিনীর এমন স্বামী! দেবতার মত এমন সৌম্য-নির্ম্মল প্রসন্ন-সুন্দর মূর্ত্তি! ওগো ঠাকুর, আমার সকল দুঃখ সার্থক হইয়াছে!"

—বলিয়া বারবার করিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিল।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার পদশব্দ শোনা গেল। কমলা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে দ্বারের পাশে দাঁড়াইল। বুধিয়া আলো ধরিয়া আগে আগে চলিল, তাহার অনুসরণ করিয়া নলিনাক্ষ বাহির হইয়া গেল।

কমলা মনে মনে কহিল—"তোমার শ্রীচরণের সেবিকা হইয়া এইখানে পরের দ্বারে দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া আছি, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে, তবু জানিতেও পারিলে না।"

মুকুন্দবাবু অন্তঃপুরে আহার করিতে গেলে কমলা আস্তে আস্তে সেই বসিবার ঘরে গেল। যে চৌকিতে নলিনাক্ষ বসিয়া-ছিল, তাহার সম্মুখে ভূমিতে ললাট ঠেকাইয়া সেখানকার ধূলি চুম্বন করিল। সেবা

করিবার কোনো অবকাশ না পাইয়া অবরুদ্ধ ভক্তিতে কমলার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন কমলা সংবাদ পাইল, বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ডাক্তারবাবু কর্ত্তাকে সুদূর পশ্চিমে কাশীর চেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে উপদেশ করিয়াছেন। তাই আজ হইতে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

কমলা নবীনকালীকে গিয়া কহিল, "আমি ত কাশী ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

নবীনকালী। আমরা পারিব, আর তুমি পারিবে না! বড় ভক্তি দেখিতেছি।

কমলা। আপনি যাহাই বলুন, আমি এখানেই থাকিব।

নবীনকালী। আচ্ছা, তা কেমন থাক, দেখা যাইবে।

কমলা কহিল—"আমাকে দয়া করুন, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন না!"

নবীনকালী। তুমি ত বড় ভয়ানক লোক দেখিতেছি। ঠিক যাবার সময় বাহানা ধরিলে! আমরা এখন তাড়াতাড়ি লোক কোথায় খুঁজিয়া পাই! আমাদের কাজ চলিবে কি করিয়া!

কমলার অনুনয়-বিনয় সমস্ত ব্যর্থ হইল—কমলা তাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমশ।

পথে।

১

তখন তরুণী উষা—বাহিরিনু পথে,
ফোট' ফোট' করে আলো,
সরিছে আঁধার কালো,
পাখী ডেকে উঠে, নিশি যাপি' কোনমতে।
বাহিরিনু পথে!

২

আকাশে উথলি উঠে নব রবিচ্ছটা;
মেঘে মেঘে দীপ্ত হাসি—
জ্বলন্ত অনলরাশি!
দিবস খুলিয়া দেছে স্বর্ণময় জটা—
কি উজ্জ্বল ঘটা!

৩

বাড়িছে দিনের দাহ; আগে ভাগে পথ;
কোথা তরুছায়াতলে,
কোথা মরু-অগ্নি জ্বলে;
নাহি শেষ—নাহি সীমা, চলি অবিরত—
অফুরন্ত পথ!

৪

আমি ত একক নহি—আরো কতজন,
কেহ কাছে—কেহ আগে,
চলিয়াছে অনুরাগে!
নাহি জানে কোথা যাবে, কোথা নিকেতন—
নাহি নিরূপণ!

৫

বলিতে পার কি "পথ কোথা হ'বে শেষ ?"
টুটে আসে পায়ে বল,
তবু বলে "চল্ চল্";
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ—নাহি সহে ক্লেশ।
কোথা পথ-শেষ!

৬

কেহ পিছে প'ড়ে থাকে—কেবা তারে চায় ?
আগে-ভাগে পথ বাহি,
কে দাঁড়ায় পিছে চাহি ?
শুধু পথ চলিয়াছি না জানি কোথায় ?
বেলা বেড়ে যায়!

৭

এই পরিচয় পথে, দেখা নাহি আর!
শুকায় কণ্ঠের মালা,
থাকে কণ্টকের জ্বালা,
থাকে স্মৃতি- আর থাকে অনন্ত অপার
পথ দুর্নিবার!

৮

শিথিল খসিয়া পড়ে বাহুর বন্ধন!
কাছে-কাছে ছিল যেই,
দেখি আর কাছে নেই!
নিঃসঙ্গ চলিতে হ'বে পথে একায়ন—
মুদিয়া নয়ন!

৯

ক্রমে বেলা প'ড়ে আসে, পথ না ফুরায়!
শুধু পথ চলিয়াছি,
শুধু আগে চেয়ে আছি;
ছায়া করি' আসে সন্ধ্যা রবি ডুবে যায়;
চ'লেছি কোথায়!

১০

সম্মুখে প্রান্তর দীর্ঘ আসন্ন রজনী!
চির অনুত্তীর্ণ পথ,
প'ড়ে অজগরবৎ!
"আর কতদূর ?" হেথা সুধাই আপনি,
মনে ভয় গণি!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে হৃদয় বিস্ময় ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাঁহার রচিত বাঙলা গদ্য অসম্পূর্ণ ও অপ্রস্ফুট। উহার অন্বয়, ছন্দঃ, বিভক্তিবিধান, সর্ব্বনামপ্রয়োগ ও ক্রিয়াসংস্থান কতকটা উদ্ভট। বিশেষত বিরাম চিহ্নবিরহিত হওয়াতে রচনা নিতান্ত জটিল ও বিরক্তিকর এবং অর্থবোধ একান্ত দুরধিগম্য হইয়াছে। তথাপি সেই রচনার মত উন্নত ও সুন্দর সামগ্রী বঙ্গভাষায় আর কিছু বিরচিত হয় নাই। প্রত্যেকটি ছত্রে যে তীক্ষ্ণ ধী, যে অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তিবল দৃষ্ট হইবে, তাহা অনন্যসাধারণশক্তিসম্পন্ন। তিনি বেদান্তসূত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে নাই, ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুইতিন বাক্যের অন্বয় করিয়া হঠাৎ অর্থবোধ করিতে পারেন না।" সুতরাং এই গদ্যরচনার বোধসৌকর্য্যার্থে রামমোহন রায়কে একটা "অনুষ্ঠানপ্রকরণ" লিখিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে লিখিত হইয়াছে—"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষমত করিতে উচিত হয়। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ চেষ্টা করিবেন না।" এইরূপে বহু নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বঙ্গভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। স্বয়ং কাঠ কাটিয়া ও লাউ শুকাইয়া যে বীণা গঠন করিয়াছেন, তাহার বাহ্যরূপ কতকটা উদ্ভট হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে ব্রহ্মকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে দেবর্ষির বীণানিঃসৃত স্বরলহরীর আনন্দ ও পবিত্রতা পাওয়া যায়। উপায়ের তুচ্ছতা দূর করিয়া, উপায়কে নবভাবে সৃষ্ট ও বলসম্পন্ন করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অবস্থা তাঁহার অন্তরায় হয় নাই—শক্তিশালী মহাজনগণের পক্ষে কোনকালেই তাহা হয় না।

যে কয়েকখানি ক্ষুদ্রপুস্তকে তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষার কিরীটরত্ন। ঋষিগণের কথা লইয়া তিনি নিজে ঋষির ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাহা এই যুগে, বিশেষত বঙ্গদেশ হইতে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

তৎকৃত এক একটি ছত্র ব্যাখ্যা করিতে এক-একখানি পুস্তকরচনার প্রয়োজন; এত সংক্ষিপ্ত অথচ এরূপ পূর্ণ-অর্থব্যঞ্জক, এরূপ উন্নত অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক কিছু এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। যাঁহারা মনে করিবেন, রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিদেশীশিক্ষার প্রভাবান্বিত, তাঁহাদিগকে আমরা তাঁহার বাঙ্‌লা গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঋষিবাক্যের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তিনি ধীর ও প্রশান্ত ভাবে ঋষিবাক্যের সমর্থ করিয়াছেন, বৈদেশিক নানা ভাষায় প্রাজ্ঞ হইয়াও তিনি সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং আজীবন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি শ্লেষ, বিদ্রূপ, বিদ্বেষ ও মৎসরতার বান নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও শান্ত-সমাহিত সহিষ্ণুতা কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নাই। শিশুর চীৎকার ও আস্ফালনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতা যেরূপ তাহাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া অতি সন্তর্পণে সৎপথে আনিতে যত্ন করেন,—বিদ্বেষিগণের প্রতি তিনিও সেইরূপ ঐকান্তিকী করুণার সহিত অগ্রসর হইয়াছেন। কোলাহলের উত্তর দিতে যাইয়া নিজে কোলাহল করেন নাই, তাই তাঁহার প্রত্যুত্তরগুলিতে উন্নততর নৈতিকরাজ্যের ক্ষমা অক্ষরিত হইয়া রহিয়াছে।

যিনি নিজের সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কেনই বা নিজে উদ্‌ভ্রান্ত হইবেন? তাহা হইলে অসামান্য মনস্বিতা সত্ত্বেও পরের ভ্রমপ্রদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। যে যুগে গর্জ্জন, আস্ফালন, এমন কি, সময়ে সময়ে অল্পবিস্তর বাহুযুদ্ধ ভিন্ন কোন তর্কেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইত না, সেই যুগে রামমোহনের একি অসামান্য সৌম্যভাব! অতি তুচ্ছ কথা লইয়া বিরোধী লোকেরা তাঁহাকে গালি দিয়াছে, তিনি সেই সকল তুচ্ছ কথার এমন গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছেন যে, আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, তিনি সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন কেন? তাঁহার বেদান্তসূত্রের ভূমিকা হইতে পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি—"শুনিতে পাই যে, কোনো কোনো ব্যক্তি কহিয়া থাকেন, তোমরা ব্রহ্মোপাসক, তবে শাস্ত্রপ্রমাণে সকল বস্তুকে ব্রহ্মবোধ করিয়া পঙ্ক-চন্দন, শীত-উষ্ণ, চোর-সাধু, এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর—ইহার উত্তর বেদান্তসূত্রের ভাষাবিবরণের ২২ পৃষ্ঠায় লেখা গিয়াছে যে, বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিকজ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা যোগবাশিষ্ঠ-মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন যে গৃহস্থ, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিকজ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে বেশী পটু হইয়া কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।" আর এক স্থলে—"মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর সকল লোকের মত যাহা হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া দুইএক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে

করে, আর পূর্ব্বে কেহ কি পণ্ডিত ছিলেন না এবং অন্য কেহ কি সংসারে পণ্ডিত নাই যে, তাঁহারা এই এই মতকে জানিলেন না।” অপর কেহ হইলে এ সকল কথা উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু রামমোহন সহিষ্ণুতামর্য্যাদার সহিত ইহারও এই উত্তর দিয়াছেন, “এই সকল প্রশ্ন শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে, তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি, তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান, না হয়, হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন, তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায় এই হিন্দোস্থান অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন— এই হিন্দোস্থানেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণসম্প্রদা, নানকসম্প্রদা, দাদুসম্প্রদা এবং শিবনারায়ণীসম্প্রদা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তবে কিরূপে কহেন যে, তাবং পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়।” এই বিনয় ও সহিষ্ণুতা এবং লোকশিক্ষাকল্পে অতি দুর্ব্বল অভিযোগীকেও বুঝাইবার জন্য এরূপ আন্তরিক যত্ন, তাঁহার বিশ্বহিতেচ্ছা সপ্রমাণ করিতেছে। অথচ যে স্থানে তর্কনিপুণ শাস্ত্রনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের শ্লোক অজস্র উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, সে স্থানে রামমোহনের লেখনী হইতে লোকপাবনী গঙ্গাধারার ন্যায় শাস্ত্রের যে সুনির্ম্মল ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়ে স্বভাবতই সশ্রদ্ধ নমস্কারপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কোন অটল গিরিশিখর হইতে যেরূপ নির্ম্মল স্রোত শতমুখে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে, তাঁহার লোকহিতেচ্ছাপ্রণোদিত বিশুদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যায় হিন্দুসমাজ যেন সেইরূপ নবপ্রাণ লাভ করিয়াছিল।

আর একটি কথা এই, তাঁহার অসাধারণ যুক্তিবল সর্ব্বদাই শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিয়াছে। যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা কোন জাতিবিশেষের উন্নতিকল্পে গ্রন্থ লিখেন নাই,—বিশ্বহিতেচ্ছার প্রেরণায় অক্ষয় সত্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা কোন সময়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই—সর্ব্বকালে যে কথা বিকাইবে, যে সুধাময় বাক্য আতুর ও আর্ত্তের চিরকাল হৃৎস্বাস্থ্য পুনরানয়ন করিবে, সেই সকল সনাতন বাণী যাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই হিন্দুস্থানের কোন্ ব্যক্তি সাধু বলিয়া গণ্য হইবেন? রামমোহন অসীম শ্রদ্ধার সহিত জগদ্‌গুরু ঋষিগণের বাক্যের অনুশীলন করিয়াছেন। যে স্থানে তিনি ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাও প্রাচীনতর ও যোগ্যতর ঋষিবাক্যের বলে; যথা অঙ্গিরা, হারীত প্রভৃতির বাক্য তিনি মনুর বাক্যদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ বেদে আছে—

যৎকিঞ্চিৎ মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজম্—

এবং বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

এই মহোদয়ের অসামান্য পাণ্ডিত্য, বিনয় ও শাস্ত্রপ্রমাণ সহ ব্যাখ্যাত অকাট্যযুক্তির ‘মোহিনী’ বিদ্বেষীরাও দীর্ঘকাল

অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহমরণসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও প্রবন্ধাবলী পাঠ করুন। সহমরণ এক ভীষণ নির্ম্মম প্রথা। এজন্য সহমরণ অশাস্ত্রীয়, ইহাই প্রমাণ করিতে তিনি অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু যুক্তির প্রাধান্য প্রদশন করিয়া ঋষিরাজ্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে এই ঋষিশাসিত ভারতীয় সমাজে কে তাঁহার কথা শুনিতে দাঁড়াইত? যাঁহারা শত শত শ্লোক লইয়া প্রতিপক্ষতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র শ্লোকের দ্বারা পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। সহমরণ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও সন্দর্ভগুলি পর্য্যালোচনা করিলে আর একটি বিষয়ের প্রতি স্বতই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। রামমোহন, প্রতিপক্ষের যতপ্রকার যুক্তি, তাহার সমস্তগুলি তর্কস্থলে দাঁড় করাইয়া শাস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। সচরাচর এরূপ স্থলে দৃষ্ট হয় যে, কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা প্রতিপক্ষের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল যুক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে আড়ম্বরের সহিত সজোরে আঘাত করিয়া স্বমতস্থাপনের চেষ্টা পাই— অনেক সময়েই অপেক্ষাকৃত প্রবল যুক্তিগুলির পাশ কাটাইয়া যাই। কিন্তু রামমোহনের আলোচনায় পরিদৃষ্ট হয় যে, প্রতিপক্ষের সূক্ষ্মতম যুক্তিগুলিকেই তিনি বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন।—যতপ্রকারে তাঁহারা স্বমতসমর্থনের চেষ্টা পাইতে পারেন, ততপ্রকারেই তিনি তাঁহাদের যুক্তিগুলিকে ঝুঁটি ধরিয়া আলোর সম্মুখে আনিয়াছেন এবং যে শাস্ত্রভিত্তির উপর তাঁহারা দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছেন, শাস্ত্রের অনুশাসনদ্বারাই তাঁহাদিগকে সে আশ্রয়-বিচ্যুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে একদিকে তাঁহার প্রতিভার উদার ও নির্ভীক শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে তাঁহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর সাধুতা সপ্রমাণ করিতেছে।

যে অমৃতময়, তেজোময় পুরুষের শরণ লইয়া তিনি ভক্তিসহকারে বেদান্তের অনুশীলন করিয়াছেন, সেই নির্ব্বিকার পুরুষের পরম সৌম্যভাবের আভাস তাঁহার চরিত্রে পড়িয়াছিল, এইজন্য তিনি জগতের শিক্ষকরূপে পূজা পাইবার যোগ্য। তিনি ঋষিগণের যোগ্য বংশধর এবং প্রকৃতব্রাহ্মণরূপে সমাজের বরণীয়। সত্যকথা বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল, সত্য প্রমাণ করিবার যোগ্য পাণ্ডিত্য তাঁহার ছিল, সত্য হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার যোগ্য বিশ্ববিস্তার প্রীতি ও বিনয় তাঁহার ছিল। তিনি একুশটি ভাষা জানিতেন, ইহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার অসামান্য অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও উচ্ছ্বাস পূর্ণ অনুরাগের কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িতেন। কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজপণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"যদি প্লেটো বা সক্রেটিস্, মিল্টন্ বা নিউটন্ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া আমি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেছি।" এই অসামান্য লোকটিকে দেখিয়া ইংরেজপণ্ডিত জাতীয় স্পর্দ্ধা ও বৈষম্য, সকলই ভুলিয়া

আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিলাতে তিনি যে সকল তর্কে যোগদান করেন, তাহাতেও তাঁহার শান্ত সমাহিত ভাব, বুদ্ধির তীক্ষ্ণত্ব-স্থৈর্য্য সর্ব্বত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ Robert Owen সাহেব তর্কে পরাভূত হইয়া ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে মেরি কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন—"Robert Owen রাজাকে তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যবাদে দীক্ষিত-প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু রাজার যুক্তির অসামান্য প্রখরতা ও আমাদের ভাষায় তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার Robert Owenএর সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করিয়া দিল, Robert Owen পরাভূত হইয়া রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার ন্যায় ধীর ও শান্ত ব্যক্তির এরূপ অধীরতা আমি আর কখনও দেখি নাই, কিন্তু রাজা রামমোহন তাঁহার প্রতি কোন অশ্রদ্ধাযুক্ত কিংবা অধীর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।"

এই প্রশান্ত ও অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য কোথা হইতে আসিল? তাঁহার বিরুদ্ধে যত প্রকার বিদ্রূপ, তাচ্ছীল্য ও রূঢ়বাক্য প্রযুক্ত হইত, তাহা তাঁহার সাধুত্বের বর্ম্মে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত,—তীক্ষ্ণত্ব হারাইয়া ফেলিত, কিছুতেই তিনি বিচলিত হইতেন না। তিনি যে সমাজে গিয়াছেন, সেইখানে অপরাপর সকলে শিশুর মত হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার প্রবীণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও হিতসঙ্কল্প, সকলের নিকট হইতে নিজের প্রাপ্য মর্য্যাদা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যেন সবলে আদায় করিয়া লইয়াছে। যে দেশে কপিল, শঙ্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই দেশই যেন রামমোহনের জন্মিবার প্রকৃত স্থান বলিয়া মনে হয়।

এতদ্দেশীয়গণের সঙ্গে তর্কের সময় তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রোক্ত মতের দ্বারা স্বীয় যুক্তির পোষকতা করিতেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি সমুচিত সম্ভ্রমের অভাব দেখাইয়া যাঁহারা সহমরণপ্রথা সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করা ততটা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তাঁহার যুক্তিগুলি কেমন গম্ভীরভাবে ও অল্পকথায় ব্যক্ত হইত এবং নারীজাতির প্রতি তাঁহার কি অপূর্ব্ব ভক্তি ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত উত্তরপ্রত্যুত্তরে পাঠক বিদিত হইবেন -

"প্রতিদ্বন্দ্বী।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ যে, স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর শাস্ত্রানুসারে পুনরায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে না—এককালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশ হয়, অতএব এপ্রকার দুর্ভাগা যে বিধবা, তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে কালযাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট, সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা যাহাতে কুলত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে।

রামমোহন।—স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল

জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহাদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন—পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদপ্রাপ্তির যোগ্যা নহে—কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক। প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়—স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীনা হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন। বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাটরাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছে। বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন। দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন। কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন যে, তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই। তৃতীয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক, কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্রে দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেন। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর যে, কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোনরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষ স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে, আপনাদিগের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্য্যন্ত যে, কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়। চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহগণনাতেই ব্যক্ত আছে অর্থাৎ এক পুরুষের প্রায় দুই, তিন, দশ, বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্টে যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহার অনুষ্ঠান করে। পঞ্চম তাহার ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা। দেখ, কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশপনেরো বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাঁহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না

—অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহার সহিত দুইচারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানাদুঃখসহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্মনির্ব্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদিগের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়। বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ-অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন, যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদিপাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুরশাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ, সকলের রন্ধনপরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিতকালে করে। রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ সকলকে স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহ্য করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচারদোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে একদিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়। এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহ্য করে। আর যাহার স্বামী দুইতিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে। কখন এমন উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে এবং কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ হইলে চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে। অনেকে ধর্ম্মভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে যদি কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্যনিমিত্ত পুনরায় তাহাদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখনও বা ছলে প্রাণবধ করে। এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখের দুঃখিনী তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"

এই বিবরণটি পাঠ করিয়া স্বতই বলিতে ইচ্ছা হয়—"হে মাতৃরূপা রমণি, তুমি রামমোহনকে সার্থক পালন করিয়াছিলে, রামমোহন তোমার দুগ্ধধারার পবিত্র সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" উদ্ধৃত অংশটিতে কোন উচ্ছ্বাস

নাই, কিন্তু উহাতে দুঃখের যে জীবন্ত চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, কোন্ কাব্যের কোন্ অংশ তদপেক্ষা অধিক সকরুণ?

অনেকের বিশ্বাস, রামমোহন রায় হিন্দুদেবদেবীবিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক পাদ্রীদের মত এদেশের প্রতিমা-পূজাকে হেয় বলিয়া কখনই প্রচার করেন নাই। পৌরাণিক দেবদেবীগণ অল্পস্বত্ব সাধারণ লোকের ধর্ম্মধারণার সহায়তার জন্য কল্পিত এবং সমাজে তাঁহাদের প্রয়োজন ছিল, এ কথা তিনি পাদ্রীদের সঙ্গে বিচারের সময় পুনঃপুন ঘোষণা করিয়াছেন; চিহ্ন ও রূপ যে উদ্দেশ্যে কল্পিত, সেই উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইয়া তাহারাই উদ্দেশ্যস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং জাতীয়জীবনে ব্রহ্ম-বুদ্ধির পুনঃসঞ্চার করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পাদ্রীরা পৌত্তলিক বলিয়া যখন হিন্দুদিগকে গালি দিতেছিলেন, তখন তাহা তিনি সহ্য করেন নাই, পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম প্রতিপন্ন করিয়া দেবদেবীকল্পনার আবশ্যকতা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং যে খ্রীষ্টানেরা পবিত্রাত্মাকে কপোতরূপে কল্পনা ও যিশুকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহাদের হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিবার কোন অধিকার নাই, নির্ভীক-ভাবে এ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি কখনই স্বজাতির দ্রোহ আচরণ করিয়া বিদেশীর সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করেন নাই। প্রত্যুত রামপ্রসাদের ন্যায় ভক্ত, যাঁহারা সাকারবাদী হইয়া উচ্চ ধর্ম্ম-তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা তিনি সর্ব্বদা বিশিষ্ট শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষী নন্দলাল ঠাকুর তাঁহাকে রাম-কৃষ্ণ-মহাদেব-বিদ্বেষী বলিয়া কোন প্রতিবাদপুস্তকে উল্লেখ করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন—"হরি-হরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নামগ্রহণ হইয়াছে, তথায় 'ভগবান্'-শব্দ কিংবা 'পরমারাধ্য'শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের নামসকলকে দেখিতে পাইবেন।" এই কথা প্রমাণের জন্য তিনি স্বীয় বহুবিধ গ্রন্থের পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশপূর্ব্বক হরিহরের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ প্রতিপন্ন করিতেছেন। নন্দলাল ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—"রামমোহন এদেশীয় ব্রাহ্মণকে বেদবিহীন বলিয়া নিন্দা করেন।" এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করিয়া রামমোহন রায় লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার উচিত ছিল, কোন্ পুস্তকে কোন্ স্থানে লিখিয়াছি, তাহার ধ্বনি দিয়া লিখিতেন।" উক্ত ঠাকুর তাঁহার উপর বেদব্যাসকে মিথ্যাবাদী বলার অভিযোগ দেওয়ায় তিনি দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছিলেন "যে বেদব্যাসের নাম লইয়া উপনিষদের ভূমিকায় মঙ্গলাচরণ করি, যাঁহাকে এক স্থানে বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব বলিয়া লিখিয়াছি, যাঁহার সূত্রকে বেদ বলিয়া জানিয়াছি।" সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন অসম্মানসূচক উল্লেখ অসম্ভব। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিযোগের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাঁহার ধৃত বচনসকলের ও তাঁহার কৃত ব্যাখ্যাকে পুনঃপুনঃ গৌরবপূর্ব্বক লিখিয়াছি।"

সুতরাং ক্রাইষ্ট যেরূপ বলিয়াছিলেন,

রামমোহনও তেমনই বলিতে পারিতেন—"আমি ভাঙিতে আসি নাই, গড়িতে আসিয়াছি।"

বর্ত্তমান যুগের প্রথমাবস্থার সঙ্গে তাঁহার আরাধ্যচিত্র আমাদের মনে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। রামমোহনের ছবি যেমনই প্রতিভা-ব্যঞ্জক, তেমনই অসামান্যবীরত্বপূর্ণ। তীক্ষ্ণ সঙ্কল্পারূঢ় উজ্জ্বল চক্ষু, বাগ্মিতার পরিচায়ক স্থূল হনু, দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং ঋজু সুদীর্ঘমূর্ত্তিতে যেন কটি বাঁধিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার বহুস্তরে বিভক্ত শিথিল জামার আস্তরণ হইতে গম্বুবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত যেন সত্যপ্রতি-পাদনের জন্য উদ্যত হইয়া আছে, বিশাল পাগড়ীটি ঘনসংচ্ছন্ন বক্রকেশাস্তের উপান্তে কুটিলভাবে সন্ন্যস্ত। এই বীরবেশে ষোড়শবর্ষকাল কলিকাতামহানগরীর বক্ষে রামমোহন তর্কযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কোনদিন নাস্তিক বৌদ্ধকে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া ক্রমাগত তর্ক করিতেছেন, মিঃ আর্নট এতদবস্থায় তাঁহাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। মৌলভি গোলাম আব্বাস তাঁহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের এমনই গোঁড়া হইয়াছিলেন যে, তিনি আত্মীয়সভার উৎসবের সময় পাখোয়াজ বাজাইতেন। এদিকে Mr. Adamsএর ন্যায় কত পাদ্রী তাঁহার সঙ্গে তর্কপরাজয় স্বীকার করিয়া ইউনিটিরিয়ান্ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দেশের সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হিন্দুর দায়ভাগসম্বন্ধে তাঁহার শ্রম ও যত্ন বিস্ময়কর, সহমরণপ্রথা উঠাইয়া দিয়া তিনি হিন্দুসমাজের অনেকের শ্রদ্ধাপ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার চেষ্টা আমাদের চিরকৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিবে। সংস্কৃতশিক্ষার পরিবর্ত্তে ইংরাজিশিক্ষাপ্রবর্ত্তনের চেষ্টার জন্য তিনি তুল্যরূপই প্রসিদ্ধ। পাদ্রীদিগকে অকুণ্ঠিতভাবে প্রতিরোধ করিয়া এবং বিলাতে যাইয়া বেদান্তের মহিমা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদিগকে তিনি বুঝাইয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, তাঁহার ধর্ম্ম উন্নততর। কোনস্থানেই তিনি স্বীয় সম্মান ও স্বীয় ধর্ম্মকে লঘু করিয়া পরের পৃষ্ঠপোষকতার প্রার্থী হন নাই। তিনি বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যের একরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভাষার তিনি যে ক্ষুদ্র ব্যাকরণখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন, বঙ্গভাষার প্রতিভার তিনি তখন যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত অন্য কেহ সে পরিচয় পান নাই। সেই ব্যাকরণখানি আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলি সেই চেষ্টার বিকাশে যত্নপর হইলে ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের অশেষ উন্নতি হইত। তাহা না করিয়া আধুনিক ব্যাকরণগুলি উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছে। আর তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—হিন্দুর যে নির্ম্মল প্রাচীন ধর্ম্ম "খনির তিমিরগর্ভে হীরক যেমতি" সেইরূপ লুক্কায়িত ছিল, তিনি তাহাই পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হিন্দুর

চিরন্তন ও স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে তিনিই আমাদের প্রকৃত শিক্ষক, কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঋষিরা সাধুপুষ্পিত, সর্ব্বপ্রকার-বৈষম্য-বর্জ্জিত পুণ্য তপোবনে বসিয়া যে আনন্দ ও শান্তির অমরকাব্য বেদবেদান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেই আনন্দ ও শান্তির আধার-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিয়া তিনি সমাজে নবজীবনের উৎস সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন—প্রকৃত গুরুর ন্যায় তিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। আজ যাহা-কিছু দৈন্য, যাহা-কিছু দুঃখ, তাহা আমাদের নিজস্ব, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আশার যে একটি ক্ষীণ-কিরণ সঞ্চরিত হইয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতা প্রদান করিতেছে, তাহা রামমোহনের দিব্যপ্রতিভানিঃসৃত। তিনি প্রাচীন জীর্ণসমাজকে ধরিয়া-তুলিয়া চিরন্তন সত্যধর্ম্মের দিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছিলেন,—অদ্যাবধি সেই লক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ কলকোলাহল করিয়া ছুটিতে চাহিতেছে। শাহ আলম্ বাদশাহ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন,—যাঁহার ললাটে প্রকৃতি স্বহস্তে রাজটীকা আঁকিয়া দিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের প্রতি অর্পিত হইয়া লৌকিক উপাধিটি ধন্য হইয়া গিয়াছে। যিশুও 'King of Jews' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুগে যুগে শাসনের পরিবর্ত্তন, সম্রাটের অভ্যুদয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতবর্ষের যে কয়েক-জন চিরন্তন সম্রাট্ আছেন, রামমোহন তাঁহাদেরই পার্শ্বে দাঁড়াইবেন,—এ রাজ্য তাঁহাদেরই আছে—এবং চিরকাল তাঁহাদেরই হউক।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নৌকাডুবি।

৫৮

যেদিন সন্ধ্যার সময় নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ লইয়া হেমনলিনীর সঙ্গে অন্নদাবাবুর আলোচনা হইয়াছিল, সেইদিন রাত্রেই অন্নদা-বাবুর আবার সেই শূলবেদনা দেখা দিল।

রাত্রিটা কষ্টে কাটিয়া গেল। প্রাতঃ-কালে তাঁহার বেদনার উপশম হইলে তিনি তাঁহার বাড়ীর বাগানে রাস্তার নিকটে শীত-প্রভাতের তরুণ সূর্য্যালোকে সম্মুখে একটি টিপাই লইয়া বসিয়াছেন—হেমনলিনী সেই-খানেই তাঁহাকে চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গতরাত্রের কষ্টে অন্নদাবাবুর মুখ বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গেছে, তাঁহার চোখের নীচে কালী পড়িয়াছে, মনে হই-তেছে, যেন এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার বয়স অনেক বাড়িয়া গেছে।

যখনি অন্নদাবাবুর এই ক্লিষ্টমুখের প্রতি হেমনলিনীর চোখ পড়িতেছে, তখনি তাহার

বুকের মধ্যে যেন ছুরি বিঁধিতেছে। নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে হেমনলিনীর অসম্মতিতেই যে বৃদ্ধ ব্যথিত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই মনোবেদনাই যে তাঁহার পীড়ার অব্যবহিত কারণ, ইহা হেমনলিনীর পক্ষে একান্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; সে যে কি করিবে, কি করিলে বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে, তাহা বারবার করিয়া ভাবিয়া কোনোমতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

এমন-সময় হঠাৎ খুড়াকে লইয়া অক্ষয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অক্ষয় কহিল—"আপনি যাইবেন না, ইনি গাজিপুরের চক্রবর্ত্তিমহাশয়, ইঁহাকে পশ্চিম-অঞ্চলের সকলেই জানে—আপনাদের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ কথা আছে।"

সেই জায়গাটাতে বাঁধানো চাতালের মত ছিল—সেইখানে খুড়া আর অক্ষয় বসিলেন।

খুড়া কহিলেন, "শুনিলাম, রমেশবাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে—আমি তাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি তাঁহার স্ত্রীর খবর কি আপনারা কিছু পাইয়াছেন?"

অন্নদাবাবু ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন, "রমেশবাবুর স্ত্রী!"

হেমনলিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "মা, তোমরা আমাকে বোধ করি নিতান্ত সেকেলে অসভ্য মনে করিতেছ। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া সমস্ত কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি খামকা গায়ে পড়িয়া পরের কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে আসি নাই। রমেশবাবু পূজার সময় তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ষ্টীমারে করিয়া যখন পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই ষ্টীমারেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আপনারা ত জানেন, কমলাকে যে একবার দেখিয়াছে, সে তাহাকে কখনো পর বলিয়া মনে করিতে পারে না। আমার এই বুড়াবয়সে অনেক শোকতাপ পাইয়া হৃদয় কঠিন হইয়া গেছে, কিন্তু আমার সেই মা-লক্ষ্মীকে ত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। রমেশবাবু কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠিক করেন নাই—কিন্তু এই বুড়াকে দুইদিন দেখিয়াই মা কমলার এম্নি স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি রমেশবাবুকে গাজিপুরে আমার বাড়ীতেই উঠিতে রাজি করেন। সেখানে কমলা আমার মেজো মেয়ে শৈলর কাছে আপন বোনের চেয়ে যত্নে ছিল। কিন্তু কি যে হইল, কিছুই বলিতে পারি না—মা যে কেন আমাদের সকলকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভাবিয়া পাইলাম না। সেই অবধি শৈলর চোখের জল আর কিছুতেই শুকাইতেছে না।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন, "তাঁহার কি হইল, তিনি কোথায় গেলেন?"

খুড়া কহিলেন—"অক্ষয়বাবু, আপনি ত সকল কথা শুনিয়াছেন, আপনিই বলুন। বলিতে গেলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

অক্ষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিল। নিজে

কোনোপ্রকার টীকা করিল না, কিন্তু তাহার বর্ণনায় রমেশের চরিত্রটি রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল না।

অন্নদাবাবু বারবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা ত এ সমস্ত কথা কিছুই শুনি নাই। রমেশ যেদিন হইতে কলিকাতার বাহির হইয়াছেন, তাঁহার একখানি পত্রও পাই নাই।"

অক্ষয় সেই সঙ্গে যোগ দিল—"এমন কি, তিনি যে কমলাকে বিবাহ করিয়াছেন, এ কথাও আমরা নিশ্চয় জানিতাম না। আচ্ছা চক্রবর্ত্তিমহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কমলা রমেশের স্ত্রী ত বটেন? ভগ্নী বা আর কোনো আত্মীয়া ত নহেন?"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন "আপনি বলেন কি অক্ষয়বাবু? স্ত্রী নহেন ত কি? এমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে জোটে?"

অক্ষয় কহিল -"কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, স্ত্রী যত ভাল হয়, তাহার অনাদরও তত বেশি হইয়া থাকে। ভগবান্ ভাল লোকদিগকেই বোধ করি সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন!" —এই বলিয়া অক্ষয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

অন্নদা তাঁহার বিরল কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন—"বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা হইবার তা ত হইয়াই গেছে, এখন আর বৃথা শোক করিয়া ফল কি?"

অক্ষয় কহিল—"আমার মনে সন্দেহ হইল, যদি এমন হয়, কমলা আত্মহত্যা না করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন। তাই চক্রবর্ত্তিমহাশয়কে লইয়া কাশীতে একবার সন্ধান করিতে আসিলাম। বেশ বুঝা যাই তেছে, আপনারা কোনো খবরই পান নাই। যাহা হউক, দুচারদিন এখানে তল্লাস করিয়া দেখা যাক্!"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"রমেশ এখন কোথায় আছেন?"

খুড়া কহিলেন, "তিনি ত আমাদিগকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেছেন।"

অক্ষয় কহিল—"আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু লোকের মুখে শুনিলাম, তিনি কলিকাতাতেই গেছেন। বোধ করি আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিবেন। মানুষ ত আর অনন্তকাল শোক করিয়া কাটাইতে পারে না, বিশেষত তাঁহার অল্পবয়স। চক্রবর্ত্তিমহাশয়, চলুন, সহরে একবার ভাল করিয়া খোঁজ করিয়া দেখা যাক্।"

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয়, তুমি ত এইখানেই আসিতেছ?"

অক্ষয় কহিল—"ঠিক বলিতে পারি না। আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া আছে অন্নদাবাবু। যতদিন কাশীতে আছি, আমাকে এই খোঁজেই থাকিতে হইবে। বলেন কি, ভদ্রলোকের মেয়ে, যদিই তিনি মনের দুঃখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন, তবে আজ কি বিপদেই পড়িয়াছেন বলুন দেখি! রমেশবাবু দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি ত পারি না।"

খুড়াকে সঙ্গে লইয়া অক্ষয় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া একবার হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হেমনলিনী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া

বসিয়াছিল। সে জানিত, তাহার পিতা মনে মনে তাহার জন্ত আশঙ্কা অনুভব করিতেছেন।

হেমনলিনী কহিল—"বাবা, আজ একবার ডাক্তারকে দিয়া তোমার শরীরটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করাও। একটুতেই তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার করা উচিত।"

অন্নদাবাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। রমেশকে লইয়া এতবড় আলোচনাটার পর হেমনলিনী যে তাঁহার পীড়া লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিল, ইহাতে তাঁহার মনের মধ্য হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। অন্তসময় হইলে তিনি নিজের পীড়ার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন—আজ কহিলেন, "সে ত বেশ কথা। শরীরটা না হয় পরীক্ষা করানোই যাক্। তাহা হইলে আজ না হয় একবার নলিনাক্ষকে ডাকিতে পাঠাই। কি বল ?"

নলিনাক্ষসম্বন্ধে হেমনলিনী একটুখানি সঙ্কোচে পড়িয়া গেছে। পিতার সম্মুখে তাহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সহজভাবে মেলা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে, তবু সে বলিল, "সে-ই ভাল, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিই।"

অন্নদাবাবু হেমের অবিচলিত ভাব দেখিয়া ক্রমে সাহস পাইয়া কহিলেন—"হেম, রমেশের এই সমস্ত কাণ্ড—"

হেমনলিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "বাবা, রৌদ্রের ঝাঁজ বাড়িয়া উঠিয়াছে—চল, এখন ঘরে চল।"—বলিয়া তাঁহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে আরামকেদারায় বসাইয়া তাঁহার গায়ে বেশ করিয়া গরম কাপড় জড়াইয়া-দিয়া তাঁহার হাতে একখানি খবরের কাগজ দিল এবং চসমার খাপ হইতে চসমাটি বাহির করিয়া নিজে তাঁহার চোখে পরাইয়া-দিয়া কহিল—"কাগজ পড়, আমি আসিতেছি।"

অন্নদাবাবু সুবাধ্য বালকের মত হেমনলিনীর আদেশপালন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। হেমনলিনীর জন্ত তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একসময় কাগজ রাখিয়া হেমের খোঁজ করিতে গেলেন—দেখিলেন, সেই প্রাতে অসময়ে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছু না বলিয়া অন্নদাবাবু বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার একবার হেমনলিনীকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, তখনো তাহার দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তখন শ্রান্ত অন্নদাবাবু ধপ্ করিয়া তাঁহার চৌকিটার উপর বসিয়া-পড়িয়া মুহুর্মুহু মাথার চুলগুলাকে করসঞ্চালনদ্বারা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

নলিনাক্ষ আসিয়া অন্নদাবাবুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং যথাকর্ত্তব্য বলিয়া দিল এবং হেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্নদাবাবুর মনে কি বিশেষ কোনো উদ্বেগ আছে ?" হেম কহিল, "তা থাকিতে পারে।"

নলিনাক্ষ কহিল, "যদি সম্ভব হয়, উঁহার মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। আমার

মার সম্বন্ধেও ঐ এক মুস্কিলে পড়িয়াছি—তিনি একটুতেই এম্‌নি ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার শরীর সুস্থ রাখা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামান্ত কি-একটা চিন্তা লইয়া কাল বোধ হয় সমস্তরাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। আমি চেষ্টা করি যাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হন, কিন্তু সংসারে থাকিতে গেলে তাহা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না।”

হেমনলিনী কহিল, “আপনাকেও আজ তেমন ভাল দেখাইতেছে না।”

নলিনাক্ষ। না, আমি বেশ ভালই আছি। মন্দ থাকা আমার অভ্যাস নয়। তবে কাল বোধ হয় কিছু রাত জাগিতে হইয়াছিল বলিয়া আজ আমাকে তেমন তাজা দেখাইতেছে না।

হেমনলিনী। আপনার মাকে সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা যদি একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে থাকিত, তবে বোধ হয় ভাল হইত। আপনি একলা, আপনার কাজকর্ম্ম আছে, কি করিয়া আপনি উঁহার শুশ্রূষা করিয়া উঠিবেন?

এ কথাটা হেমনলিনী সহজভাবেই বলিয়াছিল, কথাটা সঙ্গত, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু বলার পরেই হঠাৎ তাহাকে লজ্জা আক্রমণ করিল, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল—তাহার সহসা মনে হইল, নলিনাক্ষবাবু যদি কিছু মনে করেন। অকস্মাৎ হেমনলিনীর এই লজ্জার আবির্ভাব দেখিয়া নলিনাক্ষও তাহার মা'র প্রস্তাবের কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি সারিয়া-লইয়া কহিল—“উঁহার কাছে একজন ঝি রাখিলে ভাল হয় না?”

নলিনাক্ষ কহিল, “অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, মা কিছুতেই রাজি হন না। তিনি শুদ্ধাচারসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বলিয়া মাহিনা-করা লোকের কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় না। তা ছাড়া, তাঁহার স্বভাব এমন যে, কেহ যে দায়ে পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না।”

ইহার পরে এসম্বন্ধে হেমনলিনীর আর কোনো কথা চলিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—“আপনার উপদেশমতে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক-একবার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোনো আশা নাই। আমার কি কোনোদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না—আমাকে কি কেবলি বাহিরের আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে?”

হেমনলিনীর এই কাতর আবেদনে নলিনাক্ষ একটু চিন্তিত হইয়া কহিল—“দেখুন, বিঘ্ন যদি না আসে, তবে আমরা জানিতেই পারি না, আমরা কতদূর অগ্রসর হইলাম। বিঘ্ন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্যই উপস্থিত হয়। আপনি হতাশ হইবেন না।”

হেমনলিনী কহিল, “কাল সকালে আপনি একবার আসিতে পারিবেন? আপনার সহায়তা পাইলে আমি অনেকটা বললাভ করি।”

নলিনাক্ষের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে যে একটি অবিচলিত শান্তির ভাব আছে, তাহাতে হেমনলিনী যেন একটা আশ্রয় পায়। নলিনাক্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু হেমনলিনীর মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনার স্পর্শ রাখিয়া গেল। সে তাহার শয়নগৃহের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া একবার শীতরৌদ্রালোকিত বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই রমণীয় মধ্যাহ্নে কর্ম্মের সহিত বিরাম, শক্তির সহিত শান্তি, উদ্যোগের সহিত বৈরাগ্য একসঙ্গে বিরাজ করিতেছিল, সেই বৃহৎ ভাবের ক্রোড়ে সে আপনার ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করিয়া দিল—তখন সূর্য্যালোক এবং উন্মুক্ত উজ্জ্বল নীলাম্বর তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে জগতের নিত্য-উচ্চারিত সুগভীর আশীর্ব্বচন প্রেরণ করিবার অবকাশ লাভ করিল।

হেমনলিনী ভাবিতে লাগিল, "এই আলোক ত প্রতিদিন আমার সম্মুখে উদিত হয়, এই জগৎ ত অহরহ আমাকে বেষ্টন করিয়া থাকে—কিন্তু যতক্ষণ না একটি মানুষ আসিয়া মাঝখানে দাঁড়ায়, ততক্ষণ কেন ইহাদের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয় না!"

তাহার পর নলিনাক্ষের মার কথা ভাবিতে লাগিল। কি চিন্তা লইয়া তিনি ব্যাপৃত আছেন, তিনি কেন যে রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেছেন না, তাহা হেমনলিনী বুঝিতে পারিল। নলিনাক্ষের সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাবের প্রথম আঘাত, প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়া গেছে। নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী বেদনা নাই—তা নাই থাকিল! ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষ যে কোনো স্ত্রীলোকের ভালবাসার অপেক্ষা রাখে, তাহা ত মনেই হয় না। তবু সেবার প্রয়োজন ত সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন—নলিনাক্ষকে কে দেখিবে! এ সংসারে নলিনাক্ষের জীবন ত অনাদরের সামগ্রী নহে—এমন লোকের সেবা ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।

আজ প্রভাতে হেমনলিনী রমেশের জীবন-ইতিবৃত্তের যে একাংশ শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্ম্মের মাঝখানে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে যে, এই নিদারুণ আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার সমস্ত মনের সমস্ত শক্তি আজ উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, রমেশের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। সে রমেশকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। পৃথিবীতে কত শতসহস্র লোক ভালমন্দ কত-কি কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, সংসারচক্র চলিতেছে—হেমনলিনী তাহার বিচারভার লয় নাই। রমেশের কথা হেমনলিনী মনেও আনিতে ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে আত্মঘাতিনী কমলার কথা কল্পনা করিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে—তাহার মনে হইতে থাকে, এই হতভাগিনীর আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কি কোনো সংস্রব আছে? তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত হইতে থাকে। সে জোড়হাত করিয়া বলে, "হে ঈশ্বর, আমি ত অপরাধ

করি নাই, তবে আমি কেন এমন করিয়া জড়িত হইলাম ? আমার এ বন্ধন মোচন কর, একেবারে ছিন্ন করিয়া দাও! আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে তোমার এই জগতে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দাও!"

রমেশ ও কমলার ঘটনা শুনিয়া হেমনলিনী কি মনে করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য অন্নদাবাবু উৎসুক হইয়া আছেন—অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া পাড়িতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। হেমনলিনী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছিল, সেখানে একএকবার গিয়া হেমনলিনীর চিন্তারত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের উপদেশমত অন্নদাবাবুকে ক্ষারকচূর্ণমিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইয়া হেমনলিনী তাঁহার কাছে বসিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "আলোটা চোখের সাম্‌নে হইতে সরাইয়া দাও।"

ঘর একটু অন্ধকার হইলে অন্নদাবাবু কহিলেন, "সকালবেলায় যে বৃদ্ধটি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বেশ সরল বোধ হইল।"

হেমনলিনী এই প্রসঙ্গ লইয়া কোনো কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু আর অধিক ভূমিকা বানাইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "রমেশের ব্যাপার শুনিয়া আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেছি—লোকে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে,—আমি আজ পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু আর ত—"

হেমনলিনী কাতরকণ্ঠে কহিল—"বাবা, ও সকল কথার আলোচনা থাক্।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"মা, আলোচনা করিতে ত ইচ্ছা করেই না। কিন্তু বিধির বিপাকে অকস্মাৎ একএকজন লোকের সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখ জড়িত হইয়া যায়, তখন তাহার কোনো আচরণকে আর উপেক্ষা করিবার জো থাকে না।"

হেমনলিনী সবেগে বলিয়া উঠিল—"না না—সুখদুঃখের গ্রন্থি অমন করিয়া যেখানে-সেখানে কেন জড়িত হইতে দিব! বাবা, আমি বেশ আছি—আমার জন্য তুমি বৃথা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, আমার বয়স হইয়াছে, এখন তোমার একটা স্থিতি না করিয়া ত আমার মন স্থির হইতে পারে না। তোমাকে এমন তপস্বিনীর মত কি আমি রাখিয়া যাইতে পারি ?"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখ মা, পৃথিবীতে একটা আশা চূর্ণ হইল বলিয়াই যে আর সমস্ত দুর্ম্মূল্য জিনিষকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। তোমার জীবন কিসে সুখী হইবে, সার্থক হইবে, আজ হয় ত মনের ক্ষোভে তাহা তুমি না জানিতেও পার —কিন্তু আমি নিয়ত তোমার মঙ্গলচিন্তা করি—আমি জানি তোমার কিসে সুখ, কিসে মঙ্গল, আমার প্রস্তাবটাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়ো না।"

হেমনলিনী দুই চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলিয়ো না, আমি তোমার কোনো কথাই উপেক্ষা করি না।

তুমি ত জান বাবা, জীবনে এমন একএকটা সময় আসে, যখন সহজ কথাও অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। আমাকে মনের সমস্ত চিন্তা একটু গুছাইয়া লইবার সময় দিবে না? তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয় তাহা পালন করিব, কেবল একবার অন্তঃকরণটা পরিষ্কার করিয়া একবার ভালরকম করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে চাই!"

অন্নদাবাবু সেই অন্ধকারে একবার হেমনলিনীর অশ্রুসিক্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। আর কোনো কথা কহিলেন না।

পরদিন সকালে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া বাহিরে গাছের তলায় চা খাইতে বসিয়াছেন, তখন অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু নীরব প্রশ্নের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অক্ষয় কহিল, "এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।" এই বলিয়া এক-পেয়ালা চা লইয়া সে সেখানে বসিয়া গেল।

আস্তে আস্তে কথা তুলিল—"রমেশবাবু ও কমলার জিনিষপত্র কিছু-কিছু চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের ওখানে রহিয়া গেছে, সেগুলি তিনি কোথায় কাহার কাছে পাঠাইবেন, তাই ভাবিতেছেন। রমেশবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের ঠিকানা বাহির করিয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন, তাই আপনাদের এখানে যদি—"

অন্নদাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া কহিলেন—"অক্ষয়, তোমার কাণ্ড-জ্ঞান কিছুমাত্র নাই! রমেশ আমার এখানেই বা কেন আসিবে, আর তাহার জিনিষ-পত্র আমিই বা কেন রাখিতে যাইব?"

অক্ষয় কহিল, "যা হোক্, অন্যায় করুন আর ভুল করুন্, রমেশবাবু এখন নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন, এ সময়ে কি তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের কর্ত্তব্য নয়? তাঁহাকে কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয়, তুমি কেবল আমাদের পীড়ন করিবার জন্য এই কথাটা লইয়া বারবার আন্দোলন করিতেছ। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, এ প্রসঙ্গ তুমি আমাদের কাছে কখনোই তুলিয়ো না!"

হেমনলিনী স্নিগ্ধস্বরে বলিল "বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার অসুখ করিবে— অক্ষয়বাবু যাহা বলিতে চান, বলুন্ না, তাহাতে দোষ কি।"

অক্ষয় কহিল—"না না, আমাকে মাপ করিবেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

৫৯

মুকুন্দবাবু সপরিজনে কাশী ত্যাগ করিয়া মিরাটে যাইবেন, স্থির হইয়া গেছে। জিনিষপত্র বাঁধা হইয়াছে, কাল প্রভাতেই ছাড়িতে হইবে। কমলা নিতান্ত আশা করিয়াছিল, ইতিমধ্যে এমন একটা-কিছু ঘটনা ঘটিবে, যাহাতে তাহাদের যাওয়া বন্ধ হইবে। ইহাও সে একান্তমনে আশা করিয়াছিল যে, নলিনাক্ষডাক্তার হয় ত আর দুইএকবার তাঁহার রোগীকে দেখিতে আসিবেন। কিন্তু দুয়ের কোনোটাই ঘটিল না।

পাছে বামুনঠাকরুণ যাত্রার উদ্যোগের গোলেমালে পালাইয়া যাইবার অবকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নবীনকালী তাহাকে কয়দিন সর্ব্বদাই কাছে-কাছে রাখিয়াছেন তাহাকে দিয়াই জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদার অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছেন।

কমলা একান্তমনে কামনা করিতে লাগিল, আজ রাত্রির মধ্যে তাহার এমন একটা কঠিন পীড়া হয় যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া নবীনকালীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা-ভার কোন্ ডাক্তারের উপর পড়িবে, তাহাও সে মনে মনে ভাবে নাই, এমন নহে। এই পীড়ায় যদি অবশেষে তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে আসন্ন মৃত্যুকালে সেই চিকিৎসকের পায়ের ধূলা লইয়া সে মরিতে পারিবে, ইহাও সে চোখ বুজিয়া কল্পনা করিতেছিল।

রাত্রে নবীনকালী কমলাকে আপনার ঘরে লইয়া শুইলেন। পরদিন ষ্টেশনে যাইবার সময় নিজের গাড়ির মধ্যে তুলিয়া লইলেন। কর্ত্তা মুকুন্দবাবু রেলগাড়িতে সেকেণ্ডক্লাসে উঠিলেন—নবীনকালী বামুন-ঠাকরুণকে লইয়া ইণ্টার্‌মীডিয়েটে স্ত্রীকক্ষে আশ্রয়লাভ করিলেন।

অবশেষে গাড়ি কাশীষ্টেশন্ ছাড়িল—মত্ত হস্তী যেমন করিয়া লতা ছিঁড়িয়া লয়, তেম্‌নি করিয়া রেলগাড়ি গর্জ্জন করিতে করিতে কমলাকে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। কমলা ক্ষুধিতচক্ষে জান্‌লা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নবীন-কালী কহিলেন, "বামুনঠাকরুণ, পানের ডিপেটা কোথায় রাখিলে?"

কমলা পানের ডিপেটা বাহির করিয়া দিল। ডিপে খুলিয়া নবীনকালী কহিলেন, "এই দেখ, যা ভাবিয়াছিলাম, তাই হইয়াছে! চূনের কোটোটা ফেলিয়া আসিয়াছ? এখন আমি করি কি! যেটি আমি নিজে না দেখিব, সেটিতে একটা-না-একটা গলদ্ হইয়া আছেই! এ কিন্তু বামুনঠাকরুণ তুমি সয়তানী করিয়া করিয়াছ! কেবল আমাকে জব্দ করিবার মৎলবে! ইচ্ছা করিয়া আমাদের হাড় জ্বালাইতেছ! আজ তরকারিতে নুন্ নাই, কাল পায়সে ধরা-গন্ধ—মনে করিতেছ, এ সমস্ত চালাকি আমরা বুঝি না! আচ্ছা, চল মিরাটে, তার পরে দেখা যাইবে তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে!"

গাড়ি যখন পুলের উপর দিয়া চলিল, কমলা জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া গঙ্গা-তীরবর্ত্তী কাশীসহরটা একবার দেখিয়া লইল—ঐ সহরের মধ্যে কোন্ দিকে যে নলিনাক্ষের বাড়ী, তাহা সে কিছুই জানে না। এইজন্য রেলগাড়ির দ্রুতধাবনের মধ্যে ঘাট, বাড়ী, মন্দিরচূড়া, যাহা-কিছু তাহার চক্ষে পড়িল, সমস্তই নলিনাক্ষের আবির্ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

নবীনকালী কহিলেন, "ওগো, অত করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছ কি! তুমি ত পাখী নও- তোমার ডানা নাই যে উড়িয়া যাইবে।"

কাশীনগরীর চিত্র কোথায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কমলা স্থির-নীরব হইয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে গাড়ি মোগলসরাইয়ে থামিল। কমলার কাছে ষ্টেশনের গোলমাল, লোক-জনের ভিড়, সমস্তই ছায়ার মত, স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে কলের পুতলার মত এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়িতে উঠিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া আসিতেছে, এমন-সময় কমলা হঠাৎ চমকিয়া-উঠিয়া শুনিতে পাইল, তাহাকে কে পরিচিতকণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে! কমলা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, উমেশ।

কমলার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কহিল, "কিরে উমেশ!"

উমেশ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে কমলা নামিয়া পড়িল। উমেশ তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কমলার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার সমস্ত মুখ আকর্ণপ্রসারিত হাসিতে ভরিয়া গেল।

পরক্ষণেই গার্ড্‌ কাম্‌রার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নবীনকালী চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন, "বামুনঠাকরুণ, করিতেছ কি! গাড়ি ছাড়িয়া দেয় যে! ওঠ, ওঠ!"

কমলার কানে সে কথা পৌঁছিলই না। গাড়িও বাঁশী ফুঁকিয়া-দিয়া গস্‌গস্‌শব্দে ষ্টেশন্‌ হইতে বাহির হইয়া গেল!

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস্‌?"

উমেশ কহিল, "গাজিপুর হইতে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"সেখানে সকলে ভাল আছেন ত? খুড়ামশায়ের কি খবর?"

উমেশ কহিল—"তিনি ভাল আছেন।"

কমলা। আমার দিদি কেমন আছেন?

উমেশ। মা, তিনি তোমার জন্য কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "উমি কেমন আছে রে? সে তার মাসীকে কি মাঝে মাঝে মনে করে?"

উমেশ কহিল, "তুমি তাহাকে যে একজোড়া গহনা দিয়া আসিয়াছিলে, সেইটে না পরা-হলে তাহাকে কোনোমতে দুধ খাওয়ানো যায় না। সেইটে পরিয়া সে দুই হাত ঘুরাইয়া বলিতে থাকে, 'মাসি গ-গ গেছে', আর তার মার চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল "তুই এখানে কি করিতে আসিলি?"

উমেশ কহিল, "আমার গাজিপুরে ভাল লাগিতেছিল না, তাই আমি চলিয়া আসিয়াছি।"

কমলা। যাবি কোথায়?

উমেশ কহিল, "মা, তোমার সঙ্গে যাইব।"

কমলা কহিল, "আমার কাছে একটি পয়সাও নাই।"

উমেশ কহিল—"আমার কাছে আছে।"

কমলা। তুই কোথায় পেলি?

উমেশ। সেই যে তুমি আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়াছিলে, সে ত আমার খরচ হয় নাই।

বলিয়া গাঁট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কমলা। তবে চল্‌ উমেশ, আমরা কাশী যাই, কি বলিস্‌? তুই ত টিকিট করিতে পারিবি?

উমেশ কহিল, "পারিব।"—বলিয়া তখনি টিকিট কিনিয়া আনিল। গাড়ি প্রস্তুত ছিল, গাড়িতে কমলাকে উঠাইয়া দিল—কহিল, "মা, আমি পাশের কাম্‌রাতেই রহিলাম।"

কাশীষ্টেশনে নামিয়া কমলা উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, এখন কোথায় যাই বল্ দেখি?"

উমেশ কহিল, "মা, তুমি কিছুই ভাবিয়ো না—আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় লইয়া যাইতেছি।"

কমলা। ঠিক জায়গা কিরে! তুই এখানকার কি জানিস্ বল্ দেখি?

উমেশ কহিল, "সব জানি। দেখ ত কোথায় লইয়া যাই।"

—বলিয়া কমলাকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলিয়া-দিয়া সে কোচ্‌বাক্সে চড়িয়া বসিল। একটা বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ি দাঁড়াইলে উমেশ কহিল—"মা, এইখানে নাম।"

কমলা গাড়ি হইতে নামিয়া উমেশের অনুসরণ করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই উমেশ ডাকিয়া উঠিল—"দাদামশায়, বাড়ী আছ ত?"

পাশের একটা ঘর হইতে সাড়া আসিল—"কে ও, উমেশ না কি! তুই কোথা থেকে এলি?"

পরক্ষণেই হুঁকাহাতে স্বয়ং চক্রবর্ত্তি-খুড়া আসিয়া উপস্থিত। উমেশ সমস্ত মুখ পরিপূর্ণ করিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল। বিস্মিত কমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্রবর্ত্তীকে প্রণাম করিল। খুড়ার খানিকক্ষণ মুখে আর কথা সরিল না;—তিনি কি যে বলিবেন, হুঁকাটা কোন্‌খানে রাখিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে কমলার চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত নতমুখ একটুখানি উঠাইয়া কহিলেন—"মা আমার ফিরে এল! চল চল, উপরে চল!"

"ও শৈল, শৈল! দেখে যা, কে এসেছে!"

শৈলজা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। শৈল তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে চাপিয়া-ধরিয়া তাহার ললাট-চুম্বন করিল। চোখের জলে দুই কপোল ভাসাইয়া-দিয়া কহিল, "মা গো মা! আমাদের এমন করিয়াও কাঁদাইয়া যাইতে হয়!"

খুড়া কহিলেন—"ও সব কথা থাক্ শৈল, এখন উঁহার নাওয়া-খাওয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দাও!"

এমন-সময় উমা 'মাসি মাসি' করিয়া দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া-লইয়া বুকে চাপিয়া-ধরিয়া চুমা খাইয়া-খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

শৈলজা কমলার রুক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্র দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে টানিয়া লইয়া-গিয়া যত্ন করিয়া স্নান করাইল—নিজের ভাল কাপড় একখানি বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। কহিল, "কাল রাত্রে বুঝি ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই! চোখ বসিয়া গেছে যে! ততক্ষণ তুই বিছানায় একটু গড়াইয়া নে! আমি রান্না সারিয়া আসিতেছি!"

কমলা কহিল—"না দিদি, তোমার সঙ্গে, চল, আমিও রান্নাঘরে যাই।"

দুই সখীতে একত্রে রাঁধিতে গেল।

চক্রবর্ত্তিখুড়া অক্ষয়ের পরামর্শে যখন কাশীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, শৈলজা ধরিয়া পড়িল—"বাবা, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাশী যাইব।"

খুড়া কহিলেন—"বিপিনের ত এখন ছুটি নাই।"

শৈল কহিল—"তা হোক্, আমি একলাই যাইব। মা আছেন, উঁহার অসুবিধা হইবে না।"

স্বামীর সহিত এরূপ বিচ্ছেদের প্রস্তাব শৈল পূর্ব্বে কোনোদিন করে নাই।

খুড়াকে রাজি হইতে হইল। গাজিপুর হইতে যাত্রা করিলেন। কাশীষ্টেশনে নামিয়া দেখেন, উমেশও গাড়ি হইতে নামিতেছে। —"আরে, তুই এলি কেন রে!" সকলে যে কারণে আসিয়াছেন, তাহারো সেই একই কারণ। কিন্তু উমেশ আজকাল খুড়ার গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে—সে এরূপ অকস্মাৎ চলিয়া আসিলে গৃহিণী অত্যন্ত রাগ করিবেন জানিয়া সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া উমেশকে গাজিপুরে ফিরাইয়া পাঠান। তাহার পরে কি ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সে গাজিপুরে কোনোমতেই টিকিতে পারিল না। গৃহিণী তাহাকে বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বাজারের পয়সা লইয়া সে একেবারে গঙ্গা পার হইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। চক্রবর্ত্তিগৃহিণী সেদিন এই ছোকরাটির জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রমশ।

রামায়ণের রচনাকাল।

ভাষাবিচার।

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবৎ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিৎ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥"

মানবসমাজে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহা প্রধানত দ্বিবিধ;—নীরব ও সরব। ইঙ্গিত, চিত্র ও লিপি ভাবপ্রকাশের নীরব উপায়। সরব উপায়ের সাধারণ নাম ধ্বনি। তাহা ব্যক্তাব্যক্তভেদে দ্বিবিধ। তাহাই সাধারণত ভাষানামে পরিচিত। প্রয়োগভেদে ভাষা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—সাহিত্যের ভাষা এবং কথোপকথনের ভাষা।

কথোপকথনের ভাষাই প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহার তুলনায় সাহিত্যের ভাষা

অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উভয় ভাষার উৎপত্তি-স্থান এক হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের অভাব নাই। সাহিত্যের ভাষা সুসংযত; কথোপকথনের ভাষা অসংযত। সাহিত্যের ভাষায় পরিবর্ত্তনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প; কথোপকথনের ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সাহিত্যের ভাষা দেশকালপাত্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহুদেশে বহুলোকের মধ্যে একভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু কথোপকথনের ভাষা তাহার পূর্ব্বেই দেশকালপাত্রভেদে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের ভাষা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; পুরাতন কথোপকথনের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!

ভাষা প্রথমে সংস্কারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় কোনরূপ সাংসারিক কথোপকথনের প্রয়োজন সাধন করিত। সে ঠিক কতদিনের কথা, মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সংস্কার সাধিত হইয়া, সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া, মানবভাষা ক্রমশ উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়াছে। মানব-সমাজের সর্ব্বপুরাতন সাহিত্য ভারতবর্ষের সংস্কৃতসাহিত্য। তাহা কত পুরাতন, সভ্য-সমাজের সুধীগণ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য লালায়িত। তথাপি এ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই ঐতিহাসিক তথ্যরূপে স্বীকৃত হইবার উপযুক্ত হয় নাই। এখনও তাহার অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

সংস্কৃতভাষা কত পুরাতন, কে তাহার কালনির্ণয় করিবে? সেকালের কোন লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। কতকালে ভাষা ধীরে ধীরে সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই বা কে বলিবে? তাহারও কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বহু ব্যাকরণ প্রচলিত ও বিলুপ্ত হইবার পর, যে পাণিনীয় ব্যাকরণ অবশেষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা যে কত পুরাতন, তাহারও মীমাংসা করিবার উপায় নাই।

যে ভাষা মানবজাতির সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্যরচনার পরিচয় প্রদান করিয়া, সভ্য-সমাজে ভারতবর্ষের নাম চিরগৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহা কি কেবল সাহিত্যের ভাষা? তাহা কি কখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত না?, এইপ্রকার মীমাংসা করিবার জন্য কৌতূহল প্রবল হইলেও, ইহার মীমাংসা করা সহজ বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাণিনির সময়ে কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহারই কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাণিনিসূত্রে যে সকল শব্দের অনুশাসন সাধিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনি ধ্বনি-মাত্রকেই "শব্দ"-শব্দের অন্তর্গত করেন নাই। ভাষ্যকার তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য ধ্বনিকে "শব্দ" ও "অপশব্দ" নামক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। অপশব্দ অশিষ্য; তাহার জন্য পাণিনিসূত্র রচিত হয় নাই। শব্দানুশাসনের জন্যই পাণিনিসূত্র রচিত হইয়াছিল। সুতরাং "শব্দ"-শব্দের অর্থ,—সংস্কৃত বা সাধু শব্দ।

অপশব্দ ব্যাকরণ হইতে নির্ব্বাসিত

হইলেও, জনসমাজের কথোপকথন হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারে নাই। বরং শব্দ অপেক্ষা অপশব্দের সং াই যে অধিক ছিল, ভাষ্যকার তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* লোকে কথোপকথনে অ শব্দের ব্যবহার করিত; তথাপি তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা ছিল। প্রধান চেষ্টা অপশব্দ-ব্যবহারের নিন্দা। তাহা ম্লেচ্ছাচার বলিয়া নিন্দিত।

একালের সভ্য ও অসভ্য শব্দের ন্যায় সেকালের আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ লোকসমাজের ... ধ অবস্থার পরিচয় প্রদান করিত। আর্য্য-অনার্য্যের প্রভেদ অদ্যাপি পৃথিবী হইতে দূরীকৃত হয় নাই। এখনও সভ্য-সমাজ অসভ্যনাম গ্রহণ করিতে অসম্মত। সেকালের আর্য্যগণ আর্য্যত্বরক্ষার্থ ইহা অপেক্ষাও লালায়িত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে নানা বিষয়ে অনার্য্যের সহিত পার্থক্যরক্ষার্থ যত্ন করিতে হইত।

প্রধান পার্থক্য ভাষায়। কে শিক্ষিত সুসভ্য, কে অশিক্ষিত অসভ্য, কথোপকথনেই তাহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আর্য্যগণ যে কথোপকথনেও পার্থক্যরক্ষার্থ যত্নশীল ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। পাণিনিসূত্র এই অনুমানের পক্ষসমর্থন করে।

পাণিনি সমগ্র সংস্কৃতশব্দকে "ছন্দস্" ও ... ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া ... ছন্দস্" যে সাহিত্যের ভাষা, ... নহে; তাহা বুঝিতে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় না। পাণিনি যাহাকে "ভাষা" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও কি কেবল সাহিত্যের ভাষা? পাণিনি ভাষা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। উত্তরকালের জনৈক টীকাকার তাহাকে লোকসমাজের "কথোপকথনের ভাষা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।† এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হইলে, পাণিনির সময়ে কথোপকথ আর্য্যসমাজে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত থাকা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু উত্তরকালের টীকাকারের ব্যাখ্যা ধরিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত সকলে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিবেন অন্য প্রমাণের আবশ্যক। কারণ, অনে বলিয়া থাকেন,—"সংস্কৃতভাষার গ প্রণালীই এরূপ সিদ্ধান্তের প্রধান অন্তর সমুচিত শিক্ষা ভিন্ন যে ভাষা অধিগত হয় সে ভাষায় কথোপকথন সম্পাদন করা স নহে।" এ বিষয়ে একালের অভিজ্ঞ লইয়া বিচার করিলে চলিবে না। আমর একালের লোক; ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া বহুক্লেশে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করি। আমাদের পক্ষে সে ভাষায় কথোপকথন সম্পাদন করা সহজ হয় না। কিন্তু সংস্কৃতভাষাই যখন আর্য্যসমাজের চিরপরিচিত ভাষা ছিল, তখন আর্য্যসমাজের পক্ষে সে ভাষা শিক্ষা করা বা তাহাতে কথোপকথন সম্পাদন করা এরূপ কঠিন ছিল না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পক্ষে সংস্কৃতে কথোপকথন ও শাস্ত্রা... করিবার প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম... প্রচলিত ছিল। এদেশে যখনই পুন

* সোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ।

† ...তে লোকোঽনয়া পরিপাট্যা ইতি স্বস্তিধরাচার্য্যঃ॥

আর্য্যগৌরবসংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, তখনই সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ"নামক অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।* বিক্রমাদিত্যের সময়ে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষাই ব্যবহৃত হইত। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃতে থোপকথন করিতেন, এই কথা ব্যক্ত করিার জন্য বলা হইয়াছে—"কে না সংস্কৃতে কথোপকথন করিত?" ইহা অতিশয়োক্তি হও, কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহার ই যে মুখ্যকল্প হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা র পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

অন্যদেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের হাসের নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। তীয় পুরাতত্ত্বানুশীলনের সময়ে সেই ক্য স্মরণ রাখা আবশ্যক। অন্যদেশের তহাস ক্রমোন্নতির ইতিহাস; ভারতবর্ষে কয়ৎকাল পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবার পর, অবনতির সূত্রপাত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি পুরাকাল হইতেই তাহার আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা ভারতবর্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া, জ্ঞানগৌরবের সমুচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তখন আর্য্যমাত্রেই সুশিক্ষায় সমুন্নত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইতে চাহিতেন না, প্রাণপণে আর্য্যারক্ষা করিতেন; কথোপকথনেও অনার সহিত পার্থক্যরক্ষার্থ যত্নশীল হইতেন। কালে তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবার চেষ্টা করা বিচিত্র নহে; তাহাই বরং স্বাভাবিক। শাস্ত্রেও তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।†

সেকালের ভারতবর্ষের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের আচারব্যবহারের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞানানুশীলনই ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। তজ্জন্য শাস্ত্র বলিতেন -

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।"

ব্রাহ্মণকে বিনা কারণেই ষড়ঙ্গ বেদ ... য়ন করিতে ও ধর্ম্ম জানিতে হইবে। এই শাস্ত্রশাসনের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণকে তাঁহার পদমর্য্যাদারক্ষার্থই সুশিক্ষিত হইতে হইবে। একদা এই শাস্ত্রশাসন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণসমাজে শিক্ষার প্রভাব এরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, বহুশতাব্দীর অধঃপতনের পরেও, অদ্যাপি নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সেকালে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ শশবিষাণের ন্যায় অপরিচিত ছিল।

ব্রাহ্মণকে যে মহোচ্চপদবী প্রদান করিয়া পুরাতন ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে লজ্জিত হয় নাই, ব্রাহ্মণের পক্ষে সে পদমর্য্যাদা রক্ষা করা সহজ হয় নাই,—তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মানবজীবনে ভূদেবরূপে জনসমাজে বিচরণ করিতে হইত।

অধঃপতন সংঘটিত হইয়া গতিরোধের জন্য শাস্ত্র নানা চে

* কালে শ্রীসাহসাঙ্কস্য কে ন সংস্কৃতবাদিনঃ।

† ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ।

শাজাহানের শেষ দিন।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র হইতে।

ছিলেন। উত্তরকালের ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সংস্কৃত-ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া বোধ হয় না; অভ্যাসদোষে যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও অপশব্দ ব্যবহার করিয়া বসিতেন। তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল।* ব্রাহ্মণকে তাঁহার পবিত্র পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য উত্তরকালের মনীষিগণ নানারূপে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের আরম্ভেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ভারতবর্ষের আর্য্য-সমাজ বিনা প্ররোচনায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিত, সেই ভারতবর্ষে বসিয়া পতঞ্জলি ব্যাকরণ-অধ্যয়নের প্রয়োজনসংস্থাপনার্থ গ্রন্থারম্ভেই দীর্ঘবক্তৃতার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন! ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিব কেন? এই প্রশ্নের অবতারণাই অধঃপতনের সূচনা করিতেছে! পতঞ্জলি প্রাণপণে ব্যাকরণ অধ্যয়নের বিবিধ-প্রয়োজন-সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি তর্ক এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাহা তর্ক নহে; তাহার নাম উত্তেজনা। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আর কোন কারণে না হউক, আমরা ম্লেচ্ছ না হইয়া পড়ি, এইজন্যই আমাদিগকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইবে! +

আর্য্যসন্তানের পক্ষে ম্লেচ্ছ হইয়া পড়া নিরতিশয় নিন্দার বিষয় বলিয়া পরিচিত না থাকিলে, ব্যাকরণ-অধ্যয়নের জন্য এইরূপ তর্কে উত্তেজনা করিবার চেষ্টা হইত না!

পাণিনির সময়ে আর্য্যসমাজে কথোপকথনেও সংস্কৃতশব্দ ব্যবহৃত হইত; কাত্যায়নের সময়ে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষার ব্যবহার না করিলে কি কি ক্ষতি হয়, তাহার আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল; পতঞ্জলির সময়ে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে কথোপকথনেও সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির যুগে কথোপকথনের ভাষায় এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ রচিত হইবার সময়ে কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহার মীমাংসা করিতে পারিলে, রামায়ণ কোন্ সাহিত্যযুগের গ্রন্থ—তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে। রামায়ণে এ বিষয়ে কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

রামায়ণে এই বিষয়ের প্রমাণের আধিক্য না থাকিলেও, অভাব থাকা স্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে যে দুইএকটি প্রমাণ প্রক্রান্ত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তাহাতে রামায়ণরচনাকালে শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হইবারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইল্বলনামক রাক্ষস ব্রাহ্মণ সাজিয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আহার করিত। সে যখন নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইত, তখন সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিত। যথা—

"ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপম্ ইল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥" ৩।১১।৫৬॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়া গিয়াছেন,—ইল্বল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-

* আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।

\+ ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

গণের মনে বিশ্বাস-উৎপাদনার্থই ব্রাহ্মণবৎ সংস্কৃতবাক্য ব্যবহার করিত। * ইহা দ্বারা রামায়ণরচনাকালে ব্রাহ্মণসমাজের নিমন্ত্রণ-রীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পরিচয় কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হওয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ সাজিতে হইলে বেশভূষার পরিবর্তন করিলেই যথেষ্ট হইত না; ভাষাকেও ব্রাহ্মণের উপ-যোগী করিয়া লইতে হইত। এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট। তথাপি রামায়ণে আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের সহিত হনুমানের প্রথম কথোপ-কথন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সীতাবিরহিত রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে ঋষ্যমূকপর্ব্বতসন্নিকটস্থ পম্পা-সরোবরের নিসর্গসুন্দর তটান্তদেশে উপনীত হইলেন, তখন বালিভয়সন্ত্রস্ত গৃহনিষ্কাসিত হৃতসর্ব্বস্ব সুগ্রীব ঋষ্যমূকে লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি রামলক্ষ্মণকে বালিপ্রেরিত গুপ্তচর মনে করিয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া বানরসেনাও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; প্রাণ-ভয়ে ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল; যে যেখানে ছিল, সকলেই সুগ্রীবের সম্মুখে করজোড়ে সমবেত হইয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিল! কেবল এক বীর অচল-অটল-ভাবে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি মহাবীর আঞ্জনেয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"যস্মাদুদ্বিগ্নচেতাস্ত্বং বিদ্রুতো হরিপুঙ্গব।
তং ক্রূরদর্শনং ক্রূরং নেহ পশ্যামি বালিনম্॥" ৪।২।১৫॥

যাহার ভয়ে তুমি এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছ, সেই ক্রূরদর্শন বালিকে ত এখানে দেখি-তেছি না; তবে এত সন্ত্রস্ত হইয়াছ কেন? হনুমানের এই উক্তিতে ফল হইল না দেখিয়া, তিনি পুনবায় ধিক্কারে সুগ্রীবের আত্মমর্য্যাদা প্রবুদ্ধ করিবার আশায় বলিতে লাগিলেন—

"অহো! শাখামৃগত্বং তে ব্যক্তমেব প্লবঙ্গম।
লঘুচিত্ততয়াত্মানং ন স্থাপয়সি যো মতৌ॥" ৪।২।১৭॥

হায়! তুমি যে শাখামৃগ, তাহাই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে! লঘুচিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কল্পাত্মক বুদ্ধিতে স্থির হইতে পারিতেছ না। ইহাতেও ফল হইল না। তখন হনুমান্ পুনরায় বলিলেন—

"বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্ব্বমাচর।"

যাহা করিবে, বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন কৌশলে তাহা সাধন কর। এই শেষ কথা সুগ্রীবের মনঃপূত হইল। তিনি হনুমান্‌কেই তথ্য-নির্ণয়ার্থ দৌত্যকার্য্যে বরণ করিলেন। তখনও প্রাণের ভয় দূর হয় নাই; তাই তিনি হনুমান্‌কে ছদ্মবেশে গমন করিবার পরামর্শ দিয়া বলিলেন—

"তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম।"

তুমি যাও, এই মানবযুগল কে, তাহার সন্ধান লও; কিন্তু "প্রাকৃতজনের" ন্যায় গমন কর। প্রাণের ভয়েই সুগ্রীব এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এস্থলে "প্রাকৃতেনেব" পদের ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন,—"উদাসীনেনেব।" তাহাতে ভাবার্থ পরিস্ফুট হয় না। 'উদাসীনের ন্যায় গমন কর' বলিলে, দুইপ্রকার অর্থবোধ হইতে পারে;—(১) প্রাণের আশা বিস-

* ব্রাহ্মণরূপং ব্রাহ্মণসদৃশবেষম্। সংস্কৃতং বদন্ ব্রাহ্মণবদিতি শেষঃ। এতদুভয়ং বিশ্বাসার্থম্।

জন করিয়া যাও; (২) সন্ন্যাসীর ন্যায় ছদ্মবেশে গমন কর। উভয় অর্থই ভাবপ্রকাশে অসমর্থ। এস্থলে দূতের প্রাণরক্ষার কৌশল-উদ্ভাবনার্থই সুগ্রীব ছদ্মবেশের উপদেশ দিয়াছিলেন; রামচন্দ্রও জানিতে পারিবেন না, অথচ কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তাই সুগ্রীব হনুমান্‌কে অশিক্ষিত পল্লিবাসীর ন্যায় ছদ্মবেশে গমন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সুগ্রীবের আশঙ্কা ছিল,—চরের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইলেই, চর বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাকে নিশ্চয় নিহত করিবে। তিনি তজ্জন্যই 'বোকা সাজিয়া' গমন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এখানেও প্রাণের ভয় সুগ্রীবের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়াছিল। হনুমান্ ইহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাণের ভয় না থাকিলেও সত্যসংবাদসংগ্রহের প্রয়োজন আছে। প্রাকৃতজনের ছদ্মবেশে গমন করিলে, রামচন্দ্র অবজ্ঞাবশত সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন; তাঁহার পক্ষেও সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অবসর উপস্থিত হইবে না। তাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও, সুগ্রীবোপদিষ্ট প্রাকৃতবেষ ধারণ করিলেন না; ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের সমীপস্থ হইলেন। যথা—

"কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মরুতাত্মজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ॥" ৪।৩।২॥

এখানে "ভিক্ষুরূপের" ব্যাখ্যায় টীকাকার "প্রাকৃততাপসরূপং" লিখিয়া সুগ্রীবের উপদেশের সহিত হনুমানের কার্য্যের সামঞ্জস্যরক্ষার চেষ্টা করিয়া ভাবার্থ পরিস্ফুট হইবার বাধা প্রদান করিয়াছেন। আধুনিক "তিলকটীকার" এই ব্যাখ্যা মহাত্মা তুলসীদাসের ভাষারামায়ণের অনুরূপ। সেখানে সুগ্রীব যাহা বলিয়াছেন, হনুমান্ যন্ত্রের ন্যায় তাহাই করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"অতি সভীত কহ সুন হনুমানা।
পুরুষ-যুগল বল-রূপ-নিধানা॥
ধরি বটুরূপ দেখতৈ জাঈ।
কহি সুজান! জিয় সৈন বুঝাঈ॥
বিপ্ররূপ ধরি কপি তঁহ গয়উ।
মাথ নায় পুঁছত অস ভয়উ॥"

বাল্মীকিবর্ণিত হনুমান্ এরূপ প্রকৃতির পাত্র ছিলেন না। তিনি কিজন্য ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভিক্ষুর ভাষা—সংস্কৃতভাষা—ব্যবহার করিয়া, রামচন্দ্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণে কার্য্যসিদ্ধির আশায়, হনুমান্ সুগ্রীবের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে ভিক্ষুরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে "ভিক্ষু" বলিতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী "প্রাকৃত তাপস" বুঝাইত; তাঁহারা প্রাকৃতভাষাই ব্যবহার করিতেন। এস্থলে সেই আধুনিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, পুরাতন গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিলকটীকায় এরূপ ব্যাখ্যাবিভ্রাটের অভাব নাই!

ভিক্ষুশব্দ পাণিনিসূত্রের নানা স্থানে উল্লিখিত। বৌদ্ধগণ ঐ শব্দের সৃষ্টি করেন নাই; প্রচলিত সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণিনিসূত্রে যে ভিক্ষুশব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রসঙ্গক্রমে সেই ভিক্ষুগণের শিক্ষাদীক্ষারও কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সনাশংসভিক্ষ উঃ ॥৩।২।১৬৮॥

এই সূত্রানুসারে "ভিক্ষু"শব্দের ব্যুৎপত্তি

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর এবং আশংস ও ভিক্ষ এই দুইটি ধাতুর উত্তর "তাচ্ছীল্যার্থে" উ-প্রত্যয় হয়। তদনুসারে চিকীর্ষু, আশংসু ও ভিক্ষু শব্দের উৎপত্তি। সূত্রানুসারে ভিক্ষুশব্দের অর্থ—ভিক্ষাশীল। সুতরাং যে-কোন ভিক্ষাশীলকেই "ভিক্ষু" বলা যাইতে পারে। অন্যান্য সূত্র না থাকিলে, এই সিদ্ধান্তই প্রবল হইত। কিন্তু অন্য সূত্রে ভিক্ষুর পরিচয় থাকায়, ভিক্ষুকমাত্রকেই "ভিক্ষু" বলা যায় না।

পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ ॥৪।৩।১১০॥

পারাশর্য্যপ্রোক্ত ভিক্ষুসূত্র এবং শিলালিপ্রোক্ত নটসূত্র অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা ব্যুৎপন্ন হইতেন, এই সূত্রে তাহাদের কথাই উক্ত হইয়াছে।

পারাশর্য্যের ন্যায় কর্ম্মন্দ-প্রোক্ত "ভিক্ষুসূত্র" এবং শিলালির ন্যায় কৃশাশ্ব প্রোক্ত "নটসূত্র" প্রচলিত থাকার কথা পরসূত্রেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণে জানিতে পারা যায়,—সেকালের "ভিক্ষু" একশ্রেণীর অধ্যয়নশীল সন্ন্যাসী; তাঁহারা ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতেন বলিয়া, "ভিক্ষু"নামে কথিত। তাহার অর্থ—বিলাতী "ভ্যাগাবণ্ড" নহে! হনুমান্ রামলক্ষ্মণের নিকট ভিক্ষুর ছদ্মবেশে উপনীত হইয়া, ছদ্মবেশের মর্য্যাদারক্ষার্থ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিয়া, তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের স্বতন্ত্র সূত্র ছিল; সাধারণত ভিক্ষুগণের পক্ষে তাহার অধিক অধ্যয়নের প্রয়োজন হইত না। হনুমানের কথোপকথনে তাহারও অধিক শাস্ত্রাধ্যয়নের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—

"নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্ ॥" ৪।৩।২৮॥

যিনি ঋগ্বেদে বিনীত হন নাই, যজুর্ব্বেদ ধারণ করেন নাই, সামবেদ জ্ঞাত হন নাই, তাঁহার পক্ষে এরূপভাবে বাক্যোচ্চারণ করা সম্ভব নহে। এই শ্লোকোক্ত "বিনীত"শব্দের ব্যাখ্যায় তিলকটীকাকার "প্রাতিশাখ্যের" উল্লেখ করিয়াছেন।

"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥" ৪।৩।২৯ ॥

রাম আরও বলিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বহুপ্রকারে সমগ্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছে; অনেক কথোপকথনের মধ্যেও কিছুমাত্র অপশব্দ ব্যবহার করে নাই। এই বর্ণনায় সেকালের কথোপকথনে অপশব্দ পরিহার করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিতে পারা যে জনসমাজের শ্রদ্ধা-আকর্ষণের উপায় বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ সেই সমুন্নত শিক্ষাযুগের মহাকাব্য। এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

সেকালে কোন্ শ্রেণীর নরনারী কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার প্রধান প্রমাণ—ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র। অধ্যাপক ওয়েবর্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেও, তাহাকে দ্বিসহস্র বৎসরের পরকালবর্ত্তী বলিতে সাহস করেন নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে নটসূত্র যে কত পুরাতন, পাণিনিসূত্রেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তথাপি তাহাকে নৃত্যশাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার

ত্রুটি হয় নাই! নট ও নাট্যশালা যে নর্ত্তক ও নৃত্যাগার নহে, তাহা সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই স্বীকার করিবেন। নাট্যশালায় নৃত্য হইত, নট নৃত্য করিত; তথাপি নটের নাম "নর্ত্তক" এবং নাট্যশালার নাম "নৃত্যাগার" বলা যায় না। নৃত্য অভিনয়ের অঙ্গীভূত ছিল। ভারতীয় নাট্যসাহিত্য কত পুরাতন, এস্থলে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। তাহা পুরাতন হউক বা আধুনিক হউক, তাহাতে সমাজচিত্র সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য ঐতিহাসিকের নিকট অধিক আদরের সামগ্রী। ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের অধিকাংশ গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল গ্রন্থের নাম সুপরিচিত, তাহারও সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। একদা ভারতীয় নাট্যসাহিত্য যে কিরূপ বিপুলাকার ধারণ করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র নাট্যসাহিত্য "রূপক" ও "উপরূপক" নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত ছিল। আগে রূপক, তাহার পর উপরূপক। ভরতপ্রণীত "নাট্যশাস্ত্রে" রূপকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, উপরূপকের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রূপক দশ শ্রেণীতে ও উপরূপক অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতে যে বহুগ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল, তাহা অতিশয়োক্তি নহে। বহু গ্রন্থ না থাকিলে, শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। এই সকল রূপক ও উপরূপকের নানা গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া, নাট্যকোবিদ স্বনামখ্যাত শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহাতে সেকালের লোকব্যবহারের নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ সর্ব্বসাধারণের গোচর হইয়াছে। কিন্তু সেকালে কোন্ শ্রেণীর লোকে কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিত, অনূদিত গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য মূলগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। তাহাতে কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

শ্রব্যকাব্য অধীত হইত; দৃশ্যকাব্য অধ্যয়নার্থ বিরচিত হইত না। তাহা নরনারীর সম্মুখে অভিনীত হইত। প্রত্যক্ষবৎ লোকব্যবহারের অভিনয় করিয়া, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদান করাই নাট্যসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সকল ব্যবহার লোকসমাজে অপরিচিত ছিল, নাট্যাভিনয়ে পাত্রপাত্রীগণ সেরূপ ব্যবহার করিলে, অভিনয়ের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবার কথা। নাট্যসাহিত্যের পাত্রপাত্রীগণ উত্তম ও অধম নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তম পাত্রের সংস্কৃতে, অধম পাত্রের প্রাকৃতভাষায় কথোপকথন করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাত্রীগণ সাধারণত প্রাকৃতভাষাই ব্যবহার করিতেন; বিশেষ প্রয়োজনে সংস্কৃতভাষাব্যবহারেরও নিয়ম ছিল। তাপসীগণ উত্তম পাত্রের ন্যায় সংস্কৃতভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। নাট্যসাহিত্যের এই রচনারীতি লোকব্যবহারের বিশিষ্ট প্রমাণ। রূপকে সংস্কৃতের বাহুল্য; উপরূপকে প্রাকৃতের প্রাবল্য। দুই শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য দুইটি সাহিত্যযুগের রচনারীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহাতে পুরাকালের কথোপ-

কথনে সংস্কৃতভাষার প্রাধান্য এবং উত্তরকালের কথোপকথনে প্রাকৃতভাষার প্রাধান্য প্রকটিত হইতেছে। সংস্কৃতভাষা কথোপকথনে কদাপি ব্যবহৃত হইবার রীতি না থাকিলে, নাট্য-সাহিত্যে এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতাম না।

লোকব্যবহার নানা ভাগে বিভক্ত। রাজদ্বারে, সজ্জনসমাজে, ক্রয়বিক্রয়ব্যাপারে, গৃহকার্য্যে, নানা স্থানে নানা কার্য্যে নানা ভাবে নরনারীকে কথোপকথন সম্পাদন করিতে হয়। সকল স্থানে ও সকল কার্য্যেই এক প্রকারের ভাষা ব্যবহার করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

আমরা নিরক্ষর ভৃত্য বা পল্লিবাসী কৃষক ও শ্রমজীবীর সহিত যেরূপ ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকি, গৃহে, সজ্জনসমাজে বা বিচারালয়ে সেরূপ ভাষায় কথোপকথন করিতে পারি না। প্রয়োজনের অনুরোধেই ভাষার পার্থক্য রক্ষা করিতে হয়। সেকালে যে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত। এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজদ্বারে সংস্কৃতভাষাই প্রযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল। অদ্যাপি যে সকল পুরাতন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া, আমাদিগকে সেকালের রাজাজ্ঞার মর্ম্মঘোষণা করিয়া, পুরাতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিতেছে, তাহাতে সংস্কৃতভাষারই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।* সুতরাং রাজকার্য্যে ও বিচারালয়ে যে সংস্কৃতভাষাই ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সংশয় নাই। শাস্ত্রীয়বিচারে সজ্জনসমাজে অদ্যাপি সংস্কৃতভাষাব্যবহারের রীতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এই রীতি পুরাকালে প্রবল ছিল। এই সকল কারণে, সেকালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যাবহারিক কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত থাকাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ভারতবর্ষের পুরাতন কথোপকথনের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় "রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটি" নামক সুধীসমিতিতে নানা আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহাদের তর্কবিতর্ক এক্ষণে প্রবন্ধাকারে সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হইবার রীতি তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কথোপকথনের ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং কোনকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃতভাষা নিয়ত কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবার রীতি থাকিলেও, তাহা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃতভাষার মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। কোন্ সময়ে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিতে পারিলে, পুরাতন সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসসঙ্কলনের অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

কাত্যায়নের যে "ভ্রাজা-শ্লোক" রচনা করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি শ্লোক "মহাভাষ্যে" উদ্ধৃত হইয়াছে। "মহাভাষ্যের" টীকাকার মহামহোপাধ্যায় জৈয়টাত্মজ কৈয়ট তাহাকে "কাত্যায়ন-

* পালিভাষানিবদ্ধ অশোকশাসনকে রাজশাসন বলা যায় না; তাহা ধর্ম্মশাসনলিপি।

বিরচিত" বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। * তাহা এই প্রবন্ধের শিরোভাগ অলঙ্কৃত করিতেছে। ঐ শ্লোকে কাত্যায়নের সময়ে কথোপকথনের রীতি কিরূপ ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে অপশব্দপ্রয়োগের নিন্দা এবং যথাবৎ ব্যবহারকালে সাধুশব্দপ্রয়োগের শুভফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাত্যায়নের সময়ে ভারতবর্ষ শিক্ষাদীক্ষা ও লোকব্যবহারে পূর্ব্বাবস্থা হইতে কিয়ৎপরিমাণে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল-প্রতাপ ভারতবর্ষের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রধাবিত হইয়াছে। যে প্রাকৃতভাষা পুরাকালে সজ্জনসমাজের কথোপকথনেও ব্যবহৃত হইত না, তাহাই ধর্ম্মপ্রচারে, শাস্ত্রবিচারে ও সাহিত্যরচনায় প্রচলিত হইতেছিল। এই বিপ্লবযুগে আর্য্য-সমাজ বেদরক্ষার্থ, আর্য্যাচাররক্ষার্থ, পূর্ব্ব-গৌরবরক্ষার্থ নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "ভ্রাজা"শ্লোকের অপশব্দনিন্দায় ও সাধুশব্দপ্রশংসায় তাহারই ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথাপি সজ্জনসমাজের কথোপকথনেও ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া, কালে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনেও তাহা স্থানলাভ করিয়াছিল। সে পরিবর্ত্তন যুগে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা যুগপৎ ব্যবহৃত হইবার কথা। কারণ, পরিবর্ত্তনবেগ যতই প্রবল হউক, তাহা পূর্ব্বরীতিকে সহসা ভাসাইয়া-লইয়া যাইতে পারে না। নূতন আসিয়া পুরাতনের সঙ্গে মিলিত হইলে, কিছুদিন একসঙ্গে অবস্থানের পর, নূতনের উজ্জ্বলালোকে পুরাতনের ক্ষীণপ্রভা ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে সংস্কৃতসাহিত্যে এই পরিবর্ত্তনযুগের কথোপকথনের ভাষার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে প্রমাণ "নিরুক্ত-পরিশিষ্টের" ভাষ্যকারের লেখনীপ্রসূত। তাহার সময়ে সংস্কৃত "দেবভাষা" এবং প্রাকৃত "মানুষী ভাষা" নামে কথিত হইত। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ কথোপকথনে কিরূপ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া, "নিরুক্ত-পরিশিষ্ট" ভাষ্যকার লিখিয়া গিয়াছেন, — তৎকালে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনে উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত—

"যা চ দেবানাং যা চ মানুষাণাম্।"

কথোপকথনের ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তনের ন্যায় সাহিত্যের ভাষারও নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। সাহিত্যের ভাষায় পরিবর্ত্তনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর, নানা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। রচনা-রীতি চিরকাল একরূপ থাকে না, ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে রচনারীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রচনারীতি দেশকালপাত্রভেদে পৃথক্ না হইয়া পারে না। একই দেশে একই কালে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনারীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাহা ব্যক্তিগত পার্থক্য। তদ্দ্বারা কোন ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত পার্থক্যের ন্যায়, কালগত পার্থক্যও দেখিতে

* কাত্যায়নোপনিবদ্ধভ্রাজাখ্যশ্লোকমধ্যপঠিতস্য তস্য শ্রুতিরনুগ্রাহিকাস্তি। ইতি কৈয়টঃ।

পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা সম্ভব।

এক যুগে সরল সুললিত বাক্যবিন্যাসের প্রভাব; অন্য যুগে আবার নিরতিশয় দুরূহ আড়ম্বরপূর্ণ বচনাবলীর প্রাদুর্ভাব;—ভারতীয় সংস্কৃতসাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এক যুগে রূপক অপেক্ষা সহজ বর্ণনার আধিক্য; অন্য যুগে সকল বর্ণনার মধ্যেই রূপকের আতিশয্য;—ইহার প্রমাণও নিতান্ত দুর্লভ নহে। এক যুগে এক শব্দের একরূপ অর্থ; অন্য যুগে সেই শব্দের অন্যরূপ অর্থ;—তাহারও নানারূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল পার্থক্য ব্যতীত, সংস্কৃতসাহিত্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এক যুগে যে শব্দ কেবল বৈদিক সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভাষাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না; অন্য যুগে তাহাই ভাষাসাহিত্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক যুগে যাহা ভাষাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, অন্য যুগে তাহার ব্যবহার বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত হইবারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণে এই সকল রচনারীতির পার্থক্যের অভাব নাই। পাণিনিসূত্রের সহিত পরবর্তী বার্ত্তিক ও ভাষ্যের সমালোচনা করিলে, বিভিন্ন সাহিত্যযুগের রচনারীতির বিবিধ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; রামায়ণের সঙ্গে বার্ত্তিক, ভাষ্য ও পাণিনিসূত্রের সমালোচনা করিলেও, সেইরূপ নানা পার্থক্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সকল পার্থক্য বিচার করিতে পারিলে, রামায়ণ কোন্ সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভাষাবিচার নিরতিশয় শ্রমসাধ্য দুরূহ ব্যাপার। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি না। যে-পরিমাণ অধ্যয়নলব্ধ অভিজ্ঞতা থাকিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার অভাবে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, অনধিকারচর্চ্চার অন্যায় অত্যাচারে মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইবারই আশঙ্কা উপস্থিত হয়!

রামায়ণের ভাষার বিশেষত্ব কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, বহুবার রামায়ণের আদ্যন্ত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। প্রথম অধ্যয়নে তাহা প্রতিভাত না হইতে পারে; ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যাহা সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা সচরাচর "আর্ষপ্রয়োগ"নামে সুপরিচিত। রামায়ণে এই শ্রেণীর প্রয়োগের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্ষপ্রয়োগের প্রচলিত অর্থ—ঋষির প্রয়োগ। বাল্মীকি ভারতবর্ষের শেষ ঋষি হইলে, আর্ষপ্রয়োগ-অবলম্বনে রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা করা সহজ হইত। কিন্তু বাল্মীকির পরেও ঋষিলিখিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

"আর্ষপ্রয়োগ"নামে যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা ঋষিমাত্রের পদমর্য্যাদাগত রচনারীতি হইলে, তদ্দ্বারা রচনাকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। তদ্দ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে,—এই গ্রন্থ সাধারণ লেখকের লেখনীপ্রসূত নহে; ইহা ঋষিপ্রণীত। কিন্তু যাহা সচরাচর "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া পরিচিত, তাহা কি কেবল ব্যক্তিগত রচনারীতি? রামায়ণের যে সকল প্রয়োগ "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া পরিচিত, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, এই সিদ্ধান্ত

স্বীকার করা যায় না। "আর্ষপ্রয়োগ" হইতে কালগত রচনারীতিরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আর্ষপ্রয়োগ" টীকাকারগণের সহজ ব্যাখ্যা। কোন প্রয়োগকে "আর্ষ-প্রয়োগ" বলিয়া দিলে, পাঠক আর কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক সে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহাকে "আর্ষপ্রয়োগের" প্রয়োজন, নিয়ম ও মূলকারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রামায়ণের যে সকল প্রয়োগ "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া পরিচিত, তাহার আলোচনা না করিয়া, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত। রামায়ণের ভাষা-বিচারের প্রথম বিষয়—"আর্ষপ্রয়োগ"। অতঃপর সর্ব্বাগ্রে তাহাতেই হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রার্থনা।*

হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতম পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অদ্য দশদিন হইল, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমহুতাশনের উর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কি শান্তিতে, কি অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ -যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,— আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগ্নীগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে -কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়,

* স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধসভায় বঙ্গদর্শন-সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

সমীরণের ন্যায় -তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি!

আজ প্রায় পঞ্চাশবৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কি জানি। কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কি দুঃখ, কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতি দিন, প্রতি রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্য্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাসলালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চ্চা অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের সময়ে তাহাদের মত অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া শাস্তসংযত শৌর্য্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কি করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল আশিষস্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্ম্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্ব্বাগ্রে তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়িবন্ধুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয় ত

কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল—তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্ম্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এইদিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চ্চায় প্রশ্রয় দেন নাই;—ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি ধনের গণ্ডীর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল—ধনিদরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল, তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে—ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে

পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রব-লাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কি পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্ম্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্ম্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্ম্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে, ধর্ম্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া, সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই! পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না,—ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদ-বিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্ একদিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া-দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া-দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া-দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মান-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের ঊর্দ্ধে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঊর্দ্ধে তাঁহাকেই দর্শন করিব!

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও! সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের

আবির্ভাবতিরোভাবের মধ্যে তোমার "আনন্দরূপমমৃতং" প্রকাশ কর। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোক-বিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধুবহন করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে তোমার অনন্ত মাধুর্য্যের কোনো ক্ষয় নাই—তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপ-বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক্!

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওষধীরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক্, এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক, সূর্য্য মধুমান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।*

আমরা যাঁহার বরণীয় স্মৃতির উপাসনার জন্য আজ এই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের সহিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা একান্ত কঠিন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যপরিষদের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে সেই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু পারিভাষিক হিন্দুধর্ম্ম বা পারিভাষিক ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা যে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি প্রশস্ততর, সেই ভিত্তির আশ্রয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। এবং পরম আহ্লাদের বিষয় যে, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া,—সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,—দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অন্য দেশে ধর্ম্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক, আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সংজ্ঞা আয়ত ও প্রশস্ত। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে,

* গত ২২শে মাঘ জেনেরেল অ্যাসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ হলে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত শোকসভায় লেখককর্ত্তৃক পঠিত।

আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশক্রমে তাহারই নাম ধর্ম্ম। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্ম্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে উর্দ্ধে দেবলোকে; ইহার শাখাপ্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানবসমাজে কর্ম্মরূপ ফুল ফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মানবজীবনের যাহাতে স্ফূর্ত্তি ধর্ম্মের তথায় অধিকার; সাহিত্যে মানবজীবনের স্ফূর্ত্তি, অতএব সাহিত্য ধর্ম্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। লোকস্থিতি ধর্ম্মের অভিপ্রায় সাহিত্য লোকস্থিতির সহায় অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, মানুষকে মানুষের সহিত করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকস্থিতির আনুকূল্য করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়,—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষ্টয়ী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপিতামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শসাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; এবং আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের ব্যবহারসম্পাদনার্থ যে-কিছু লৌকিকসাহিত্য বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অপৌরুষেয় বাণীর স্মৃতি ও অনুস্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগ ব্যাপিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাগ্বাদিনীর বীণার তন্ত্রীতে তাহাই বিবিধ মূর্চ্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার করধৃত-পুস্তক-মধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রলয়কালে মহাবরাহের দংষ্ট্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম্ম তখন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। এই পুরাতন সমাজতরণী যখন স্বদেশের অজ্ঞানে ও বিদেশের অনাচারে বিপ্লুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকস্থিতির আনুকূল্যের জন্য সেই প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন; সেই পুরাতনী বাণীর বৈদেশিক বিকৃত প্রতিধ্বনিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তর স্বাস্থ্য। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি, এবং আমার বিবেচনায় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে, আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জাবোধ করি না, আমরা স্বদেশীকে বিদেশীর ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই এই অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্ব্বত্র অশোভন ও অসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজজীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই

জানেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সেদিন 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকালে ইংরেজি বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না; এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধিরূপে দেখিতে পাই। অন্য উদাহরণের উল্লেখের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এককালে ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সেই বর্ষাকালের ঝটিকা দুর্য্যোগ এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তখন যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্য-ভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্যক্‌ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, স্বাতন্ত্র্যের সহকারে সংযমই ভারতসমাজের প্রধান লক্ষণ। আমরা যাঁহার তিরোভাবে শোকপ্রকাশের জন্য অদ্য এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি সেই ভারতসমাজের নেতা মহর্ষিগণেরই সন্তান ছিলেন, ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমই তাঁহার মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক তিনি যে অভিনব সাহিত্যের ভাগীরথী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমকেই তাহার প্রধান লক্ষণস্বরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার অসামান্যক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' যে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই, 'সার সত্যের আলোচনা'য় তাহা সংযমদ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'মানসী'র স্বাতন্ত্র্য 'স্বদেশী সমাজ' এর কল্যাণপ্রদ সংযমে পরিণত হইয়াছে। তিনি একাধারে যে স্বাতন্ত্র্য ও সংযমের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, প্রার্থনা করি, সেই মহাদর্শ বঙ্গীয় সমাজকে ও বঙ্গীয় সাহিত্যকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করুক। তিনি যে মনস্বী পুত্রগণে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মরণ-চিহ্ন আমাদিগকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিরজীবী হইয়া বঙ্গভারতীর ক্রোড়-দেশ অলঙ্কৃত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নবজীবনের আদর্শ। *

তত্ত্ববিদ্যাসভার দ্বাদশবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভার নামে সভ্য ও সুহৃদ্বর্গের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সবিনয়ে ও সাদরে অভিবাদন করিতেছি। আপনাদিগের আন্তরিক শুভ-ইচ্ছা দ্বারা এই সভাকে সংবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

বর্ত্তমানযুগের ধর্ম্মের আদর্শকে, তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে, উভয় দিকেই, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদিগের এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক যুগের ধর্ম্মই সেই যুগের বিজ্ঞান ও দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু কোন প্রাচীনযুগের অন্তিম ও নবযুগের আরম্ভকালে, যুগসন্ধি ও যুগান্তর উপস্থিত হইলে, সর্ব্বথাই প্রাচীনধর্ম্মের সঙ্গে নূতন বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপেই যুগে যুগে ধর্ম্মসমস্যা উৎপন্ন হয়, এবং এই সমস্যা ভেদ করিয়া ধর্ম্মকে নবযুগের উন্নত বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নূতন আয়োজনও আবশ্যক হইয়া উঠে। তত্ত্ববিদ্যাসভা এই ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই দ্বাদশবর্ষকাল নিষ্ঠাসহকারে এই লক্ষ্যেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা এই চেষ্টাকে হানচক্ষে দর্শন করেন,—যুক্তিতর্কের শুষ্ক-কঙ্করচর্ব্বণ জ্ঞানে ইহার বিচার ও আলোচনার প্রতি যাঁহারা উপেক্ষাপ্রদর্শন করেন,—ভক্তির স্ফুরণ ও অধ্যাত্মজীবনের পরিপুষ্টিসম্পাদনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ আলোচনাকে যাঁহারা অনাবশ্যক মনে করেন,—তাঁহারা অধ্যাত্মজীবনের অজ্ঞ অভিমানে পূর্ণ হইলেও যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সুমহৎ উপাসনামন্দিরের বহিরঙ্গনের বহিঃপ্রাচীরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান যুগে জড়বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি যেরূপ একদিকে অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, সেইরূপ এই সকল আলোচনা ও আবিষ্কারের গুণেই, সকল বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান যাহা, সেই দর্শন বা ব্রহ্মবিজ্ঞানও অন্যদিকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব গভীরতা প্রাপ্ত হইতেছে। এইজন্য, বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের অন্বেষণে ও সাধনে বিজ্ঞান ও দর্শনকে উপেক্ষা বা বর্জ্জন করিলে চলিবে না। সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যেখানেই স্রষ্টার ধ্যানধারণা করিতে যাইবে, সেখানেই পদে পদে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসত্য মানসী প্রতিমার পূজা

* শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণদিনে তত্ত্ববিদ্যাসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিবৃত বক্তৃতার মর্ম্ম অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধ।

করিতেই হইবে। প্রত্যেকের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিলেই যে সত্য উপাসনা হয়, তাহা নহে। শব্দ যখন বন্ধ্যাপুত্রবৎ বা আকাশকুসুমবৎ কল্পনামাত্রকে নির্দ্দেশ করে না, কিন্তু প্রকৃতবস্তু নির্দ্দেশ করে, শব্দ-উচ্চারণে যখন বস্তুজ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠে,—তখনই শব্দ সত্য ও সেই-সত্য-শব্দ-সাহায্যে সত্য উপাসনা সম্ভব হয়। কিন্তু স্রষ্টৃসম্বন্ধিনী ধারণাকে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র করিতে গেলে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূলতত্ত্বসকল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করা আবশ্যক হয় এবং তখন জড়বিজ্ঞানের আলোচনা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা ব্যতিরেকে স্রষ্টার সত্যজ্ঞান লাভ করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জনসমাজের প্রকৃতি ও বিবর্ত্তনের মুখ্যতত্ত্বসকলের কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ না করিলে, ঈশ্বরকে নিয়ন্তৃরূপে—Moral Governor রূপে—সত্যভাবে ধ্যান করা সম্ভব হয় না। ঈশ্বর যে দণ্ডধারী ধর্ম্মরাজ হইয়া জনসমাজের পরিবর্ত্তনশীল বিধিব্যবস্থার মধ্য দিয়াই আপনার সনাতন অনুশাসনসকল যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মকে সংবর্দ্ধিত ও অধর্ম্মকে নিরস্ত করিতেছেন, সমাজতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা ব্যতিরেকে এই জ্ঞান কদাপি পরিস্ফুট, কদাপি সত্য, কদাপি বস্তুতন্ত্র হইতে পারে না। এইজন্য সমাজ-বিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের আলোচনা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। সেইরূপ সৌন্দর্য্যব্যক্ত কলাবিজ্ঞানের সম্যক্ আলোচনা ব্যতিরেকে, কি জড়প্রকৃতিতে, কি মানবসমাজে, হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি রসের মধ্যে,—নিখিলরসামৃতমূর্ত্তিরূপে যিনি নিয়ত আপনার অরূপ রূপমাধুরী বিচিত্র জগৎরঙ্গমঞ্চে প্রকট করিয়া, জীবের সঙ্গে অপূর্ব্ব-নিগূঢ় রসলীলায় নিযুক্ত রহিয়াছেন,—সেই সুন্দরের সত্যধ্যান এবং বস্তুগত সম্ভোগ কদাপি সম্ভব নহে। এইজন্য রসতত্ত্বমাত্রই ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। এবং এই সকল কারণেই বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম প্রাচীনযুগের সাধনচক্রের সঙ্কীর্ণ নেমিরেখা পরিত্যাগ করিয়া, নিখিল জ্ঞান, নিখিল তত্ত্ব, নিখিল কর্ম্ম, নিখিল রসকে অধিকার করিয়া, 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ, সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা, সকলের মধ্যে সম্ভোগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিশ্বসাধনাব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রসঙ্গের বহুলপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে ধর্ম্মের আদর্শও অনিবার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, স্ফুটতর, গভীরতর, প্রশস্ততর ও উন্নততর হইয়া উঠিয়াছে। এই উন্নত-ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া পদে পদে আমাদিগকে বিজ্ঞান-দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; না করিলে, ইহার জটিল সমস্যাসকলের সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মকে আর কেবল কিংবদন্তির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব নহে। বর্ত্তমানের ধর্ম্মের আদর্শে ও সাধনে, মানবসমাজের পূর্ব্ব-সঞ্চিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণীরূপে শাস্ত্রসকল সম্যক্‌ভাবে সম্মানিত হইবে সত্য, কিন্তু অভ্রান্ত বলিয়া আর গৃহীত

হইবে না। প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে বর্ত্তমানের সাধনাকে মিলাইয়া প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট এবং বর্ত্তমানের অনুভূতিকে সংশোধিত ও সপ্রমাণিত করিতে হইবে। এই যুগধর্ম্মকে কেবল গুরুমুখীন করিয়া রাখিলেও আর চলিবে না। বর্ত্তমানের ধর্ম্মের আদর্শে ও সাধনে, উন্নত সাধক ও বিশ্বস্তসাক্ষিরূপে গুরু নিশ্চয়ই পূজার্হ হইবেন, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের যষ্টিরূপে গৃহীত হইবেন না। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন শিষ্যের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করাই যখন গুরুর ধর্ম্ম এবং জ্ঞানমাত্রেই যখন জ্ঞাতার অনুভূতির অপেক্ষা করে, তখন গুরূপদেশকেও আপনার কৃতার্থতালাভের জন্যই শিষ্যের স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ধর্ম্মকে আবার ব্যক্তিগত মতামতের শিথিল বালুকাস্তূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেও চলিবে না। কেন না, ধর্ম্ম কদাপি মতের উপরে স্থাপিত হইতে পারে না সত্যের উপরেই স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। মতামত এ জগতে অগণ্য, কিন্তু সত্য স্বরূপত এক। সেই এক মহাসত্যের অন্বেষণ, সেই মহাসত্যকে সাধন করা, সেই মহাসত্যকে লাভ করা, জীবনে, চরিত্রে জনসমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা সেই সত্যকে মূর্ত্তিমৎ করিয়া লোকমণ্ডলীমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্ম্মের একমাত্র সনাতন লক্ষ্য। সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন, সকল সাধনা বিভিন্ন-ক্ষেত্রে সেই এক সত্যেরই অন্বেষণ করিতেছে। সত্যলাভ যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তবে বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম কদাপি আপনার লক্ষ্য লাভ করিতে পারিবে না।

ফলত ধর্ম্মসাধন যুগে যুগে তত্তৎ-যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানাদিকে স্বল্পবিস্তররূপে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। আমাদিগের দেশে ভক্তিসাধন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বৈষ্ণবসাধনায় রসতত্ত্বের উপরেই ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদর্শনে, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর তত্ত্ববিচারে, রসতত্ত্বের অতি গভীর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তিরূপে ভগবানের ভজনা ও ভগবল্লীলা সম্ভোগ করিতে যাইয়া, সমগ্র কলাচর্চ্চাকে আপনাদিগের ভক্তিসাধনের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। খৃষ্টীয়সমাজে, বিশেষত ক্যাথলিক্‌সম্প্রদায়মধ্যে, বহুল পরিমাণে সমাজতত্ত্বের উপরে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসংহতি প্রত্যেক মানবশিশুর জননীরূপে বিদ্যমান থাকিয়া তাহার নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট করিতেছে। মা যেমন আপনার অঙ্কে ধারণ করিয়া সন্তানকে স্তনদানে জীবিত রাখেন ও পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করেন, জনসংহতি সেইরূপ আমাদিগের প্রত্যেককে আপনার সঞ্চিত জ্ঞান, ভাব, কল্যাণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিত রাখিতেছে এবং নিয়ত পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতেছে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার মূল প্রকৃতিই একদিকে এই উদারপ্রেম ও অযাচিত দান ও প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অসীম ব্যাকুলতা এবং অন্যদিকে এই বশ্যতা, এই নির্ভরশীলতা, এই বিশ্বস্ততা।

এই সমাজতত্ত্ব রোমকসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সাধনের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, Catholic Churchএর সঙ্গে প্রত্যেক Catholic সাধকের সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মাতা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহশীল, সেইরূপ প্রত্যেক Catholic সাধকের প্রতি স্নেহশীল হইয়া Catholic Church আপনার উদার প্রেমগুণে প্রত্যেকের বন্ধনমোচন করিতেছে আর প্রত্যেক Catholic সাধক এই মাতৃরূপিণী Churchএর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া, তাহার উপরে নির্ভরশীল ও তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া, এই উদার প্রেমের প্রতিদান করিতেছে। রস ভক্তির প্রাণ। ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবসাধন রসতত্ত্বকে এইজন্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও আত্মভূত করিয়াছে; না করিলে, এ সাধন কদাপি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিত না। বশ্যতাতে বিধি-নিষেধাত্মক নৈতিকসাধন ও সমাজধর্ম্মের সনাতন প্রতিষ্ঠা। Catholic সাধন এই নীতিবিজ্ঞান ও এই সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত ও আত্মভূত করিয়াছে; না করিলে, তাহা ভিত্তিহীন ও শিথিলগ্রন্থি হইয়া পড়িত।

আজ পর্য্যন্ত জগতের ঐতিহাসিক ধর্ম্মসকল যে পরিমাণে কোথাও বা রস-তত্ত্বকে, কোথাও বা নীতিবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত ও আত্মভূত করিয়াছে, সেই পরিমাণে সৃষ্টিতত্ত্ব বা জড়বিজ্ঞানকে কোথাও অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আজ পর্য্যন্ত জগতের ধর্ম্মসকল জীব, জগৎ ও, ব্রহ্ম, তিনের মধ্যে প্রকৃত একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্যজগতে, বিশেষত ইহুদী, আরব প্রভৃতি সেমিটিক্ জাতি-সকলের ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনে সর্ব্বথাই ব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছে। ইহুদীর ভূমিতেই খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি। গ্রীকৃচিন্তাদ্বারা পরিপুষ্ট হইলেও, ইহুদীর প্রভাবে সেমিটিক্ দ্বৈতবাদ খৃষ্টধর্ম্মের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, খৃষ্টীয়সাধনায় জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের প্রকৃত একত্বপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অদ্যাপি প্রবল অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। গ্রীক্-প্রভাবে, আলেক্জেণ্ড্রিয়ার তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সাধনায় ও শিক্ষায়, একসময়ে খৃষ্টধর্ম্মেও অতি উন্নত ব্রহ্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু রোমকচিন্তাদ্বারা অভিভূত হইয়া, রোমক নেতৃবর্গের প্রভাবে, অতি অল্পকালমধ্যেই খৃষ্টীয়সাধনার তত্ত্বাঙ্গ অসাড় এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্ম রোমক ব্যবহার বিজ্ঞানের জালে জড়িত ও পরমার্থতত্ত্ব হইতে স্বল্পবিস্তর বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন হইতে খৃষ্টীয়সাধনায় বিধিনিষেধাত্মক নৈতিক আদর্শই প্রবল হইয়া রহিয়াছে। দ্বৈতভাব এই নৈতিক আদর্শের প্রাণ; অদ্বৈততত্ত্বে, এই কঠোর বিধিনিষেধাত্মক আদর্শের সম্যক্ প্রসার অসম্ভব। এই-জন্য আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যজগতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম, তিনের মধ্যে প্রকৃত একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

আমাদিগের দেশে এই একত্বপ্রতিষ্ঠার বিপুল চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা জীব ও জড়ের সত্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বহুলপরিমাণে অলীক ও মায়িক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি

উপদেশের দ্বারা যেখানে আপাতত জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেও জীবকে শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অতীত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ চৈতন্যরূপেই দেখা হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যে নিত্যবস্তু নিয়ত বিদ্যমান থাকিয়া শরীরের জন্ম-স্থিতি-ক্ষয়-রোগ-স্বাস্থ্য প্রভৃতি অবস্থাবিপর্য্যয় এবং মন ও বুদ্ধির সঙ্কল্প-বিকল্প-সচেতন-অচেতনাদি ভাবপরিবর্ত্তনের মধ্যে আমাদিগের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে জীবরূপে গৃহীত হইয়াছে।

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এ সকল সেই পরমপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হইলেও, ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদিগের মধ্যে তাঁহার স্বরূপপ্রকাশ হয় না। তাঁহাকে স্বরূপত জানিতে হইলে, তাঁহার যে শ্রেষ্ঠ জীবপ্রকৃতি দ্বারা তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাকে জানিতে হইবে। সেখানেই তিনি স্বরূপত বিদ্যমান ও প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই জীবপ্রকৃতিকে জানিতে হইলে, শরীর-মন প্রভৃতি হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে হইবে। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে, ইন্দ্রিয় হইতে মনকে, মন হইতে বুদ্ধিকে, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারকে প্রত্যাহৃত করিয়া, অবশেষে সেই অহঙ্কার হইতেও তাহার মূলস্থ সাক্ষিচৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া,— আপনার অন্তরস্থ নিত্যবুদ্ধশুদ্ধ চৈতন্যবস্তুকে দেখিতে হইবে। এইরূপে জীব যখন সংসারমুক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানে—

> অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
> সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥—

যখন জীবের এই সত্যজ্ঞান আবির্ভূত হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার চরমাদর্শ। এই আদর্শে জড়জগৎ বা জনসমাজ, এ দুএর কোন একটিরও বিশেষ স্থান নাই।

বৈষ্ণবতত্ত্বে জীবব্রহ্মের আপাতপার্থক্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু মৌলিক একত্ব কদাপি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয় নাই। ব্রহ্মের অখণ্ডৈকত্ব বা একরসত্ব অস্বীকার করিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বগত ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠা করিয়াই বৈষ্ণবতত্ত্ব আপনার মধ্যে ভক্তি ও ভক্তিসাধক নিত্য-উপাসনাদির স্থান করিয়া লইয়াছে। জড়-জগৎ ও জীবজগৎ উভয়কেই ভগবল্লীলার আধার ও প্রকাশরূপে গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব-সাধন কিয়ৎপরিমাণে ইহাদের সত্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবসাধনে ভগবান্‌কে সম্যক্‌ভাবে স্রষ্টারূপে ভজনা করিবার প্রয়াস অতি অল্পই হইয়াছে। পঞ্চরসের মধ্যে শান্তরস ভক্তিসোপানের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিতেছে। বৈদিকধর্ম্মে মানবীয় সাধনার সঙ্গে নিসর্গের একটা সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মাখামাখিভাব দৃষ্ট হয় সত্য, পৌরাণিক ধর্ম্মের উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গে ও পৌরাণিক উপাসনার রূপকাদির মধ্যেও নিসর্গের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, তথাপি ইহা

স্বীকার করিতেই হইবে যে, উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুধর্ম্ম ইহার অশেষ ক্রিয়াকর্ম্ম-কাব্যকল্পনার মধ্যেও, চিরদিনই নিতান্ত নির্গুণের পক্ষপাতী হইয়া রহিয়াছে।

এই সকল কারণে জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম-সাধনে আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান আপনার যথাযথ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্ম এইজন্য প্রায় সর্ব্বত্রই একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য এই সকল ধর্ম্মে ও সাধনে নবজীবনের আদর্শও বহুলপরিমাণে এই অন্তর্মুখীনতাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে।

ফলত একদিকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি এবং অপরদিকে আত্মা ও ধর্ম্ম, এতদুভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ কল্পনা করিয়াই নবজীবনশব্দ ও তদাশ্রয়ী ভাবসকল পৌরাণিক ধর্ম্মে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্ম আদিতে,—কি বেদে, কি তালমুদে,—প্রায় সর্ব্বত্রই স্বভাব ও নিসর্গকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মবিবর্ত্তনের সেই আদিম সোপানের আরাধ্য দেবতাসকল স্থূলবস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছিলেন, এবং তাঁহাদের আরাধনা শরীরব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সূত্রে অনুস্যূত ছিল। ঋগ্বেদের অগ্নি, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি সকলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নৈসর্গিক বস্তু। বরুণ আকাশরূপে সকলকে আচ্ছাদন করিয়া সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের সেই সর্ব্বজনবিদিত শ্লোক,—দুইজন মনুষ্য যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়, তিনজন যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থ, চারিজন যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম,—বরুণ-অর্থে জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করে নাই, কিন্তু এই চাক্ষুষ আকাশদেবতাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এই চাক্ষুষ আকাশদেবতার সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই ক্রমে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ অগ্নি প্রভৃতিও চাক্ষুষ দেবতা ছিলেন। নৈসর্গিক আকারেই অগ্নি পূজিত হইতেন। একদিকে এই সকল নিসর্গদেবতা, অন্যদিকে পিতৃদেবতা, এই উভয়বিধ বৈদিক দেবতাশ্রেণীই স্থূল বিস্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য ছিলেন। য়িহুদার য়েহোহম, জিহোভা প্রভৃতিও সমাজপতিরূপে স্থূলবিস্তর বুদ্ধিগ্রাহ্য, ও বিধিনিষেধাত্মক সামাজিকজীবনের চাক্ষুষ ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপাদির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহির্মুখীন শারীরধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্মের সঙ্গে প্রাচীন ইহুদীধর্ম্মের কোন বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই।

কিন্তু ক্রমে দেবতা যখন নিসর্গ ছাড়িয়া অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, আত্মাতে পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হইলেন বা হৃদয়ের অভ্যন্তরে কর্ম্মের মৌলিক অদৃশ্য-প্রেরণার মধ্যে আপনার অনুজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বাহিরের সঙ্গে অন্তরের বিরোধের সূত্রপাত হইল। বাহিরে সংসার, অন্তরে সংসারাতীত ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে কর্ম্ম, অন্তরে ভাব ও উদ্দেশ্য। সংসারে বা কর্ম্মে নহে, কিন্তু জ্ঞানে, ভাবে, হৃদয়ের প্রেরণার মধ্যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিরাজ

করেন। সুতরাং তখন হইতে বহির্জীবনকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইবে, এই আদর্শ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। এবং তদবধি নবজীবন-শব্দ ও তদাশ্রয়ী ভাব পৌরাণিক চিন্তা ও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

নবজীবন বলিতে এখনও আমরা এই প্রাচীন, এই পৌরাণিক, এই একান্ত অন্তর্মুখীন আদর্শ ই বুঝিয়া থাকি। নবজীবন লাভ করিতে হইলে, সংসারে মৃত হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে সজীব হইতে হইবে। এই বহির্জীবনকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া অন্তর্জীবনকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। বিষয়ে বিরক্তি ও ব্রহ্মে অনুরাগ সাধন করিতে হইবে। দৃশ্যবিষয়ে অবজ্ঞা ও অদৃশ্যে আস্থাস্থাপন করিতে হইবে। খৃষ্টীয়, ইস্লামীয়, বৈষ্ণবীয় নবজীবনের আদশ স্বল্পবিস্তর ইহাই।

এই আদর্শের মধ্যে যে মৌলিক ভাব আছে, তাহা বর্জ্জন করিলেও চলিবে না। বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধন যেমন প্রাচীনকালে, সেইরূপ আমাদিগের মধ্যেও ধর্ম্মলাভের উপায়রূপে অবশ্যই অবলম্বিত হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইবে না। যথাযথ ও পূর্ণতর ভোগের জন্যই বৈরাগ্যের প্রয়োজন। আপাতত যাহা অনাত্ম বলিয়া মনে হয়, তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবার জন্যই আত্মানাত্মবিবেক কঠোর ও দৃঢ়ভাবে সাধন করিতে হইবে। যতদিন না বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধিত হইয়াছে, ততদিন আত্মাকেই অনাত্মরূপে দেখিবে, অনাত্মাতে আত্মার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা বিরোচনধর্ম্ম,—আসুরতত্ত্ব,—অজ্ঞানান্ধকারের সৃষ্টি। আত্মাকে দেহের মধ্যে, ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডে, শিবকে জীবের মধ্যে, ভিন্নাভিন্নভাবে দর্শন করা ইন্দ্রধর্ম্ম। ব্রহ্মতত্ত্ব শুদ্ধপ্রজ্ঞালভ্য। এই তত্ত্বলাভ, এই ধর্ম্মসাধন ও এই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেক-বৈরাগ্যাদি পৌরাণিক সাধনাও আধুনিক আদর্শে যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। ফলত এই সকল সাধন ব্যতিরেকে কোনপ্রকারেই নবজীবনের নবীন আদর্শ আয়ত্ত হইবে না।

এই আদর্শ কি, প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৬০

দিনের মধ্যে অক্ষয় একসময় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে কমলার প্রত্যাবর্ত্তনসম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না। কমলা কেন যে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহা না জানিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে কাহারো কাছে কোনো কথা বলিতে চান না। সে যখন ইচ্ছা করিয়া তাহার আত্মীয়বন্ধুসভার অন্তরালে চলিয়া আসিয়াছে, যখন লজ্জাভয়ও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তখন তিনি তাহাকে সেই বন্ধুসমাজের নিকট, সমস্ত কথা না জানিয়া, প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। তা ছাড়া, রমেশের প্রতি অক্ষয়ের যে বিশেষ বন্ধুভাব নাই, তাহাও খুড়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

কমলা কেন চলিয়া গিয়াছিল, কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এ সম্বন্ধে বাড়ীর কেহ কোনো প্রশ্নই করিল না—কমলা যেন ইঁহাদের সঙ্গেই কাশী বেড়াইতে আসিয়াছে, এম্‌নিভাবে দিন কাটিয়া গেল। উমির দাই লছমনিয়া স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনার ছলে কিছু বলিতে গিয়াছিল, খুড়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিলেন।

রাত্রে শৈলজা কমলাকে আপনার বিছানায় লইয়া শুইল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল এবং দক্ষিণহস্ত দিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই কোমল হস্তস্পর্শ নীরব প্রশ্নের মত কমলাকে তাহার গোপনবেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

কমলা কহিল—"দিদি, তোমরা কি মনে করিয়াছিলে? আমার উপরে রাগ কর নাই?"

শৈল কহিল—"আমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাই? আমরা কি এটা বুঝি নাই, সংসারে তোর যদি কোনো পথ থাকিত, তবে তুই এই ভয়ানক পথ লইতিস্ না! আমরা কেবল এই বলিয়া কাঁদিয়াছি, ভগবান্ তোকে কেন এমন সঙ্কটে ফেলিলেন! যে লোক কোনো অপরাধ করিতে জানে না, সেও দণ্ড পায়!"

কমলা কহিল—"দিদি, আমার সব কথা তুমি শুনিবে?"

শৈল স্নিগ্ধস্বরে কহিল—"শুনিব না ত কি বোন্?"

কমলা। তখন যে তোমাকে কেন বলিতে পারি নাই, তাহা জানি না। তখন আমার কোনো কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মাথায় এমন বজ্রাঘাত হইয়াছিল যে, লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না। সংসারে আমার মা-বোন কেহ নাই, দিদি, তুমি আমার মা বোন্ দুই—তাই তোমার কাছে সব কথা বলিতেছি, নহিলে আমার যে কথা, তাহা কাহারো কাছে বলিবার নয়।

কমলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল। শৈলও উঠিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। সেই অন্ধকার বিছানার মধ্যে বসিয়া কমলা বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল।

কমলা যখন বলিল, বিবাহের পূর্ব্বে বা বিবাহের রাত্রে সে তাহার স্বামীকে দেখে নাই, তখন শৈল কহিল—"তোর মত বোকা মেয়ে ত আমি দেখি নাই। তোর চেয়ে কম বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল—তুই কি মনে করিস্, লজ্জায় আমি আমার বরকে কোনো সুযোগে দেখিয়া লই নাই!"

কমলা কহিল—"লজ্জা নয় দিদি। আমার বিবাহের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ যখন আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, তখন আমার সমস্ত সঙ্গিনীরা আমাকে বড়ই ক্ষ্যাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে সাতরাজার ধন মাণিক পাই নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করি নাই। এমন কি, তাঁহার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ মনের মধ্যেও অনুভব করা আমি নিতান্ত লজ্জার বিষয়, অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আজ তাহারই শোধ দিতেছি।"

এই বলিয়া কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে আরম্ভ করিল—"বিবাহের পর নৌকাডুবি হইয়া আমরা কি করিয়া রক্ষা পাইলাম, সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যখন বলিয়াছিলাম, তখনো জানিতাম না যে, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া যাঁহার হাতে পড়িলাম, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানিলাম, তিনি আমার স্বামী নহেন।"

শৈলজা চমকিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি কমলার কাছে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল—"হায়রে পোড়াকপাল—ও তাই বটে! এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম! এমন সর্ব্বনাশও ঘটে!"

কমলা কহিল—"বল্ দেখি দিদি, যখন মরিলেই চুকিয়া যাইত, তখন বিধাতা এমন বিপদ্ ঘটাইলেন কেন!"

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল—"রমেশবাবুও কিছু জানিতে পারেন নাই?"

কমলা কহিল—"বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি একদিন আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাকিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'আমার নাম কমলা, তবু তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?' আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেইদিন তাঁহার ভুল ভাঙিয়াছিল। কিন্তু দিদি, সে সকল দিনের কথা মনে করিতেও আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।"—এই বলিয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল।

শৈলজা একটু একটু করিয়া কথায় কথায় সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া বাহির করিয়া লইল। সমস্ত কথা শোনা হইলে সে কহিল, "বোন, তোর দুঃখের কপাল, কিন্তু আমি এই কথা ভাবিতেছি, ভাগ্যে তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি! যাই বলিস্, বেচারা রমেশবাবুর কথা মনে করিলে বড় দুঃখ হয়। আজ রাত অনেক হইল, কমল, তুই আজ ঘুমো। কদিন রাত জাগিয়া কাঁদিয়া মুখ কালী হইয়া গেছে। এখন কি করিতে হইবে, কাল সব ঠিক করা যাইবে।"

রমেশের লিখিত সেই চিঠি কমলার কাছে ছিল। পরদিন সেই চিঠিখানি লইয়া শৈলজা তাহার পিতাকে নিভৃতঘরে ডাকিয়া পাঠাইল এবং চিঠি তাঁহার হাতে দিল। খুড়া চস্‌মা চোখে তুলিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তাহার পরে চিঠি মুড়িয়া চস্‌মা খুলিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই ত, এখন কি কর্ত্তব্য!"

শৈল কহিল, "বাবা, উমির কয়দিন হইতে সর্দ্দিকাশি করিয়াছে, একবার নলিনাক্ষ-ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাও না! কাশীতে তাঁহার আর তাঁর মার ত খুব নাম শোনা যায়। একবার তাঁকে দেখিই না।"

রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিল —এবং ডাক্তারকে দেখিবার জন্য শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "কমল, আয়, শীঘ্র আয়!"

নবীনকালীর বাড়ী যে-কমলা নলিনাক্ষকে দেখিবার ব্যগ্রতায় প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কমলা আজ লজ্জায় উঠিতে চায় না।

শৈল কহিল, "দেখ্ পোড়ারমুখি, আমি তোকে বেশিক্ষণ সাধিব না, তা আমি বলিয়া রাখিতেছি—আমার সময় নাই—উমির ব্যামো কেবল নামমাত্র, ডাক্তার বেশিক্ষণ থাকিবে না তোকে সাধাসাধি করিতে গিয়া মাঝে হইতে আমার দেখা হইবে না।"

এই বলিয়া কমলাকে জোর করিয়া টানিয়া-লইয়া শৈলজা দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। নলিনাক্ষ উমার বুক-পিঠ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ওষুধ লিখিয়া-দিয়া চলিয়া গেল।

শৈল কমলাকে কহিল, "কমল, বিধাতা তোকে যতই দুঃখ দিন, তোর ভাগ্য ভাল। এখন দুই একদিন বোন তোকে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে—আমরা একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। ইতিমধ্যে উমির জন্য ঘন-ঘন ডাক্তারের প্রয়োজন হইবে, অতএব নিতান্ত তোকে বঞ্চিত হইতে হইবে না।"

খুড়া একদিন এমন সময় বাছিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন, যখন নলিনাক্ষ বাড়ীতে থাকে না। চাকর কহিল, "ডাক্তারবাবু নাই।" খুড়া কহিলেন, "মাঠাকরুণ ত আছেন, তাঁহাকে একবার খবর দাও। বল, একটি বৃদ্ধব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

উপরে ডাক পড়িল। খুড়া গিয়া কহিলেন, "মা, আপনার নাম কাশীতে বিখ্যাত। তাই আপনাকে দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে আসিলাম। আমার আর কোনো কামনা নাই। আমার একটি দৌহিত্রীর অসুখ, আপনার ছেলেকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম, তিনি বাড়ী নাই—তাই মনে করিলাম

শুধু-শুধু ফিরিব না, একবার আপনাকে দর্শন করিয়া যাইব।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"নলিন এখনি আসিবে, আপনি ততক্ষণ একটু বসুন। বেলা নিতান্ত কম হয় নাই—আপনার জন্ত কিছু জলখাবার আনাইয়া দিই।"

খুড়া কহিলেন, "আমি জানিতাম, আপনি আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না—আমার যে ভোজনে বেশ একটুখানি সখ আছে, তাহা আমাকে দেখিলেই লোকে টের পায়—এবং সকলেই এ বিষয়ে আমাকে একটু দয়াও করে।"

ক্ষেমঙ্করী খুড়াকে জল খাওয়াইয়া বড় খুসি হইলেন। কহিলেন, "কাল আমার এখানে আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রহিল—আজ প্রস্তুত ছিলাম না, আপনাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না।"

খুড়া কহিলেন, "যখনি প্রস্তুত হইবেন, এই ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিবেন। আপনাদের বাড়ী হইতে আমি বেশি দূরে থাকি না। বলেন ত আপনার চাকরটাকে লইয়া আমার বাড়ী দেখাইয়া আসিব।"

এম্‌নি করিয়া খুড়া দুইচারিদিনের যাতায়াতেই নলিনাক্ষের বাড়ীতে বেশ একটু জমাইয়া লইলেন।

ক্ষেমঙ্করী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন—"ও নলিন, তুই চক্রবর্ত্তিমশায়ের কাছ থেকে ভিজিট্ নিস্ নে যেন!"

খুড়া হাসিয়া কহিলেন—"মাতৃ-আজ্ঞা উনি পাইবার পূর্ব্ব হইতেই পালন করিয়া আসিতেছেন—আমার কাছ হইতে উনি কিছুই নেন নাই। যাঁহারা দাতা, তাঁহারা গরীবকে দেখিলেই চিনিতে পারেন।"

৬১

দিনদুয়েক পিতায় ও কন্যায় পরামর্শ চলিল। তাহার পরে একদিন সকালে খুড়া কমলাকে কহিল—"চল মা, আমরা দশাশ্বমেধে স্নান করিতে যাই।"

কমলা শৈলকে কহিল—"দিদি, তুমিও চল না!"

শৈল কহিল, "না ভাই, উমির শরীর তেমন ভাল নাই।"

খুড়া যে পথ দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন, স্নানান্তে সে পথ দিয়া না ফিরিয়া অন্য এক রাস্তায় চলিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন, একটি প্রবীণা স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন।

কমলাকে সম্মুখে আনিয়া খুড়া কহিলেন—"মা, ইঁহাকে প্রণাম কর, ইনি ডাক্তারবাবুর মাতা।"

কমলা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—'তুমি কে গা!—দেখি দেখি, কি রূপ! যেন লক্ষ্মীটির প্রতিমা!"—বলিয়া কমলার ঘোম্‌টা সরাইয়া তাহার নতনেত্র মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন। কহিলেন—"তোমার নাম কি বাছা?"

কমলা উত্তর করিবার পূর্ব্বেই খুড়া কহিলেন—"ইঁহার নাম হরিদাসী। ইনি আমার দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার

মা-বাপ কেহ নাই—আমার উপরেই নির্ভর।'

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আসুন না চক্রবর্ত্তিমশায়, আমার বাড়ীতেই আসুন।"

বাড়ীতে লইয়া-গিয়া ক্ষেমঙ্করী একবার নলিনাক্ষকে ডাকিলেন। নলিনাক্ষ তখন বাহির হইয়া গেছেন।

খুড়া আসনগ্রহণ করিলেন—কমলা মেজের উপরে বসিল। খুড়া কহিলেন "দেখুন, আমার এই ভাইঝিব ভাগ্য বড় মন্দ। বিবাহের পরদিনেই ইহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেছেন—ইহার সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ নাই। হরিদাসীর ইচ্ছা ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া তীর্থবাস করে—ধর্ম্ম ছাড়া উহার সান্ত্বনার সামগ্রী আর ত কিছুই নাই। এখানে আমার বাড়ী নয়—আমার চাকরি আছে—উপার্জ্জন করিয়া আমাকে সংসার চালাইতে হয়। আমি যে এখানে আসিয়া ইহাকে লইয়া থাকিব, আমার এমন সুবিধা নাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এটিকে আপনার মেয়ের মত যদি কাছে রাখেন, তবে আমি বড় নিশ্চিন্ত হই। যখনি অসুবিধাবোধ করিবেন, গাজিপুরে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, দুদিন ইহাকে কাছে রাখিলেই মেয়েটি কি রত্ন, তাহা বুঝিতে পারিবেন—তখন মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িতে চাহিবেন না।"

ক্ষেমঙ্করী খুসি হইয়া কহিলেন—"আহা, এ ত ভাল কথা। এমন মেয়েটিকে আপনি যে আমার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন—এ ত আমার মস্ত লাভ। আমি কতদিন রাস্তা হইতে পরের মেয়েকে বাড়ীতে আনিয়া খাওয়াইয়া-পরাইয়া আনন্দ করি, কিন্তু তাহাদের ত রাখিতে পারি না। তা হরিদাসী আমারই হইল—আপনি ইহার জন্য কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আমার ছেলের কথা অবশ্য আপনারা পাঁচজনের কাছে শুনিয়া থাকিবেন—নলিনাক্ষ—সে বড় ভাল ছেলে। সে ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ নাই।"

খুড়া কহিলেন—"নলিনাক্ষবাবুর নাম সকলেই জানে। তিনি এখানে আপনার কাছে থাকেন জানিয়া আমি আরো নিশ্চিন্ত। আমি শুনিয়াছি, বিবাহের পর দুর্ঘটনায় তাঁহার স্ত্রী জলে ডুবিয়া মারা যাওয়াতে তিনি সেই অবধি একরকম ব্রহ্মচারীর মতই আছেন।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"সে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে—ও কথা আর তুলিবেন না—মনে করিলেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।"

খুড়া কহিলেন—"যদি অনুমতি করেন, তবে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখিয়া এখন বিদায় হই। মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব। ইহার একটি বড় বোন আছে—সেও আপনাকে প্রণাম করিতে আসিবে।"

খুড়া চলিয়া গেলে ক্ষেমঙ্করী কমলাকে কাছে টানিয়া-লইয়া কহিলেন, "এস ত মা, দেখি! তোমার বয়স ত বেশি নয়। আহা, তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে, জগতে এমন পাষাণও আছে! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বিধাতা এত রূপ কখনো বৃথা নষ্ট করিবার জন্য গড়েন নাই।"—বলিয়া কমলার চিবুক

স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"এখানে তোমার সমবয়সী সঙ্গিনী কেহ নাই—একলা আমার কাছে থাকিতে পারিবে ত ?"

কমলা তাহার দুই বড় বড় স্নিগ্ধ চক্ষে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া কহিল, "পারিব মা !"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"তোমার দিন কাটিবে কি করিয়া, আমি তাই ভাবিতেছি।"

কমলা কহিল—"আমি তোমার কাজ করিব।"

ক্ষেমঙ্করী। পোড়াকপাল ! আমার আবার কাজ ! সংসারে ঐ ত আমার একটিমাত্র ছেলে—সেও সন্ন্যাসীর মত থাকে—কখনো যদি বলিত মা, 'এইটে আমার দরকার আছে, আমি এইটে খেতে চাই, আমি এইটে ভালবাসি', তবে আমি কত খুসি হইতাম—তাও কখনো বলে না। রোজগার ঢের করে, হাতে কিছুই রাখে না—কত সৎকাজে যে কতদিকে খরচ করে, তাহা কাহাকে জানিতেও দেয় না। দেখ বাছা, আমার কাছে যখন তোমাকে চব্বিশ-ঘণ্টা থাকিতে হইবে, তখন এ কথা আগে হইতেই বলিয়া রাখিতেছি, আমার মুখে আমার ছেলের গুণগান বারবার শুনিয়া তোমার বিরক্ত ধরিবে—কিন্তু ঐটে তোমাকে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।

কমলা পুলকিতচিত্তে চক্ষু নত করিল।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আমি তোমাকে কি কাজ দিব, তাই ভাবিতেছি। সেলাই করিতে জান ?"

কমলা কহিল—"ভাল জানি না মা।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আচ্ছা, আমি তোমাকে সেলাই শিখাইয়া দিব।"

ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করিলেন—"পড়িতে জান ত ?"

কমলা কহিল—"হাঁ, জানি।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"সে হইল ভাল। চোখে ত আর চস্‌মা নহিলে দেখিতে পাই না—তুমি আমাকে পড়িয়া শোনাইতে পারিবে।"

কমলা কহিল—"আমি রাঁধাবাড়া-ঘর-কন্নার কাজ সমস্ত শিখিয়াছি।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"অমন অন্নপূর্ণার মত চেহারা, তুমি যদি রাঁধাবাড়ার কাজ না জানিবে ত কে জানিবে! আজ পর্য্যন্ত নলিনকে আমি নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছি—আমার অসুখ হইলে বরঞ্চ স্বপাক রাঁধিয়া খায়, তবু আর কাহারো হাতে খায় না। এবার হইতে তোমার কল্যাণে তাহার স্বপাক খাওয়া আমি ঘোচাইব। আর অক্ষম হইয়া পড়িলে আমাকেও যদি চারটিখানি হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খাওয়াও ত আমার তাহাতে অনভি-রুচি হইবে না। চল মা, তোমাকে আমার ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর সমস্ত দেখাইয়া আনি।"

এই বলিয়া ক্ষেমঙ্করী তাঁহার ক্ষুদ্র ঘর-কন্নার সমস্ত নেপথ্যগৃহ কমলাকে দেখাই-লেন। কমলা ইতিমধ্যে একটা অবকাশ বুঝিয়া আস্তে আস্তে আপনার দরখাস্ত জারি করিল। কহিল, "মা, আমাকে আজকে রাঁধিতে দাও না।"

ক্ষেমঙ্করী একটুখানি হাসিলেন। কহিলেন,

"মা, রাজা জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার রাজত্ব ছাড়িতে চায় না—এম্‌নি মায়ার বন্ধন! গৃহিণীর রাজত্ব ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে—জীবনে অনেক জিনিষ ছাড়িতে হইয়াছে—তবু ওটুকু সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়াই আছে। এই কর্ত্তৃত্বটুকু প্রাণ ধরিয়া আর কাহারো হাতে ছাড়িয়া দিতে মন সরে না। সর্ব্বদাই ভয় হয়, আমি যেমন করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিয়াছি, পাছে আর কেহ তাহা উলট্‌পালট্‌ করিয়া দেয়। পাছে রান্নার সময় কোথাও লেশমাত্র নোংরামি ঘটে। কিন্তু মরিতে বসিয়াও যদি এই হাঁড়িকুঁড়ির ভাবনা লইয়া বেলা বহিয়া যায়, তবে আর করিলাম কি? তা মা, আজকের মত তুমিই রাঁধ—দুইচারদিন যাক্‌—ক্রমে সমস্ত ভার আপনিই তোমার হাতে পড়িবে—আমিও ভগবানে মন দিবার সময় পাইব। বন্ধন একেবারেই ত কাটে না—এখনো দুইচারিদিন মন চঞ্চল হইয়া থাকিবে—ভাঁড়ার ঘরের সিংহাসনটি কম নয়।"

এই বলিয়া ক্ষেমঙ্করী, কি রাঁধিতে হইবে, কি করিতে হইবে, কমলাকে সমস্ত উপদেশ দিয়া পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন। ক্ষেমঙ্করীর কাছে আজ কমলার ঘরকন্নার পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কমলা তাহার স্বাভাবিক তৎপরতার সহিত রন্ধনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া, কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় এলোচুল ঝুঁটি করিয়া-লইয়া রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

নলিনাক্ষ বাহির হইতে বাড়ীতে ফিরিলেই প্রথমে তাহার মাকে দেখিতে যাইত। তাহার মাতার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে কখনই ছাড়িত না। আজ বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র রান্নাঘরের শব্দ এবং গন্ধ তাহাকে আক্রমণ করিল। মা এখন রান্নায় প্রবৃত্ত আছেন মনে করিয়া নলিনাক্ষ রান্নাঘরের দরজার সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পদশব্দে চকিত কমলা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে নলিনাক্ষের সহিত তাহার চোখে-চোখে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতাটা রাখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিল—কোমরে আঁচল জড়ান ছিল—টানাটানি করিয়া ঘোম্‌টা যখন মাথার কিনারায় উঠিল, বিস্মিত নলিনাক্ষ তখন সেখান হইতে চলিয়া গেছে। তাহার পর কমলা যখন হাতা তুলিয়া লইল, তখন তাহার হাত কাঁপিতেছে।

পূজা সকাল-সকাল সারিয়া ক্ষেমঙ্করী যখন রান্নাঘরে গেলেন, দেখিলেন, রান্না সারা হইয়া গেছে। ঘর ধুইয়া কমলা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে কোথাও পোড়াকাঠ বা তরকারির খোসা বা কোনোপ্রকার অপরিচ্ছন্নতা নাই। দেখিয়া ক্ষেমঙ্করী মনে মনে খুসি হইলেন, কহিলেন, "মা, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে।"

নলিনাক্ষ আহারে বসিলে ক্ষেমঙ্করী তাহার সম্মুখে বসিলেন—আর একটি সঙ্কুচিত প্রাণী কান পাতিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল—উঁকি মারিতে সাহস করিতেছিল না—ভয়ে মরিয়া যাইতেছিল,—পাছে তাহার রান্না খারাপ হইয়া থাকে।

ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিন, আজ রান্নাটা কেমন হইয়াছে?"

নলিনাক্ষ ভোজ্যপদার্থসম্বন্ধে সমজ্‌দার ছিল না—তাই ক্ষেমঙ্করী এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্ন কখনো তাহাকে করিতেন না। আজ বিশেষ কৌতূহলবশতই জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলিনাক্ষ যে অন্ধকার রান্নাঘরের নূতন রহস্যের পরিচয় পাইয়াছে, তাহা তাহার মা জানিতেন না। ইদানীং মাতার শরীর খারাপ হওয়াতে নলিনাক্ষ রাঁধিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে মাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করিতে পারে নাই। আজ নূতন লোককে রন্ধনে নিযুক্ত দেখিয়া সে মনে মনে খুসি হইয়াছে। রান্না কিরূপ হইয়াছে, তাহা সে বিশেষ মনোযোগ করে নাই—কিন্তু উৎসাহের সহিত কহিল, "রান্না চমৎকার হইয়াছে মা!"

আড়াল হইতে এই উৎসাহবাক্য শুনিয়া কমলা আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে পাশের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার চঞ্চল বক্ষকে দুই বাহুর দ্বারা পীড়ন করিয়া ধরিল।

আহারান্তে নলিনাক্ষ আপনার মনের মধ্যে কি-একটা অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুসারে নিভৃত অধ্যয়নে চলিয়া গেল।

বৈকালে ক্ষেমঙ্করী কমলাকে লইয়া নিজে তাহার চুল বাঁধিয়া সীমন্তে সিঁদূর পরাইয়া দিলেন—তাহার মুখ একবার এপাশে, একবার ওপাশে ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন—কমলা লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমঙ্করী মনে মনে কহিলেন, "আহা, আমি যদি এইরকমের একটি বৌ পাইতাম!"

সেই রাত্রেই ক্ষেমঙ্করীর আবার জ্বর আসিল। নলিনাক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, তোমাকে আমি কিছুদিন কাশী হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাইব। এখানে তোমার শরীর ভাল থাকিতেছে না।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"সেটি হবে না বাছা। দুচারদিন বাঁচাইয়া রাখিবার আশায় আমাকে যে কাশী ছাড়িয়া অন্য কোথাও লইয়া মারিবি, সেটি হবে না। ওকি মা, তুমি যে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছ? যাও যাও, শুতে যাও। সমস্ত রাত অমন জাগিয়া কাটাইলে চলিবে না। আমি যে-কদিন ব্যামোতে আছি, তোমাকেই ত সব দেখিতে-শুনিতে হইবে। রাত জাগিলে পারিবে কেন? যা ত নলিন, একবার ও ঘরে যা ত।"

নলিনাক্ষ পাশের ঘরে যাইতেই কমলা ক্ষেমঙ্করীর পদতলে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আর জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার মা ছিলে মা। নহিলে কোথাও কিছু নাই, তোমাকে এমন করিয়া পাইব কেন? দেখ, আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি বাজে কোনো লোকের সেবা সহিতে পারি না—কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দিলে আমার গা যেন জুড়াইয়া যায়। আশ্চর্য্য এই যে, মনে হইতেছে, তোমাকে আমি যেন কতকাল ধরিয়াই জানি। তোমাকে ত একটুও পর মনে হয় না। তা শোন মা, তুমি নিশ্চিন্ত-মনে ঘুমাইতে যাও। পাশের ঘরে নলিন

রহিল—মার সেবা সে আর কারো হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না—তা হাজার বারণ করি আর যাই করি ওর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কে বল! কিন্তু ওর একটি গুণ আছে, রাত জাগুক্ আর যাই করুক, ওর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যাইবে না—তার কারণ, ও কখনো কিছুতে অস্থির হয় না। আমার ঠিক তার উল্টা। মা, তুমি বোধ করি মনে মনে হাসিতেছ। ভাবিতেছ, নলিনের কথা আরম্ভ হইল, এবারে আর কথা থামিবে না। তা মা, এক ছেলে থাকিলে ঐরকমই হয়। আর নলিনের মত ছেলেই বা কজন মায়ের হয়। সত্য বলিতেছি, আমি একএকবার ভাবি—নলিন ত আমার বাপ—ও আমার জন্যে যতটা করিয়াছে, আমি কি উহার জন্যে ততটা করিতে পারি! ঐ দেখ, আবার নলিনের কথা। কিন্তু আর নয় যাও মা, তুমি শুইতে যাও। না না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না—তুমি যাও—তুমি থাকিলে আমার ঘুম আসিবে না। বুড়োমানুষ, লোক কাছে থাকিলেই কেবল বকিতে ইচ্ছা করে।"

পরদিন কমলাই ঘরকন্নার সমুদয় ভার গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ পূর্ব্বদিকের বারান্দার এক অংশ ঘিরিয়া-লইয়া মার্ব্বেল দিয়া বাঁধাইয়া একটি ছোট ঘর করিয়া লইয়াছিল—ইহাই তাহার উপাসনাগৃহ ছিল—এবং মধ্যাহ্নে এখানেই সে আসনের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিত। সেদিন প্রাতে সে ঘরে নলিনাক্ষ প্রবেশ করিয়াই দেখিল—ঘরটি ধৌত, মার্জ্জিত, পরিচ্ছন্ন—ধুনা জ্বালাইবার জন্য একটি পিতলের ধুনুচি ছিল, সেটি আজ সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। শেল্‌ফের উপরে তাহার কয়েকখানি বই ও পুঁথি সুসজ্জিত করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গৃহখানির যত্নমার্জ্জিত নির্ম্মলতার উপরে মুক্তদ্বার দিয়া প্রভাতরৌদ্রের উজ্জ্বলতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দেখিয়া স্নান হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত নলিনাক্ষের মনে বিশেষ একটি তৃপ্তির সঞ্চার হইল।

কমলা প্রভাতে ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ক্ষেমঙ্করীর বিছানার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহার স্নাতমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন—"একি মা, তুমি একলাই ঘাটে গিয়াছিলে? আমি আজ ভোর হইতে ভাবিতেছিলাম, আমার অসুখ, তুমি কাহার সঙ্গে স্নানে যাইবে। কিন্তু তোমার অল্প বয়স, এমন করিয়া একলা—"

কমলা কহিল—"মা, আমার বাপের বাড়ীর একটা চাকর থাকিতে পারে নাই, আমাকে দেখিতে কাল রাত্রেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন "আহা, তোমার খুড়িমা বোধ হয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—চাকরটাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তা বেশ হইয়াছে—সে তোমার কাছেই থাক্ না—তোমার কাজে-কর্ম্মে সাহায্য করিবে। কোথায় সে, তাহাকে ডাক না।"

কমলা উমেশকে লইয়া হাজির করিল। উমেশ গড় হইয়া ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর নাম কিরে?"

সে কহিল—"আমার নাম উমেশ।"

বলিয়া অকারণ-বিকশিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া গেল।

ক্ষেমঙ্করী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"উমেশ, তোর এই বাহারে কাপড়খানা তোকে কে দিলে রে?"

উমেশ কমলাকে দেখাইয়া কহিল—"মা দিয়াছেন।"

ক্ষেমঙ্করী কমলার দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, "আমি বলি, উমেশ বুঝি ওর শাশুড়ির কাছ হইতে জামাইষষ্ঠী পাইয়াছে।"

ক্ষেমঙ্করীর স্নেহলাভ করিয়া উমেশ এই-খানেই রহিয়া গেল।

উমেশকে সহায় করিয়া কমলা দিনের বেলাকার সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলিল। স্বহস্তে নলিনাক্ষের শোবার ঘর ঝাঁট দিয়া, তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া, সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। নলিনাক্ষের ময়লা ছাড়া-ধুতি ঘরের এক-কোণে পড়িয়া ছিল। কমলা সেখানি ধুইয়া, শুকাইয়া, ভাঁজ করিয়া আল্‌নার উপরে ঝুলাইয়া রাখিল। ঘরের যে-সব জিনিষ কিছুমাত্র অপরিষ্কার ছিল না, তাহাও সে মুছিবার ছলে বারবার নাড়াচাড়া করিয়া লইল। বিছানার শিয়রের কাছে দেয়ালে একটা গা-আল্‌মারি ছিল -সেটা খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল নীচের থাকে নলিনাক্ষের একজোড়া খড়ম আছে। তাড়াতাড়ি সেই খড়মজোড়াটি তুলিয়া-লইয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল—এবং ছোট শিশুটির মত বুকের কাছে ধরিয়া অঞ্চল দিয়া বারবার তাহার ধুলা মুছাইয়া দিল।

বৈকালে কমলা ক্ষেমঙ্করীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন-সময় হেমনলিনী একটি ফুলের সাজি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিল।

ক্ষেমঙ্করী উঠিয়া-বসিয়া কহিলেন—"এস এস, হেম এস, বোস। অন্নদাবাবু ভাল আছেন?"

হেমনলিনী কহিল "তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া কাল আসিতে পারি নাই, আজ তিনি ভাল আছেন।"

কমলাকে দেখাইয়া ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"এই দেখ বাছা,—শিশুকালে আমার মা মারা গেছেন; তিনি আবার জন্ম লইয়া এতদিন পরে কাল পথের মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখা দিয়াছেন। আমার মার নাম ছিল হরি-ভাবিনী—এবারে হরিদাসী নাম লইয়াছেন। কিন্তু হেম, এমন লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছ? বল ত!"

কমলা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। হেম-নলিনীর সঙ্গে আস্তে আস্তে তাঁহার পরিচয় হইয়া গেল।

হেমনলিনী ক্ষেমঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আপনার শরীর কেমন আছে?"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"দেখ, আমার যে বয়স হইয়াছে, এখন আমাকে আর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। আমি যে এখনো আছি, এই ঢের। কিন্তু তাই বলিয়া কালকে চিরদিন ফাঁকি দেওয়া ত চলিবে না। তা তুমি যখন কথাটা পাড়িয়াছ, ভালই হই-য়াছে—তোমাকে কিছুদিন হইতে বলিব-বলিব করিতেছি, সুবিধা হইতেছে না। কাল

রাত্রে আবার যখন আমাকে জ্বরে ধরিল, তখন ঠিক করিলাম, আর বিলম্ব করা ভাল হইতেছে না। দেখ বাছা, ছেলেবয়সে আমাকে যদি কেহ বিবাহের কথা বলিত ত লজ্জায় মরিয়া যাইতাম—কিন্তু তোমাদের ত সেরকম শিক্ষা নয়। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ— বয়সও হইয়াছে—তোমাদের কাছে এ সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলা চলে। সেইজন্তই কথাটা পাড়িতেছি, তুমি আমার কাছে লজ্জা করিয়ো না। আচ্ছা বল ত বাছা, সেদিন তোমার বাবার কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি কি তোমাকে বলেন নি ?"

হেমনলিনী নতমুখে কহিল—"হাঁ, বলিয়াছিলেন।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"কিন্তু তুমি বাছা সে কথায় নিশ্চয়ই রাজি হও নাই। যদি রাজি হইতে, তবে অন্নদাবাবু তখনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। তুমি ভাবিলে, আমার নলিন সন্ন্যাসিমানুষ, দিনরাত্রি কি-সব যোগযাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন ? হোক্ আমার ছেলে, তবু কথাটা উড়াইয়া দিবার নয়। উহাকে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, উহার যেন কিছুতেই কোনোদিন আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল ;—আমি উহাকে জন্মকাল হইতে জানি, আমার কথাটা বিশ্বাস করিয়ো। ও এত বেশি ভালবাসিতে পারে যে, সেই ভয়েই ও আপনাকে এত করিয়া দমন করিয়া রাখে। উহার এই সন্ন্যাসের খোলা ভাঙিয়া যে উহার হৃদয় পাইবে, সে বড় মধুর জিনিষটি পাইবে, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। মা হেম, তুমি বালিকা নও, তুমি শিক্ষিত, তুমি আমার নলিনের কাছ হইতেই দীক্ষা লইয়াছ, তোমাকে নলিনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি যদি মরিতে পারি, তবে বড় নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব। নহিলে, আমি নিশ্চয় জানি, আমি মরিলে ও আর বিবাহই করিবে না। তখন ওর কি দশা হইবে, ভাবিয়া দেখ দেখি ! একেবারে ভাসিয়া বেড়াইবে ! যাই হোক্, বল ত বাছা, তুমি ত নলিনকে শ্রদ্ধা কর আমি জানি, তবে তোমার মনে আপত্তি উঠিতেছে কেন ?"

হেমনলিনী নতনেত্রে কহিল, "মা, তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে কর, তবে আমার কোনো আপত্তি নাই।"

শুনিয়া ক্ষেমঙ্করী হেমনলিনীকে কাছে টানিয়া-লইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলিলেন না।

"হরিদাসি, এই ফুলগুলো"—বলিতে বলিতে পাশে চাহিয়া দেখিলেন, হরিদাসী নাই। সে নিঃশব্দপদে কখন্ উঠিয়া গেছে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর ক্ষেমঙ্করীর কাছে হেমনলিনী সঙ্কোচবোধ করিল—ক্ষেমঙ্করীরও বাধো-বাধো করিতে লাগিল। তখন হেম কহিল, "মা, আজ তবে সকাল-সকাল যাই। বাবার শরীর ভাল নাই।"—বলিয়া ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিল। ক্ষেমঙ্করী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন— এস মা, এস !"

হেমনলিনী চলিয়া গেলে ক্ষেমঙ্করী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কহিলেন, "নলিন, আর আমি দেরি করিতে পারিব না।"

নলিনাক্ষ কহিল, "ব্যাপারখানা কি ?"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আমি আজ হেমকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম—সে ত রাজি হইয়াছে, এখন তোমার কোনো ওজর আমি শুনিতে চাই না। আমার শরীর ত দেখিতেছিস্। তোদের একটা স্থিতি না করিয়া আমি কোনোমতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমি ঐ কথাই ভাবি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "আচ্ছা মা, ভাবিয়ো না, তুমি ভাল করিয়া ঘুমাইয়ো, তুমি যেমন ইচ্ছা কর, তাহাই হইবে।"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে ক্ষেমঙ্করী ডাকিলেন—"হরিদাসি।"

কমলা পাশের ঘর হইতে চলিয়া আসিল। তখন অপরাহ্নের আলোক ম্লান হইয়া ঘর প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। হরিদাসীর মুখ ভাল করিয়া দেখা গেল না। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"বাছা, এই ফুলগুলিতে জল দিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখ।" বলিয়া বাছিয়া একটি গোলাপ তুলিয়া ফুলের সাজিটি কমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

কমলা তাহার মধ্যে কতকগুলি ফুল তুলিয়া একটি থালায় সাজাইয়া নলিনাক্ষের উপাসনাগৃহের আসনের সম্মুখে রাখিল। আর কতকগুলি একটি বাটিতে করিয়া নলিনাক্ষের শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর রাখিয়া দিল। বাকি কয়েকটি ফুল লইয়া সেই দেয়ালের গায়ের আল্‌মারিটা খুলিল এবং সেই খড়মজোড়ার উপর ফুলগুলি রাখিয়া তাহার উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেই তাহার চোখ দিয়া আজ ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই খড়ম ছাড়া জগতে তাহার আর কিছুই নাই—পদসেবার অধিকারও হারাইতে বসিয়াছে।

এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে কে প্রবেশ করিতেই কমলা ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আল্‌মারির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ। কোনোদিকে কমলা পালাইবার পথ পাইল না—লজ্জায় কমলা সেই আসন্ন সায়াহ্নের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল না কেন ?

নলিনাক্ষ ঘরের মধ্যে কমলাকে দেখিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলাও আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তখন নলিনাক্ষ পুনর্ব্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেয়েটি আল্‌মারি খুলিয়া কি করিতেছিল—তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিলই বা কেন ? কৌতূহলবশত নলিনাক্ষ আল্‌মারি খুলিয়া দেখিল—তাহার খড়মজোড়ার উপর কতকগুলি সদ্যসিক্ত ফুল রহিয়াছে। তখন সে আবার আল্‌মারির দরজা বন্ধ করিয়া শয়নগৃহের জান্‌লার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শীতসূর্য্যাস্তের ক্ষণকালীন আভা মিলাইয়া আসিয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ক্রমশ।

ত্রিবঙ্কুর।

৫

যখন সূর্য্যের প্রখর তাপ কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অপরাহ্ন চারঘটিকার সময় গায়ক-বাদকের দল আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দলে-দলে গরুর গাড়িতে আসিয়াছে। মহারাজা নিজ প্রাসাদের গায়ক-বাদক-দিগকে কিয়ৎকালের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

উহাদের মুখাবয়ব-রেখা সূক্ষ্ম ও সুকুমার, সমস্ত মুখশ্রী কলা-গুণিজন-সুলভ। নিঃশব্দে নগ্নপদে উহারা প্রবেশ করিল,—মার্জ্জারবৎ মখমল কোমল-পদ-সঞ্চারে প্রবেশ করিল। দস্তুরমত সম্মানপ্রদর্শনার্থ একটু নতশির হইয়া, তাহার পর ভূতলে গালিচার উপর উপবেশন করিল। মাথায় ক্ষুদ্র জরির পাগ্‌ড়ি; উহাদের গাত্র পুরাকালীন গ্রীসীয়-ধরণে—রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত;—উদরের একপার্শ্ব অনাবৃত রাখিয়া উহা স্কন্ধের উপর দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় ধাতব বলয়ে ভূষিত। উহাদের ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা পরিচ্ছদের মধ্য হইতে আতর-গোলাপের গন্ধ ভুবভুর্ করিয়া বাহির হইতেছে।

উহারা তাম্রতন্ত্রীযুক্ত বড় বড় বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে আনিয়াছে:—সে একপ্রকার বিরাট্ "ম্যাণ্ডলিন্" কিংবা "গিতার্"। যন্ত্রগুলির ডাণ্ডি বাঁকিয়া-গিয়া একপ্রকার বিরাড়াকার জন্তুবিশেষের মস্তকে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই "গিতার্"-গুলি বিভিন্নপ্রকারের এবং উহা হইতে বিভিন্নপ্রকারের স্বর নিঃসৃত হইবার কথা। কিন্তু সকলগুলিরই স্বরকোষ প্রকাণ্ড এবং স্বরের রেস্ বৃদ্ধি করিবার জন্য যন্ত্রগুলির গায়ে ফাঁপা তুম্বসকল রহিয়াছে; মনে হয়, যেন একটি তরু-কাণ্ডের গায়ে বড়-বড় ফল ফলিয়া রহিয়াছে। এই যন্ত্রগুলি রং করা, গিল্টি-করা, হাতীর-দাঁতের কাজ-করা, বহু পুরাতন, সম্পূর্ণরূপে শুষ্কীকৃত, শব্দযোনি ও বহুমূল্য দুর্লভ জিনিষ। কেবলমাত্র উহাদের বিচিত্র আকৃতি ও অদ্ভুত গঠন দেখিয়াই আমার মনে রহস্যময় ভাব—ভারতসংক্রান্ত রহস্যময় ভাব জাগিয়া উঠিল। বাদকেরা হাসিমুখে যন্ত্রগুলি আমাকে দেখাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গুলীর দ্বারা, কতকগুলি ছড়ের দ্বারা ও কতকগুলি ঝিনুকের দ্বারা বাজাইতে হয়। আর-এক-প্রকার যন্ত্র আছে তাহার তারের উপর কালো ডিম্বাকার একটুক্‌রা আবলুশ্-কাষ্ঠ বুলাইয়া বাজাইতে হয়। বাদনের কি সূক্ষ্ম ভেদ! এই সকল সূক্ষ্মভেদ আমাদের পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্যার অগোচর!

তা ছাড়া, কতকগুলি "টম্‌টম্"-বাদ্য আছে,—সেগুলি বিভিন্ন সুরে বাঁধা। আবার, কতকগুলি বালক গায়ক আসিয়াছে; উহাদের পরিচ্ছদ বিশেষরূপে জম্‌কালো ও

বিলাস-জৃম্ভিত। আমার জন্য, সঙ্গীত-কার্য্যের যে অনুক্রমণিকা ছাপা হইয়াছে, উহার একখণ্ড আমার হস্তে উহারা অর্পণ করিল। গায়ক-বাদকদিগের শ্রুতিমধুর অদ্ভুত নাম উহাতে লেখা রহিয়াছে—সকল নামগুলিই প্রায় দ্বাদশ-পদাক্ষরের।

পাঁচটা বাজিল। গায়ক-বাদকের দল সব-সুদ্ধ প্রায় ২৫জন। উহারা গালিচার উপর আসীন। যে বৈঠকখানা-ঘরে উহারা বসিয়াছে, সেই ঘরের মধ্যে এখনি যেন সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে। দোলার দোলন-বৎ অলসভাবে "পাখা" চলিতেছে। এইবার সঙ্গীতের আলাপ সুরু হইবে; কেন না, যন্ত্রের অগ্রপ্রান্তস্থ পশুমূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলি হইতে না-জানি-কি ভয়ানক শব্দ—এই "টম্‌টম্"-গুলি হইতে না-জানি-কি ভীষণ কোলাহলই সমুত্থিত হইবে। আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি—একটা তুমুল শব্দ শুনিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি। গায়ক-বাদকদিগের পশ্চাদ্ভাগে একটা খিলানা-কৃতি দ্বার উন্মুক্ত; তাহার পরেই একটা শাদা প্রবেশ-দালান। সেই দালানে অস্তমান সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি প্রবেশ করিয়া মহারাজের একদল সৈন্যের উপর নিপতিত হইয়াছে। শোভার্থ সজ্জিত এই সৈনিকমূর্ত্তিগুলি, মাথায় লাল পাগড়ি পরিয়া, রক্তিম সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান। এদিকে, গায়ক-বাদকের দল ঘোর-ঘোর অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে নিমজ্জিত।

উহাদের সঙ্গীত কি আরম্ভ হইয়াছে? হাঁ, বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছে। কেন না, দেখিতেছি, উহারা গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কৈ, কিছুই ত শুনা যাইতেছে না।...না না—ঐ যে...একটি ক্ষুদ্র তার-গ্রামের সুর—কদাচিৎ শ্রুতিগ্রাহ্য—"লোহেন্‌গ্রিন্" গীতিনাট্যের উদ্ঘাটক আলাপ-চারীর ন্যায় অতি-বিলম্বিত লয়ে বাদিত হইতেছে। পরে, উহা "দুন্"-লয়ে বাজিতে লাগিল, তান-পল্লবে জটিল হইয়া উঠিল; কিন্তু শব্দের মাত্রা, আদৌ বৃদ্ধি না পাইয়া, শুধু ছন্দোময় গুঞ্জনে পরিণত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই সকল শক্তিমান্ তন্ত্রীসমূহ হইতে নিঃশব্দপ্রায় সঙ্গীত বাহির হইতেছে।—যেন করপুট-বন্দী মক্ষিকার গুন্‌গুন্‌শব্দ, যেন জান্‌লা-শাসির গায়ে পতঙ্গের ঘর্ষণশব্দ অথবা যেন dragon-fly মক্ষিকার কাতরধ্বনি বলিয়া মনে হয়। উহাদের মধ্যে একজন মুখের মধ্যে একটি ছোট ইস্পাতের জিনিষ রাখিয়া তাহার উপর গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিয়া ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় একপ্রকার ছন্‌ছন্ শব্দ বাহির করিতেছে। একটা বৃহৎ "সিতারের" উপর এবং অন্যান্য বিচিত্র যন্ত্রের উপর বাদক যেন অতি ভয়ে-ভয়ে ও সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া প্রায় একই সুর ক্রমাগত বাহির করিতেছে। পেচকের চাপা কণ্ঠস্বরের ন্যায়, ক্রমাগত হুহু!—হুহু!—এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে। আবার সুদূর সমুদ্রতটের উপর বীচিভঙ্গশব্দের ন্যায় একপ্রকার চাপা আওয়াজ কোন-এক যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। একপ্রকার "টম্‌টম্"-জাতীয় যন্ত্র আছে, তাহার কিনারার উপর বাদক অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া

বাজাইতেছে।...তাহার পর, হঠাৎ অতর্কিত-পূর্ব্ব কতকগুলি ঝাঁকানি আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড প্রকোপ মুহূর্ত্তদ্বয়-স্থায়ী। সেই সময় "গিতার্"-তন্ত্রীগুলি যার-পর-নাই সজোরে কম্পিত হইতে থাকে এবং টম্‌টম্‌গুলি হইতেও তখন গম্ভীর চাপা আওয়াজ বাহির হইতে থাকে। কোন কাঁপা মাটির উপর গুরুপদক্ষেপে হাতী চলিয়া গেলে যেরূপ শব্দ হয়, উহার সেইরূপ শব্দ; অথবা কোন গূঢ়মার্গ আন্তর্ভৌম জল-প্রবাহনিঃসৃত কল্লোলের ন্যায়—কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত প্রশমিত হইল। আবার সেই পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দপ্রায় বাদনক্রিয়া।

একজন ব্রাহ্মণযুবক—যার চোখদুটি অতি সুন্দর—সে ভূমির উপর আসনবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে; তাহার জানুর উপর একটি জিনিষ রহিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যেরূপ সুশোভন ও সুরুচিসূচক, এ জিনিষটা ঠিক তার বিপরীত। ইহা নিতান্ত রূঢ় গ্রাম্যধরণের। একটা সামান্য মাটির হাঁড়ি, তাহার মধ্যে কতকগুলো নুড়ি। হাঁড়ির বৃহৎ মুখটা তাহার নগ্ন সুবক্র বক্ষের উপর স্থাপিত। ঐ মুখের কিয়দংশ যে পরিমাণে খুলিয়া রাখিতেছে কিংবা বুকে চাপিয়া বন্ধ করিতেছে, তদনুসারে তন্নিঃসৃত শব্দেরও তারতম্য হইতেছে। এবং অঙ্গুলীর দ্বারা সেই হাঁড়িটা এত তাড়াতাড়ি বাজাইতেছে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উহার শব্দ কখন লঘু, কখন গভীর, কখন খট্‌খটে। এক-এক সময়ে যখন নুড়িগুলা নড়িয়া উঠে, তখন শিলাবৃষ্টির ন্যায় পট্‌পট্‌শব্দ শ্রুত হয়। পূর্ব্বোক্ত শব্দময় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন কোন একটি গিতার্ হইতে স্বতন্ত্রভাবে তান উত্থিত হয়, তখন কোন স্বর হইতে স্বরান্তরে গড়াইয়া যাইবার সময় ধ্বনিটা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। সেই আবেগময় তানটি সজোরে পূর্ণস্বরে বাদিত হয় এবং তীব্র যাতনায় যেন একেবারে অধীর ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তখন টম্‌টম্‌গুলির বাদ্য এই কম্পমান আর্ত্তনাদকে আবৃত না করিয়া, একপ্রকার রহস্যময় তুমুল শব্দ বাহির করিতে থাকে। উহা মানবহৃদয়ের দুঃখ-যাতনার পরাকাষ্ঠা এরূপ তীব্রভাবে প্রকাশ করে—যাহা আমাদের উচ্চতম পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সাধ্যাতীত।...

—"হস্তীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে"—একজন বলিয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত শুনিতেছিলাম—এই বাক্যে আমার সেই মোহ ছুটিয়া গেল।...হাতী আবার কোথা হইতে আসিল?—ও! মনে পড়িয়াছে; ···ভারতীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত হাওদা-সমেত একটি হস্তী দেখিবার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; এবং তদনুসারে আমার জন্য রাজার হস্তিশালা হইতে হস্তী সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ হয়।

সঙ্গীত থামিয়া গেল। কেন না, হাতী দেখিবার জন্য এখন আমাকে ঘরের বাহির হইতে হইবে। বাড়ীর দ্বারদেশ পার হইয়াই হঠাৎ দেখিলাম—আমার সম্মুখে তিনটা বড়-বড় হস্তী দণ্ডায়মান। অস্তমান সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত এই তিনটা হাতী দ্বারদেশের সন্নিকটে আমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। উহাদের সর্ব্বশরীর

সাজসজ্জায় এরূপ আবৃত যে, সম্মুখে আসিয়া প্রথমে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না;—লক্ষ্য হয় শুধু উহাদের সুদীর্ঘ আত্মরক্ষণের অস্ত্র দন্তদ্বয়, উহাদের কালো-ফুট্‌কি-যুক্ত গোলাপি-রঙের প্রকাণ্ড শুণ্ড, আর উহাদের কর্ণদ্বয়—যাহা হাতপাখার ন্যায় ক্রমাগত আন্দোলিত হইতেছে। সবুজ ও লাল রঙের দীর্ঘ পরিচ্ছদ; স্তম্ভযুক্ত হাওদা, ঘণ্টিকার হার এবং জরির টুপি—যাহা উহাদের বিস্তৃত ললাট পর্য্যন্ত নাবিয়া আসিয়াছে। তিনটা হাতীই প্রকাণ্ড, ৭০বৎসর বয়ঃক্রম, বেশ বলিষ্ঠ, আর এমন বশ্য—এমন শান্ত। উহাদের বুদ্ধিব্যঞ্জক ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত হইল। আর এমন শায়েস্তা, - যাহাতে আমি ধীরে-সুস্থে আরোহণ করিতে পারি, তজ্জন্য অনেকক্ষণ জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল।

আবার যখন আমি সেই মক্ষিকাগুঞ্জনবৎ সঙ্গীতের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, তখন শুভ গোধূলি সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে যখন সেই স্তব্ধপ্রায় সমবেত সঙ্গীতের বিরাম হইতেছে—সেই অবকাশকালে প্রত্যেক যন্ত্র আবার পৃথক্‌ভাবে খুব উচ্চৈঃস্বরে সজোরে তান ধরিতেছে। বাদক কোনটাকে ছড়ের দ্বারা, কোনটাকে হস্তের দ্বারা প্রপীড়িত—কোনটাকে বা মিজ্‌রাফের দ্বারা সন্তাড়িত করিতেছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক, কোনটাকে তারের উপর ডিম্বাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড বুলাইয়া কাঁদাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই বিষাদময় সুরগুলি, মঙ্গলিয়া কিংবা চীনদেশীয় সঙ্গীতের ন্যায়, আমাদের নিকট নিতান্ত দূরদেশীয় কিংবা দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয় না। আমরা উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। সেই একই মানবজাতির সুতীব্র মর্ম্মবেদনা উহারা প্রকাশ করিতেছে—যে জাতি কালসহকারে আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মূলত ভিন্ন নহে। "জিগান্"-নামক য়ুরোপীয় বেদিয়ারা আমাদের মধ্যেও এইরূপ জ্বরজ্বালাময় সঙ্গীত আনয়ন করিয়াছে।

শেষে কণ্ঠসঙ্গীত। একটির পর একটি সেই সমস্ত সুকুমার বালকগুলি (সুন্দর-পরিচ্ছদ-পরিহিত—বড় বড় চোখ) খুব তাড়াতাড়ি দ্রুতলয়ে কতকগুলি গান গাহিল। উহাদের বালকণ্ঠস্বর ইহারই মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে—চিরিয়া গিয়াছে। জরির পাগ্‌ড়িপরা একটি লোক উহাদের অধিনেতা ও শিক্ষক। সে মাথা নীচু করিয়া—পাখীকে যেরূপ সর্পেরা দৃষ্টির দ্বারা মুগ্ধ করে, সেইরূপ সমস্তক্ষণ উহাদের চোখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। মনে হইল, যেন সে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা উহাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে;—ইচ্ছা করিলে যেন সে উহাদের ভঙ্গুর ক্ষীণ কণ্ঠযন্ত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। "কনিষ্ঠ-গ্রামের" সুরে উহারা যে গান ধরিয়াছিল, সেই গানটিতে কুপিত কোন দেবতাকে প্রার্থনার দ্বারা প্রসন্ন করা হইতেছে।

সর্ব্বশেষে, ঐ দলের যে প্রধান গায়ক, এইবার তাহার গাহিবার পালা। ত্রিশবর্ষবয়স্ক যুবাপুরুষ, দেখিতে বলিষ্ঠ, সুন্দর মুখশ্রী। কোন যুবতী কামিনীর বল্লভ আর

তাহাকে ভালবাসে না বলিয়া সেই কামিনী আক্ষেপ করিয়া যে গান করিতেছে, সেই গানটি ঐ গায়ক এইবার আমাকে শুনাইবে।

সে বরাবর ভূতলেই বসিয়া ছিল। প্রথমে সে গানটি মনে-মনে ঠিক করিয়া লইল, পরে, তাহার দৃষ্টি একটু ঘোর-ঘোর ভাব ধারণ করিল। তাহার পরেই সে একেবারে সজোরে গলা ছাড়িয়া দিল। প্রাচ্যদেশীয় শানাই প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর অতীব তীক্ষ্ণ। স্বর-গ্রামের কতকগুলি সুরের উপর পুরুষোচিত বল-সহকারে (একটু কর্কশ) উহার কণ্ঠস্বর স্থায়ী হইল। খুব তীব্রভাবে (আমার পক্ষে নূতন) কত মর্ম্ম-বেদনাই প্রকাশ করিল। তাহার মুখে কত দুঃখের ভঙ্গী—তাহার সরু-সরু হস্তে কত কষ্টের সঙ্কোচন প্রকটিত হইতে লাগিল। এই সমস্তই উচ্চাঙ্গকলার মধ্যে ধর্ত্তব্য।

ইহারা মহারাজের খাস্ গায়ক-বাদক। মহারাজা প্রতিদিন রুদ্ধপ্রাসাদে, ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, উহাদের সঙ্গীত শুনিয়া থাকেন। তাঁহার চারিপার্শ্বে ভৃত্যবর্গ মার্জ্জারবৎ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং জোড়হস্তে নতশিরে ক্রমাগত প্রণাম করে।...জীবনের দুঃখযন্ত্রণা, প্রেমের দুঃখ-যন্ত্রণা, মৃত্যুর দুঃখযন্ত্রণা—এই সম্বন্ধে মহা-রাজের কল্পনা ও চিন্তাপ্রবাহ আমাদিগের হইতে না-জানি কত ভিন্ন!...আদব-কায়দার সহিত বিদেশীয় ভাষায় বাধ বাধ ভাবে আমা-দের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা স্বল্পক্ষণ হইয়াছে, তাহাতে যত-না আমি তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছি—তাহা অপেক্ষা এই উচ্চাঙ্গের দুর্লভ সঙ্গীত (যাহা তাঁহার খাস্ জিনিষ) শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনো-ভাবের একটু বেশি আভাস পাইয়াছি, সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়সঙ্গীত।

(১)

শতাব্দীর দীপ্তসূর্য্য এইবার উঠিয়াছে জ্বলি
প্রাচী-পথ আলো করি। জাগিয়াছে নব বলে বলী
এশিয়ার সুপ্ত সিংহ। বহি আসে গভীর গর্জ্জন;
ছুটে আসে লক্ষধারে নবোদিত রবির কিরণ
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে।—ভাগ্য যার চির অন্ধকার,
তার দ্বারে আজ কেন সৌভাগ্যের শুভ সমাচার?
এ কাহার পরিহাস, কার্ এই নিদারুণ খেলা,
শ্মশানে বসাতে চাহে অকস্মাৎ উৎসবের মেলা?

(২)

মৃত যারা, তারা আজ কি বুঝিবে জীবনের স্বাদ ?
তাদের ললাটে লেখা —আছে, থাক্ কলঙ্ক-সংবাদ।
তবু কি ঘুমাবে তারা ? ঘুমে কারো নাই অধিকার ;
মেলি তন্দ্রালস আঁখি দেখে নিক্ আলোক আবার।
হায় আঁধারের কীট, চিরদিন রহিলি এমন ;
বৃথা তোর আশে-পাশে আসিতেছে নব জাগরণ !
তাই মুগ্ধ বিশ্ব ভরি উঠিছে যে জয়কোলাহল,
তার মাঝে যোগ দিতে আজ তোর বক্ষে নাহি বল।

(৩)

তাই তোর মুখে শুনি' জয় আর যশের ঘোষণা,
ব্যঙ্গ করে বিশ্ববাসী। রাখ্ তবে নিষ্ফল বন্দনা !
এই দৃপ্ত সমারোহ, উৎসবের মঙ্গল-আচার,
মাতৃভূমি, হে বিধবা, এতে তোর নাই অধিকার।
কোথা সে অম্বর, মুক্ত, কোথা এই লোহার পিঞ্জর !
পারে কি খাঁচার পাখী ফুটাইতে অভ্রবাহী স্বর ?
তবু আজ প্রাণভরা উদ্বেলিত আনন্দ-বিস্ময়,
বাহিরে ঝঙ্কারি তোলে, —জয় জয়, জাপানের জয়।

(৪)

কাদের এ দেশ ? তারা কবে হ'ল জগতে প্রকাশ ?
কি ভাব ? কি ভাষা ?—ছিল এদের কি কোন ইতিহাস,
যাহে ভাবী গৌরবের চিহ্ন কিছু গিয়েছিল দেখা ?
কিম্বা এরা সদ্যস্পৃষ্ট, ভাগ্যচক্রে উঠে এল একা
জ্বলন্ত গ্রহের মত, আত্মতেজে আপনি অধীর,
নাই ত্রুটি, নাই দৈন্য ; হেরি' বিশ্ব নোয়াইল শির ?
আজ শুধু প্রাণভরা বন্দনার আনন্দ-বিস্ময়
উচ্ছ্বাসে গাহিয়া উঠে,—জয় জয়, এশিয়ার জয়।

(৫)

কাহাদের বাহুবল সংগঠিত হৃদয়ের বলে,
সংযমী সাধক ত্যাগী কারা দীর্ঘ তপস্যার ফলে,
ধর্ম্ম কাহাদের কর্ম্মে জেগে থাকে ধ্রুবতারামত,
দর্পে কারা নহে স্ফীত, অবিচার-অবমানে নত,

কারা হেন শক্তিধর বিশ্বস্পৰ্দ্ধী জয় অগণন
পারে নির্ব্বিকারচিত্তে অনায়াসে করিতে গ্রহণ,
কাহাদের দেশহিত নহে শুধু বাক্যের প্রবাহ,
ঘরে ঘরে যার তরে পড়ে গেছে মরণে উৎসাহ!

(৬)

মিত ভাষা, ক্ষিপ্র কর্ম্ম, সৌজন্য, ঔদার্য্য অতুলন,
শান্ত সহৃদয় গৃহে, রণে কারা অজেয় ভীষণ,
যুদ্ধশেষে কারা ভুলে প্রতিহিংসা ঘোর বৈরিতার,
ক্ষমা-প্রেমে করে কারা অরাতিরে চির আপনার,
নাই ভীরু পলায়িত অবিশ্বাসী কাহাদের ঘরে,
বীরপ্রসূ অন্তঃপুরে ক্ষমা নাই কাপুরুষ-তরে,
ছিন্ন করি' আলিঙ্গন পতি পুত্রে আপনার হাতে
সাজায়ে পাঠায় কারা মৃত্যুশুভ্র যশের সভাতে।

(৭)

কাহাদের রাজতন্ত্র পীড়নের যন্ত্রসম নয়,
রাজভক্তি প্রজাপ্রীতি এক খাতে একসাথে বয়,
রাজার প্রাসাদ হ'তে তুচ্ছতম দীনের কুটীরে
ঐক্যে সখ্যে পূত মন্ত্র বাজিতেছে অন্তরে-বাহিরে,
কাহাদের গৃহস্থালী ধনধান্যে স্বাস্থ্যে উদ্ভাসিত,
শিল্পসজ্জা পণ্যভার দেশে আর বিদেশে পূজিত,
কাদের বাণিজ্যতরী উড়াইয়া বিজয়কেতন
সগর্ব্বে সর্ব্বত্র ফিরি করিতেছে সৌভাগ্যকীর্ত্তন।

(৮)

কাহাদের শিক্ষাদীক্ষা দেশান্তরে লভি নববল
স্বজাতির স্বদেশের করিতেছে শুধু মুখোজ্জ্বল,
কাহাদের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ নহে গণ্য ধনে আর কুলে।
গৌরবের সিংহাসন গুণিজনে শিরে লয় তুলে!
কারা এই মহাজাতি, ধন্য কোন্ রত্নগর্ভা ভূমি?
কেমনে বলিব তাহা, হে ভারত, কি সুধাও তুমি।
হে মোর দুর্ব্বলা মাতা, তব রক্তে গঠিত যে প্রাণ,
বীরযোগ্য বন্দনা কি তার কণ্ঠে পায় কভু স্থান?

(৯)

ধন্য ধন্য বীরভূমি, ধন্য ধন্য হে বীরের জাতি,
জয় হোক্, জয় হোক্, চিরদীপ্ত থাক্ যশোভাতি।
আবার আসুক্ শান্তি, গ্লানিশেষে পরম মঙ্গল,
পুন তব গৃহে গৃহে উঠুক্ আনন্দকোলাহল!
ধনধান্যে থাকো পূর্ণ, প্রীতিপুণ্যে অক্ষুণ্ণ সতত,
সমস্ত বিশ্বের শিরে শোভা পাও কিরীটের মত।
মহোজ্জ্বল অতীতের অনাদৃত ভ্রংশ-ধ্বংস-প'রে
তোমারে সম্মুখে করি' এশিয়া দাঁড়াক্ গর্ব্বভরে।

(১০)

পশ্চিমের গণ্ডী ছাড়ি' ভাগ্যরেখা পূবে এল সরি,
হারায়ো না পশ্চিমের মিথ্যা আর স্বার্থ অনুসরি'
ভাগ্যের সে অভ্যুদয়। হারায়ো না আপন সম্বল,
ত্যাগে স্নিগ্ধ, সত্যে শুদ্ধ প্রাচ্যের সে আদর্শ উজ্জ্বল,
যে সাধনবলে পেলে বিধাতার অনুকম্পা হেন,
সে আলোক জ্বেলে রেখো, ভস্ম তাতে নাহি হ'য়ো যেন,
পড়িয়ো না রাজরোষে, কত রাজ্য চূর্ণ হ'ল যায়,
মহাসম্রাটের সেই দণ্ড যেন পড়ে না মাথায়।

(১১)

ভারতের পুণ্যতীর্থ, এশিয়ার প্রজ্বলিত আশা,
এই ভালো, এই ভালো! আর যেন বাড়ে না পিপাসা।
অতিদর্প, অতিলোভ, অতিস্ফীতি ধ্বংসের কারণ,
এই চিরন্তন নীতি চিরদিন রাখিয়ো স্মরণ।
আর তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ অভিমানি হে মোর স্বদেশ,
নবীনের পদতলে বসি লহ নব উপদেশ।
বল তারে,—জ্ঞাতিত্ব না মান যদি, মোরে শিষ্যবৎ
ডাক স্নেহে তব কাছে, গড়ে' তোল মোর ভবিষ্যৎ।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

রঘুবংশ।

দিলীপের পুত্রলাভ।

রঘুবংশের প্রথম আট সর্গে বর্ণিত বৃত্তান্তগুলির মূল কোথায়, এই প্রশ্ন স্বতই সকল পাঠকের মনে উদয় হয়। এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা রঘুবংশের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে পাওয়া যায় না। অথচ বিষয়টি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। সম্প্রতি 'বঙ্গবাসী'-সংবাদপত্রের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড' পাঠ করিতে করিতে একটি উপাখ্যান দেখিতে পাইলাম, সেটির সহিত রঘুবংশের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত 'দিলীপের পুত্রলাভ' প্রসঙ্গের কতকটা মিল রহিয়াছে।* পাঠকগণের, বিশেষত কলেজের ছাত্রবর্গের নিকট বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত না থাকাই সম্ভব, এই বিবেচনায় অদ্যকার প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম।

রঘুবংশবর্ণিত বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে ও স্থূলভাবে বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়:—একদা রাজা দিলীপ অন্যমনস্কতাবশত ইন্দ্রের কামধেনুর প্রতি সমুচিত সম্মান দেখান নাই। সেই অবমাননায় কামধেনু রাজাকে শাপ দেন যে, তাঁহার দুহিতার সেবা না করিয়া রাজা অপত্যলাভ করিবেন না। পরে রাজা অনপত্যতানিবন্ধন মনস্তাপে কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। ঋষিবর যোগবলে শাপবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া রাজাকে স্বীয় আশ্রমে প্রতিপালিতা কামধেনুদুহিতা নন্দিনীকে ভক্তিসহকারে সেবা করিতে বলিলেন। রাজাও নন্দিনীর সেবা করিয়া সেই গবীর নিকট অভীপ্সিত বর পাইলেন ও যথাসময়ে পুত্রলাভ করিলেন। গোচারণকালে একটি ঘটনা হইয়াছিল, সেটিও উল্লেখযোগ্য। একদিন এক প্রকাণ্ডকায় সিংহ ধেনুকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন ধর্ম্মশীল রাজা আপনার দেহাবনিময়ে ধেনুর নিষ্ক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু বাস্তবিক সেটি মায়াসিংহ রাজার ভক্তিপরীক্ষার্থ নন্দিনাকর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

সূক্ষ্ম ঘটনাগুলি ছাড়িয়া দিলে মুখ্যবৃত্তান্তটি এই দাঁড়ায় যে, ধেনুর সমুচিত সম্মান না করিলে শ্রেয়োহানি ঘটে ও পুত্রলাভের জন্য গোসেবা প্রশস্ত উপায়। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়, গোসেবায় অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় ও গোজাতির প্রতি অনাদরে প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রসঙ্গে ঋতম্ভর রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্তটি এই:—ঋতম্ভর রাজা পুত্রলাভের জন্য জাবালি-ঋষির উপদেশে গোসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং গবীর উচ্ছিষ্ট তৃণজলে ক্ষুৎপিপাসা প্রশমিত করিয়াছিলেন। একদিন রাজা বনশোভানিরীক্ষণে অন্যমনা হইয়া আছেন, এমন সময়ে এক সিংহ আসিয়া গবীকে আক্রমণ করিল। অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির

---

* রামায়ণে ঘটনাটি অবশ্য নাই। রামায়ণে দিলীপ রঘুর প্রপিতামহ। (আদিকাণ্ড, ৭০ অধ্যায়)

সহিত কালিদাসবর্ণিত ঘটনাগুলির ঐক্য নাই। কিন্তু উপাখ্যানের শেষভাগে আবার একইপ্রকারের বৃত্তান্ত রহিয়াছে। ঋতম্ভর রাজাও আবার অন্ত ধেনু চরাইয়া তাহার নিকট ঈপ্সিত পুত্রবর পাইলেন। তাহা হইলেই দেখা গেল, উভয় স্থলেই ঋষির উপদেশে গোসেবার কথা রহিয়াছে। উভয় স্থলেই গোসেবার প্রণালী, সিংহের আক্রমণ ও সেবাপ্রসন্না ধেনুর বরদান, অনেকটা একরকমের। পাঠকগণ রঘুবংশের শ্লোকগুলির সহিত পৌরাণিক উপাখ্যানের সৌসাদৃশ্য সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিবেন, এই আশায় উপাখ্যানটির প্রধান প্রধান অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম।*

ঋতম্ভরোঽত্র নৃপতিরনপত্যঃ পুরাভবৎ।
কলত্রাণি বহূন্যস্য ন পুত্রং প্রাপ তেষু বৈ॥ ১৭॥
তদা জাবালিনামানং মুনিং দৈবাদুপাগতম্।
পপ্রচ্ছ কুশলোদ্যুক্তঃ স পুত্রোৎপত্তিকারণম্॥ ১৮॥
স্বামিন্ বন্ধ্যস্য মে ব্রূহি পুত্রোৎপত্তিকরং বচঃ।
যৎ কৃত্বা জায়তেঽপত্যং মম বংশধরং বরম্॥ ১৯॥

* * * *

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা জগাদ মুনিসত্তমঃ।
সুতোৎপত্তিকরং বাক্যং প্রণতস্য সুতার্থিনঃ॥ ২১॥
অপত্যপ্রাপ্তিকামস্য সন্ত্যপায়াস্ত্রয়ঃ প্রভো।
বিষ্ণোঃ প্রসাদো গোশ্চাপি শিবস্যাপ্যথবা পুনঃ॥ ২২॥
তস্মাত্ত্বং কুরু বৈ পূজাং ধেনোর্দেবতনোর্নৃপ।
যস্যাঃ পুচ্ছে মুখে শৃঙ্গে পৃষ্ঠে দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ২৩॥
সা তুষ্টা দাস্যতি ক্ষিপ্রং বাঞ্ছিতং ধর্ম্মসংযুতম্।
এবং বিদিত্বা গোপূজাং বিধেহি ত্বমৃতম্ভর॥ ২৪॥

১৮শ অধ্যায়।

তস্মাত্ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ গোপূজাং বৈ সমাচর।
সা তুষ্টা দাস্যতি ক্ষিপ্রং পুত্রং ধর্ম্মপরায়ণম্॥ ১৫॥

* * * *

জাবালিঃ কথয়ামাস ধেনুপূজাং যথাবিধি।
প্রত্যহং বিপিনং গচ্ছেচ্চারণায় ব্রতী তু গোঃ॥ ১৭॥
গবে যবাংস্তু সম্ভোজ্য গোময়স্থান্ সমাহরেৎ।
ভক্ষণায় যবাস্তে তু পুত্রকামেন ভূপতে॥ ১৮॥
সা যদা পিবতে তোয়ং তদা পেয়ং জলং শুচি।
সোচ্চস্থানে যদা তিষ্ঠেৎ তদা নীচাসনস্থিতঃ॥ ১৯॥
দংশান্ নিবারয়েন্নিত্যং যবসং স্বয়মাহরেৎ।
এবং প্রকুর্ব্বতঃ পুত্রং দাস্যতে ধর্ম্মতৎপরম্॥ ২০॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুত্রকাম ঋতম্ভরঃ।
ব্রতঞ্চকার ধর্ম্মাত্মা ধেনুপূজাং সমাচরন্॥ ২১॥
প্রত্যহং কুরুতে গাঞ্চ যবসাদ্যেন তোষিতাম্।
দংশান্ ন্যবারয়দ্ধীমান্ যবভক্ষ্যকৃতাদরঃ॥ ২২॥
এবং ধেনুং পূজয়তো গতাস্তু দিবসা ঘনাঃ।
বনমধ্যে তৃণাদাংশ্চ চরন্তীমকুতোভয়াম্॥ ২৩॥
একদা নৃপতিস্তস্য বনস্থ শ্রীনিরীক্ষণে।
ন্যস্তদৃষ্টিঃ স পরিতো বভ্রাম সুকুতূহলী॥ ২৪॥
তদাগত্যাহনদ্গাং বৈ পঞ্চাস্যঃ কাননান্তরাৎ।
ক্রোশন্তীং বহুধা দীনাং হম্বারাবেণ দুঃখিতাম্॥ ২৫॥
তদা নৃপঃ সমাগত্য বিলোক্য নিজমাতরম্।
সিংহেন নিহতাং পশ্চন্ রুরোদাতীব বিহ্বলঃ॥ ২৬॥

* * * *

পূর্ব্ববৎ পালয়ন্ ধেনুং জগাম বিপিনং মহৎ।
রামনাম স্মরন্নিত্যং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ৪০॥
তস্মৈ তুষ্টা তু সুরভিঃ প্রোবাচ পরিতোষিতা।
রাজন্ বরয় মত্তো বৈ বরং হৃৎস্থং মনোরমম্॥ ৪১॥
তদা প্রোবাচ বৈ রাজা পুত্রং দেহি মনোরমম্।
রামভক্তং পিতুর্ভক্তং স্বধর্ম্মপ্রতিপালকম্॥ ৪২॥
তুষ্টা দত্ত্বা বরং সাপি তস্মৈ রাজ্ঞে সুতার্থিনে।
জগামাদর্শনং দেবী কামধেনুঃ কৃপাবতী॥ ৪৩॥

১৯শ অধ্যায়।

রঘুবংশের আরও অনেক স্থলের সহিত পদ্মপুরাণের কোন কোন শ্লোকের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ

* শ্লোকগুলি 'বঙ্গবাসী'-সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

রঘুবংশের আরম্ভে কালিদাসের বিনয়গর্ভ শ্লোককয়েকটির সহিত পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডের আরম্ভে বর্ণিত শেষনাগের উক্তির কয়েকটি শ্লোকের সৌসাদৃশ্য দেখাইতেছি:

রাবণারিকথাবার্দ্ধৌ মশকো মাদৃশঃ কিয়ান্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মোহিতা ন বিদন্ত্যপি ॥ ১২ ॥
তথাপি ভো ময়া তুভ্যং বক্তব্যং স্বীয়শক্তিতঃ।
পক্ষিণঃ স্বগতিপ্রায়ং খে গচ্ছন্তি সুবিস্তরে ॥ ১৩ ॥

*　　*　　*　　*

রঘুনাথস্য সৎকীর্ত্তির্মদ্বুদ্ধিং নির্ম্মলীমসাম্।
করিষ্যতেঽগ্নিসম্পর্কাৎ কনকং ত্বমলং যথা ॥ ১৫ ॥

১ম অধ্যায়।

রঘুবংশে দিলীপের পুত্রলাভবৃত্তান্ত ও পদ্মপুরাণে ঋতম্ভরের বৃত্তান্ত পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিতে গেলে দেখা যায়, পৌরাণিক বৃত্তান্তটি নিতান্ত কাঁচা (Crude); পক্ষান্তরে, কালিদাসের বর্ণনায় প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতে এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, মহাকবি এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ইংরাজি-সাহিত্যে দেখিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ শেক্স্পীয়র তাঁহার নাটকের গল্পাংশ অপরের নিকট গ্রহণ করিয়াও, স্বীয়প্রতিভাবলে আখ্যান-বস্তুর পরিবর্ত্তন করিয়া ও পাত্রগণের চরিত্র নূতন করিয়া গড়িয়া, অসাধারণ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। প্রতিভাশালী কবির কৃতিত্বই এইখানে। সেইজন্যই কবিবর মিল্টন্ বলিয়াছেন 'To borrow and to better it in the process is no plagiary.'

আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে কালিদাস প্রতিভার বলে উপাখ্যানটির কিরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, ইহা একটা দেখিবার জিনিষ। প্রথমত দেখিতেছি, কালিদাস সমস্ত বৃত্তান্তটিকে rationalise করিতেছেন, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর করিয়া তুলিতেছেন। অলৌকিক ঘটনাকেও প্রাকৃতিক নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার চেষ্টা শেক্স্পীয়র তাঁহার 'টেম্পেষ্ট' প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতঘটনামূলক নাটকে করিয়াছেন। কালিদাসের প্রণালীও এস্থলে কতকটা সেইরূপ। গোনিগ্রহে শ্রেয়োহানি ও গোসেবায় পুত্রলাভ হয়, এই পৌরাণিক তত্ত্বটি সাধারণভাবে বলিলে যেন কেমন-কেমন শুনায়। সম্ভবত কালিদাসের কালেও স্বাধীনচিন্তার স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল,—পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তগুলি শিক্ষিত-লোকে অবিচারিতভাবে লইতে ইতস্তত করিত। সেইজন্য কবি যে-সে ধেনুর কথা বলিতেছেন না,—ইন্দ্রের কামধেনু ও বশিষ্ঠপ্রতিপালিতা কামধেনুদুহিতা নন্দিনীর কথা বলিতেছেন। দেবযোনি ধেনুর ক্রোধে ও প্রসাদে কি না হইতে পারে? কালিদাসের বর্ণিত ব্যাপারে বেশ একটা সুস্পষ্ট কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কামধেনুর অবমাননায় যখন অনপত্যতা ঘটিয়াছিল, তখন কামধেনু-দুহিতার সেবায় যে সেই দৈবী বাধা দূরীভূত হইয়া পুত্রলাভ ঘটিবে, ইহা বেশ সুসঙ্গত মনে হয়। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে এই দৈবী বাধার উল্লেখ নাই। অবমানিতা কামধেনুর সাক্ষাৎভাবে প্রসাদন না করাটা পাছে অসঙ্গত ঠেকে, সেইজন্য কালিদাস বশিষ্ঠের

মুখ দিয়া সে কথাটাও বলাইয়াছেন যে, ঐ উপায় এখন সুদূরপরাহত। দিলীপের অন্যমনস্কতার কারণটা যদিও সুরুচিসঙ্গত নহে বলিয়া বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না, কিন্তু সেখানেও একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ওরূপ অপরাধের ঐরূপ শাস্তিই ঠিক যুক্তিযুক্ত। এ ঠিক সেই শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপের ন্যায় logical। এইখানেই কালিদাসের কৃতিত্ব ও কাব্যকৌশল। এতক্ষণে বুঝা গেল, শাপবৃত্তান্ত সংযোজনা করিয়া পরবর্ত্তী বৃত্তান্তটিকে অনেকটা সম্ভবপর করিয়া তোলা হইয়াছে। ইহার উপর আবার বশিষ্ঠের যোগবলে শাপবৃত্তান্তজ্ঞান প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার সন্নিবেশিত করিয়া ঘটনাটিকে আরও জমাট করিয়া তোলা হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক সকল ব্যাপারেই যেন একটা অলৌকিকের প্রভাব আসিয়া পড়িতেছে।

ঋতম্ভরের উপাখ্যানে ধেনুর বরেই তাঁহার পুত্রলাভ ঘটিল। কালিদাস এখানেও দুইটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া ব্যাপারটিকে সম্ভবপর করিয়া (rationalise করিয়া) তুলিয়াছেন। প্রথম, যদিও নন্দিনীর বরেই রাজার অভীষ্টসিদ্ধি হইল, তথাপি কবি একটা স্থূলকারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা সেই সুলক্ষণা গবীর দুগ্ধপান করিতে আদিষ্ট হইলেন। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, যজ্ঞীয় চরুর ন্যায় সেই দুগ্ধেই পুত্রবীজ নিহিত ছিল। দ্বিতীয়, কুলগুরুর আদেশে রাজা ও রাজ্ঞী ইন্দ্রিয়দমনে বাহ্যাভ্যন্তরশুচি হইয়া সংযম অভ্যাস করিলেন। এখানেও আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সেই পবিত্রভাবে সম্মেলনেই পুণ্যাত্মা রঘুর উৎপত্তি। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ঋষিবাক্যের অনুসারে কবি সস্ত্রীক দিলীপকে তপোবনে আনিয়াছেন ও কুলগুরুনির্দ্দিষ্ট সংযম পালন করাইয়াছেন। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে এ সকল কিছুই নাই।

পরে সিংহের আক্রমণব্যাপারেও কালিদাস একটু সূক্ষ্ম শিল্প দেখাইয়াছেন। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে দেখা যায় যে, ঋতম্ভর রাজা বনশোভায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া গবীকে ছাড়িয়া এদিক্-ওদিক্ বেড়াইতেছিলেন,—'পরিতো বভ্রাম',—ইত্যবসরে সিংহ গবীকে আক্রমণ করিল। ইহাতে রাজার অপরাধ গুরুতর ঠেকে। অপর পক্ষে কালিদাস বলিতেছেন, রাজা দিলীপ অন্য কোথাও যান নাই, ধেনুর কাছে থাকিয়াই ক্ষণমাত্রের জন্য পর্ব্বতের শোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই অনর্থ ঘটিল। এখানে রাজার অপরাধ খুব কম। তাহার উপরও আবার কালিদাস একটা যুক্তির অবতারণা করিয়া রাজার অপরাধ আরও লঘু করিয়া দিতেছেন :—'সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈঃ' ইহা ভাবিয়াই রাজা অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পরে আবার যখন দেখিলাম যে, সেটা মায়াসিংহ,—নন্দিনীর মায়ায় পরিকল্পিত, তখন ত বেশই বুঝিলাম, রাজার কিছুই অনবধানতা ঘটে নাই; রাজা বরাবর ধেনুর উপর ন্যস্তদৃষ্টি থাকিলেও এই অনর্থ ঘটিত। রাজাকে উন্মনস্ক করিবার জন্যই যে নন্দিনী দেবমায়ায় পর্ব্বতশোভা বাড়াইয়া তোলেন নাই, অথবা দেবমায়ায় রাজাকে

উদ্ভ্রান্তচিত্ত করেন নাই, এ কথাই বা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? ঋতম্ভর রাজা আততায়ী সিংহের বধের উদ্যোগ না করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলাইলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে জাবালির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পক্ষান্তরে, কালিদাসের বর্ণনায় দিলীপের বীরত্ব, করুণচিত্ততা, ক্ষত্রিয়োচিত আর্ত্তত্রাণশীলতা, মহানুভাবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সম্যক্‌ পরিচয় পাই। ঋতম্ভরের ন্যায় দিলীপ সত্যসত্যই গোবধ-জনিতপাপভাক্‌ হইলেন না। এই প্রসঙ্গেও আবার অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে মূলবৃত্তান্তটি আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

আরও দুইএকটি খুঁটিনাটিতে কালিদাসের প্রতিভার পরিচয় পাই। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে জাবালি-ঋষি দৈবাৎ আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। এটা নিতান্ত অকৌশলীর মত নির্দ্দেশ। কালিদাস, দিলীপকে অপুত্রতার কারণ ও প্রতিষেধের উপায় জানিবার জন্য, কুলগুরুসন্নিধানে যাত্রা করাইয়াছেন। তিনি যে পুণ্যাত্মা ছিলেন, ইহা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার ইন্দ্রালয়ে অবাধ গতিবিধি ছিল, এ কথাও কবি কৌশলে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। স্বর্গ হইতে অবতরণকালে তাঁহার অন্যমনস্কতার যে সুরুচিবিগর্হিত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেখানেও তিনি ধর্ম্মজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন,—কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তাড়নায় নহে, ইহাই কবির অভিপ্রেত। দুইটি স্থলে তাঁহার অন্যমনস্কতার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহার চিত্তের একাগ্রতার কিঞ্চিৎ ত্রুটি ছিল। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্যই কুলগুরু তাঁহাকে সংযম অভ্যাস ও গোসেবা করিতে নিযুক্ত করিলেন, এরূপও অনুমান করা যায়। গোময়স্থ-যব ভক্ষণ একটু বীভৎস হয় বলিয়া, কালিদাস এটুকু পরিবর্জন করিয়াছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে এইরূপ অনেক কাব্যকৌশলই ধরা পড়ে।

পদে পদে পুরাণবর্ণিত ঋতম্ভরের উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের সর্গদ্বয়ের তুলনা করিতে গিয়া, কবির কাব্যকে বড় আংশিক ও খণ্ডিত ভাবে দেখিতে হইয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলাম, মূলগল্পটি কবি স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে কেমন ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। এখন যদি সমস্ত বিবরণটি একত্র করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কালিদাসের কি অতুলনীয় প্রতিভা ও রচনাকৌশল। দিলীপের ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও পরাক্রম, তাঁহার সুশাসন ও রাজ্যসমৃদ্ধি, অপুত্রতাবশত চিত্তক্ষোভ ও এই অনর্থপ্রশমনের জন্য কুলগুরুর উপদেশ লইতে সস্ত্রীক তপোবন-যাত্রা; পথের শোভাবর্ণন, তপোবনের মাহাত্ম্য ও তপোবনবাসিগণের ক্রিয়াকলাপ-বর্ণন; বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর সহিত দিলীপ ও সুদক্ষিণার সদালাপ, বশিষ্ঠের কুশল-পরিপ্রশ্ন, রাজার সখেদ নিবেদন, বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক যোগবলে অপুত্রতার কারণনির্দ্দেশ ও তৎপ্রশমনের উপায়নির্দ্দেশ; নন্দিনীর তৎসমকালে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, রাজা ও রাজ্ঞীর শুদ্ধাচারে গোসেবা, রাজার

গোচারণে যাত্রা; কাননের শোভাবর্ণন, ধেনুর চেষ্টাদিবর্ণন, সিংহের সহিত রাজার কথোপকথন, নন্দিনার প্রসন্নতা ও বরদান; রাজার তপোবনে প্রত্যাবর্ত্তন ও নন্দিনীর নিদেশপালন; ইত্যাদি পর-পর ঘটনা কালিদাস সুকৌশলে ও সুসৌষ্ঠবে সাজাইয়া একখানি সুবিন্যস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহাতে দিলীপের দেবচরিত্র জীবন্তভাবে পরিস্ফুট হইতেছে, এবং তপোবন ও গোচারণস্থলী, গোপপল্লী ও শৈলশিখর, পয়স্বিনী হোমধেনু ও শুদ্ধসংযত ঋষিদম্পতি, এ সমস্তই তাহার পশ্চাতে ও পার্শ্বে স্পষ্ট মানসগোচর হইতেছে। পঞ্চতন্ত্রোক্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যেমন মৃতসিংহের অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন, মহাকবি কালিদাসও সেইরূপ অনন্যসামান্য প্রতিভাবলে শুষ্কনীরস পৌরাণিক উপাখ্যানটিকে সরস ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশীয় মদ্য।

এদেশে বহুপূর্ব্বকাল হইতে মদ্যপান প্রচলিত আছে। সমাজের যে সকল লোকই মদ্যপান করিত, এমন নহে; কিংবা মদ্যপান যে দূষণীয় বিবেচিত হইত না, তাহাও নহে। এখানে মদ্যের বা মদ্যপানের দোষগুণ বিচার্য্য নহে। মদ্য যে বিদেশ হইতে এদেশে আসে নাই, উহার সাধনক্রম যে দেশীয়, তাহাই এখানে স্মরণ করা যাইতেছে। বস্তুত যে দেশে মধুপর্ক ও মধু সবিশেষ প্রচলিত ছিল, সে দেশে মধুশব্দের এক অর্থ মদ্য হওয়া বিচিত্র ছিল না। যে দেশে তাল ও খর্জ্জুর রস একদিন রাখিয়া দিলে সে রসের মাদকতা জন্মে, সে দেশে মদ্যপিপাসা অক্লেশে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। যে দেশে মধুপুষ্প (মউলফুল) ও ইক্ষুরস সুলভ্য ছিল, সে দেশে নানাবিধ মদ্য প্রস্তুত করা দুরূহ ছিল না। বৈদিককালের সোমরস গণনার মধ্যে না আনিয়া পুলস্ত্য দ্বাদশবিধ মদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।* যথা, পানস—পনস বা কাঁঠাল হইতে, দ্রাক্ষ দ্রাক্ষা হইতে, মাধ্বীক মধু হইতে, খার্জ্জুর—পাকা খেজুর হইতে, তাল—পাকা তাল হইতে, ঐক্ষব—ইক্ষুরস হইতে, মাধ্বীক—মউলফুল হইতে, টাঙ্ক—কপিত্থ হইতে, মার্দ্বীক—মৃদ্বিক বা দ্রাক্ষাবিশেষ হইতে, মৈরেয়—ধাত্রীপুষ্প-(ধাউফুল)-যোগে শর্করা হইতে, নারিকেলজ—নারিকেলের জল বা নারিকেলগাছের রস হইতে, মদ্য জাত হইত। এই একাদশবিধ মদ্য ব্যতীত সুরানামক মদ্য ছিল। মনু বলেন—

* মনুসংহিতার টীকায় কুল্লূকভট্ট।

গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।

গুড় হইতে গৌড়ী, যবতণ্ডুলাদি হইতে পৈষ্টী এবং মধুপুষ্প (মউল) হইতে মাধ্বী*—এই ত্রিবিধ মদ্য সুরানামে কথিত হইত। পুলস্ত্য সুরাকে সকল মদ্যের অধম বলিয়াছেন, এবং মনু সুরাপান কেবল শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ করেন নাই। বোধ হয়, মদ্য চ্যাবিত করিলে (চোয়াইলে) সুরা বা অর্ক (আরক) হইত। চ্যাবিত মদ্য অচ্যাবিত মদ্য অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বলিয়া সুরার অধমত্ব হইয়াছিল, কিংবা শৌণ্ডিক সুরাজীবী ছিল বলিয়া সুরা দ্বিজগণের অপেয় হইয়াছিল। সুরা বলিলে পূর্ব্বকালে পৈষ্টী সুরা অধিক বুঝাইত। সুরা চ পৈষ্টী মুখ্যোক্তা। মনু বলেন, সুরা অন্নের মল।

উপরে দ্বাদশবিধ মদ্যের প্রধান উপকরণের উল্লেখ করা গিয়াছে। বস্তুত প্রাচীনকালের কোন মদ্য কেবল একটি উপকরণে প্রস্তুত হইত না। পানস মদ্য করিতে পাকা আম, মাংস, দুগ্ধ, সিদ্ধি প্রভৃতি; দ্রাক্ষমদ্য করিতে দধি মধু; মাধ্বক-মদ্য করিতে বিড়ঙ্গ, সালেপ মিশ্রি, লবণাদি; খার্জ্জুরমদ্য করিতে কাঁঠাল-আদা; ইত্যাদি প্রযুক্ত হইত।† বঙ্গদেশের মধ্যে বেহারে এবং বেহারের মধ্যে গয়াজেলায় মদ্যপান অত্যন্ত প্রচলিত আছে। সেখানে ধনবান্ মদ্যপায়ী আম, বেল, কাঁঠাল, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি উপকরণ সুরাজীবীর নিকট পাঠাইয়া ইচ্ছামত সুরা প্রস্তুত করিয়া আনেন।

উল্লিখিত দ্বাদশবিধ মদ্য ব্যতীত অন্য বহুবিধ মদ্যের নাম পাওয়া যায়। সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদে অন্য কয়েকপ্রকার মদ্যের নাম আছে। তন্মধ্যে দুইএকটির নাম করা যাইতেছে। শীধু দ্বিবিধ;—ইক্ষুর পক্করসে সিদ্ধ, পক্করসশীধু; এবং ইক্ষুর আমরসে সিদ্ধ, শীতরসশীধু। বারুণী - পুনর্নবা (পুণ্যে)-যুক্ত তাল বা খর্জ্জুররস জাত। চলিত কথায় ইহাকে তালী বা তাড়ী বলা যাইতে পারে। অরিষ্ট পক্ক ঔষধের জলযুক্ত মদ্য, এবং আসব—অপক্ক ঔষধের জলযুক্ত মদ্য, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্যবর্গের অন্তর্গত। মদ্যের অবস্থাবিশেষ বা সঞ্জাত-মদ্যভাবকে আসব বলে।‡

বর্ণ, আস্বাদ, উৎপত্তি এবং শরীরের প্রতি ক্রিয়াভেদে মদ্য নানাবিধ। কিন্তু একটি উপাদান যাবতীয় মদ্যে বর্ত্তমান থাকে। তাহারই মাদকতাগুণে মদ্যের মাদকতা, এবং পরিমাণানুসারে মদ্যের তীক্ষ্ণতা বা মৃদুতা হয়। আধুনিক ও প্রাচীন শব্দসাম্যরক্ষার নিমিত্ত এই উপাদানকে কোহল বলা যাইবে। সুশ্রুত কোহল-নামক মদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

যে দ্রব্যে শর্করা আছে, কিংবা যাহাকে শর্করায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, তাহা হইতেই কোহল পাওয়া যাইতে পারে। শর্করার কিয়দংশ কোহলে, অপর কিয়দংশ কার্বন্ ডাক্সাইড্ নামক গ্যাসে পরিণত হয়। এনিমিত্ত শর্করার সহিত প্রচুর জল মিশ্রিত

* মধুকবৃক্ষো মধুস্তৎপুষ্পৈঃ কৃতা সা মাধ্বী।—কুল্লূকভট্ট।

† মৎস্যতন্ত্র। রাজেন্দ্রলাল in J. A. S. B. for 1873, quoted in the Report of the Bengal Excise Commission, 1883—84.

‡ আসবো মদ্যানামবস্থাবিশেষঃ সদ্যঃকৃতসংসাধনঃ সঞ্জাতমদ্যভাবঃ।—বাচস্পত্য।

করা আবশ্যক। শুষ্ক শর্করা কোহলে পরিণত হইতে পারে না। তাই আমরা চিনি ও মিছরি খাইতে পাই। শর্করারস অত্যন্ত ঘন হইলেও কোহল জন্মিতে পারে না। তাই আম, বেল প্রভৃতি ফলের মোরব্বা করা যাইতে পারে। কিন্তু জলমিশ্রিত হইলেও শর্করা স্বত কোহলে পরিণত হইতে পারে না। জলমিশ্রিত শর্করার সহিত দ্রব্য-বিশেষ যোগ করা আবশ্যক। ইহাকে মন্ত-বীজ বলা যায়। মনুর ভাষায় ইহার নাম কিণ্ব। যেমন দুগ্ধে দধিবীজ যোগ না করিলে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় না, তেমনই সজল শর্করায় কোহল-কিণ্ব না পড়িলে কোহল জন্মে না। গ্রীষ্মানুসারে তাল ও খর্জুর রস দুইতিন ঘণ্টায় মদ্যে পরিণত হয়। সে রসে জল ও শর্করা থাকে; খর্জুরবৃক্ষের পত্রাদিতে এবং বায়ুতে কোহল-কিণ্ব ধূলিবৎ বিদ্যমান আছে। কালক্রমে তাহা রসে গিয়া পড়িলে রসের শর্করার কিয়দংশ কোহলে এবং অপর কিয়দংশ কার্বন্-ডায়াক্সাইড্‌নামক গ্যাসে পরিণত হয়। ফলে রস হইতে উক্ত গ্যাসের বুদ্বুদ উঠিতে থাকে, এবং রসের মাদকতাগুণ আসে। এই কিণ্বের যোগ নিবারিত হইলে মিষ্টরসে কোহল জন্মিতে পারে না। কোহল-কিণ্ব এক উদ্ভিদ্‌বিশেষ। উহা এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। একত্রীকৃত হইলে সূক্ষ্ম বস্তুও দৃষ্ট হয়। তাড়ী চারিদিন রাখিয়া দিলে তলে শাদা ধূলার মত বস্তু জমিতে দেখা যায়। তাহাই পুঞ্জীকৃত সূক্ষ্ম উদ্ভিদরূপ কোহল-কিণ্ব। শুকাইলে তাহা শাদা ধূলার মত হয়। তদবস্থায় তাহার ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। সদ্য খেজুররসে অল্পসংখ্যক কিণ্বরূপ উদ্ভিদ পতিত হয়। কিন্তু তাহারা প্রচুর খাদ্য পাইয়া একদিকে পুষ্টিলাভ ও বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, অন্যদিকে রসের শর্করার কোহলিক বিকার উৎপন্ন হয়। তেমনই দধিবীজে দধ্যম্ল কিণ্ব থাকে। দুগ্ধে একপ্রকার শর্করা থাকে। তজ্জন্য দুগ্ধের ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ আছে। দধ্যম্ল-কিণ্বের ক্রিয়াবশত দুগ্ধশর্করার কিয়দংশ দধ্যম্লে পরিণত হয়। এইরূপ, ধান্যমণ্ডাদিসন্ধিত কাঞ্জিক বা আমানি ও তাড়ীর অম্লত্বের কারণস্বরূপ বিশেষ বিশেষ কিণ্ব আছে। কিন্তু যাবতীয় কিণ্বের একটি লক্ষণ এই আছে যে, তাহাদের অত্যল্পেই উপযুক্ত দ্রব্যের বহুপরিমাণে বিকার উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ বিকারকে সন্ধান * (fermentation) বলা যায়।

তবে, কোহল পাইতে হইলে শর্করা, জল এবং কোহল-কিণ্ব আবশ্যক। বায়ুর উষ্ণতা-বিশেষে কিণ্ব সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উষ্ণতা তদপেক্ষা উনাধিক হইলে বৃদ্ধি মন্দ-মন্দ হয়। অধিক উষ্ণতায় এই সকল কিণ্বরূপ উদ্ভিদ, অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায়, অবসন্ন বা মৃত হয়। শীতকালে খেজুররস অল্প-সময়ে মাতিয়া উঠে না, গ্রীষ্মকালে অল্পসময়ের মধ্যে মাতিয়া উঠে, এবং পরে অম্ল হইয়া পড়ে। এখানে প্রথমে কোহল-

* কেহ কেহ সন্ধান-শব্দে distillation বুঝিয়াছেন। কিন্তু ভাবপ্রকাশের সন্ধানবর্গ দেখিলে তাঁহাদের ভ্রান্তি হইবে।

কিণ্ব এবং পরে শুক্ত-কিণ্ব, এই দুই বিকার উৎপাদন করে।

শর্করা একপ্রকার নহে, নানাপ্রকার আছে। যাবতীয় শর্করা সমভাবে কোহল-কিণ্বাক্রান্ত হয় না। ইক্ষুশর্করা সহসা কোহলকিণ্বাক্রান্ত হয় না। কিন্তু মধু-সহজেই হয়। গ্রীষ্মকালে মধুর সহিত জল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে একদিনেই মধু-শর্করার কিয়দংশ কোহলে পরিণত হয়। এখানে অবশ্য বায়ুর ধূলিরূপে বিদ্যমান কোহলকিণ্ব মধুতে পতিত হয়। মধুতে দ্বিবিধ শর্করা থাকে। সদ্য মধু রৌদ্রে রাখিলে মধুর কিয়দংশ দানা বাঁধে, কিয়দংশ বাঁধে না, দ্রবভাবেই থাকে। ঐ দুই অংশ দ্বিবিধ শর্করা। যে শর্করা দানা বাঁধে, তাহা শ্বেতসারকে (যেমন পালো) বিকৃত করিলে পাওয়া যায়। এজন্য সে শর্করাকে শ্বেতসার-শর্করা বলা যায়। মধুর যে শর্করা দানা বাঁধে না, তাহা অধিকাংশ মিষ্টফলের রসের মিষ্টতার কারণ। এজন্য এই শর্করাকে ফল শর্করা বলা যায়। মধুতে ইক্ষুশর্করা নাই। কিন্তু ইক্ষুশর্করাকে উক্ত দ্বিবিধ শর্করাময় মধুবিশেষে পরিণত করিতে পারা যায়। ইক্ষুশর্করা মধুশর্করায় পরিণত হইলে তাহা কোহলকিণ্বাক্রান্ত হয়, এবং তখন কোহলের উৎপত্তি হয়। তবে, গুড় হইতে কোহল পাইতে গেলে ইক্ষুশর্করাকে প্রথমে মধুশর্করায়, এবং পরে মধুশর্করাকে কোহলে পরিণত করিতে হয়। এখানে দুইটি ক্রিয়া হয়।

তাড়ীতে কোহলকিণ্ব থাকে। জল-মিশ্রিত মধুতে অত্যল্প তাড়ী বা কোহলকিণ্ব যোগ করিলে মধুশর্করা দ্রুতবেগে কোহলে পরিণত হইতে থাকে। কোহলকিণ্ব জলে ফেলিয়া ছাঁকিলে সেই কিণ্বের একপ্রকার নির্যাস পাওয়া যায়। সে নির্যাসে কিণ্ব থাকে না। কিন্তু ইক্ষুশর্করার সহিত সে নির্যাস যোগ করিলে ইক্ষুশর্করা মধুশর্করায় পরিণত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অত্যল্প নির্যাস বহুপরিমিত ইক্ষুশর্করাকে মধুশর্করায় পরিণত করিতে পারে। অতএব এই নির্যাসের ক্রিয়া কিণ্বতুল্য। কিন্তু কিণ্ব জীবিতপদার্থ, কঠিন; এই নির্যাস জীবিত-পদার্থ নহে, দ্রব জৈবপদার্থ। ইংরাজিতে এরূপ কিণ্বধর্ম্মসম্পন্ন পদার্থকে 'এন্‌জাইম্' (enzyme) বলে। ক্লেদে জাত বলিয়া বাঙ্গলায় ইহাকে ক্লৈদ বলা যাইতে পারে। তবে, ইক্ষুগুড়ে কোহলকিণ্ব পড়িলে কোহল-কিণ্বজাত ক্লৈদবিশেষের ক্রিয়ায় ইক্ষুশর্করা প্রথমে মধুশর্করায় পরিণত হয়; * তখন কোহলকিণ্বের ক্রিয়ায় সে শর্করা কোহলে পরিণত হয়।

তণ্ডুল, যব, গোধূমাদিতে শ্বেতসারনামক পদার্থ আছে। আরারুট সেই পদার্থ। শ্বেতসারকে শর্করাবিশেষে (শ্বেতসার-শর্করায়) পরিণত করিতে পারা যায়। শ্বেতসার ও শর্করার মূল উপাদান একই,—কার্বন্, হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্। উভয়ের মধ্যে একটা সুবোধ্য প্রভেদ এই যে, শ্বেতসার জলে দ্রব হয় না, শর্করা হয়।

* অত্যল্প হাইড্রোক্লোরিক্ কিংবা সল্‌ফ্যুরিক্ অম্লের সহিত ইক্ষুশর্করাজল ফুটাইলে মধুশর্করা হয়। এখানে সে অজৈবক্রিয়া আলোচ্য নহে।

তণ্ডুল হইতে কোহল পাইতে হইলে তণ্ডুলকে প্রথমে শর্করায় পরিণত করা আবশ্যক। শর্করা হইলে তাহাকে কোহলে পরিণত করা সুসাধ্য। আমরা তণ্ডুলকে শর্করায় নিত্য পরিণত করিয়া থাকি। আমরা চাউল বা ভাত খাই; তাহা পাকাশয়ে দ্রবীভূত না হইলে রক্তের সহিত মিশিতে পারিত না। তেমনই ধান্য হইতে যখন অঙ্কুর বহির্গত হয়, তখন তাহা মাটি, জল, বায়ু লইয়া নিজের খাদ্য গড়িতে পারে না। তখন তাহা ধান্যে সঞ্চিত চাউল খাইয়া বাঁচিতে ও বাড়িতে থাকে। চাউল বা চাউলের শ্বেতসারাদি পদার্থ রসে পরিণত না হইলে সে রস চারার সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে পারিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, চাউলের শ্বেতসার দ্রবীভূত হইতে পারে। এইরূপে যবতণ্ডুলাদির শ্বেতসার হইতে যে শর্করা জন্মে, তাহাকে যবশর্করা বলা যায়। যবশর্করা মধুর ন্যায় সহজে কোহলকিণ্বাক্রান্ত হয়। অতএব যব, তণ্ডুল, গোধুম, বিলাতি আলু প্রভৃতি যাহাতে শ্বেতসার আছে, তাহাকেই মদ্যের উপকরণ করা যাইতে পারে।

জলে চাউল ভিজাইয়া রাখি, চাউল দ্রব হয় না। চাউল ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করি, চাউলের শ্বেতসার জলের সহিত মিশিয়া ভাতের ফেন হয়। কিন্তু জলে শর্করা যেমন দ্রব হয়, শ্বেতসার তেমন দ্রব হয় না। কিন্তু ভাত খাই, তাহা মুখের লালা এবং উদরের পাচকাশয়-(pancreas)-রসযোগে ভাতের শ্বেতসার শর্করাবিশেষে (যবশর্করায়) পরিণত হয়। মুখের লালা ও ক্লোমরসে ক্লৈদবিশেষ থাকে। তাহাদেরই ক্রিয়ায় শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়। যেমন বহুবিধ কিণ্ব আছে, তেমনই বহুবিধ ক্লৈদ আছে। আমরা যে দাইল-মৎস্য-মাংস খাই, তৎসমুদয় আমাশয়ের রসস্থিত ক্লৈদ দ্বারা জীর্ণ হয়। ডুমুর ও পেঁপের রসে তত্তুল্য ক্লৈদ আছে। তাহার ক্রিয়ায় মাংস দ্রব হয়। যেমন কিণ্ব পৃথক্ করিতে পারা যায়, ক্লৈদ তেমন পৃথক্ করিতে পারা যায়; কিন্তু বিশুদ্ধ পাইবার উপায় অদ্যাপ অজ্ঞাত। তবে তাড়ীর সহিত যেমন কোহলকিণ্ব চলিয়া আসে, তেমনই পেঁপের রসের সহিত পেঁপের ক্লৈদ চলিয়া আসে।

এই সকল তত্ত্বে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখন দেশীয়মদ্যোৎপাদন বুঝা যাউক। আজকাল বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে গুড় হইতে, বিহারে (এবং পূর্ব্ব-বাঙ্লার কোন কোন জেলায়) মউল হইতে, এবং ওড়িশার তিনটি জেলায় চাউল হইতে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কখন কখন মউলের সহিত অল্প গুড় মিশান হইয়া থাকে। তবে, বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় -

গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।

ইহাদের সহিত তাড়ী আনিলে,

গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী নির্যাসাঃ কথিতাঃ পরাঃ।

পাওয়া যাইতেছে। এই সকল মদ্য প্রাচীনকালে যে ক্রমে প্রস্তুত হইত, অদ্যাপি সেই ক্রমেই চলিতেছে। কারণ গবর্মেণ্ট উৎপন্ন সুরার উপর শুল্ক লইয়াই ক্ষান্ত হন, সুরাজীবীর অবলম্বিত ক্রমে হস্তক্ষেপ করেন না।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, মদ্য ও সুরা শব্দের অর্থ এক নহে। মদহেতু দ্রবদ্রব্যমাত্রেই মদ্য, কিন্তু মদ্যমাত্রেই সুরা নহে। গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী সুরা। এই সকল সুরা পাইতে চ্যাবন বা পাতন আবশ্যক। সুরা-শব্দের প্রাচীন অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া চ্যাবিত মদ্যমাত্রের সামান্যনাম সুরা রাখা যাইতে পারে। চ্যাবন বা চোয়ান অর্থে কোন দ্রব্যকে তাপে বাষ্পীভূত এবং সেই বাষ্পকে শীতে ঘনীভূত করা বুঝায়। জল, কোহল ও বহুবিধ গন্ধদ্রব্যকে তাপে বাষ্পীভূত এবং তাহাদের বাষ্পকে শীতে ঘনীভূত করিতে পারা যায়। কোহল জলে মিশে; কিন্তু জল অপেক্ষা কোহল অধিক উদ্‌বেয় অর্থাৎ সহজে বাষ্পীভূত হয়। যাবতীয় মদ্যে কোহলের সহিত জল ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে যে সকল পদার্থ উদ্‌বেয়, তৎসমুদয় তাপ পাইলে কোহল ও জলের সহিত বাষ্পাকারে চলিয়া আসে, অনুদ্‌বেয় পদার্থ পড়িয়া থাকে।

সুরাপাতন নিমিত্ত যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার সংস্কৃত নাম ময়ূরযন্ত্র। কেহ কেহ তাহাকে বকযন্ত্র বলেন। ময়ূর বা বকের আকারের সহিত সে যন্ত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। চলিত ভাষায় ইহার নাম অন্ধা। অন্ধা অন্ধশব্দের অপভ্রংশ। এই নাম হইবার কারণ এই যে, এই যন্ত্রের পাত্রের মুখ বন্ধ থাকে, অথচ ভিতরে বাষ্প উত্থিত ও ঘনীভূত হইতে থাকে। এই যন্ত্রের তিনটি অঙ্গ:—(১) একটি স্থালী (ভাটী), যাহাতে মদ্য রাখিয়া আগুনে উত্তপ্ত করা হয়; (২) একটি স্থালী (ধরণী), যাহাতে বাষ্প ঘনীভূত এবং ক্ষরিত হয়; ইহা শীতল জলে ব্যাপ্ত থাকে; (৩) একটি কি দুইটি নল ভাটীর ও ধরণীর মুখে যুক্ত থাকে। দেশীয় অন্ধায় বাঁশের নল ব্যবহৃত হয়। জল ও কোহলের বাষ্প ভাটী হইতে নলপথে ধরণীতে উপস্থিত হয়। সেখানে শীতে ঘনীভূত হইয়া সুরা হয়। কোন কোন স্থানে গর্ভযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রে নল থাকে না। চুলীর উপরে তিনটি হাঁড়ি উপরে উপরে রাখিলে যেমন দেখায়, গর্ভযন্ত্র সেইরূপ দেখায়। প্রথম, নীচের হাঁড়িটি বড়; তাহাতে মদ্য থাকে। তৃতীয়, উপরের হাঁড়িটি ছোট; তাহাতে শীতল জল থাকে। দ্বিতীয়, মধ্যের হাঁড়িটির তলে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের পাশে ইটের টুকরা রাখিয়া তাহার উপরে একটি ছোট হাঁড়ি বা ভাঁড় বসান হয়। এই ভাঁড়টি সুরাধার। নীচের হাঁড়ি হইতে সুরাবাষ্প উঠিয়া দ্বিতীয় হাঁড়িতে প্রবেশ করে। তাহার মুখে স্থাপিত শীতল হাঁড়ির সংস্পর্শে সে বাষ্প জমিয়া সুরাধারে ক্ষরিত হয়। এইরূপে মদ্যের সমস্ত কোহল পৃথক্ হয় না। কিন্তু যন্ত্র প্রস্তুত করা সুসাধ্য। বঙ্গীয় সুরা-কমিশন্ মনে করিয়াছেন যে, গুপ্তভাবে সুরাপাতন নিমিত্ত গর্ভযন্ত্র অধিক ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে গর্ভপাতনযন্ত্র আবশ্যক হয়। নেপালীরা এইরূপ যন্ত্রে সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

কোহলের পরিমাণানুসারে মদ্য তীক্ষ্ণ বা মৃদু হয়। যে মদ্যে যত অধিক কোহল থাকে, সে মদ্য তত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মাদকতা-শক্তিসম্পন্ন। এখানে ভাঙ্, ধুতুরা, কুচিলা

প্রভৃতির মাদকতা লক্ষ্য নহে। মদ্যের কোহলের পরিমাণজ্ঞাপন নিমিত্ত 'প্রমাণ-সুরা' (proof spirit) নামক সংজ্ঞার ব্যবহার আছে। ওজনে জলের প্রায় সমান কোহল থাকিলে সেই-জল-মিশ্রিত কোহলকে 'প্রমাণ-সুরা' বলা যায়। বিলাতি ব্রাণ্ডি ও হুইস্কি প্রায় প্রমাণ-সুরা। প্রমাণ-সুরা অপেক্ষা অধিক কোহল থাকিলে তীক্ষ্ণ সুরা, এবং অল্প থাকিলে মৃদু সুরা হয়। দেশীয় প্রচলিত সুরার কোনটাই প্রমাণ-সুরা নহে; সকলেই জলের ভাগ অধিক থাকে।

এখন দেশীয় মদ্য বর্ণিত হইতেছে। (১) তাড়ী। ইহার নিমিত্ত কোন আয়োজন আবশ্যক হয় না। খেজুর বা তাল রস দুইতিনঘণ্টা রাখিয়া দিলেই তাড়ী হয়। অধিক সময় রাখিলে তাড়ী অম্ল হইয়া পড়ে। প্রথমে রসের শর্করা কোহলে, এবং পরে কোহল শুক্তাম্ল প্রভৃতি অম্লে পরিণত হয়। বায়ু ও গাছের পাতা প্রভৃতি হইতে কোহল-কিণ্ব ও শুক্তকিণ্ব রসে পতিত হয়। তাড়ীতে কোহলের ভাগ অল্প থাকে। শত ভাগে দুইতিন ভাগের অধিক প্রমাণ-সুরা প্রায় পাওয়া যায় না। খেজুররস হইতে মদ্য হয় বলিয়া ওড়িশার ব্রাহ্মণেরা খেজুরগাছ পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না।

(২) পচাই। ইহাকে পচা ভাতের মদ্য বলা যাইতে পারে। বিলাতি বিয়র্-নামক মদ্য পচাইর তুল্য। কিন্তু ঐ দুই মদ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী এক নহে। পচাই করিতে ভাতের সহিত 'বাকর'নামক উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হয়। পাঁচছয়দিনে ভাত সন্ধিত বা অভিষুত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। সেই রসের সহিত জল মিশাইয়া কিংবা সন্ধিত ভাতের সহিত গরমজল মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইলে পচাই হয়। 'হাণ্ডিয়া'নামক মদ্যও পচাইমাত্র। চলিত কথায় পচাই 'পাঁচি'-মদ নামে খ্যাত। সাঁওতাল, কোল এবং বাউরি-বাগ্দি, ডোম-হাড়ি প্রভৃতি জাতিরা পচাই পান করিয়া থাকে। *

সুরা।—(১) গৌড়ী, কেবল গুড় হইতে উৎপন্ন। এ নিমিত্ত খেজুরেগুড় প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ আখের গুড় অপেক্ষা খেজুরে সস্তা। খাঁড় অপেক্ষা মাত বা চিটে বা চোয়া ভাল।† কারণ মাতে মধুশর্করা এবং খাঁড়ে ইক্ষু-শর্করা অধিক থাকে। জল ও গুড় বড় বড় মট্‌কাতে ঢালিয়া অল্প মদ্যবীজ (পুরাতন মদ্য) যোগ করা হয়। মট্‌কার গলা পর্য্যন্ত মাটীতে পোঁতা থাকে। এজন্য মট্‌কা সহসা ভাঙে না, মট্‌কার জলও প্রায় সমান উষ্ণতায় থাকে। গ্রীষ্মকালে চারিপাঁচ-

* পচাই লেখকের অজ্ঞাত। উপরের বর্ণনা ১৮৮৩ সনের বেঙ্গল এক্‌সাইস্ কমিশনের রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

† সংস্কৃত গুড়শব্দে বাঙ্‌লা চিটে বা মাত বুঝায়। অতএব এই সুরাকে গৌড়ী বলাই সঙ্গত। বঙ্গদেশের গৌড়নগর কি গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল? সংস্কৃত শর্করা হইতে ইংরাজি sugar, এবং খণ্ড (বাংলা খাঁড়, ওড়িয়া কন্দ) হইতে ইংরাজি candy শব্দ হইয়াছে।

দিনে, এবং শীতকালে সাতআটদিনে 'ফুটা' বা কোহলিক সন্ধান শেষ হয়। তখন সেই জল চোয়াইলে গৌড়ী সুরা পাওয়া যায়। নির্জল শুদ্ধ শর্করা হইতে মণকরা প্রায় ৪৬সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাইবার কথা।* কিন্তু বিলাতেও মণকরা ৪৩৷৷০ সের ভাঁড়ের অধিক পাওয়া যায় নাই। এদেশে গুড় (শর্করা নহে) হইতে ১৬ হইতে ২০ সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাওয়া যায়। কারণ গুড়ের জল ও কিট্টের পরিমাণ সমান থাকে না। তদ্ভিন্ন, সন্ধান ও চ্যাবনের দোষে সুরা কম হয়। সুরা চোয়াইয়া লইবার পর যে মদ্য অবশেষে থাকে, তাহাতে শর্করা ও কোহলের ভাগ থাকে। এজন্য তাহা ফেলিয়া না দিয়া নূতন মদ্য প্রস্তুত করিবার সময় গুড়ের সহিত মদ্যবীজস্বরূপ যোগ করা হইয়া থাকে।

(২) মাধ্বী সুরা।—মউলফুল হইতে উৎপন্ন। মধ্যভারতের অরণ্য মউলের প্রধান জন্মস্থান। কাংড়া ও অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর, গুজরাট ও বোম্বাই প্রভৃতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থানে মউলের গাছ আছে। কেবল কলিকাতা ও মাদ্রাজ-অঞ্চলে নাই। চৈত্র বা মধুমাসে মধুকের ফুল হয়। গাছ হইতে ফুল পড়িতে থাকে, দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা তাহা কুড়াইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। মউলফুলের ঘটাকার কিরীট (corolla) স্থূল ও মিষ্ট। কাঁচাফুল শুকাইলে ওজনে প্রায় অর্দ্ধেক শুকাইয়া যায়। সেই ফুলে শতকরা প্রায় ৪০ভাগ মধুশর্করা এবং প্রায় ১২ভাগ মধুশর্করার পরিণামশীল পদার্থ থাকে।† দরিদ্রলোকেরা মউলফুল চাউলের সহিত বাটিয়া পিটে করিয়া খায়। বস্তুত মউলের ফুল এদেশের বহু দরিদ্রলোকের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ হইয়া আছে। মউলের ফল, বীজের শাঁস ও তৈল, এবং মউলের কাঠ, সকলই মূল্যবান্।

যেখানে মউলগাছ জন্মে, সেখানে ফুলের মণ প্রায় এক টাকা। যতই মূল্য হউক, তাহা গুড়ের মূল্য অপেক্ষা কম। সুতরাং মউল হইতে সুরা প্রস্তুত করায় লাভ আছে। যাঁহাদিগের নিকট সুরা পরিচিত, তাঁহারা বলেন, মউলের সুরা আইরিশ্ হুইস্কির তুল্য।

জলে মউলফুল ভিজাইয়া রাখিলেই ফুলের শর্করা কোহলে পরিণত হইতে থাকে। তবে, বায়ুর অনিশ্চিত কোহলকিণ্বের আশা না করিয়া মদ্যবীজ যোগ করিলে ক্রিয়া নিশ্চিত হইয়া উঠে। অতএব গুড় হইতে মদ্য প্রস্তুত করা যেমন সহজ, মউল হইতেও তেমনই সহজ। কিন্তু সুরাপায়ীরা কেবল কোহল চায় না, বিশেষ গন্ধ ও স্বাদও চায়।

* ইংরাজি gallon ৫সের ভাঁড় ধরা গেল।

† সকল মউলফুলে জল এবং শর্করার ভাগ অবশ্য সমান থাকে না। কোন ফুলে ৩৬ ভাগ+১২ ভাগ শর্করা, কোন ফুলে ৪২+১০ ভাগ পাইয়াছি। সে যাহা হউক, যে ফুলে এত মধু থাকে, তাহার নাম মধুপুষ্প হওয়াতে ভালই হইয়াছে। মাক্ষিক মধুতে শত ভাগে প্রায় ৭২ ভাগ মধুশর্করা থাকে। মধুমাসে জাত বলিয়া মধুপুষ্প, না মধু আছে বলিয়া মধুপুষ্প নাম হইয়াছে? মধু, মহু, মউ হইতে মহুল, মহুয়া, মউল প্রভৃতি চলিত নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোলেরা মউলগাছকে মধুকং দারু বলে। তেমনই তাহারা সালগাছকে সর্জ্জরস বলে। সংস্কৃত হইতে কোল না কোল হইতে সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি?

এই গন্ধ ও স্বাদ জন্মাইতে সকল শৌণ্ডিক দক্ষ নহে। কেহ বা অধিক লাভের আশায় মণ্ডের জলের পরিমাণ কম করে, কেহ বা সুরার শেষ পর্য্যন্ত মণ্ড চ্যাবিত করিতে থাকে। উভয় স্থলেই সুরায় এক দোষ জন্মে। রসায়নবিদ্যায় কোহল একটি নহে, বহুবিধ আছে। সুরাপায়ী একপ্রকার কোহল চায়, কিন্তু অধিকাংশ সুলভ সুরায় কেবল সেই কোহলটি না থাকিয়া অন্যবিধ কোহল ও উদ্বেয় পদার্থ থাকে। এই সকল পদার্থ তৈলাকারে সুরার উপরে ভাসিতে থাকে। এই তৈল বিষাক্ত, উৎকটগন্ধ ও তীব্রস্বাদ। সুতরাং পেয় সুরায় তৈল না থাকিলেই ভাল। মণ্ড যত ঘন হয়, পাতিত সুরায় তত তৈল থাকে। মণ্ড ঘন করিলে চ্যাবনব্যয় কম হয়। কিন্তু ঘন মণ্ডে কোহলের পরিমাণ কম হয়। ইহার দুই কারণ আছে। শর্করার ঘনজলে কোহলকিণ্ব স্বচ্ছন্দে বাড়িতে পারে না, এবং কোহলের ভাগ কিছু অধিক হইলেও পারে না। এইরূপ কারণে শর্করার ঘনরসে কিংবা সুরাতে জৈবপদার্থ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে শীঘ্র পচে না। সুতরাং চ্যাবনব্যয় কমাইতে গিয়া শৌণ্ডিকের অন্যদিকে ক্ষতি হয়। সুরা-উৎপাদন ব্যবসায়ের বিষয়। ক্রেতার রুচি অনুসারে সুরাজীবী সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। যাহারা ঘোর মাতাল হইতে চায়, তাহারা সুরাতৈল আকাঙ্ক্ষা করে। আবার, প্রতারক সুরাবিক্রেতা সতৈল সুরায় জল মিশাইয়া তীক্ষ্ণ সুরা বলিয়া বিক্রয়ের পথ দেখে। দেশীয় সুরাকরে একমণ মউলফুল হইতে গড়ে ১২।১৩সের ভাঁড় প্রমাণসুরা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু মণকরা অর্দ্ধেক শর্করা ধরিলে প্রায় ২০সের ভাঁড় পাইবার কথা। বিলাতে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ দেশীয় সুরাকরে কেবল গুড় কিংবা কেবল মউলের মণ্ড না করিয়া ঐ দুই দ্রব্য মিশাইয়া করা হইয়া থাকে। এইরূপে গৌড়মধ্বী সুরা পাওয়া যায়। বাস্তবিক কোহলিক সন্ধানের নিমিত্ত বিভিন্ন শর্করা ও কিট্টযুক্ত (গাদযুক্ত) শর্করা ভাল। মউলের সপ্তমাংশ কি অষ্টমাংশ গুড় মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এইরূপে মণ্ড শীঘ্র সন্ধিত হয় এবং বোধ হয় সুরাপায়ীর নিকট গুণেও ভিন্ন হয়। দেখা যায়, মউল ও গুড় হইতে মণকরা প্রায় ১১।১৩সের ভাঁড় প্রমাণ-সুরা উৎপন্ন হয়। ৫০সের মউল ও ১০সের গুড় হইতে ২০সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাওয়া কঠিন নহে। আরাজেলায় মণকরা ২৫সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, এদেশের অধিকাংশ শৌণ্ডিকেরা যথোচিত পরিমাণে সুরা নিষ্কাশিত করিতে পারে না।

(৩) পৈষ্টী সুরা।—চাউল, যব, গোধূম প্রভৃতির পিষ্ট হইতে এই সুরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ বলেন—

শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মদ্যং সুরা স্মৃতা।

বঙ্গদেশে ইহা ধেনোমদ নামে খ্যাত। ধেনোমদের একটা দুর্গন্ধ থাকে। 'ধেনো' নাম হইলেও ধান হইতে এই মণ্ড হয় না। এদেশে আতপচাউল এক্ষণে পৈষ্টীর উপকরণ। চাউলের সহিত দুইএকটা ধান্য মিশ্রিত থাকে বলিয়া পৈষ্টীর নাম ধেনো হইয়াছে।

বিলাতেও যব, গোধূম, তণ্ডুল প্রভৃতি হইতে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সে দেশের অবলম্বিত ক্রম এদেশের ক্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বস্তুত সে দেশের ক্রম ধরিয়া এদেশের পৈষ্টীর উৎপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা।

ওড়িশায় নিম্নলিখিত ক্রমে পৈষ্টী সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে আতপচাউল উত্তমরূপে ধুইয়া ফুটন্ত জলের উষ্ণ বাষ্পে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ চাউল শীতল হইলে তাহার সহিত 'বাকর'নামক উদ্ভিজ্জপদার্থবিশেষ উত্তমরূপে মিশান হয়। এই চাউল একরাত্রি একটা ঝুড়িতে চাপা দিয়া রাখা হয়। এই সময় চাউল গরম হইয়া উঠে। পরদিন উক্ত চাউল বড় বড় পিষ্টকের আকারে মাটির উচ্চ মেজের সারি সারি করিয়া সাজান হয়। সেখানে দুইএকদিনের মধ্যে চাউল আবার গরম হইয়া উঠে, তাহাতে এক জাতীয় ছত্রাক (ছাতা) ধরে, এবং পিষ্টকসকল ('কলাহচ') কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ হয়। এ সময়ে ছত্রাকের ব্যাপ্তিবশত চাউল পিষ্টকের আকার ধারণ করে। তিনচারিদিন পরে পিষ্টকসকল তুলিয়া উপরি উপরি স্তূপাকার করিয়া রাখা হয়। এইভাবে চারিপাঁচদিন গেলে বড় বড় মট্‌কাতে পিষ্টক ও জল নিক্ষেপ করা হয়। পরদিন নূতন সিদ্ধ আতপচাউল পিষ্টকের সমপরিমাণে সেই মট্‌কায় ফেলা হয়। পুরাতন সঞ্চিত মদ্য কিংবা মদ্যবীজ যোগ করা হয় না। দুইএকদিনের মধ্যে জল ফুটিতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালে ৭।৮দিনের মধ্যে সমুদয় চাউল গলিয়া জলের মত হয় এবং ফুটা বন্ধ হয়। শীতকালে ২।৪দিন অধিক লাগে। এখন সেই মদ্য চোয়াইয়া লইলে সুরা পাওয়া যায়। একমণ চাউল হইতে প্রায় ২০সের ভাঁড়প্রমাণসুরা উৎপন্ন হয়।

বিলাতে যবকে জলে আর্দ্র রাখিয়া তাহার অঙ্কুরোৎপাদন করা হয়। সেই যবে ক্লেদবিশেষ জন্মে। তখন তাহাকে উত্তপ্ত ও শুষ্ক করিলে সেই ক্লেদের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তদনন্তর সেই যব কিংবা সেই যবের সহিত অন্য যব বা তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে ফেলা হয়। এখানে যবশর্করাক্লেদের ক্রিয়াবশত যব ও তণ্ডুলের শ্বেতসার যবশর্করায় পরিণত হয়। তার পর সেই জলে কোহলকিণ্ব যোগ করিলে শর্করা কোহলে পরিণত হয়।

এদেশের পৈষ্টী সুরার উৎপাদনে 'বাকর' এবং পিষ্টকে জাত ছত্রাক চাউলের শ্বেতসারকে যবশর্করায় এবং যবশর্করাকে কোহলে পরিণত করে। বোধ হয়, 'বাকর' শব্দ বাকল বা বল্কল শব্দের অপভ্রংশ। নানাজাতীয় গাছের বাকল ও শিকড় রৌদ্রে শুকাইয়া ও পরে গুঁড়া করিয়া আতপচাউলের গুঁড়ার সহিত মিশান হয়। তাহাতে গরমজল মাথাইয়া সমুদয় চূর্ণে ছোট ছোট পিণ্ড পাকান হয়। এই সকল পিণ্ড একদিন খড়ের মধ্যে রাখা হয়। তখন পিণ্ডসকল গরম হইয়া উঠে। পরদিন তৎসমুদয় রৌদ্রে শুকান হয়। এই সকল পিণ্ড 'বাকর'নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বাগ্‌দি ও শুঁড়িরা বাকর প্রস্তুত করে, ওড়িশায় করদরাজ্যের পার্ব্বত্যলোকেরা করে। বঙ্গদেশের বাকর শাদা,

ওড়িশার বাকর কালো। শুনা যায়, শতাধিকজাতীয় গাছ হইতে বাকর করা হইয়া থাকে। সে সকল গাছ কি, তাহা বাকরবিক্রেতারা বলিতে চায় না। সে যাহা হউক, চাউল হইতে মদ্য করিতে হইলেই বাকর যোগ করা হইয়া থাকে। পচাই ও হাণ্ডিয়া করিতে লাগে, চাউলের সুরা করিতে লাগে। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে গুড়ের সহিত চিঁড়া কিংবা চাউল যোগ করা হইয়া থাকে। সেখানেও বাকর লাগে।

বিম্‌স্‌সাহেব পচাই করিবার বাকরের কতকগুলি গাছগাছড়ার নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। * তন্মধ্যে দেখা যায়, কতকগুলি গাছ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়; যথা—কণ্টকারি, গোক্ষুর, অনন্তমূল, শতমূল ইত্যাদি। কতকগুলি কষায়; যথা—হরীতকী, কেন্দু, গামার, শোণা, সোদাল ইত্যাদি। কতকগুলি তিক্তদ্রব্য; যথা—ক্ষেতপাপড়া, নিম, বাসক, কুরচি, কালমেঘ ইত্যাদি। কতকগুলি ঘোর বিষ; যথা—চিতা, ধুতুরাবীজ, কুচিলাবীজ, সিদ্ধি ইত্যাদি। এই সকল গাছের গুণ স্মরণ করিলে মনে হয়, অনেকগুলি উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বাকরের প্রয়োজন হইয়াছে। (১) ভাতের সন্ধান উৎপাদন। সকলেই জানেন, গাছপালার ছাল ও শিকড় গুঁড়া করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহাদের সন্ধানজ বিকার শীঘ্র আরম্ভ হয়। কি কারণে হয়, তাহা এখানে বলিবার স্থান নাই। যে কারণেই হউক, ভাত রাখিলে তাহার বিকার জন্মিতে কালবিলম্ব হয়। (২) মদ্যের গুণবৃদ্ধি। ঔষধ যোগ করিবার উদ্দেশ্য এই। আয়ুর্বেদোক্ত মদ্যে এইরূপ ঔষধ যোগ করা হইয়া থাকে। (৩) পূতিনিবারণ। তিক্তদ্রব্য দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা। বিলাতি বিয়র্‌-নামক মদ্যে তিক্ত 'হপ্‌'নামক উদ্ভিদ যোগ করার উদ্দেশ্য এই। (৪) মাদকতাবৃদ্ধি। ধুতুরা, কুচিলা প্রভৃতি যোগ করিবার অন্য উদ্দেশ্য নাই।

বাকরের এই সকল উপকরণ দেখিলে মনে হয়, পচাই মদ্য করিবার সময় উহাদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। পচাই চোয়ান হয় না, কাজেই তাহা শীঘ্র পচিয়া দুর্গন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুরায় সে আশঙ্কা কম। দ্বিতীয়ত পচাইর তীক্ষ্ণতা বা মাদকতা বৃদ্ধির চেষ্টা স্বাভাবিক মনে করা যাইতে পারে। কারণ সুরাতে যত কোহল থাকিতে পারে, 'পচাই'য়ে তত পারে না। কিন্তু ধুতুরাকুচিলা যোগ করিয়া সুরার মাদকতাবৃদ্ধির চেষ্টা দুরাশা। কারণ মাদকদ্রব্য উদ্‌বেয় না হইলে সুরাতে গিয়া পড়িতে পারে না। বস্তুত মদ্যে ধুতুরা-কুচিলা মিশাইয়া চোয়ান হইয়াছিল। গবর্মেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক ওয়ার্ডেন্‌সাহেব সে সুরায় তাহাদের অংশ পান নাই। মদ্যে যোয়ান, মৌরী, মেথী, দারুচিনি, চন্দন, এলাচ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যোগ করিয়া মদ্য এবং সুরা সুগন্ধ করা হইয়া থাকে। ইহাদের সার উদ্‌বেয়। কিন্তু বাকরের অনেকগুলি উপকরণ আদৌ উদ্‌বেয় নহে।

সুরার বাকরের উপকরণ জানা নাই। কিন্তু বোধ করি, ইহার উপকরণ এত অধিকসংখ্যক নহে। যতদুর বুঝিতে পারা গিয়াছে,

* Vide appendix to the report of the excise commission 1883—84. Vol I.

তাহাতে বোধ হয় যে, উপকরণের মধ্যে কষায় এবং তিক্ত দ্রব্য থাকিলেই চলে। যেমন এক বিশল্যকরণী খুঁজিতে গিয়া গন্ধমাদনপর্ব্বত আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, সেকালের অনেক উপকরণে গন্ধমাদনের বহু উদ্ভিদ অনর্থক আসিয়া পড়িয়াছিল। এ কথা আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে। তবে প্রশংসার কথা এই যে, নিরর্থক উপকরণ থাকিলেও ফলে প্রায় সমান দাঁড়ায়। যে ক্রমে পৈষ্টী সুরা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক অনুক্রম আবশ্যক, সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত। এখানে যে বিজ্ঞানে প্রবেশ করিবার স্থান নাই, অধিকন্তু সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির প্রবল আশঙ্কা আছে। ফলে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখাইয়াই নিরস্ত হইতেছি। শতভাগ চাউলে ৭৮ভাগ শ্বেতসার আছে। বিজ্ঞানের হিসাবে শতভাগ শ্বেতসার হইতে ৩৫ কি ৩৬ভাগ কোহলের অধিক আশা করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ৩২ ভাগকেই সীমা মনে করেন। তদনুসারে একমণ চাউল হইতে ২৫সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাওয়া যাইতে পারে। কটকে একমণ চাউল হইতে ২২৷৷০সেরপ্রমাণসুরা পাওয়া গিয়াছে। মদ্যের সমস্ত কোহল চোয়াইয়া লওয়া হয় না। প্রায়ই ১৷৷০সের ভাঁড় প্রমাণসুরা ফেলা যায়। অতএব দেশীয় পৈষ্টী সুরার উৎপাদনের ক্রম নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে।

নির্দ্দোষ না হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। কারণ যে ব্যবসায় বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, তাহার দোষ গিয়া উন্নতি না হইয়া পারে না। তবে, সকল স্থলেই যে সম্ভাব্য উন্নতি লাভ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নহে। তথাপি স্থূলত বলা যাইতে পারে যে, এ দেশে যে সকল পণ্যদ্রব্য বহুকাল হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানও তৎসমুদয়ের উৎপাদনে অধিক সুবিধা দেখাইতে পারে না। ঘরে বসিয়া অব্যবসায়ী হইয়া দেশীয় কলার কূট সমালোচনা করিতে অবশ্য পারা যায়। কিন্তু দেশকাল পাত্র, উপকরণ-আয়োজন-বিক্রয় প্রভৃতি চিন্তা করিলে উন্নতিমার্গপ্রদর্শন নিতান্ত দুরূহ।

সুরা যে কেবল পানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, এমন নহে। বার্নিশ ও গন্ধযুক্তিতে, ঔষধকরণে, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতিতে কোহল অত্যন্ত আবশ্যক। ত্রিবিধ সুরার উপকরণ ও কোহলপরিমাণ দেখিলে মাধ্বী সুরার উৎপাদনব্যয় অল্প। একমণ মউল ও একমণ চাউলের মূল্য কখন সমান হইবে না। অথচ উভয় উপকরণ হইতে প্রায় সমানপরিমাণে কোহল উৎপন্ন হয়। ধান্য অপেক্ষা যব মহার্ঘ এবং চাউলে যত শ্বেতসার আছে, যবে তদপেক্ষা কম আছে। এজন্য বিলাতে সুরার নিমিত্ত চাউলের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপত্তিতে বিলাতি হুইস্কি আমাদের পৈষ্টীর তুল্য। এদেশে পৈষ্টীর অভাব নাই, তথাপি দেশীয় ধনবান্ সুরাপায়ীর নিমিত্ত বিস্তর বিলাতি হুইস্কি এদেশে আসিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, সুরাব্যবসায়েও শিক্ষিত উদ্যোগী পুরুষ আবশ্যক হইয়াছে।*

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* এই প্রবন্ধসঙ্কলনবিষয়ে কটকের এক্‌সাইস্‌ ডেপুটি কলেক্‌টর্‌ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এবং সেণ্ট্রাল্‌ ডিস্‌টিলারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ সেন লেখককে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সফলতার সদুপায়।

ভারতবর্ষে পাঠশালা প্রভৃতিতে দেশীভাষায় যে শিক্ষা চলিতেছে, তাহার সংস্কারসাধনের জন্য গবর্মেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। সহরে এবং ভদ্রপল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, কৃষিপল্লীগুলিতে ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা অনুপযুক্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সকল স্থানের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন করিয়া পাঠ্যবিষয় সবল করিবার প্রস্তাব বিচার করিবার জন্য গবর্মেণ্ট একটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। পাঁচজন এই কমিটির সদস্য;—তাঁহারা পাঁচজনেই গবর্মেণ্টকর্ম্মচারী; তাহার মধ্যে চারিজন ইংরেজ; যে একজনমাত্র বাঙালী ছিলেন, তিনি অনরেব্‌ল্‌ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ্চ তারিখে ভারতশিক্ষানীতিসম্বন্ধে গবর্মেণ্টের যে মন্তব্য বাহির হইয়াছে, কমিটি তাহারই একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—বিশেষভাবে চাষবাসের উপদেশ দেওয়াই যে গ্রাম্যস্কুলের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা নহে, পরন্তু সেখানে ছাত্রদের এমনভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান্ চাষী এবং বীক্ষণপর, মননশীল ও পরীক্ষাপটু ("observer, thinker and experimenter") হইতে পারে, তা সে যতই সামান্যভাবে হউক না কেন। সেই সঙ্গে, যে জমিদারকে খাজনা দেয় ও যে মহাজনের সঙ্গে শস্যের কারবার করে, তাহাদের হাত হইতে যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এরূপভাবে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি অপরিচিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রীতিতে না হইয়া সাদাভাষায় লিখিত হওয়া উচিত এবং তাহার বিষয়গুলি গ্রাম্যজীবনযাত্রাসংক্রান্ত হওয়া চাই। এই সকল স্কুলে ব্যাকরণের প্রথম পরিচয়মাত্র ও শুভঙ্করীমতে অঙ্কশিক্ষা চলিবে। ছাত্রগণ গ্রামের ম্যাপ্ ভাল করিয়া বুঝিবে এবং হিসাবনিকাশের কাগজ বুঝিবার উপযুক্ত এমন কেজোরকমের শিক্ষা লাভ করিবে, যাহাতে পাঠশালাত্যাগের পূর্ব্বে গ্রাম্যহিসাবের সমস্ত মারপ্যাঁচসম্বন্ধে ওস্তাদ হইয়া বাহির হইতে পারে এবং জমাবের খাজনার অঙ্ক বুঝিতে তাহাদের ধোঁকা না লাগে। চাষাদের জন্য সরল, উপযুক্ত এবং কার্য্যকর ধরণের স্কুল স্থাপন এবং প্রজাদের মধ্যে এইরূপ স্কুলের আদর জন্মানো ভারত-সরকার একটি সর্ব্বপ্রধান ব্যাপারের মধ্যে গণ্য করেন।—

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গবর্মেণ্টের উক্ত সাধু মন্তব্যের মধ্যে আমাদের পক্ষে সুদূর আশঙ্কার কারণ যে কিছু প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

পঞ্চায়তের চারিজন ইংরেজ ও তাঁহাদের

পশ্চাতে একজন বাঙালী মিলিয়া ভারত-সরকারের এই মন্তব্য হইতে দুইটি সংক্ষিপ্ত-সার মর্ম্ম উদ্ধার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, গবর্মেণ্টের এই সকল বাক্য আলোচনা করিয়া কমিটি দেখিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বাংলার গ্রাম্যস্কুলগুলি প্রধানত দুই বিষয়ে দোষযুক্ত : -১। শিক্ষার প্রবাহ অতিরিক্ত দীর্ঘ, অতিরিক্ত অগ্রগামী, এবং অতিরিক্ত বিচিত্র ; ২। পাঠ্যগ্রন্থগুলি জনসাধারণের ব্যবহৃত সরলভাষায় লিখিত নহে।

এ দুটি কথাও অত্যন্ত নিরীহ। যে দোষ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রতিকারও অত্যন্ত সোজা। আর কিছু নয়, চাষীকে সৌরজগতের বিবরণ না মুখস্থ করাইয়া তাহার গ্রামের ভূবৃত্তান্ত জানাইয়া দাও এবং ভদ্রপল্লীতে যেখানে সাধুভাষা তাহার "সুশীতল সমীরণ"-এর ষত্ব-ণত্ব-বিচার লইয়া ভদ্রসন্তানকে ঘর্ম্মসিক্ত করিতেছে, কৃষিপল্লীতে সেখানে 'ঠাণ্ডা বাতাস"চালাইলেই ব্যাকরণের দুঃসহ তাপ নিবারণ হইতে পারিবে। পাঠ্যপুস্তক ত আজকাল সরকারী কারখানাতেই তৈরি হইতেছে, কলের চাপে রসকস সব বাহির হইয়া গেছে, এখন বড় কথা ভাঙিয়া ছোট কথা করাই বা শক্ত কিসের!

অতএব এ পর্য্যন্ত আমরা ভারত-সরকারের মন্তব্য এবং কমিটি-পঞ্চায়তের টিপ্পনী দিব্য নিশ্চিন্তচিত্তে পড়িয়া যাইতেছিলাম। মনে করিতেছিলাম, যে সকল খালবিলের মধ্যে বিস্তার জাহাজ চলিবার পথ নাই, সে সকল জায়গাতেও বিদ্যার ডিঙি-ডোঙা চালাইবার এই যে ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা বিদ্যোৎসাহী রাজসরকারের উপযুক্ত বটে।

তাহার পরে এই সঙ্কলিত গ্রাম্য প্রাইমারী স্কুলের চারি শ্রেণীতে কি কি বিষয় পড়ানো হইবে, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলেই খুসি হইয়াছেন।

তাহার পরে দশম প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন—বাংলা নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ ন্যূনাধিক সংস্কৃতান্বিত (sanscritized) ভাষায় লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমন সকল পরিভাষা থাকে, যাহা পল্লিবাসীরা বোঝে না। অতএব এই সকল স্কুলের উপযুক্ত আদর্শপাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করিবার জন্য কয়েকটি বিচক্ষণ কর্ম্মচারী লইয়া একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হউক্। বইগুলি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হইবে, তাহার পরে সরকার মঞ্জুর করিলে কমিশনার সাহেব ও স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর-দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বইগুলিকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় (local vernaculars) তর্জ্জমা করিবার জন্য লোক নির্ব্বাচন করিবেন। ডিরেক্টর যে সকল বিচক্ষণের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন বোধ করিবেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া তর্জ্জমাগুলি মঞ্জুর করিয়া দিবেন।

এই দশম প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া মনে মনে একটু হাসিয়াছিলাম। চাষাদের জন্য সহজ বইটি তৈরি করিতে হইবে, কিন্তু প্রণালীটি একেবারেই সহজ নয়। ইংরেজিতে বই লিখিয়া সেটাকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে জিনিষটা যে কিরকম সরল ও স্বাভাবিক হইবে, তাহা বুঝা শক্ত নয়। হইতে পারে, স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরগণ একত্র

হইলে, বিশেষত কমিশনারসাহেবের মত অতবড় লোক যদি মনোযোগ করেন, তবে এই কঠিন কাজের জন্য ক্ষমতাশালী লেখক যথেষ্টপরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে, তাহার উপর আবার এই সকল সুযোগ্য লোকের রচনা পরীক্ষা করিবার জন্য, আর কেহ নয়, স্বয়ং ডিরেক্টরসাহেব যখন নিজের বিবেচনাশক্তি খাটাইয়া যোগ্যতর যাচনদার নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত, তখন খুঁৎ থাকিবার কোনো সম্ভাবনা না থাকাই সম্ভব; কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করি, এত কেন? যেখানে সুগমতার জন্য সরকারবাহাদুর এত কাতর, সেখানে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য-সহকারে এমন দুর্গমপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে বসা কেন? না হয়, বইগুলি একেবারেই ভাষায় লেখা হইত! দেশী ভাষায় অজ্ঞ সরকারবাহাদুরের মঞ্জুরির জন্য ইংরেজিতে লেখা চাই! এতবড় অক্ষমতার জন্য যদি সরকারের লজ্জা না হয়, তবে এতবড় অবিশ্বাসের জন্য তাঁহার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। অন্তত অনরেব্‌ল্ কে, জি, গুপ্ত মহাশয়ের মতও কি আর চারজনমাত্র বিশ্বাস-যোগ্য বাঙালী এই হতভাগ্য বাংলাদেশে জুটিত না—হায়, এদেশে সরকারবাহাদুরের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইবার কি কোনো সহজ উপায়ই নাই?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দশম প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম—তাহার প্রধান কারণ, মন তখনো নিশ্চিন্ত ছিল। এই প্যারাগ্রাফটিতে, পাঠ্যগ্রন্থগুলি "local vernacular"এ তর্জ্জমা করিবার প্রস্তাব ছিল। কথাটি ভীতিজনক মনে হয় নাই—মনে করিয়াছিলাম, বাংলার "local vernacular" বাংলা, বেহারের বেহারী, উড়িষ্যার উড়িয়া।

অবশেষে একাদশ প্যারাগ্রাফে উত্তীর্ণ হওয়া গেল। প্যারাগ্রাফটি অত্যন্ত ছোট—সমস্ত রেজোল্যুশনের মধ্যে ইহার অপেক্ষা ছোট প্যারাগ্রাফ আর নাই। কিন্তু জগতে মারাত্মক জিনিষের যে খুব বড় হইবার প্রয়োজন আছে, তাহা নহে—তীরের কাঠিটা যত বড়ই হোক, তাহার ফলাটুকু ছোট হইলেও হৃৎপিণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট।

এই ক্ষুদ্র একাদশ প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন: ইংরেজি আদর্শপাঠ্যপুস্তক-গুলি যথেষ্টপরিমাণ স্থানীয় প্রচলিতভাষায় তর্জ্জমা হওয়াটাকে কমিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। যথা, তাঁহাদের বিবেচনায় বেহারে অন্তত তিন উপভাষায় তর্জ্জমা হওয়া চাই, ত্রিহুতি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি; এবং বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে উত্তর, পূর্ব্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ভাষায় তর্জ্জমা হওয়া উচিত হইবে।

এ সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য নাই;—এই প্যারাগ্রাফটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া পশ্চাতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে অন্তর্দ্ধান করিল। ইহার পরে অন্য কথার অবতারণা করা হইয়াছে।

যাহাই হউক, দেখা গেল, চারিজন ইংরেজ এবং তাঁহাদের অনুগত একজন বাঙালি বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তি-পত্তনে ভাষাবিচ্ছেদ ঘটানোটাকে "matter of great importance" গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।

প্রয়োজনীয়তার বিচার ভিন্নপক্ষ হইতে ভিন্নরকম আকার ধারণ করে। যে ব্যক্তি ঝোল রাঁধিয়া মাছ খাইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে মাছটাকে চারপাঁচটুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলা matter of great importance কিন্তু মাছের পক্ষে কোনোমতে আগাগোড়া ল্যাজামুড়া আস্ত রাখিয়া চলাই matter of great importance। এইরূপ ভিন্নপক্ষের ভিন্ন লক্ষ্য থাকাতেই কমিটির নিকট যাহা এত বেশি প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে, আমাদের তাহাতে কিছুতেই উৎসাহবোধ হইতেছে না।

কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে; কিন্তু জগতে সকলের সব উপকার করা যায় না—সকলদিক্ সামঞ্জস্য করিয়া উপকার করিতে হয়। একতলায় এমন উপকার করিতে বসা ঠিক নয়, যাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলায় ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভাল নয়। সরকারবাহাদুর যদি ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাষাবিচ্ছেদ সুরু করিয়া দেন, তবে কৃষিপল্লীতে তাহার সূত্রপাত হইয়া দিনে দিনে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত তাহার ফাটল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।

এ কথা বলা বাহুল্য, জাতীয় ঐক্যের প্রধান অবলম্বন ভাষা—পরস্পরের মধ্যে অন্তরের গতিবিধির ইহাই রাজপথ। ভারতবর্ষে ভাষার বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, এমনতর গিরিমরুর ব্যবধানও করিতে পারে নাই। ইহার উপরেও যেখানে ভাষার যথার্থ বিচ্ছেদ নাই, সেখানেও যদি বিচ্ছেদ সযত্নে তৈরি করিয়া তোলা হয়, যাহা ভগ্ন তাহাকেও যদি জাঁতার মধ্যে ফেলিয়া চূর্ণ করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই, তবে—তবে কি আর করিতে পারি, অন্তত দুইহাত তুলিয়া ব্রিটিশসরকারকে আশীর্ব্বাদ করিব না।

শান্তপ্রকৃতি লোকেরা বলিবেন, এখনি এত ভয় পাইবার প্রয়োজন কি? কেবল প্রস্তাবমাত্র হইয়াছে, এখনো ত পাকা হয় নাই।

কিন্তু সময় যে খারাপ, এ যে কালবৈশাখ। উত্তরপশ্চিমে প্রথমে অল্প একটুখানি মেঘ উঁকি দেয় মাত্র, তাহার পরে সামাল-সামাল করিতে করিতেই যে ঝড় আসিয়া পড়ে। এমন যে বারবার ঘটিতেছে। এই হতশ্রী দেশে মন্দ যদি একবার দেখা দেয়, সে যে আর যাইতেই চায় না; ম্যালেরিয়াই বল, প্লেগ্‌ই বল, আর অন্য যা-কিছুই বল, ছুটির সময় হইলেও আবার মেয়াদ বাড়াইয়া লয়। লক্ষ্মীই চঞ্চলা, কিন্তু অলক্ষ্মীর স্বভাবটা ঠিক যে তাহার উল্টা। তাই আশঙ্কা হইতেছে, কমিটির মন্তব্যের এই যে এগারো প্যারাগ্রাফটি, বুঝি বা ইঁহাকে ঠেলিয়া নাড়ানো সহজ হইবে না।

বিশেষত দেখা যাইতেছে, এটা একটা খাপছাড়া ব্যাপার নয়—আমাদের ভাগ্যগগনে ধূমকেতুর পুচ্ছটা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মুণ্ডটা পর্য্যন্ত সমস্তটা যেন ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—সুতরাং এখন ইহাকে স্বপ্ন বা মায়া বা মতিভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বোঝা যাইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের

দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাটা যে আমাদের চরিত্রগত দোষ, তাহা লইয়া কিছুদিন হইতে কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। দোষ সংশোধন করা আমাদের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। বেদনা যেখানে, ভয় সেখানে বেশি, সুতরাং সন্দেহ সেখানে স্বাভাবিক। রাশিয়া একটু নড়িলে-চড়িলেই অমনি ইংরেজ সন্দেহ করেন, বুঝি ভারতবর্ষের দিকে সিঁধকাটি অগ্রসর হইতেছে—এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকেরা কতদিন তাহাকে কতই আশ্বাস দিয়াছে, কত ভর্ৎসনা করিয়াছে, কিন্তু স্বভাব কিছুতেই যায় না—পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতকশোপযানং—তাহার কারণ, এই সাম্রাজ্যটুকুর প্রতি ইংরেজের অত্যন্ত দরদ। আমাদেরও যেখানে দরদ, সেখানে আমরা তাঁহাদেরই মত দুর্ব্বল, সেখানে আমরা সতর্ক না হইয়া বাঁচি না। আজ সমস্ত য়ুরোপ পরস্পরের প্রতি সন্দেহে কামানে-বন্দুকে আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে—আর আমরা হীনশক্তি জাতি, প্রবল রাজার ইচ্ছাধীন হইয়া আছি, শুধু ইচ্ছাধীন নহে সন্দেহাধীন হইয়া আছি, আমরা মাঝে মাঝে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কাগজে লিখি ও সভা ডাকি, রেজোল্যুশন্ জারি করি ও মেমোরিয়াল্ পাঠাই মাত্র—তাহাতে জগতে ক্ষতিও কাহারো নাই, খরচও বেশি হয় না, ফলও অতি অল্পই পাওয়া যায়, লাঞ্ছনা যথেষ্টই ঘটে -তবু স্বভাব যায় না -সে স্বভাব প্রাচ্য-স্বভাব নহে, মনুষ্যস্বভাব।

স্নেহের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সন্দেহ করাটা কেবল যে স্বাভাবিক, তাহা নহে, তাহা কর্ত্তব্য। মাতা ছেলের গলায় সোনার কণ্ঠি পরাইয়া বাহিরে পাঠাইতে গেলে সন্দেহ করেন যে, যে ব্যক্তি পর, তাহার কাছে আমার ছেলের প্রাণের চেয়ে তাহার সোনার কণ্ঠি বেশি মূল্যবান্ মনে হইতে পারে। পরের প্রতি তাঁহার এই সন্দেহ অন্যায় হইলেও, অতিমাত্র হইলেও, ছেলের রক্ষার পক্ষে ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য। সরকারের সকল মৎলব যখন আমরা বুঝি না এবং বোঝা সম্ভবও নহে, তখন দেশের প্রতি মমত্ববশত মন্দটা সন্দেহ করিয়া বসা যে অন্যায় হয়, তাহা নয়। মনেই কর না কেন, তিব্বতীরা যদি তাহাদের দেশে ইংরেজের পরম বৈষ্ণবভাবের সাত্ত্বিক অভিযান peaceful mission এর কথা একেবারেই বিশ্বাস না করিয়া গোরাদের তরফে কিছু ক্রূর মৎলব ছিল, এইরূপই সন্দেহ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের প্রাচ্য পূর্ব্বপুরুষ ধরিয়া তাহাদিগকে কটু কথা বলা কি সকলের মুখে মানাইবে? ব্যাধের নিরীহভাবে অত্যন্ত পা টিপিয়া-টিপিয়া চলা সত্ত্বেও সন্দিগ্ধ পাখী যখন উড়িয়া যায়, তখন শিকারী তাহাকে দুষ্ট বলিয়া গালি দেয় শুনিয়াছি—কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ব্যাধ না হইত, তবে এত রাগ করিয়া পাখীকে গালি দিত না,—সে সকরুণচিত্তে বলিত, সন্দিগ্ধ সতর্কতা বেচারী পাখীর পক্ষে প্রাণরক্ষার একটা উপায়। বিশেষত এও একটা ভাবিবার কথা যে, পাখী যদি সন্দিগ্ধ ও সতর্ক না হয়, তবে আজ যে ব্যক্তি ব্যাধ

নয়, কাল তাহারো শিকার করিবার প্রলোভন জাগিয়া ওঠে।

যাই হোক, ভালই বল আর মন্দই বল, এই অতি ক্ষুদ্র একাদশ প্যারাগ্রাফটিতে আমাদের মনে বৃহৎ সন্দেহ জন্মিয়াছে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারত-সরকারের ১৯০৪ শালের রেজোল্যুশনের অত্যন্ত সুকোমল থাবার মধ্য হইতে অদ্য এই যে কমিটির ক্ষুদ্র পঞ্চনখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য সাধু হইতে পারে, তবু আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না।

কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয় ত চান, কিন্তু কমিটিও যে বিশুদ্ধভাবে সেই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন, সে কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত, যদি দেখিতাম কর্তৃ-পক্ষের স্বদেশেও তাঁহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে। তাঁহাদের শাস্ত্রে বলে, charity begins at home, বদান্যতা ঘর হইতে সুরু হয় এ স্থলে ঘরের চেয়ে পরের প্রতি বদান্যতার মাত্রাধিক্য দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

ইংরেজের দেশেও চাষা যথেষ্ট আছে এবং সেখানে যে ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয়, তাহা সকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজের বাক্য উদ্ধৃত করিব। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আসামের আমেরিকান্ মিশনরিগণ যখন আসামের বিদ্যালয় হইতে বাংলা পড়ানো উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, তখন সেখানকার স্কুল ইন্স্পেক্টর রবিন্সন্সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। সেই প্রতিবাদের এক স্থানে ল্যাঙ্কা-শিয়রের চাষীদের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন :—

Is there not some difference between this language and that used by Johnson? The Orthography appears different, the grammatical forms are different; the vocables themselves, as here given, it would be impossible to find in any dictionary of the English language. * * * * Call this a distinct language, the vernacular dialect of the people, having more points of difference from, than of resemblance to, the language usually known as the English, and proceed to prepare school-books in it?

রবিন্সন্সাহেব এম্‌নিভাবে লিখিয়াছেন, যেন এ সম্বন্ধে কোনো তর্কই উঠিতে পারে না। বস্তুত আজিও ল্যাঙ্কাশিয়রের উপভাষায় ল্যাঙ্কাশিয়রের চাষাদের বিশেষ উপকারের জন্য পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন হইতেছে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে চাষীদের শিক্ষা সুগম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ইংরাজিভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance। কিন্তু, সে দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অখণ্ডতারক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই—সুতরাং সেখানে ভাষাকে চারটুক্‌রা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ

ক্লেশলাঘব করার কল্পনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্ধিমানের একত্রসম্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতেই পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্যদেশে রাজপুরুষ ভাবিতেছেন চাষার পরিশ্রম বাঁচাইবার কথা, আর আমরা ভাবিতেছি সেই সঙ্গে ভাষার ঐক্য বাঁচাইবার উপায় ;—যাহা এক ভাবনার অন্তর্গত হওয়া উচিত ছিল, তাহা দুইখানা হইয়া গিয়া বিপদ্ বাধিয়াছে। দুই পক্ষ যদি সমকক্ষ হইত, তাহা হইলেও আজ আমাদের এত উদ্বেগ জন্মিত না। আমরা জানি, গবমেণ্টেব রেজোল্যুশন এবং আমাদের রেজোল্যুশনে বস্তু ও ছায়ার মত প্রভেদ গবর্মেণ্টের রেজোল্যুশন্ আকাশের বজ্র আর আমাদের সভাস্থলের রেজোল্যুশন্ রঙ্গমঞ্চীয় বজ্রের ব্যঙ্গমাত্র—তবু, বিপদের সময়, যে ব্যক্তি অসহায়, সে খানিকটা ঝট্‌পট্ করিয়াও বাঁচে, আমরাও তাহাই করি অতএব আসন্ন সঙ্কটের সময় আর কিছু না হয় ত একটা রেজোল্যুশন্ উত্থাপন ও একখানা মেমোরিয়াল্ পাঠাইবার উদ্যোগ করা যাইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা মনে হয় এই যে, আমাদের পক্ষ হইতে যিনি সভাস্থলে রেজোল্যুশন্ উত্থাপন করিবেন, তিনি তদুপলক্ষ্যে তর্কটা তুলিবেন কি? আমাদের তরফের কোন্ কথাটা তিনি পরিষ্কার করিবেন?

সেদিন লাটসাহেব পূর্ব্বদেশকে খোঁটা দিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বদেশের মনের ভাব পশ্চিমদেশ বুঝিতে পারে না। তাঁহাদের বর্ত্তমানকালের কবিগুরু কিপ্লিঙের শাস্ত্র হইতে তিনি এই সারশিক্ষা উদ্ধার করিয়াছেন। যেখানে পরস্পরের মধ্যে এমনতর না বুঝিবার সম্বন্ধ আছে, সেখানে শাসনকার্য্য চালানো কঠিন—এমন অবস্থায় আমাদের দুরবগাহ প্রাচ্যভাবগুলিকে যদি আমরা পাশ্চাত্যবুদ্ধির উপযুক্ত সুগম করিয়া না তুলি, তবে আমাদের পক্ষে বিপদ্।

কিন্তু যে আশঙ্কা মনে লইয়া আজ আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার মধ্যে প্রাচ্য দুর্বোধ্যতা ত লেশমাত্র নাই—এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের চেয়ে তাঁহারা কম বোঝেন। জনসাধারণের শিক্ষার উপসর্গ লইয়াই হোক বা যে উপলক্ষ্যেই হোক, দেশের উপভাষার অনৈক্যকে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাকা করিয়া তুলিলে তাহাতে যে দেশের সাধারণ মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পাশ্চাত্য কর্ত্তৃপক্ষেরা, এমন কি, তাঁহাদের বিশ্বস্ত বাঙালীসদস্য, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালই বোঝেন।

কর্ত্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের বাঙালি পারিষদ বলেন, তোমাদের সাহিত্যভাষা বড় বেশি Sanscritized—সংস্কৃতান্বিত। এইজন্যই কৃষিপল্লীর পাঠশালা হইতে তাহাকে নির্ব্বাসিত না করিলে, চাষার ছেলেদিগকে observer, thinker এবং experimenter বীক্ষণপর, মননশীল ও পরীক্ষাপটু করা যাইতে পারিবে না।

পূর্ব্বতন যুগে য়ুরোপে হঠাৎ যখন এক-সময়ে শিল্পসাহিত্যের একটা যেন বান আসিয়াছিল, সেই সময়কার য়ুরোপীয় নাম "রেনেসাঁস্"—সেই রেনেসাঁসের বন্যার মুখে ষোড়শ শতাব্দীতে বিস্তর লাটিনমূলক কথা ইংরেজিভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

আমাদের দেশে প্রাচীনভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির এরূপ আকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃতভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে। অন্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্ম্মসাহিত্যের একমাত্র প্রস্রবণ সংস্কৃত। পুরাণপাঠ, কীর্ত্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, তর্জ্জা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের সাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই স্বভাবতই সংস্কৃতকথাকে দেশের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের, ভাবসম্বন্ধের পথ চিরদিন অবারিত আছে। বর্ত্তমানকালেও দেশের বিদ্বানেরা যে ভাষার মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, যে ভাষায় দেশের সমস্ত ভদ্রসম্প্রদায় তাঁহাদের বীক্ষণা শক্তি, মননা শক্তি, পরীক্ষণা শক্তির সমস্ত ফলকে বিস্তীর্ণ দেশ ও বিস্তীর্ণ কালের জন্য স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই ভাষার সহিত নিম্নসাধারণের চিত্তের যোগ কৃত্রিম বাধার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এ কথা বলিলে অবশ্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে—কিন্তু চাষাদের মঙ্গলের পক্ষেও ইহা প্রয়োজনীয়, এ কথা স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় বলিলেও বিশ্বাস করিব না। যদিও তিনি বাঙালি, এবং বাঙালি হইয়াও বাংলাদেশের ভাষাকে চারখানা করিবার জন্য ছুরি তুলিয়াছেন, এবং যদিও তিনি Brutusএর মতই honourable man, তথাপি তাঁহার হস্তে এই গুপ্ত আঘাত পাইবার কালে আজ তাঁহার মাতৃভাষা বলিয়া উঠিয়াছে—"Et tu Brute!" তুমিও গুপ্তমহাশয়!

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে মিশনরীদের সঙ্গে আসামে বাংলাভাষাপ্রচলন লইয়া তখনকার শিক্ষাবিভাগের বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময়ে আসামে রাজস্ববিভাগের কমিশনার ছিলেন, ফ্রান্সিস্ জেকিন্স্। ইনি এই সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্মেণ্টের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই——"if in England it is now a matter of deep regret that we have so long neglected to teach our language to the Irish and Welsh, and thus made them one people with ourselves, it must be equally the policy and duty of the Government of India, by all means in its power, to assimilate the many nations and tribes under our rule into one people; and if the early introduction of Bengali into the lately-conquered Province of Assam has been in any degree productive of binding this people closer to the people of our earlier acquired Provinces, and of putting them on the same footing of civilization, I think the Government will have cause to rejoice at the chance or the necessity which led Messrs. Scott and Robertson to

adopt that as the official language of our Courts.

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ! নিতান্ত ত প্রাচীনকাল নয়, কিন্তু সে সময়ে কি সত্যযুগ ছিল! স্কেক্স্পিস্ সাহেবের এই পত্রাংশের মর্ম্ম অনুসারে এখনকার ভারতরাষ্ট্রনীতি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইংরেজ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখনকার কমিশনারসাহেব ইংরেজশাসনে ভারতের বিচিত্রজাতিকে এক করিবার সঙ্কল্প গৌরবের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন; আর এখন এ কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত যে সকল প্রদেশ এক, তাহাদিগকেও বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে!

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজরাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাটবাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম্ম, সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়—এবং—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই একপক্ষের সুবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্য্যয় আপনিই ঘটাইবে; নিরস্ত্র, নিঃসত্ত্ব, নিরন্ন ভারতের দুর্ব্বলতাই ইংরেজসাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতিকে বড় করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। বিশেষত লোভ যখন বেশি হয়, তখন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুব্ধভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ—ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়—চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত, তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে দুর্ব্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জ্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্

সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে সময়ে ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্, শেলি, কীট্‌স্‌, টেনিসন্‌, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপ্‌লিং হইয়াছেন কবি; যে সময়ে কার্লাইল্‌, রাস্কিন্‌, ম্যাথ্যু আর্নল্ড্‌ আর নাই, একমাত্র জন্‌ মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে সময়ে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের বজ্র-গম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না,—একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে সময়ে বীর্য্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশি-কতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও দুঃসময় বলিব কি না বলিব, তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভাল করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয়, তাহা দরখাস্ত দ্বারা হয় না; যাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক, তাহার জন্য বাক্যব্যয় করিলে কোনো ফল নাই; এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই বিধাতা দুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বুঝিব, ততদিন দুঃখ হইতে দুঃখে, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি, সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব, যাহার দ্বারা তাঁহারা এক মুহূর্ত্তে আশ্বস্ত হইবেন? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্তকাল আমা-দিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন, ইহাই আমা-দের একমাত্র শ্রেয়? যদি-বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন যে, এমন কথায় মুহূর্ত্তকালের জন্য শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারিবে? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পর্য্যন্ত না আমাদের নানাজাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে, স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, সে পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমা-দের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয়স্বার্থের দিকে তাকাইয়া—সেই স্বার্থকে যত বড় নামই দাও না কেন, না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়া-লিজ্‌ম্‌ই বল—যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারতরাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চ-অঙ্গের ধর্ম্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কি জবাব আছে? এ কথাটা যে সত্য যে, আমাদের

দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান্, বলবান্ হইয়া উঠিতেছে, এই সাহিত্য ক্রমশই অল্পে অল্পে সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। যে সকল জ্ঞান, যে সকল ভাব কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, তাহা আপামরসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; এক সময়ে যে সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালের মুখস্থকথামাত্র ছিল, এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাষায়, স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে! আমরা কি বলিতে পারি, না, তাহা হইতেছে না, এবং বলিলেও কি তাহাতে কাহারো চোখে ধূলা দেওয়া হইবে? জ্বলন্ত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে, না, তাহার আলো নাই?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যস্রোতকে অন্তত চারটে বড়-বড় বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিস্তেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কি বলিতে পারি? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। যখন বাংলাদেশকে দুই অংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তখনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যখন বনস্পতির ডাল কাটে, তখন যদি বনস্পতি বলে, আহা, কি করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে! তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে, তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিশু! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে!

আমরা জানি, পার্লামেণ্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষের জবাব দেয়; সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুসি হয়। আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, এখানেও ফললাভের উপায় সেই একই।

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বামহাত-ডানহাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেমনি একই? গবর্মেণ্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে, আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে? তাঁহারা যে ডাল নাড়া দিলে যে ফল পড়ে, আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না; এ সম্বন্ধে মিল্ কি বলিয়াছেন, স্পেন্সর্ কি বলিয়াছেন, সীলি কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার শিকিপয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষশাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই, নিজের মনের মধ্যেই একবার দৃষ্টিপাত কর না। যখন য়ুনিভার্সিটি বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন আমরা কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম? আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্মেণ্ট আমাদের বিস্তার

উন্নতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন এরূপ করিতেছেন? কারণ লেখাপড়া শিখিয়া আমরা শাসনসম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি। মনেই কর, আমাদের এ সন্দেহ ভুল, কিন্তু তবু ইহা জন্মিয়াছিল, তাহাতে ভুল নাই।

যে দেশে পার্লামেণ্ট্ আছে, সে দেশেও এডুকেশন্ বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল—কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষালাভের একটা অনিবার্য্য ফল এই যে, ইহার দ্বারা লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তিসম্বন্ধে তাহার মন সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এত-বড় বালাইকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। কখনই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধন-সম্বন্ধে পরস্পর ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবামাত্র তাহার ফল হাতে-হাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কার্য্য করা একই।

আমাদের দেশে সে কথা খাটে না। কারণ, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম এবং আমরা কর্ত্তা নহি। তার্কিক বলিয়া থাকেন—"সে কি কথা! আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর, আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না কেন! আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।" গোরু যে নন্দ-নন্দনকে দুইবেলা দুধ দেয়, সেই দুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে সেই দুধের হিসাব তলব না করে! কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাত্মাই জানে এবং তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

শাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে কর না কেন, ফরাসিরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মৎলব করে, তবে ফরাসি-প্রেসিডেণ্ট্কে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশও শোনায় না—তখন ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নানা-প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—এই-জন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জর্ম্মণি যখন ইংলণ্ডের বন্ধু ছিল, তখন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজরাজদূত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়া-ইয়া জর্ম্মন্‌রাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল, যেদিন মোগলসভায়, নবাবের দরবারে ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থব্যয়, বহু গুপ্তকৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জ্বালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্য প্রসন্নতার সহিত গায়েই মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মত নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা দেখিতে

হয়, তবে কি আন্দোলনের দ্বারাতেই তাহা সফল হইবে? যে দুধের মধ্যে মাখন আছে, সেই দুধে আন্দোলন করিলে মাখন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাখনের দুধ রহিল গোয়াল-বাড়ীতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতেও কি মাখন জুটিবে? যাঁহারা পুঁথিপন্থী, তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন—আমরা ত কোনোরূপ সুযোগ চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। মনে কর, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যায্যস্বত্বও যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেণ্ট বলিতে ত একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছে—তাঁহারা যে ন্যূনাধিকপরিমাণে ষড়্‌রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদ্বেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এদেশে আসেন নাই। তাঁহারা অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্যায়সংশোধনের সুন্দর উপায়, এমন কথা কেহ বলিবেন না। এমন কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতেও উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহস করেন না, জজের মন বুঝিয়া অনেকসময় ভাল তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেকসময় বিচারকের কাছে মৌখিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়—তাহার কারণ, জজ্ ত আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মনুষ্য। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্‌পাত করাও প্রয়োজন হইবে না?

কিন্তু আমাদের যে কি অবস্থা, কি উদ্দেশ্য এবং কি উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদিবা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিকাল্ কর্ত্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুলবালকের ডিবেটিং ক্লাব্ গবর্মেণ্ট্ যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এখানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য্য নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি।

মনে করিয়াছিলাম, আমিও আজ ডিবেটিংক্লাবে দাঁড়াইয়া বাহবা লইব; য়ুরোপের নানা ইতিহাস হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, জাতীয়মিলন ও সাহিত্যের একভাষা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় দিয়া দেশের ঐক্যচেষ্টাকে সফল করিয়া তোলে। গ্রাম আপনার সঙ্কীর্ণ ব্যবহারের জন্য যেমন স্বভাবতই আপন সঙ্কীর্ণ উপভাষাকে গড়িয়া তোলে, দেশ তেম্‌নি আপন বৃহৎ ব্যবহারের জন্য আপন সাহিত্যভাষাকে স্বভাবতই গড়িয়া তুলিতে থাকে। এক কুটীর হইতে আর এক কুটীরে, এমন কি, এক পল্লি হইতে আর এক পল্লিতে যাইবার জন্য রাজপথের প্রয়োজন না হইতে পারে—সেখানে মেঠো রাস্তা, পদচিহ্নিত পথই যথেষ্ট;—কিন্তু

যেখানে ব্যাপক বাণিজ্যের বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে, যেখানে দেশ হইতে দেশান্তরে, গ্রাম হইতে নগরে যাইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে, সেখানে পাকা-রাস্তা, বড়-রাস্তা তৈরি না হইয়া থাকিতে পারে না। চাষাপাড়ার বেড়া তুলিয়া-দিয়া পল্লিবাসীদিগকে এই পাকা-রাস্তার ব্যবহার হইতে নিরস্ত করিলে তাহাদের দুইবেলার ঘোরো কাজ, মেঠো প্রয়োজন যে একপ্রকার চলিয়া না যায়, তাহা নহে; কিন্তু দিনে দিনে চাষা বিষম চাষা এবং পল্লি ঘোরতর পল্লি হইয়া উঠিতে থাকে। বিলাতে দেখিতে পাই, কারখানার মজুরদিগকে শিক্ষিত সাধারণের সহিত সমান উন্নতির অধিকারী করিবার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষার আয়োজন চলিতেছে। যদি তাহাদিগকে উপভাষা ও অপভাষার সীমার মধ্যেই বদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তবে সুবিধার দোহাই দিয়া মস্ত একটা অসুবিধাকেই খাড়া করিয়া তোলা হইত না? একটা ভাষার জায়গায় চারটে ভাষা? কিন্তু এককেই যদি ত্যাগ করিতে হয়, তবে চারটেই বা কেন? চল্লিশটাই বা নয় কেন? কেবলমাত্র চারগুণ সুবিধায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া চল্লিশগুণ সুবিধাই বা ছাড়া যায় কেন?

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রণীত "সেকালের কথা" নামক একটি সুন্দর সচিত্র বই বাহির হইয়াছে। পাঠকেরা সেই গ্রন্থে একটি কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিবেন, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন 'ষ্টাইগোসরাস্'। প্রকৃতি তাহাকে লইয়া এক অদ্ভুত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার দেহাবশেষ হইতে প্রমাণ হইয়াছে, তাহার মাথায় যেমন একটা মস্তিষ্ক ছিল, তেম্নি তাহার কটিদেশেও একটা মস্তিষ্ক ছিল। তাহার উত্তমাঙ্গে এবং অধমাঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্ক স্থাপন করিয়া এই জীবটির ল্যাজার দিকে অথবা মুড়ার দিকে যে বিশেষ একটা অসাধারণ সুবিধা হইয়াছিল, তাহা মনে করি না। প্রকৃতি এই সমস্ত খেয়াল এখনকার দিনে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন জীবলোকে এক মস্তিষ্কেই তিনি ল্যাজামুড়া উভয়কেই চালনা করিয়া দিব্য সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু আমাদের কমিটির বিধকর্ম্মা আমাদের নিম্ন অঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র মস্তিষ্ক যোজনা করিয়া আমাদিগকে আধুনিক জীবশ্রেণীর বাহিরে ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ অনাবশ্যক অমিতাচার আধুনিক কালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া নানা পুঁথিগত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলাম।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কমিটিতে যে পাঁচজন যোগ্যলোক বসিয়াছিলেন, এমনতর ইস্কুলমাষ্টারি করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিবিদ্যাকে অপমান করিব কোন্ সাহসে? পেড্‌লার্‌সাহেব শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা, তাঁহাকে বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হইলেও তাহা অশিষ্টতা হইত। অনরেবল্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়কে সিভিল্‌সর্ভিসে প্রবেশ করিবার জন্য যে-পরিমাণ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মের পক্ষে তাহার অধিকাংশই অত্যাবশ্যক নহে—তবু গবর্মেণ্ট ব্যাবসায়িক প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি বিদ্যা গুপ্তমহাশয়ের নিকট জোর করিয়া দাবি করিয়া-

ছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার ক্লেশলাঘবের জন্য কোনো কমিটির পরামর্শ লইয়া কোনো সহজ উপায়ের সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহাকে এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে গেলে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইবে যে, চাষাকে thinker, observer ও experimenter করিতে গেলে উপভাষায় কেবল গ্রামের গোটাকতক বিষয়েই তাহার জ্ঞানকে বদ্ধ করিলে যথেষ্ট হয় না। এ কথা শুনিতে স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু ইহা সত্য যে, মানুষের যতটুকু আবশ্যক, তাহার চেয়ে তাহার আবশ্যক আরো অনেক বেশি এবং সে যতটুকু পায়, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার পথ তাহার নিকট নিয়ত অবারিত রাখা প্রয়োজনীয়।

একটা কথা এই উঠিতে পারে, আমাদের দেশের চাষাকে মনুষ্যত্বের সমস্ত সুবিধা দিবার জন্য এত বাড়াবাড়ি করিবার দরকার নাই, আপাতত চাষাত্বের যতটুকু সুবিধা তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহারি চেষ্টা করা যাক্। আচ্ছা, তার বেশি আর কাজ নাই। যেটুকু বিদ্যাতে তাহারা কেবল জমিদার ও মহাজনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সেই পর্য্যন্তই ভাল, বিদ্যা যতদূর বাড়িলে তাহারা একদিন পুলিস্ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতেও নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারে, ততদূর নাই গেল। কিন্তু জমিদার কোন্ ভাষায় কাগজপত্র রাখে? পাট্টা-কবুলতি লেখা হয় কোন্ ভাষায়? নগরবাসী জমিদারকে দরখাস্ত লিখিবার সময় কোন্ ভাষায় লিখিলে চাষার সুবিধা হইতে পারে? তা ছাড়া, চাষার কুটুম্বিতা যে তাহার গ্রামগণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে, এমন কোনো কথা নাই। এক জেলার চাষা তাহার ভিন্নজেলার জামাতাকে কি ভাষায় পত্র লিখিবে? যদি বল, এখনি বা কয়জন চাষা পত্র লেখালেখি করে? নিজে না-ও করিতে পারে, কিন্তু সে যাহাকে দিয়া পত্র লেখায়, তাহার ভাষা, তাহার জামাতা যাহাকে দিয়া পড়াইয়া লয়, সে অনায়াসে বুঝিতে পারে। মনে কর, উত্তরদেশের পল্লিবাসী দক্ষিণদেশের সহরে চাকরি করে, সে বেচারা দক্ষিণদেশী মুহুরির সহায়তায় যে পত্র তাহার পাড়ার লোককে লিখিবে, পাড়ার লোকে সে পত্র স্পষ্ট বুঝিবার জন্য কোথায় ছুটাছুটি করিয়া মরিবে? সাহিত্যভাষা শিখিবার যেটুকুমাত্র অতিরিক্ত পরিশ্রম, তাহার তুলনায় এই সমস্ত দেশব্যাপী নানা ছোট-বড় সম্বন্ধজালের ছেদসাধন যে কতবড় গুরুতর অসুবিধা ও অনিষ্টকর, তাহা কি সত্যই কমিটির পাঁচজন বুদ্ধিমানে বোঝেন না?

বোঝেন না বলিলে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা হইবে এবং বোঝেন বলিতে গেলে কটুতর সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইবে, আমি ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত নহি। অতএব আমি ও পথেই যাইব না। আমি আজ আমার দেশের লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি—আমার যা-কিছু বক্তব্য, সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে, এই সমস্ত বাদবিবাদের উন্মাদনা, এই সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার এক-

দিনের জন্যও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জ্বালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে? আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন- ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছোট আঘাত নানাদিক্‌ হইতে আসিয়া পড়ে— হাতে-হাতে প্রতিশোধ বা উপস্থিত প্রতিকারের জন্য দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দ্দিকের ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যখন হঠাৎ এখানে বেদনা, ওখানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তখনি তখনি সেটা নিবারণের জন্য রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জ্বালাযন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে, তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেম্‌নি প্রত্যেক তাড়নার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোযোগী হই। সেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই—কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বৃথাতৃপ্তি, তাহাই ভোগ করিবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হই নাই, আমি দুটো একটা গোড়ার কথা স্বদেশীলোকের কাছে উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া এই সভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। যে জাতীয় কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে বারংবার ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক-শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্য উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আধার-ক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেষ্টা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোন্‌দিন কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেকবার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত বজ্র পড়িতেও পারে, না ও পড়িতে পারে; দ্বিতীয়ত যেখানে বজ্রপড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে আমার গতিবিধি নাই, আমার পরামর্শ, প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না; তৃতীয়ত বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পাল্টা জবাব দেওয়া নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য; যেখান হইতে বজ্র পড়ে, সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তাম্রদণ্ডটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে

বিচারপূর্ব্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তুত আজ যে পোলিটিকাল্ প্রসঙ্গ লইয়া এ সভায় উপস্থিত হইয়াছি, সেটা হয় ত সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ - কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আশ্চর্য্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ যাঁহার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম, তিনি সাড়া দিলেন না—অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম, ইঁহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আসিবেন, তাঁহার যদি দয়ামায়া থাকে। তিনি যদি-বা দয়া করেন, তবু আশ্বস্ত হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আসিয়া দয়ালুর দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাত-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড় অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায়?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। "সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়" বলিয়া পতঙ্গ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে। সে স্থলে ধর্ম্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্ত্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক দুটো পেরেক ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে—আমরা সূক্ষ্ম তর্ক করিতে এবং নিখুঁৎ ইংরাজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইহার অন্যথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক্, রাগারাগি করা চলে না।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিসাবের মধ্যে আনিয়া ব্যবসা করা চলে না। হাতের কাছে একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। সেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র খৃষ্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—আইনঘটিত ত্রুটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে মিশন্ সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দু ভ্রাতা আইনের বিরূপতাসত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতার অভিপ্রায় স্মরণ করিয়া এই লাখটাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া খৃষ্টানধর্ম্মের উন্নতির জন্য টাকা দিব কেন—আইনমতে যাহা আমার, তাহা আমি ছাড়িব না। এ কথা বলিলে তাঁহাকে নিন্দা করিবার জো থাকিত না, কারণ সাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই সমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম্ম আছে, সেখানে সমাজের কোনো দাবী খাটে না, সেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্ত্বের জোরে যান, মহত্তের গৌরবই তাই; তাঁহার ওজনে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিতদেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে সকল সর্ব্বসম্মত

অধিকার আছে, তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভাল বাগ্মী,—যদি বলিত, বিজিত পরদেশীসম্বন্ধে অল্প-সংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক-আশঙ্কা-বশত যে সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে, তাহা আমরা করিব না, যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্বজাতির কাছে আমাদের গবর্মেণ্ট সকল বিষয়ে যেরূপ খোলসা জবাবদিহি করিতে বাধ্য, এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব; সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে; এদেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণই এ দেশবাসীর, আমরা যেন কেবলমাত্র খবরদারি করিতে আসিয়াছি, এমনিতর নিরাসক্ত-ভাবে কাজ করিয়া যাইব, তবে আমাদের মত লোককে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত অধম যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদধূলি পড়িবে, ততকাল আমরা ধন্য হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই, তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন খাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক্, আমরা মুড়ি খাই, তোমরা চাহিয়া দেখ অথবা তোমরা চাহিয়া দেখ, আমরা মুড়ি খাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মানুষকে মানুষের হিসাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে—সেই হিসাবে যা পাই সেই ভাল, তাহার উপরে যাহা জোটে সেটা নিতান্তই উপরি-পাওনা, তাহার জন্য আদালতে দাবী চলে না, এবং কেবলমাত্র "ফাকি দিয়া" সেরূপ উপরি পাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে দুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোট। সুদূর যুরোপের নিত্যলীলাময় সুবৃহৎ পোলিটিকাল্ রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে—ফরাসি, জর্ম্মান্, রুষ, ইটালিয়ান, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল তাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়, আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল্ ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রাগ-দ্বেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেণ্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক;—ইংরেজ স্রোতের জলের মত নিয়তই এদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করে, সেও স্বজাতির সঙ্গে—এখানকার ইতিবৃত্তচর্চ্চার ভার জর্ম্মানদের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জবানবন্দিসূত্রে, এখানকার সাহিত্যের

সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্মেন্ট-অনুবাদকের তালিকাপাঠে—এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোট, তাহা নিজের প্রতি মমত্ববশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হই, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্রুদ্ধ হন, কখনো বা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, ব্যাপারখানা এই—এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্ষুদ্র, তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনাকেও তাহার সাংঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপর-ওয়ালার যথেষ্টপরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর, তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমার একটুখানি ম্যুনিসিপালিটি লইয়া, আমার এই সামান্য য়ুনিভার্সিটি লইয়া আমরা ভয়ে-ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য্য হইতেছি, এত কলরবেও মনের মত ফল পাইতেছি না কেন? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে, সেখানে যদি যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোট দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জ্জন্‌সাহেব অমন অত্যন্ত সহজকথার মত বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়াল্‌তন্ত্রের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন? সর্ব্বনাশ, আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়সম্ভাষণের মত শুনাইতেছে। এই, অষ্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল্ আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্য্যাপ্ত প্রেমের সঙ্গীতে সে আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া নিজের রুটি পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য করিতে রাজি হইয়াছে—তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এতবড় অত্যুক্তিতে যদি কর্ত্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি! আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্তৃত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়াল্ বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে। কর্জ্জন্‌সাহেব আমাদের সুখ দুঃখের সীমানা হইতে বহু ঊর্দ্ধে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না, নিজের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছট্‌ফট্ করে কেন? এ কেমনতর—যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্য-সিন্দুরহস্তে লোক আসে এবং এই সাদরব্যবহারে ছাগের

একান্ত সঙ্কোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়— একি আশ্চর্য্য, এতবড় মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্যের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ, তাহা যে, সে একমুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছে না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগ-শিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্ত্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর! [ইম্পী-রিয়াল্‌তন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লবনিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া! বড়য়-ছোটয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিসাব যখন এক খাতায় রাখা হয়, তখন জমার অঙ্ক এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এম্‌নিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক— এবং যাহা স্বাভাবিক, তাহার উপর চোখ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি, "তুমি সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠ, তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব্ব কর", তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, "আচ্ছা, তোমার মুখে ধর্ম্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ-মনুষ্য-স্বভাবের যে নিয়তন কোঠায় আমি আছি, সেই কোঠায় তুমিও এস, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই—স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ কর—স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার, অন্তত আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও! তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!" এ কথা বলিলে তাহার কি উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কি দিতেছি, কে কি করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি—আলস্য-পূর্ব্বক তাহাও লই না। [দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জ্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই; ঘরের পাশে কি আছে জানিতে হইলেও হাণ্টার বই গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষিসম্বন্ধে বল, বাণিজ্যসম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনসম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্ত্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে, তাহার দায়িত্ব আছে, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই, এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনো যথার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না

এক পক্ষে টাকা আছে, অন্য পক্ষে শুদ্ধমাত্র চেক্‌বইখানি আছে, এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক্ ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না—ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, একএকবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল—কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হৌক, আর নিঃশব্দেই হৌক, গলাধঃকরণ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা রিরাট্‌সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড় কঠিন, তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্ব্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ্ নিজেকে অর্জ্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব কোথায়! পুরাতন কথা বলিতেছি,—এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব, আমি নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জ্জিত,—এ কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা বলেন যে, এ আবার তুমি কি নূতন কথা তুলিয়া বসিলে, তবেই আমার পক্ষে মুস্কিল—কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়! এমন কি, শুনিলে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশূন্য পদ্মার চরে অন্ধকার-রাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে, সেই জানে, যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে, যেম্‌নি আলো হয়, অম্‌নি সেই মুহূর্ত্তেই নিজের ভ্রমের জন্য বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকাররাত্রি—এখন এ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণ্যকথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন, তবে তাহাও সকরুণ-চিত্তে সহ্য করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা, তাহা নহে। আমাদের দেশে এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কি দিবেন, কাহাকে দিবেন, তাহার কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল

লক্ষ্য পাইত—আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চ্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দ্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য; আমাদের দেশে পরমুখাপেক্ষী কর্ম্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্য;—কোনো বিশেষ আইন রদ্ করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ প্রার্থনা সফল করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্য নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব, তাহাকে কার্য্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য যখন-তখন তাড়াতাড়ি দুইচারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টৌনহল্ মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই যে থাকিয়া-থাকিয়া চম্‌কাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে—আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ সম্বন্ধে গাম্ভীর্য্যরক্ষা করা আর ত সম্ভব হয় না। এই প্রহসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেণ্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সম্বন্ধেই শোভা পায়। আমি আরো উল্‌টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে—যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না, তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদানপ্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি, সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলি চাওয়া, আর এক পক্ষে কেবলি দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়? ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনোদিন নেবানো যায় না, সে ত শাস্ত্রেই বলে—এরূপ দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায়, বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অমঙ্গল, দাতার পক্ষেও তেম্নি অসুবিধা।

কিন্তু যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল—সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপোসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন-শক্তিতে দেশের মঙ্গলসাধনের উপায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়-পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেকেও একস্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার, তাহার শেষকড়া পর্যান্ত পাইতে পারি, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্যান্ত দিবার, তাহার শেষকড়া পর্যান্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া সকল কর্ম্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায়, তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দেওয়া বড় শক্ত। এই মনে কর, স্বায়ত্তশাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন্ আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্ত্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক্ এই কান্না! যাহা একজন দিতে পারে, তাহা আর একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্ত-শাসন হইয়া উঠিবে?

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে—কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি,—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই; এজন্য গবর্মেণ্টের চাপ্‌রাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না! তবে

চুলায় যাক্ স্বায়ত্তশাসন! তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই!

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব—তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না, যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।—তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ, কাড়িতেও ততক্ষণ—যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্তচিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি—রিপনের জয় হউক্ এবং কর্জ্জন্‌ও বাঁচিয়া থাকুন্!

আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম্ম দিবে কে? কর্ম্মও আমাদিগকেই দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্ব্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জ্জীব দুর্ব্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম্ম দিবে, সেই আমাদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না,—যে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে, সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না, ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্ত্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্ম্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কখনই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন, কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে—সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি দরখাস্তকাগজের নৌকা বানাইয়া সাতসমুদ্রপারে সাতরাজার ধন মাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারো-কারো কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকায় বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা কন্‌ষ্টিট্যুশনাল্ অ্যাজিটেশন্

নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড় কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায়, তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি—তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমস্ত দায়কে হাল্কা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারি করিয়া তোলা কর্ত্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যখন বিচার করিব, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অঙ্ককে যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উল্টাদিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলা ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক-উত্তেজনা-মূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্ত্তব্য হইতে, সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যখন রাগ করিয়া মকদ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তখন নিজের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলি উচ্চবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা হইলে ফললাভের লক্ষ্য দূরে গিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড় হইয়া উঠে। যথার্থভাবে, গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্যক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়—ছোট কথাকে বড় করিয়া তুলি—প্রত্যেক তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসঙ্গত অমিতাচারের দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্যদ্বারা দুর্ব্বলতার বৃদ্ধিই হয়—ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—স্বভাবের দুর্ব্বলতার উপরে নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের প্রতিও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্ব্বলতা, তাহাকে বড় নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি, তাহা নহে, গর্ব্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ, মাতাকে

তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্য্যভার যদি অন্যে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষারও যথার্থ লক্ষণ, দেশের হিতকর্ম্ম আগ্রহপূর্ব্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনোমতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষা যে আমাদের দেশে সুলভ নহে, এ কথা অন্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই, তাহা আছে ভান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করার ফল কি আছে? এ সম্বন্ধে উত্তর এই যে, দেশহিতৈষা আমাদের যথেষ্ট দুর্ব্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না—কারণ, সেরূপ অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমাদের এই দুর্ব্বল দেশহিতৈষাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার উপলক্ষ্য আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দ্বারাতেই প্রেমের চর্চ্চা হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে, যেখানে দেশ-জিনিষটা যে কি, তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না, যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোটো-বড়, দেশের পণ্ডিত-মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একস্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে একস্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ্ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যে একদিনেই হইবে—কথাটা পাড়িবামাত্রই অম্‌নি যে দেশের চারিদিক্ হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে খর্ব্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ সমস্ত কাজের লোকের গুণ—কাজ করিতে করিতে এই সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্টা হয়—এই সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতেই দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা, যত ক্ষুদ্র আকারে হোক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন সকল খাঁটিলোক, শক্তলোক যাঁহারা আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণকর্ম্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্ম্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দ্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্ত্তী সংসদ্‌কে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্ত্তৃত্বে বরণ করিতে

পারেন, তবে একদিন এই সংসদ্ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা কেবল কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া। এখনি আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্ম্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেষসম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না; আমি যাহা ব্যবহার না করিব, অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি, অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে; আমি যদি শক্তি অর্জ্জন না করি, অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলি ফাঁকি দিই; তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে—ইহা বিশ্বের অনিবার্য্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু যদি তুমি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব, তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আবাহন করা, এই মহৎ সৃষ্টিকার্য্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে—এজন্য আনন্দিত হও! নিজের শক্তির প্রতি আস্থাস্থাপন কর, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধারক্ষা কর এবং ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিকশিক্ষা চারখানা করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা দুঃখের বিষয়—কিন্তু শুধু কি নিরাশ্বাস দুঃখভোগেই এই দুঃখের পর্য্যবসান? ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম্ম নাই, আমাদের কোনো শক্তি নাই? শুধুই অরণ্যে রোদন? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুইটুক্‌রা করিতে গবর্মেণ্ট্ পারেন? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না? বাংলাভাষাকে গবর্মেণ্ট নিজের ইচ্ছামত চারখানা করিয়া তুলিতে পারেন? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না? এই যে আশঙ্কা, ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে? যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয়, তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না? সেই আমাদের সমুদয় চেষ্টার সম্মিলনক্ষেত্র, আমাদের সমুদয় উদ্যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের সমুদয় পূজা-উৎসর্গের সাধারণ ভাণ্ডার যে আমাদের নিতান্তই চাই। আমাদের কয়েকজনের চেষ্টাতেই সেই

হৎ ঐক্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে ারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। াহা দুরূহ, তাহা অসাধ্য, এই বিশ্বাসে কাজ রিয়া যাওয়াই পৌরুষ। এপর্য্যন্ত আমরা টা-কলসে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া ানিয়াছি, সেইজন্তই বারবার আক্ষেপ রিয়াছি,—এদেশে কাজ করিয়া সিদ্ধিলাভ র না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজিভাষায় রাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ াশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছি,—দেশের লোক মামার বিজ্ঞানসভার প্রতি এরূপ উদাসীন কন? ইংরেজিভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লাকে মিলিয়া রেজোল্যুশন্ পাস্ করিয়াছি, মথচ দুঃখ করিয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে াষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যবোধের উদ্রেক হইতেছে না কন? পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই র্ম্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তাহার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি,—এত কাজ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই া কেন? একবার যথার্থ কর্ম্মের সহিত থার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক্, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত যথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা াক্, তাহার পরেও যদি সফলতালাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব—

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

সঙ্কটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতাসম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগা দেশের বিনা পুরস্কারের কর্ম্মে দুর্গমপথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীরযুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি— রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয়শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে, সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু খনি আমাদের দেশের মর্ম্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি, তাহাদেরই নির্ব্বাক্ হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিম্নতম গুহার গভীরতম ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে?

একটি বিখ্যাত সংস্কৃতশ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্ত্তিত অনুবাদদ্বারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি পরে জানি
কমলা সদয়।
পরে করিবেক দান এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিস্মরি কর পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

এপার-ওপার।

আমি এপারের তীর, তুমি ওপারের
মাঝখানে বয়ে যায় নদী ;
আমি হেথা পড়ে' আছি,—তুমি আছ হোথা
কি অন্তর মাঝে নিরবধি।

নরনারী নিয়ে নিত্য খেয়াতরীখানি
পারাপার করে আনাগোনা ;
তাই সে তোমার সাথে, এতদূর থাকি
চিরদিন তবু জানাশোনা।

এপারের যাহা কিছু পাঠায়ে ওপারে
আপনি কৃতার্থ ধন্ত হই ;—
ওপারের পদধ্বনি শুনিবার লাগি
রাত্রিদিন সচকিত রই ;

তুমি ছাড়া আমি মিথ্যা, আমি ছাড়া তুমি
দু'য়ে তবে এপার-ওপার,
দেওয়া-নেওয়া, জানাশোনা, আনাগোনা দিয়ে
সার্থকতা তোমার আমার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।